

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১১

UCL
18/2/05

৪-৪৬

87

পত্রিকাধ্যক্ষ
প্রভাতকুমার দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৬

পত্রিকা প্রসঙ্গ

পাঁচ মাস পূর্বে ১৪১০ বঙ্গাব্দের সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশের সময় এই আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল, নতুন বছরের বিলম্বিত প্রথম সংখ্যাটি নিশ্চয় মাসস্থানেকের মধ্যেই প্রকাশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও কয়েকটি অপ্রত্যাশিত অসুবিধা অতিক্রম করে পত্রিকাটিকে যথা সময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারিনি, এই ব্যর্থতার দায় সর্বাংশে নিজের মনে করে অধ্যক্ষের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই। তবু পুনরায় জানাচ্ছি, পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাটি যতদূর সম্ভব দ্রুত প্রকাশের মধ্য দিয়ে চলতি বছরের শেষে দুটি পৃথক সংখ্যা প্রকাশের লক্ষ্যে তৎপর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি পরিষদের দুই প্রয়াত সভাপতি অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার বিশ্বাসের প্রতি স্মরণ-শ্রদ্ধার্থ্য হিসেবে প্রকাশ করার মুদ্রণ আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, এক মাসের মধ্যে সেটি প্রকাশিত হলে দীর্ঘবিলম্বিত সময়-পর্ব পূরণ হতে পারবে।

নিয়মিত প্রকাশ ছাড়াও আর একটি বিষয়ে সহদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। ইদানীং পত্রিকাটির প্রতি মনোযোগী যারা তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, শুধু শ্রীবৃদ্ধি নয় প্রকৃতপক্ষে গুণগত দিক থেকেও উন্নতমানের রচনার সংযোজন প্রতি সংখ্যার অন্যতর বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। রচনা সংগ্রহের বিষয়ে নিশ্চয় আরো একটি দিকেও আমাদের পরিকল্পনা সকলের চোখে পড়েছে, খ্যাতকীর্তি প্রবীণদের পাশাপাশি আমরা প্রতি সংখ্যাতেই নতুন এমন অনেক লেখককে স্থান করে দিতে চেয়েছি, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই কাজ করে যেতে ভালোবাসেন। তাছাড়া, এখন আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়ে উল্লেখ করতে গেলে, অবশ্যই বলতে হয় আহান মাত্রই সাড়া দিয়ে থাকেন স্বনামধন্য ও অল্পখ্যাত প্রবীণ-নবীন লেখকদের সংখ্যা অপ্রতুল নয়। ফলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি ঘটে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বছরে চারটে সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশের ব্যবস্থা হলে একটা পরিসর নির্দিষ্ট করেই প্রতিসংখ্যার পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা রূপায়ণ সম্ভব হবে। এখন কলেবর বিষয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আমরা ভেবে দেখতে চাইছি। পৃষ্ঠা সংখ্যা কমিয়ে পত্রিকার ব্যয়ভার নিয়ন্ত্রণ করা হবে, না বিজ্ঞাপনদাতা পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তা আর পরিষদের অসদস্য অথচ পত্রিকার প্রতি অনুরক্ত পাঠকবর্গের ক্রয়-দক্ষিণার উপর নির্ভর করে আর্থিক চাপ কমানো যাবে। এমনকী সদস্য যারা, তাঁদেরকে নিছকই নিয়মরক্ষার খাতিরে বছরে চারটি সংখ্যাই বিনামূল্যে দেওয়ার রীতি বদলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যদি না প্রস্তাবিত পূর্ববর্তী সূত্রে প্রাপ্ত উপার্জনের কারণেই পত্রিকার সামগ্রিক ব্যয় বহন থেকে পরিষদকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি না দেওয়া যায়। সর্বনিম্ন অনুরোধ, সকলস্তরের বিজ্ঞাপনদাতা এবং ক্রেতাসাধারণ এ বিষয়ে আনুকূল্য করে আমাদের সদিচ্ছা যাপনে সহায়তা করবেন। পরীক্ষামূলক ভাবে বর্তমান সংখ্যা থেকেই আমরা অতিরিক্ত মুদ্রণ ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বর্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে বিজ্ঞাপন সংগ্রহে আমরা চেষ্টা চালাতে আগ্রহী।



প্রণয় পুষ্টি সংগ্রাহক ও সম্পাদক মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিহারদ (১৮৭১ মতান্তরে ১৮৬৯-১৯৫৩)-এর বিষয়ে একালের বরণ্য ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্রর দীর্ঘ অথচ সুলিখিত নিবন্ধটি একটি শ্রমসাধ্য ও সমরোপযোগী গবেষণার ফসল। উল্লেখ্য, দেশে-বিদেশে নানা সভায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি

আলোচ্য রচনার কোনো কোনো অংশ পাঠ করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে উত্থাপিত কয়েকটি জরুরি প্রশ্নের সম্মুখীন করে, পুঁথিচর্চার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের সামনে তিনি অনেক ভাবনার সূত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন। স্মর্তব্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে সাহিত্য পরিষদের কিছু প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ও সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন এই মনীষী কর্মী, একদা *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার* সঙ্গেও লেখক হিসেবে যুক্ত ছিলেন একথা ভেবে আমরা যথেষ্ট গৌরব বোধ করতে পারি। ১৯২৬ বঙ্গাব্দে তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উদ্যোগে পরিষদের সহসভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সঙ্গে লগ্ন করে এরকম একটি মূল্যবান মননসমৃদ্ধ নিবন্ধ দিয়ে এ সংখ্যার সূচনা হল। বর্তমান সংখ্যার শেষতম নিবন্ধটি বর্তমান পত্রিকারই একটি পুরোনো সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত, এবং এ ঘটনা পূর্বপরিচিন্তিত না হলেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, শেষোক্ত নিবন্ধটির লেখক আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭৫ মতান্তরে ১৮৭২-১৯৬১ মতান্তরে ১৯৫৯) পরিষদের সহসম্পাদক পদে বৃত্ত ছিলেন ১৩২৩ থেকে ১৩২৬ পর্যন্ত কর্মকালে। একদা জাতীয়তাবাদ ও ভাষার বিতর্কে আব্দুল করিমের সঙ্গে প্রকাশ্য দ্বৈরথে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আলাওলের পুঁথি ও সময়কাল নিয়ে এই দুজনের বিতর্ক বিংশ শতকের তিরিশের দশকে নানা জায়গায় সাড়া জাগিয়েছিল। তাছাড়া উভয়েই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জন্মসূত্রে আব্দুল করিম ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার সূচক্রদপ্তী গ্রামের, গফুর সিদ্দিকীর জন্ম খাসপুব, বসিরহাট, চকিষ পরগণা—এই দুই স্থানের কোন ভাষাটি প্রকৃত মুসলমানি ভাষা হওয়া উচিত সে বিষয়ে দুজনের মধ্যে দীর্ঘকালের একটা বিরোধ ছিল। ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার-পর সিদ্দিকী খুলনা জেলার দৌলতপুরের কাছে দামোদর গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পুঁথি সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে শেষোক্ত জনের আলোচনা ও প্রবন্ধাদি সুধী মহলে এক সময় বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছিল। তাঁর লেখা *শহীদ তিতুমীর, বিবাদ সিন্দুর ঐতিহাসিক পটভূমি* গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ্য। শাহ গরিবুল্লার রচনাবলি তিনি প্রথম আলোচনা করেন—আলাওল বনাম শাহ গরিবুল্লার ভাষা নিয়ে এঁদের উভয়ের মতবিরোধ সমসাময়িক কালের সাময়িকীর পাতায় প্রবল আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। কর্মজীবনে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক, পিতার পুস্তক ব্যবসার তদারকি করতেন এবং সেসময় পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত মুসলমানি অনেক পুঁথি তিনি উদ্ধার করেছিলেন। প্রায় অষ্টাশি বছর পূর্বে প্রথম প্রকাশিত ‘মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য’ নিবন্ধটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে বিনামূল্যে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হল। আশ্চর্য এই সমা-পতন, শুরু এবং শেষের এই সংযুক্তি পাঠকদের কাছে আনন্দের হয়ে উঠবে আশাকরি।

জন্মশতবর্ষ পূর্তির লক্ষ্যে এবারে স্মরণ করা হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে একদা যুক্ত, ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রচারবিমুখ নিরলস কর্মীপুরুষ যোগেশচন্দ্র বাগলকে। প্রবীণ গবেষক-অধ্যাপক অলোক রায় তাঁর সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে যোগেশচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয়টি তুলে ধরেছেন। আর একটি নিবন্ধে তরুণ গবেষক-অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্য, তাঁর বিষয়ে অন্যতর পর্যালোচনায় যেমন তাঁর সনিষ্ঠ পাঠক-পরিচয়টি তুলে ধরেছেন, তেমন তাঁর গ্রন্থের পাঠকরাও কীভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয় দু-একটি সূত্র দিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র—*কম্বোজ* যুগের দুই সব্যসাচী লেখকের ছোটো গল্প নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল, সেও এই জন্মশতবর্ষ স্মরণপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করে। পত্র বিভাগে সংযুক্ত করা হল সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা একটি চিঠি, সেটিও এক অর্থে তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উপভোগ্য এক রসিকতায় প্রাস্ত এই মানুষটি তাঁর থেকে অনধিক তিরিশ বছরের কম বয়সী অপরিচিত এক তরুণ পাঠক হিরণ্ময় চক্রবর্তীকে এরকম একটি মজার চিঠি লিখেছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বিষয়ক নিবন্ধদুটিতে মুদ্রিত চিঠিগুলি ছাড়াও এই সংখ্যায় পৃথক দুটি গুচ্ছে মনীষী শিক্ষাচার্য ও ভাষাবিদ মণীন্দ্রকুমার বোয়ের (১৮৯৮-১৯৮৯) সঙ্গে তাঁর পুত্রতুল্য বাংলা বিদ্যাচর্চার বরণ্য শিক্ষক, কবি-প্রাবন্ধিক নাটককার সংকলন-সম্পাদক ও রসরচনায় দক্ষ শিশিরকুমার দাশের

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১১১ বর্ষ ১ সংখ্যা • বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১১

৪৭

পত্রিকাধ্যক্ষ
প্রভাতকুমার দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
১১১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১১
Sahitya-Parisat-Patrika
Vol. 111, No. 1 Baisak-Asaharh 1411
(Published on Agrahayan 1411, December 2004)

প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১১

৭২ ৪৪১৪

প্রকাশক :
শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ :
শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ৮০.০০ টাকা

সাহিত্য - পরিষৎ - পত্রিকা

১১১ বর্ষ ১ সংখ্যা • বৈশাখ - আষাঢ় ১৪১১

সূচিপত্র

পত্রিকা প্রসঙ্গ • প্রভাতকুমার দাস

লেখক-পরিচিতি •

বাংলা পুথিতালিকা নির্মাণ ও আত্মসত্তার রাজনীতি :

মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ • গৌতম ভদ্র ১

যোগেশচন্দ্র বাগল স্মরণে • অলোক রায় ৪৪

যোগেশচন্দ্র বাগল : পাঠক ও পঠিত • সুমন ভট্টাচার্য ৫০

শতবর্ষে বাংলা ছোটোগল্পের দুই শিল্পী • সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫৮

পত্রগুচ্ছ-১ (শিশিরকুমার দাশকে লেখা) • মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ৬৩

পত্রগুচ্ছ-২ (মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা) • শিশিরকুমার দাশ ৯৫

মণীন্দ্রকুমার-শিশিরকুমার : পত্র বিনিময় • নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১১৫

পত্র (শ্রীহিরণ্ময় চক্রবর্তীকে লেখা) • সৈয়দ মুজতবা আলী ১২০

প্রসঙ্গ : সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি পত্র • হিরণ্ময় চক্রবর্তী ১২২

দুর্গাপ্রতিমা : যুক্তিবাদীর বিনির্মাণে • জহর সরকার ১২৪

‘নৌকাপূজা’—শ্রীহট্ট-কাছাড়ের এক বিশেষ ধরনের

মনসাপূজা • অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৩২

সঙ্গতিসূত্র এবং মেদিনীপুরের উপভাষাবৈচিত্র্য • প্রকাশকুমার মাইতি ১৩৯

আর্য্যাবর্ত পত্রিকার ইতিহাস ও কালানুক্রমিক সূচি • অশোককুমার রায় ১৫১

সমকালে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর • সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮৪

বিস্মৃত এক সংগ্রাহক এবং একটি সংগ্রহালয়

গড়ে তোলার ইতিবৃত্ত • সুমেধা মিত্র ২০০

মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য • আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ২০৯

বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা :

রচনাপঞ্জি-২ • অশোক উপাধ্যায় সঙ্কলিত ২৩২

পরিষৎ-সংবাদ • প্র. ২৬৩

চিত্রসূচি

ক. নৌকাস্থিত দেবদেবী ও মর্তমানুষ

খ. নৌকাস্থিত দেবদেবী ও মর্তমানুষের পরিচিতি :

১ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, ২ ব্রহ্মা, ৩ বিষ্ণু, ৪ দক্ষরাজ, ৫ মহাকাল ভৈরব, ৬ নন্দী, ৭ ভূতনাথ (মহাদেব), ৮ ভৃঙ্গী, ৯ উমানন্দ ভৈরব, ১০ হরিহর, ১১ হরগৌরী, ১২ পঞ্চানন, ১৩ অগ্নি, ১৪ ঈশান, ১৫ নৈঋত, ১৬ বায়ু, ১৭ ইন্দ্র, ১৮ ধর্মরাজ, ১৯ চিত্রগুপ্ত, ২০ আন্তিক মুনি, ২১ নারদমুনি, ২২ জরৎকার মুনি, ২৩ কুবের, ২৪ মৎস্য, ২৫ কূর্ম, ২৬ বরাহ, ২৭ নরসিংহ, ২৮ বামন, ২৯ পরশুরাম, ৩০ শ্রীরাম, ৩১ বলরাম, ৩২ লক্ষ্মীনারায়ণ, ৩৩ বুদ্ধ, ৩৪ কঙ্কি, ৩৫ চন্দ্র, ৩৬ সূর্য, ৩৭ মঙ্গল, ৩৮ বুধ, ৩৯ বৃহস্পতি, ৪০ শুক্র, ৪১ শনি, ৪২ রাহু, ৪৩ কেতু, ৪৪ যক্ষী, ৪৫ রূপসী, ৪৬ কাত্যায়নী, ৪৭ জয়া, ৪৮ গঙ্গা, ৪৯ বিজয়া, ৫০ সোমেশ্বরী, ৫১ নেতা, ৫২ বিষহরি (মনসা), ৫৩ সুগন্ধা, ৫৪ ভুবনেশ্বরী, ৫৫ গণেশ, ৫৬ সরস্বতী, ৫৭ দুর্গা, ৫৮ লক্ষ্মী, ৫৯ কার্তিক, ৬০ মাঝি, ৬১ শ্রীধর, ৬২ গদাধর, ৬৩ জটাধর, ৬৪ যক্ষীধর, ৬৫ বিদ্যাধর, ৬৬ শ্রীধর পণ্ডিত, ৬৭ দোলাই মাঝি, ৬৮ সনকা, ৬৯ চান্দ সদাগর, ৭০ ধ্বস্তরি,

৭১ বেহলা, ৭২ লবীন্দর

গ. রাধাগোবিন্দ করের প্রতিকৃতি

ঘ. গঞ্জিফা তাস

ঙ. জড়ানো পট (রামায়ণ) ঊনবিংশ শতাব্দী

চ. পার্শ্বনাথ (আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দী)

ছ. হুশেন শাহের ৯২১ হিজরীতে উৎকীর্ণ শিলালিপি

(১৯৩৬-২০০৩) পত্র বিনিময় প্রকাশ করা হল পৃথক দুই গুচ্ছে, যথাক্রমে ষোলোটি এবং উনতিশিটি। পত্রগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন মণীন্দ্রকুমারের স্নেহধন্য জীবনীকার অজয়কুমার নন্দী; পরিচিতি লিখেছেন মণীন্দ্রকুমারের পুত্র এবং শিশিরকুমারের সহপাঠী বন্ধু নিত্যাশ্রয় ঘোষ, উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে পত্রগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন, শ্রীশঙ্খ ঘোষ এবং শ্রীমতী সুস্মিতা দাশ। এঁদের প্রত্যেককেই কৃতজ্ঞতা জানাই। পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধই লিখেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে আগ্রহী গবেষক, জহর সরকার, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও প্রকাশকুমার মাইতি, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে তাঁদের রচনাগুলির শিরোনাম ‘দুর্গাপ্রতিমা : যুক্তিবাদীর বিনির্মাণে’, ‘নৌকাপূজা’—শ্রীহট্ট-কাছাড়ের এক বিশেষ ধরনের মনসাপূজা’, ‘সঙ্গতিসূত্র এবং মেদিনীপুর উপভাষাবৈচিত্র্য’। সুমেধা মিত্রের লেখা নিবন্ধটিতে মুর্শিদাবাদের সংস্কৃতিমনস্ক এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তির একান্ত একক প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা একটি সংগ্রহালয়ের কথা বলা হয়েছে। সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক, তিনি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের জীবনকথা বিবৃত করেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র বর্তমান পরিকল্পনায পত্রপত্রিকার পঞ্জি প্রকাশ একটি নিয়মিত বিভাগ—এবার অশোককুমার রায় *আর্য্যাবর্ত* পত্রিকার সূচি সংকলন করেছেন, আর অশোক উপাধ্যায়ের ‘বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি-দুই’ প্রস্তুত হয়েছে—বাকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, মানভূম—এই চারটি জেলা অনুসরণ করে।



বিগত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পরবর্তী পাঁচ মাস বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এক অবর্ণণীয় প্রয়াণ-মুর্যোগ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হল। বাহ্যিক থেকে সাতানকই পর্যন্ত তাঁদের বয়সকাল, বলা যায় সকলেই পরিণত বয়সেই প্রয়াত হয়েছেন, তবু এঁরা প্রায় অনেকেই তাঁদের নিজের কর্ম-জগতে মগ্নপ্রাণে শেষদিন পর্যন্ত সমর্পিত ছিলেন বলেই, তাদের প্রস্থানসংবাদ সহ্য করা যে কোনো সাহিত্যমনস্ক মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন। ২৫ জুলাই চলে গেলেন অনিলকুমার সিংহ, ১৯২০-এ জন্মসনের হিসেবে চুরাশ বছর বয়সে। গুজরাটি মা, বাঙালি বাবার সন্তান, কখনও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন নি, অথচ ইংরেজি-বাংলা দুই ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন। ইলিয়া এরেনবুর্গের *ফল অব পারি* অনুবাদ করেছেন, কিন্তু নিজের লেখক পরিচয়ে তেমন প্রকাশ্যভাবে না এলেও সম্পাদক-প্রকাশক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সমসাময়িককালে সমাদৃত হয়েছিল। *পূর্বশা*, *অগ্রণী*, *সাহিত্যপত্র*-র মতো পত্রিকার পাশে, ১৯৪৮-এর পৌষ মাসে *নতুন সাহিত্য* নামে একটি বার্ষিকী প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদনায়, পরের বছর সেটি দ্বিতীয় বার বার্ষিকী হিসাবেই প্রকাশ পায়; কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে সেটি রূপান্তরিত হয় মাসিকে, ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত চলেছিল। এখন বিখ্যাত কিন্তু একসময় সদ্যতন, আবির্ভাব মুহূর্তে এমন অনেকেই প্রচারের প্রসারিত স্থান পেয়েছিলেন সেই পত্রিকায়, এবং সাহিত্য ছাড়াও সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করে ডাক্তারি বিষয় সম্পর্কে ‘সতুবদির রোজনামাচা’ প্রকাশ করছেন। *নতুন সাহিত্য* ভাবন প্রকাশন থেকে যে সব সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ্য *সূর্য্যবর্ত*, *হাজার বছরের প্রেমের কবিতা*; *সপ্তসিদ্ধ দশদিশু*। প্যানোরামা নামে বিজ্ঞাপন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে তিনি অনেক আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন এক সময়, কিন্তু সাহিত্যে নিছক কোনো রাজনৈতিক ছুৎমার্গকে প্রশ্রয় দেন নি। একটা সময় পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। এমনকী সাহিত্য থেকেও দূরবর্তী হয়ে উঠেছিলেন শেষ বয়সে।

সাহিত্য ও রাজনীতি জগতে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী যখন জীবিতাবস্থায় তাঁর শতায়ুজীবন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছেন, সে সময় সাতানকই বছরের হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সামান্য কদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে প্রয়াত হন ৩০ জুলাই ২০০৪-এ।

১৯০৭-এ ২৩ নভেম্বর কলকাতার ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটের পারিবারিক বাসগৃহে তাঁর জন্ম। আগাগোড়া ছাত্র হিসেবে কৃতী হীরেন্দ্রনাথ অধ্যাপক হিসেবেও সার্থকতা পেয়েছিলেন, তবু সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের প্রবহমানতার মধ্যে বেঁচে থাকাটাকেই তিনি আমৃত্যু বড়ো করে দেখেছেন। কমিউনিস্ট নেতা, প্রগতি লেখকসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সাংসদ, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক, কী সংসদভবনে, কী দেশ-বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহলে—তাঁর বক্তৃতা শোনার সুযোগ যেকোনো শ্রোতার কাছে চিরদিনই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংসদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাণী হিসেবে তাঁর পরিচিতি সর্বজনস্বীকৃত। ছাত্র জীবনে *প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা* এবং পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে *প্রগতি*, আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে *আধুনিক বাংলা কবিতা*, গোপাল হালদারের সঙ্গে *সোভিয়েট দেশ সম্পাদনা* করেছেন। ইন্দো-সোভিয়েত জর্নালের সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাস ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তাজাড়াও ইংরেজিতে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় পঁচিশটি। তুলনায় বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কম হলেও সেগুলি পাঠকমহলে বহুপরিচিত : *ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ*; *ভারতে জাতীয় আন্দোলন*; *মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ*; *চক্ষু কাণঃ*; *গ্রীসের পুরাকাহিনী*; *ভারতবর্ষের ইতিহাস (দু-খণ্ড)*; *অল্পে সুখ নেই*; *মার্কসবাদ ও মুক্তমতি*; *স্বদেশ জিজ্ঞাসা*; *বিপ্লবের পরাজয় নেই*; *গণনাট্য হিন্দু মুসলমান সমাজবাদ*; *চরৈবেতি চরৈবেতি*; *সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*; *আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ভয়*; *যুগের যন্ত্রণা : প্রত্যয়ের সংকট*। তরী হতে তীর তাঁর সুখপাঠ্য তথ্যসমৃদ্ধ আত্মজীবনী; একুশ বছরে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘায়ু কর্মজীবনে তিনি সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সারস্বত সংগঠনের পক্ষ থেকেই বহু সম্মান ও সংবর্ধনা পেয়েছেন। দেশের ও জাতির যে কোনো সংকটে ও সংঘাতে তাঁর সদাজাগ্রত বিবেক প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত, তাঁর অবর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে সেই অভিভাবকত্ব থেকে আমাদের অনেকদিন বঞ্চিত থাকতে হবে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি এই বিয়োগের তালিকাটি আগষ্ট মাসে আরও দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কঠিন রোগভোগের পর ৫ তারিখে চলে গেলেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিও কম কাজ করে যান নি। জন্ম কলকাতায়, কিন্তু শৈশব কেটেছে মালয়ে। ছাত্রী প্রতিনিধি হয়ে ইউরোপে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে সে অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন *পরিচয়* পত্রিকায়। কবি ও সম্পাদক, রাজনৈতিক বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু অঞ্চলে নিরক্ষর মহিলা ও শ্রমিকবৃন্দের সাক্ষর করার পাশাপাশি আরো অনেক সমাজসেবা মূলক কাজ করতে থাকেন। ছোটোদের জন্য ‘সুশিক্ষণ’ নামে একটা আদর্শ বিদ্যালয় গড়েছিলেন। ছোটোদের লেখক হিসেবেই তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন, তাঁর লেখা বই : *ববির বন্ধু*; *ঝাঁপুই*; *দোয়েল*; *হনুমানুষ*; *পিকুর সেই ছোটকা*; *গাড়ি হাওয়া, হাওয়া গাড়ি*; *সেই জলছবি*; *যেখানে বাঘের ভয়*। বড়োদের জন্য লিখেছেন *কাল অন্যান্দ্দিন নামে একটি উপন্যাস*। *নাটকের দল করে নাম দিয়েছিলেন গ্রুপ থিয়েটার*। ‘স্ট্রীরপত্র’ নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, পরে মৌলিক নাটকও লিখেছেন : *পৃথ*; *সম্রাজ্য*; *ভাসানু ভেলায়*; *নয় ছয়*। পুতুল নাটক তাঁর চর্চার একটা বিষয় হয়ে উঠেছিল। দূরদর্শনে ছোটোদের জন্য নানা অনুষ্ঠানে প্রাণসঞ্চার করেছেন।

বারোদিন পরে, আগস্টের ১৭ তারিখে, একই দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন নিখিল সরকার ও নিমাইসাধন বসু। একথা আজ কারো কাছে অবিস্মৃত নয়, প্রথমোক্ত জন তাঁর প্রকৃত নামের চেয়েই সাহিত্য জগতে শ্রীপাশ্ব ছদ্মনামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। ১৯৩২ এর ১ মে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে তাঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের স্নাতক পরবর্তী জীবনে সাংবাদিকতাকে পেশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্য ও গবেষণা কর্মের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে সমাজ-ইতিহাস বিষয়ে নিরন্তর উৎসাহ ও অনুসন্ধানে সমৃদ্ধ এক-একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতা ও বাঙালি সমাজের বহুবিচিত্র তথ্যের অনুসন্ধানে পাশাপাশি বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প নিয়েও তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মতব্য বাংলা মুদ্রণের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ময়দানে *আনন্দবাজার পত্রিকা* আয়োজিত মেলার সংগঠনে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। মৃত্যুর আটমাস আগে তাঁর ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ে, তা সত্ত্বেও তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রস্তুত করে গেছেন, তাঁর দেখে যাওয়া সর্বশেষ বই *পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া*। তাঁর লেখা অন্যান্য বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য : *আজবনগরী; যখন ছাপাখানা এলো; ঠগী; মোহন্তুলোকেশী সম্বাদ; দেবদাসী; হারেম; কেয়াবাং মেয়ে; মঙ্গলপাড়ের বিচার; মেটিয়াবুরুজের নবাব; বটতলা; ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক*। শ্রীপাণ্ডের চেয়ে বয়সে এক বছরের বড়ো নিমাইসাধন বসুও ইতিহাসের ছাত্র ও পরবর্তী জীবনে সফল অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। জন্ম হাওড়ায় ১জুন ১৯৩১। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যান। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ এ. এল. বেসামের অধীনে ‘ভারতের ইতিহাস’ বিষয়ে গবেষণা করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ও পরে ডি লিট উপাধি পান। তাঁর লেখা গ্রন্থ : *উনিশ শতক ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন; রেসিজম্ ইন বেঙ্গল; স্বামী বিবেকানন্দ; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী; মা সারদা; দেশ নায়ক সুভাষচন্দ্র; ভাঙনের বিশ্বভারতী; ইন্দিরা গান্ধী : অন হারসেম্ফ অ্যান্ড হার টাইম* প্রভৃতি।

আগস্টের ২৪ তারিখ আশি বছর বয়সে চলে গেলেন অভিনেতা-নাট্যকার-নির্দেশক কিরণ মৈত্র। মঞ্চ ছাড়াও বেতার দূরদর্শন এবং চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অবাধ। বাংলা নাট্য আন্দোলনের নানাপর্বে নেতৃত্বের স্থানেও তাঁর ভূমিকা স্মরণ করার মতো। ১৯২৪-এর ২৫ জানুয়ারি মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে জন্ম হলেও তাঁর পিতৃভূমি কলকাতার বরাহনগরে। শেষের দিকে বেলঘরিয়ায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল ডাক ও তার বিভাগ। ১৯৪৬-এ পুরসভাগুলির দুর্নীতি দেখে নাটক লিখেছিলেন *যা হচ্ছে তাই*। তারপর থেকে প্রচুর পূর্ণাঙ্গ ও একাক্ষ নাটক লিখেছেন। *বারোঘণ্টা, অমৃতের বিষ, আলোয় ফেরা, আমরা বেকার, একালের আয়না, চোরাবালি, জীবনদর্পণ, জাগরণ, গ্রহের ফের, ধ্বংসুরি* প্রভৃতি নাটক বারবার অভিনীত হয়েছে। পেশাদার মঞ্চে সেতু আলোড়ন তুলেছিল, ঘোটির মূল রচনা তাঁর লেখা *তৃষ্ণা* নাটক। তার লেখা নাটকের ইংরেজি, মারাঠি ও গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

৭ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন দিলীপ মালাকার, সাংবাদিক হিসেবে বিশেষ পরিচিত হলেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা। দেশে-বিদেশে বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ্য : *জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ডার; পালিটিক্যাল অ্যান্ড সোসাল রাইটিংস অব বিনয় সরকার; রহস্যময়ী প্যারিস; আজকের রাশিয়া; পাবলো পিকাসো; অর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ; সমাজ বিজ্ঞানী বিনয় সরকার; রঙ ও তুলির রবীন্দ্রনাথ; মহাকবি গ্যোটে* প্রভৃতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কৃর্তী ছাত্র, দিলীপ মালাকার তাঁর শিক্ষক বিনয়কুমার সরকারের পরামর্শে প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার্জনের জন্য ভরতি হন, এবং ইতিহাস ও ভূগোল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পি এইচ ডি উপাধি পান। তাঁর বিদেশবাসের সময় *যুগান্তর* ও *অমৃত বাজার পত্রিকা*র সঙ্গে ফ্রান্স সহ ইউরোপীয় দেশ সমূহের বিশেষ সংবাদদাতা রূপে যুক্ত ছিলেন। একসময় *যুগান্তর* পত্রিকায় ‘প্যারিসের চিঠি’ লিখে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ২২ মে মধ্য কলকাতায় কপালিটোলায় তাঁর জন্ম, তাঁর সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরো দুটি শব্দের কথা উল্লেখ্য, প্রথমটি শৌখীন আলোকচিত্রচর্চা এবং দ্বিতীয়টি দেশ ভ্রমণ, সারা ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন মানচিত্র দেখে, ইতিহাস পড়ে। ভ্রমণরসিক আর এক সাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজও প্রয়াত হয়েছেন গত ১৮ অক্টোবর, ত্রিযান্তর বছর বয়সে। প্রকৃত নাম জ্যোতির্ময় বোষ দস্তিদার, জন্ম বরিশালে (এখন বাংলাদেশ), ১৯৩১-এর ৭ মার্চ। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা* প্রকাশ হওয়ার পর

থেকেই ভ্রমণসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। *পঞ্চপ্রয়াগ, গঙ্গাসাগর, মায়াময় মেঘালয়, রূপতীর্থ ঋজুরাহো* প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশটি ভ্রমণ কাহিনির রচয়িতা শঙ্কর হিমালয় প্রিয় হলেও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণাত্য, আসাম থেকে কন্যাকুমারী, নেপাল—এমনকী ইউরোপ ও বাংলাদেশের বিবরণ ধরা আছে তাঁর লেখা গ্রন্থে। বাংলাদেশ ভ্রমণের স্মৃতি দেশের মাটি একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। তাঁর প্রয়াণে বাংলাভাষায় রচিত জনপ্রিয় ভ্রমণ কাহিনি লেখার জগতে অনেকটা শূন্যতা তৈরি হল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত পুথি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলার পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত অক্ষয়কুমার কয়াল সম্প্রতি চলে গেলেন ১২ নভেম্বর ২০০৪। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পশ্চিম দৌলতপুরে জন্ম ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে, অক্ষয়কুমার ম্যাট্রিক পাশ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রচার বিমুখ, সাধারণ গ্রামীণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত, অকৃতদার অক্ষয়কুমার নিজের জেলার বাইরে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে ঘুরে অজস্র পুথি সংগ্রহ করেছেন। সম্পাদনা ছাড়া পুথির বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন অনেক; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর প্রদত্ত পুথি সংগৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বছর দুয়ের আগে, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* ১০৭বর্ষ ১-৪ সংখ্যায় তাঁর লেখা ‘দুটি মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে কিছু কথা’ শিরোনামে তাঁর একটি ছোটো অথচ মূল্যবান সম্ভর্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি কথাসাহিত্যিক ও সমালোচক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ প্রবাসে রহস্যজনক ভাবে প্রয়াত হয়েছেন গত ১২ আগস্ট, মাত্র সাতাম বছর বয়সে। তাঁর জন্ম রাড়িখান, বিক্রমপুর, ১৯৪৭-এর ২৭ এপ্রিল। দীর্ঘদিন ধরে মৌলবাদীদের বিষমুষ্টিতে পড়ে, তিনি বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর কাছে দুষ্কৃতীদের ছরিকাঘাতে মারাত্মক জখম হয়ে, প্রথমে ঢাকায় সামরিক হাসপাতালে পরে ব্যাঙ্ককে টানা চিকিৎসার পর সুস্থ হতে পেরেছিলেন। পরে ৯ আগস্ট লেখকদের সংগঠন পেন ইন্টারন্যাশনালের আমন্ত্রণে এক বছরের জন্য গবেষণা করবার প্রস্তাব গ্রহণ করে জার্মানিতে গিয়েছিলেন। শোনা যায় স্বাধীনচেতা এই সাহিত্যিক তাঁর একটি গ্রন্থে, একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা পকিস্তানপন্থী খান সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে। এই নৃশংস হত্যার চেষ্টাকে যখন উভয়বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকরা তীব্র ঘৃণায় সজ্জবদ্ধ ভাবে, সোচ্চার দিক্কারে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন তখন সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে এই আকস্মিক প্রয়াণ প্রগতিমঞ্চের যেকোনো মানুষের সামনে এক আশ্চর্য বিমুঢ় পরিস্থিতি করে দিয়েছে।

একেবারে শেষে এসে স্মরণ করতে হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ পণ্ডিত মূলকরাজ আনন্দকে, জন্ম ১৯০৫, বিগত আঠারো সেপ্টেম্বর পুনের জাহাঙ্গীর হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। ভারতবর্ষের যে কজন লেখক ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন, তিনি তাঁদের অগ্রগণ্য পথিকৃৎ। তাঁর রচিত *আনটাচেবল; কুলি; টু লিভস অ্যান্ড এ বাড* ইত্যাদি গ্রন্থ প্রগতিশীল সাহিত্যধারায় অনন্য সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বরেন্য চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ এই পণ্ডিত, মার্ক্সীয় দর্শনে আজীবন বিশ্বাসী—অস্পৃশ্য, দুঃখী, অবহেলিত, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের কাহিনি তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রয়াণ, ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে নিঃসন্দেহে এক ইন্দ্রপতন।

এই সংখ্যার লেখকবর্গ ছাড়াও পত্রিকা প্রকাশে যাদের সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার, তারা হলেন শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ, শ্রীঅশোককুমার রায়, শ্রীশ্রবণ বসু, শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শ্রীপ্রণব বিশ্বাস। পত্রিকার পক্ষ থেকে এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক পরিচিতি

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৯২৬) প্রৈতি পত্রিকার সম্পাদক। সপ্তদশ শতাব্দীর একটি মনসামঙ্গল কাব্যের পুথি সম্পাদনা করেছেন।

অলোক রায় (১৯৩৬) বিশিষ্ট অধ্যাপক গবেষক সমালোচক। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রাক্তন অধ্যক্ষ। উনিশ শতক বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশেষজ্ঞতা বিশেষ সমাদৃত হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবকটি শাখাই তাঁর আলোচনার বিষয়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা ; বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি; কবিতার সঙ্ক্ষিপ্ত ; কেহ বলে ড্রামাটিক। গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্পাদনায় নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে।

অশোক উপাধ্যায় (১৯৪৫) বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি বিষয়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধের পঞ্জিকরণের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করছেন অনেকদিন থেকেই।

অশোককুমার রায় (১৯৪০) পেশায় পরামর্শদাতা বাস্তুকার হয়েও, সাহিত্যচর্চার একান্ত নেশায় অবসর সময়ে গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকার সূচি সংকলনে ব্যস্ত থাকেন। নিজগৃহে মাতামহ মন্মথনাথ ঘোষের নামে স্থাপিত তাঁর নিজস্ব পত্রপত্রিকার সংগ্রহটি তিনি পাঠক-গবেষকদের জন্য সুযোগ মতো ব্যবহার করতে দিয়ে এক মহৎ কর্তব্য সম্পাদনা করে চলেছেন।

গৌতম ভদ্র (১৯৪৮) বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। বর্তমানে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সায়েন্সের অধ্যাপক। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বই জালরাজার গল্প : বর্ধমানের প্রতাপচাঁদ।

জহর সরকার (১৯৫২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব। বাংলার সাংস্কৃতিকসমাজ-ইতিহাস-নৃত্ত্বে আগ্রহী। তাঁর গবেষণার বিষয় সাংস্কৃতিক নৃত্ত্বের নিরিখে ধর্মঠাকুরের সমাজতাত্ত্বিক স্বরূপ সন্ধান।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ (১৯৩৪) বর্তমানে সাহিত্য অকাদেমির ইংলিশ রাইটিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর চতুর্থখণ্ড সম্পাদনার কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে খুব শীঘ্রই কবির স্নেহশিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিষয়ে পত্রপত্রিকায় সমসাময়িক প্রতিক্রিয়ার একটি প্রকাশিতব্য সংকলন সম্পাদনা করছেন, নাম হবে পার্টিশন অব্ বেঙ্গল।

প্রকাশকুমার মাইতি (১৯৭২) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে মেদিনীপুর অঞ্চলের উপভাষা বৈচিত্র্য বিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রকাশিত বই : জীবনানন্দ এবং কয়েকজন কবি, আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা।

সুবীর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৯) বর্তমানে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের এনাটমি বিভাগের প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক। রাধাগোবিন্দ কর এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

সুমন ভট্টাচার্য (১৯৬৯) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক। জাতি বর্ণ স্ত্রাস্তর বিন্যাস আন্দোলন বিষয়ে তাঁর গবেষণার কাজ শেষ করেছেন।

সুমেশা মিত্র (১৯৪৫) রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালা অধিকারের নিবন্ধন আধিকারিক। প্রত্নতত্ত্ব বিষয় তাঁর গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত (১৯৩৪) কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। সাহিত্য অকাদেমির আহ্বানে এখন অন্নদাশঙ্কর রায়ের জীবনী লিখছেন।

হিরণ্ময় চক্রবর্তী (১৯৩৫) সরকারি উচ্চপদে চাকরি করে অবসর গ্রহণের পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলা পুথিতালিকা নির্মাণ ও আত্মসত্তার রাজনীতি : মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

গৌতম ভদ্র

আজ থেকে কত শত আলোকবর্ষ দূরে বাস করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ? ই-মেল, সাইবার বুক ইত্যাদিতে অভ্যস্ত আমরা কি জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তাঁর মতো অবলীলায় লিখতে পারব, “ঠেঁতুল দেখিলে যেমন জিহ্বায় জ্বল আসে, পুথির নাম শুনিলেও আমার তাহা না দেখা পর্যন্ত সোয়াস্তি থাকে না।”^১ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মশুলীর দেওয়া ‘সাহিত্য-বিশারদ’ উপাধিটা তাঁর গায়ে সেঁটে গেছে। অথচ আজকের দুনিয়ায় গোলকায়নের দৌলতে সাহিত্যচর্চা ও ভাষার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করার প্রকল্পটাই বিপন্ন, প্রাজ্ঞরা নতুন করে ভাবছেন কীভাবে সাহিত্য সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগগুলিকে যুগোপযোগী করা যায়, সাহিত্যবিশারদদের রুজি-রোজগার তো শিকেয় উঠবার জোগাড় হয়েছে।^২ এহেন সময়ে মুনশী আবদুল করিমের দান ও সাধনার নিছক বিবরণী পেশ করাটা কেবলমাত্র অতীতচরিতা ছাড়া আর কিছু হবে না। সেই কাজের প্রয়োজনও নেই।^৩ বাংলাদেশে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জাতীয় ‘আইকন’ বলেই স্বীকৃত, তাঁর জীবনপঞ্জির নানা ঘটনা সুপরিজ্ঞাত এমনকি জন্মের সাল নিয়েও বিভ্রান্তির নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে শুনতে পাই। আবদুল করিমের যোগ্য উত্তরসূরি প্রয়াত আহমদ শরীফ। তিন দশক ধরে পুথিতালিকার পরিমার্জনা, নানা পুথির সম্পাদনা ও এক বিশেষ ভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা পুথিসংস্কৃতির বস্তুগ্ৰাহ্য রূপকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। বাঙালির সংস্কৃতিমনস্কতার এক বিশেষ পর্যায়ের ও সময়ে বাংলা পুথির সংগ্রহরীতির অভ্যাসটি গড়ে ওঠে। ব্যক্তিবিশেষের নির্ধারিত কথা মনে রেখে এবং পুথিসম্ভারের, সংগ্রহ ও সম্পাদনার কৃৎকৌশলের বিষয় খেয়াল করেও বলা চলে যে পুথিমনস্কতার ধরনধারন এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অভ্যাসের ফল। এই অভ্যাস দেশ, কাল, পাত্র সাপেক্ষ, অভ্যাসের রকমফেরের সঙ্গে পুথিমনস্কতার চরিত্রেও রকমফের ঘটে। আজকের দিনে এই রকমফেরের কাহিনি বোঝাটা হয়তো বা আকর্ষক হতে পারে। টি.ভি. বা ‘সাইবার বুক’র যুগে বইকে তার মতো করে টিকতে হচ্ছে, কালচারাল স্টাডিজ-এর রবরবার সময়ে সাহিত্যচর্চা ভিন্ন এক কুলুঙ্গি খুঁজছে। ঠিক সেই ভাবেই উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাংলায় ছাপা বই ও ছাপাখানার পাশাপাশি পুথি পড়া বা পুথি জোগাড় করা নতুন অর্থ বহন করত, পুরনো পুথি পড়াটাই যেন এক বিশেষ দক্ষতার সূচক হয়ে উঠেছিল। এই দক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পাচ্ছে অন্য এক সূত্রে, আরেকটি নতুন পরিসরে; প্রাচ্যবিদ্যা, ভারতবিদ্যা তথা বঙ্গবিদ্যা গড়ে ওঠার তাগিদে পুরনো পুথি সংগ্রহ ও চর্চা আবশ্যিক

বলে ধার্য হচ্ছে। এই সারস্বত সাধনার প্রকাশ আবার নানা দশকে ও নানা প্রদেশে নানাভাবে রূপ পাচ্ছে, ভাষার গুরুত্ব অনুযায়ী সংগ্রহের চরিত্র, সম্পর্ক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার রকমফের ঘটছে। আবদুল করিমের বাংলা পুঁথি নিয়ে ‘খ্যাপামোর’ কথা ভাবতে গিয়ে কেউ কেউ তেলেগু ভাষার অনন্য পুঁথিসংগ্রাহক বৈয়াকরণিক ও অভিধানরচয়িতা চার্লস ফিলিপ ব্রাউনের তুলনা টানতেই পারেন।^৪ মাঝে মাঝে অহঙ্কারী ব্রাউন সাহেব মনে মনে ভাবতেন যে তাঁর নিজের মাথাটাই বিগড়েছে। অন্যদিকে মহারാষ্ট্রের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে তো একেবারে আবদুল করিমের সমসাময়িক, নিজে একজন নিঃস্ব ব্রাহ্মণ, একগুঁয়েমি ও জেদটুকুই তাঁর সম্বল। মহারাষ্ট্রের পুঁথি ও দলিলপত্রের সংগ্রহে তাঁর গোটা জীবন গেছে, মারাঠি ছাড়া এক বর্ণ ইংরিজিও তিনি লেখেননি।^৫ অথচ মেজাজে আবদুল করিমের সঙ্গে রাজবাড়ের কোনো মিল নেই। রাজবাড়ের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পাশ্চাত্যবিরোধিতার রেশমাত্র আবদুল করিমের রচনায় প্রত্যাশিত নয়। এইভাবেই ভারতীয় ভাষাচর্চার নানান্তরে নানা ব্যক্তিত্ব আরেকজনের অঙ্গাতেই দেশজ ভাষার পুঁথি সংগ্রহের মাধ্যমে নিজের সংস্কৃতির পুঁথি পাঠ করছিলেন, প্রাচ্যবিদ্যার অঙ্গনেই বঙ্গবিদ্যা বা মহারাষ্ট্রবিদ্যার অন্তর্লীন সম্পর্ক ও চরিত্রভেদ গড়ে উঠছিল।^৬ জ্ঞানাস্কনের এই নিমিত্তিতে বোঝা যায় যে পুঁথিচর্চার জগতেও কোন ‘অতীত’ ঠিক কতটুকু জায়গা পাবে, তা নিয়ে তীক্ষ্ণ বাদানুবাদ চলে, সত্তা ও সংস্কৃতির নিমিত্তিতে সেই পরিসরের দাবি আদৌ নগণ্য নয়।^৭

অন্য প্রেক্ষিতেও মুনশী আবদুল করিমের কর্মকৃতির পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বৃহত্তর অর্থে তাঁর কাজ প্রাচ্যবিদ্যার অঙ্গ হলেও তিনি বাংলা পুঁথিচর্চাতেই নিমগ্ন। তাঁর গবেষণার আদিপর্বেই প্রাচ্যবিদ্যার বিভাগগুলি স্পষ্ট হচ্ছে। তখন কারুর বোঁক প্রভুতত্ত্বে, কারুর আগ্রহ বা শিলালিপিতে, কেউ বা খুঁজে বেড়াচ্ছেন পুঁথি। এই বিশেষীকরণের ধাক্কাতেই ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে Corpus Inscriptionum Indicarum-এর মতো শিলালেখের সমাহার ছাপা হচ্ছে, উদ্যোগটা সরকারি। পরবর্তীকালে বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটা লিপিবিহারদরূপেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ছেন। অন্যদিকে এহেন প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞদের পাশে সামাজিক ও নানা পৌর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্বশিক্ষিত শেখের গবেষকরাও উঠে আসছেন, লোকইতিহাস ও অঞ্চলের ইতিবৃত্ত তাঁরাই তৈরি করছেন।

ফলে উনিশ শতকের শেষ থেকে প্রাচ্যবিদ্যার অঙ্গনে রদবদল ঘটছে। ধলাদের পাশাপাশি দেশজ পণ্ডিতরাও কোমর বাঁধছেন, এঁরা কেউ আর জোনস বা কোলব্রুক সাহেবের বেতনভোগী নিছক পণ্ডিত বা মুনশী নন, পাশ্চাত্য গবেষণা প্রকরণ এঁদের একেবারে অজানা নয়, পাশ্চাত্যের নিরিখে এঁদের কেউ কেউ নিজেরাই প্রাচ্যবিদ্যাশিষ্য। উপনিবেশে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা নতুন যৌথ প্রকল্প হয়ে উঠছে, এই কথাটুকু বঙ্কিমচন্দ্র আন্দাজ করেছিলেন। বঙ্কিমের মতে, সেই প্রকল্পে সাম্যের অভাব আছে, পাশ্চাত্যের প্রভুমন্যতায় বঙ্গব্যবহার অভিযুক্ত নির্ধারিত। *লোকরহস্য* বা *কৃষ্ণচরিত্র*-এর পাতায় পাতায় ছড়ানো অজস্র সূচীতীক্ষ্ণ পাদটীকায় প্রাচ্যবিদ্যার নিমিত্তিতে এই ক্ষমতার টানাপড়েন তিনি দেখিয়েছেন। আবার প্রতিস্পর্ধিতার ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিচারে ঐ একই জ্ঞানলোকের শরিক তিনি। তাঁর বৈচারিক পদ্ধতিটা এক, বঙ্গব্যবহার অভিযুক্ত ও বৈতণ্ডিক মেজাজটা একেবারে আলাদা।

এই প্রেক্ষিতেই অধুনা প্রাচ্যবিদ্যার ঠিকুজি নির্মাণে ব্যাপ্ত গবেষকদের কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাচ্যবিদ্যার রকমারি স্তর অনুসন্ধানে ব্যস্ত। প্রাচ্যবিদ্যার আদি ফরমায়েশি যুগেও

দেশীয় জজ পণ্ডিত, নিয়োগী, বা মুনশীরা মাদ্রাজে কলিন ম্যাকেনজি বা কলকাতায় উইলিয়ম জোনসের বক্তব্যের মধ্যে নিজেদের মত ঢোকাতে, তাঁদের পাঠানো তথ্যের মধ্যে টীকাটিপ্পনিও থাকত, জোনস বা ম্যাকেনজিদের তাত্ত্বিক প্রতিবেদনে অবলীলায় সেগুলি আস্তীকৃত হত। এক্ষেত্রে তারা কেবলমাত্র খবরের তুচ্ছ দেশোয়ালি সূত্র মাত্র নয়, বরং সাহেব প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের কনিষ্ঠ সহযোগী।^১ উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিদ্যাচর্চার মোড় বদলাল। দেশজ পণ্ডিত ও সাহেবি বিশেষজ্ঞদের চাপান-উতোর শুরু হল, প্রাচ্যবিদ্যার নানা অঙ্গনে তরঙ্গা জমে উঠল। এই তরঙ্গা নানা ভাষায় ও রূপে চলেছিল, বিশেষ বিশেষ তরঙ্গা আবার বিশিষ্ট বিদ্যার রূপ নিল। দেশজ ভাষার পত্রপত্রিকায় বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা নিজের নিজের মাতৃভাষায় তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে শুরু করলেন। আলোচনার স্বচারণক্ষেত্রটুকু যেন তাঁরা পেয়েছেন। যৌথ প্রকল্পে প্রভুমন্যতার জোর আপাত আলগা হয়ে পড়ল, প্রাচ্যবিদ্যার যেন ‘প্রকীর্ণকাশ’ শুরু হল। অবশ্যই ‘প্রকীর্ণ’ কথাটি আভিধানিক অর্থে প্রযুক্ত, আলোচনা যেন ছড়ানো, ছোটানো, নানা মিশেলে তৈরি। নানা পত্রিকায় আবদুল করিমের ছড়ানো লেখা তো আক্ষরিক অর্থেই প্রকীর্ণ। অধিকন্তু ‘প্রকীর্ণ’-এর ধারণাটি পারিভাষিক অর্থেও প্রয়োগ করছি, আচার্য ভর্তৃহরির ‘বাক্যপদীয়ে’র তৃতীয় খণ্ডের নাম তো ‘প্রকীর্ণ কাণ্ড’। তৃতীয় খণ্ডে ভর্তৃহরির উপজীব্য ‘বাক’-এর ‘বৈখরি’ রূপ, শব্দের তথ্য পদের ব্যবহারিক ও বাস্তব অবয়ব নির্ণয়। ‘বৈখরির’ অসংখ্য বৈচিত্র্যে ‘অপরিণামভেদ’ বিশ্লেষণ করাই কাণ্ডটির বিষয়। ভেদবিচারই যেন প্রকীর্ণ কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য।^২ প্রাচ্যবিদ্যার অঙ্গনেও এই সময়ে নানা ভেদ-এর কথা উঠছে, আলোচনা বিসম হয়ে পড়েছে, শব্দের চর্চার ক্ষেত্র থেকে আবদুল করিমের মতো ব্যক্তিত্ব নিজের মতো করে পেশাদারিত্বের মোকাবিলা করছেন। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ‘প্রকীর্ণতা’ বা ভেদবিচার ও বৈচিত্র্য নির্ণয় আবদুল করিমের পুথিচর্চা তথা বঙ্গবিদ্যা আলোচনায় কীভাবে ফুটে বেরোচ্ছে, সেই বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য।

কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত

বিংশ শতকের গোড়ায় প্রাচ্যবিদ্যা তথা বঙ্গবিদ্যাচর্চায় বাংলার মুরুব্বি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দরাজ হাতে নবাগতদের সার্টিফিকেট বিলোতে কোনদিনই গররাজি হতেন না। পুথিসংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ শুরু করার গোড়াতেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তারিফ ও পিঠচাপড়ানি তরুণ আবদুল করিম পেয়েছিলেন। ১৯০৯ সালেই আবদুল করিমের সম্পাদিত *রাধিকার মানভঙ্গ* গ্রন্থের গুণ বিচার করে শাস্ত্রী মহাশয় লেখেন, “তিনি এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদন কার্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহায়তা ও সুস্পন্দশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাঙলায় কেন—সমস্ত ভারতেও বোধহয় সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয় যেন কোন ‘জার্মান এডিটর’ এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।”^৩ শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে জানাতে ভোলেন না যে পেশায় আবদুল করিম চট্টগ্রামের “একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত” অথচ কাজে কর্মে তিনি জার্মান এডিটরের মতই হড়। উপমাটি ভাবিয়ে তোলে, বিংশ শতকের গোড়ায় পুথি পড়া, ছাপা ও সম্পাদনার একটি মান তৈরি হয়ে গেছে, শাস্ত্রী মহাশয় যেন তারই জিগির দিচ্ছেন। আলাওলের পুথি শুনতে শুনতে আবদুল করিম যখন চট্টগ্রামে বড়ো হচ্ছিলেন, তখনই ভারতবিদ্যাচর্চায় সংস্কৃত পুথি জার্মান রীতিতে সম্পাদিত হবার দাবি দানা বাঁধছে। ১৮৫৪ সাল নাগাদ লাহোরের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের একটি প্রস্তাব বিবেচনা করে ভারত সরকার রায় দেয় যে পুথি অনুসন্ধান ও চর্চা একটি স্বতন্ত্র শাখা, আলাদাভাবে সারা

ভারত জুড়ে সংস্কৃত পুথির অনুসন্ধান ও পঞ্জিকরণের জন্য পৃথক উদ্যোগ নেওয়া উচিত, এই পরিকল্পনার জন্য প্রদেশ পিছু অর্থও বরাদ্দ থাকবে। এককভাবে ব্রাউন, প্রিন্সেপ, ম্যাকেনজির মতো লোকেরা মাঝে মাঝে পুথিসংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন বা এশিয়াটিক সোসাইটি অঙ্গবিস্তার কাজ করেছে। এবার ভারত জুড়ে উদ্যোগ নেওয়া দরকার, কারণ সমাজের বৃহত্তর অংশে প্রাচীন সংস্কৃত পুথিতে উচ্চারিত বস্তু যেন আজও জোরদার, সেইগুলির উৎস না জানাটা শাসক হিসাবেই বোকামি হবে। কিন্তু এলোপাতাড়ি খরচ করাটা সরকারের উদ্দেশ্য নয়, বুঝে শুনে এগোতে হবে। ধাপে ধাপে কাজটাও ছকে দেওয়া হয়েছিল। মূল ষাঁকটা মূলত সংস্কৃত পুথির খতিয়ান করা, আরবিও দুয়েকটা থাকতে পারে। দেশজ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা ঘুরে ঘুরে নানা সম্ভাব্য জায়গা থেকে পুথির হদিশ নিয়ে আসবেন। দরবার, আশ্রম, মঠ, পাঠশালা, ব্যক্তি, পরিবার ইত্যাদি পুথি প্রাপ্তির সম্ভাব্য স্থানগুলি চিহ্নিত করা তাঁদের কাজ। পরে তাঁরা সেখানে সংরক্ষিত পুথির বিষয় ও সংখ্যা নির্ণয়ও করবেন। গায়ে গতরে খোঁজাখুঁজি করার ব্যাপারে দেশজ পণ্ডিতরা বেশ দড়, এই বিষয়ে ইংরেজ আমলারা নিঃসন্দেহ। কিন্তু পুথি বিচারের শেষ রাশটা থাকবে ইউরোপীয়দের হাতে। ম্যাকসমুল্যারের বৈদিক গবেষণাটাই তখন হাতে পাঁজি মঙ্গলবার; এতো পরিষ্কার যে হিন্দুদের বেদবেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণগুলিই সারময়, কাব্য, পুরাণগুলি তো তত কাজের নয়। এই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুথির তালিকা করা হবে, পুথি কেনা বা অনুলিখন করা হবে, পুথি বিক্রি করার জন্য মালিকদের নানা শেঁতাও দেওয়া যেতে পারে। তালিকার মডেলটি আলব্রেখট ভেবর কৃত বার্লিনে রক্ষিত পুথিশালার পঞ্জি বা থিওডোর আউফ্রেখট-এর বডেলিন লাইব্রেরির সংস্কৃত পুথিতালিকা। এই দুটি তালিকামাফিক বর্ণিকরণের ছাপানো নমুনাও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ও ভারপ্রাপ্ত পুথিতালিকা সংকলকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। গোড়াতেই অপ্রাসঙ্গিক বেকজুল তথ্য লেখার সুযোগ মেলে দেওয়া হল। ইউরোপের লাইব্রেরিতেই সংস্কৃত পুথির তালিকা পাঠানো হবে। সরকারি আমলারা নিশ্চিত যে কেবল ইউরোপেই যথার্থ কার্যকর সমালোচনা ও শব্দতত্ত্ব চর্চা হয়; এবং আগামী পঞ্চাশ বছরে কেবল ইউরোপেই সংস্কৃত ভাষার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহ দেখা যাবে। “For Europe alone; are two principles of criticism and philology understood and applied, and fifty years hence, in Europe alone will any intelligent interest be felt in sanskrit literature.”

এই ছকে দেশীয় প্রাদেশিক ভাষা তো দূরের কথা, নাগরি ব্যতীত প্রাদেশিক অক্ষরও বর্জনীয়। সব পুথির অনুলিপি নাগরি অক্ষরে করাটাই আবশ্যিক, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা নির্বিশেষে সেই অক্ষরটুকুই জানবেন। মাদ্রাজে ব্রাউনের সংরক্ষিত তেলগু অক্ষরে লেখা সংস্কৃত ভাষার পুথিও প্রয়োজনে নাগরীতে অনুলিখিত করতে হবে; পুথিসংগ্রহ ও তালিকা নির্মাণের মডেলের প্রয়োগ সবক্ষেত্রে একভাবে হওয়া চাই। এই শর্ত প্রতিপালিত হলেই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক চক্কিশ হাজার টাকার অনুদানটি পাবে।^{১০}

কাজের কাজে অবশ্য এই ‘জার্মান মডেলটি’ অক্ষরে অক্ষরে মানা হয়নি। মানা হয়তো বা সম্ভবও ছিল না। পূর্বভারতে পুথি খোঁজার বাৎসরিক প্রতিবেদনটি লিখতেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ইউরোপীয় রীতিতে প্রশিক্ষিত বলে তিনি ম্যাকসমুল্যারের জোরদার সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। গ্রামে গাঞ্জে মাইনে করা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পাঠিয়ে রাজেন্দ্রলাল পুথির হদিশ করেছেন, শহরের বর্ধিষ্ণু লোকের বাড়িতেও পুথির খবর পেয়েছেন। গোছগাছ করে পুথির পরিচয় পণ্ডিতরাই

লিখে দিতেন। ঐ পুথি পরিচয়ের সম্পাদনা রাজেন্দ্রলাল করতেন। রাজেন্দ্রলাল স্পষ্টই জানাচ্ছেন সরকারি নির্দেশমাফিক ছাপার অক্ষরে সাজানোটা তাঁর কাজ। পুথির নাম, গোত্র ও বিষয়ের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। পুষ্পিকার কথা, পুথির আরম্ভ ও শেষ পংক্তি এবং পাণ্ডুলিপির অবস্থা ও অক্ষরের ছাঁদও তাঁর নজর এড়ায়নি। কার হেফাজতে পাণ্ডুলিপিটি আছে এবং বিষয় অনুযায়ী বর্গভাগের একটি তালিকাও পরিশিষ্টে সংযুক্ত আছে। তালিকার উদ্দেশ্যটি ধরা বাঁধা। পাণ্ডুলিপির মূলগোত্র, সময়কাল ও বিষয়, ঠিক করা, তাহলেই সামগ্রিক পঞ্জিটি বানানো সম্ভব। অথচ আটোঁসাঁটো তালিকায় মাঝে মাঝে যে ‘অপ্রাসঙ্গিক’ গল্পগাছা ঢুকে পড়েনি, এমন কিন্তু নয়; মথুরানাথ তর্কবাগীশের অনুমিতি রহস্যের টীকা নিয়ে পক্ষধর মিশ্রের চালু কিংবদন্তি তিনি দুই পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা করেছেন।^{১১} আবার ব্যাকরণ সংক্রান্ত পুথির তালিকায় পরের পর পাণ্ডুলিপির নাম, ধাম, বিষয় পরিচয়, পুষ্পিকা ও পংক্তি সংখ্যার বিবৃতি দিতে দিতে তিনি যেন ক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এই বিবৃতির মধ্যে ‘হরিনামামৃত ব্যাকরণের’ আলোচনাসূত্রে পরম বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান রাজেন্দ্রলাল মিত্র মোক্ষম মন্তব্য করেছিলেন।^{১২} এই জাতের ব্যাকরণে কৃষ্ণ, রাধা ও বিষ্ণু নামের শব্দে বর্গ বিচার ও উদাহরণ দেওয়া হয়। একটি গভীর বিশ্বাস এই ‘জাতীয় হাস্যকর কুসংস্কারের’ (ridiculous superstition) পেছনে কাজ করছে। বৈষ্ণবদের মতে, ঠাট্টা করে বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করলেও বিদ্রূপকারীর পাপ মোচন হয়। এই সামাজিক বিশ্বাসটির বর্ণনাটি পাণ্ডুলিপিটির লেখক ও কাল নির্বাচনে আদৌ সহায়তা করে না। অথচ তালিকার ভূমিকায় সরকারি নির্দেশমতো রাজেন্দ্রলাল কেবলমাত্র পুথির কাল, লেখক ও বিষয়ের পরিচয় দিতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

এই টানাপড়েন থেকে জার্মান পণ্ডিতরাও মুক্ত ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির জন্য যথাযথ প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ এবং বর্তমানের সামাজিক প্রেক্ষিত ও নানা বিচিত্র ব্যবহারের কাহিনির মিলমিশ নিয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পুথিসংগ্রাহক যোহান গেওর্গ বুল্যারের অমূল্য প্রতিবেদনগুলিই দ্রষ্টব্য। গুজরাতে বুল্যারকে পণ্ডিতদের কাছে অধিকারভেদের প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে, ধর্মমণ্ডলীতে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের যুক্তি সাজিয়ে পুথি দেখার জন্য অনুমতি জোগাড় করতে হচ্ছে।^{১৩} খেতাব বা অর্থ দিয়ে যে সব রকমের পুথি সবার কাছ থেকে জোগাড় করা যাবে না, এই কথা বুল্যার বা রাজেন্দ্রলাল ভালোমতোই বুঝতে পারছেন কারণ ভারতে পুথিচর্চা ও সংগ্রহবিদ্যা পরম্পরা বা কুলমর্যাদা রক্ষার অঙ্গ। দেশজ পণ্ডিতদের তরফ থেকে একধরনের passive resistance বা ‘ঠাণ্ডা প্রতিরোধের’ কথাও রাজেন্দ্রলাল বলেছেন।^{১৪} অন্য পক্ষে কীলহর্ন লিখেছিলেন যে নিষ্প্রাণ পুথি বা নিজীব ভাষ্য জোগাড় করলেই কী ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব কন্ডায় আনা যাবে? যে সব পুথিগুলি নিয়ত মুখেমুখে পড়ানো হয়, সেই পরম্পরার সজীব পাঠকে কীভাবে ধরতে পারা যাবে?^{১৫}

পুথির অনুসন্ধানে একনিষ্ঠ পণ্ডিত বুল্যার-এর পক্ষেও প্রতিক্ষেত্রে সরকারি অগ্রাধিকারের কথা মাথায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সংস্কৃত পুথির ভাণ্ডারে গুজরাতি ভাষার আদি নিদর্শনের নমুনা তিনি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, বেদ-বেদান্তের পুথির পাশেই বিলহনের ‘বিক্রমাক্ষদেব চরিতের’ মতো কাব্য তাঁর কাছে মূল্যবান হয়ে উঠছে।^{১৬} গুজরাতে নানা জায়গায় জৈন ভাণ্ডারের সম্পদ আবিষ্কার তো তাঁরই কীর্তি। ঐ ভাণ্ডারেই যেন তাঁর সমধর্মকে বুল্যার খুঁজে পেলেন। দ্বাদশ শতকের ‘কলিযুগ সর্বস্ব পণ্ডিত’ হেমচন্দ্র সুরির জীবনী লিখতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এত সব কেজো ব্যতিক্রমের মধ্যেও নীতিগতভাবে রাজেন্দ্রলাল, বুল্যার বা কীলহর্নকে

ইউরোপীয় পঞ্জির ছকটি মাথায় রাখতে হয়, প্রতিবেদনের শেষে সরকারি নির্দেশনামার বুড়ি বা আউফ্রেখটের তালিকার কথা উল্লেখ করতে হয়।^{১৭} এই উদ্যোগের সার্থকতা তো শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যার সংস্কৃতজ্ঞ সারস্বত মণ্ডলীতে সীমাবদ্ধ, উদ্যোগটাও সরকারি। ইউরোপীয় সারস্বত সাধনার ঘরানা অনুযায়ী আউফ্রেখটের মডেল ক্যাটালগটি আদ্যন্ত লাতিন ভাষায় লেখা, মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি সংস্কৃত ভাষায়, হরফটা নাগরী। নামটা লাতিন অক্ষরে, “Catalogus Codicum Sanskritorum Bibliothecae Bodleinae” প্রথম পাতাতেই বিষয়ের বর্ণীকরণও লাতিন ভাষায়, যেমন—‘Poesis Epica’, ‘Doctrina Mystica’, (Tantra), ‘Grammatica’ (Vyakarana) ইত্যাদি।^{১৮} এইভাবে বর্ণবিভাগের ছকটি রাজেন্দ্রলাল মিত্ররাও কমবেশি মেনে নিচ্ছেন, তাঁদের প্রতিবেদন বা তালিকায় অবশ্য উপনামে বা উপভাগে যথেষ্ট রকমফের ঘটছে; আউফ্রেখট ‘ফিলজফিয়া’র খাতে পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, যোগ, সাংখ্য, ন্যায়দর্শনের কথা বলেই উপবিভাগে দাঁড়ি টানছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজে ভারতীয় দর্শনের প্রধান ভাগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ফলে আউফ্রেখটের উল্লিখিত দর্শনগুলির পাশে তিনি বৈশেষিক ও বেদান্তের উল্লেখ করছেন, তাঁর পঞ্জিতে জৈন ও বৌদ্ধদের দর্শনের জন্য জায়গা ধরা আছে। ফলে প্রস্থানের নামান্তর ঘটেছে, হয়তো পর্বসংখ্যা বিশদ হচ্ছে, কিন্তু খোপগুলির মৌলিক বিন্যাস এক থাকছে।^{১৯} উনিশ শতকের শেষ দশকে সংকলিত বিখ্যাত পঞ্জিসমষ্টির ভূমিকায় আউফ্রেখট পুথিতালিকা নির্মাণের সাধারণ অনুজ্ঞাগুলি বিধিবদ্ধ করেছিলেন। সেই অনুসারে ভারতে রচিত পুথিতালিকার দফাওয়ারি পদ্ধতি নির্ণীত হয়ে গিয়েছিল।^{২০} তালিকাকারের পক্ষে পুথির কালনির্ণয় করা আশু কাজ, তার গুরুত্বই প্রথম। এর পরে পুথি লেখকের পরিচয় ও পরম্পরার কথা লিখতে হয়। ঐ তালিকায় পুথির পত্র সংখ্যা, অক্ষরের ছাঁদ ইত্যাদি তথ্য থাকলে তো সোনায সোহাগা। কেবল সংক্ষিপ্ত নাম বা প্রাপ্তিসংবাদে বিভ্রান্তিই বাড়ে, বিষয় নির্ণীত হয় না। এই নিরিখে ভাউ দাজী বা রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের প্রতিবেদনের আউফ্রেখট সমালোচনা করেছেন, তুলনায় পেটারসন বা অরেলস্টাইনের তৈরি করা পুথি পরিচিতি তাঁর অনেক পছন্দসই।

বেশ স্পষ্ট যে হরপ্রসাদ উল্লিখিত জার্মান পণ্ডিত ধাঁচটি পুথিসংগ্রহ ও সম্পাদনার একটি বিশেষ পেশাদারি মডেল। দেশ, কাল ও লেখক সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য, পুথির বহিরঙ্গের শৈলী ও বিষয়গৌরবই ঐ তালিকায় জায়গা পাবে। এই বিচারে পুথিটি কালের বিচারে ও বিষয়ের ভারে গুরুত্বপূর্ণ। এককভাবে আলোচ্য পুথিটি তার অতীতকালেই সংলগ্ন, ঐ পুথির যথাযথ অতীত বর্ণনাই সংগ্রাহক ও পঞ্জিকারের দায়িত্ব, ক্রমরক্ষাই যেন উদ্দেশ্য।

এই পেশাদারি মডেলের পাশে আবদুল করিমের মতো পুথিপ্রেমিকের আদত বক্তব্যটি একটু আলাদা। জীবনসায়াহে পুথিপ্রেমের উৎসটি আবদুল করিম খুঁজছেন বাল্য অভিজ্ঞতায়। সেই অভিজ্ঞতাই তো বাড়ন্ত বেলায় তাঁকে পুথিপ্রেমিক করে তুলছে। তাঁর স্মৃতিচারণে শুনি,—

নিজ বাড়ীতে ও পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ীতে তখন হামেশাই পুথি পড়ার মজলিশ বসিত। কিছু না বুকিলেও সেই মজলিশে গিয়া আলাপের পুথি পড়া শুনিতাম। শুনিয়া শুনিয়া আমার ভাবপ্রকণ কিশোর হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মিত, তাহার স্মৃতি আজও মুছিয়া যায় নাই। এইভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মে। তাহাই ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে মনকে সাহিত্যের বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদনে একান্ত লোলুপ করিয়া তোলে।

এই রসের টানেই তাঁর সাধনা। তাঁর কথায়,

‘প্রাচীনপুথির সন্ধান ও আবিষ্কার আমার যেন ধ্যানের বস্তু হইয়া ওঠে। সারা জীবন আমি ধ্যাননিমগ্ন যোগীর ন্যায় সেই এক ধ্যানেই কাটাইয়াছি।’^{২১}

ফলে তাঁর চিন্তায় পুথিচর্চা তাঁর দৈনন্দিন জীবনলগ্ন, নিছক অতীতের নিরেট নিখাদ প্রত্নতত্ত্ব নয়। অথচ এ সময়েই কলকাতা, পুনা, অকসফোর্ড, বার্লিন বা লাইপজিগে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি তথা প্রাতিষ্ঠানিক পুথিচর্চার ও সম্পাদনার পেশাদারি মডেলটি ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে, পেশাদারিত্বের তকমাটা সজ্ঞানে বা অসজ্ঞানে গ্রামনিবাসী পুথি প্রেমিকের গায়ে সাঁটাতেই হবে, তা না হলে সারস্বত সমাজে তাঁর পাত পাওয়াটাই হয়তো বা ভার হয়ে উঠবে।

আবদুল করিমের স্মৃতিচারণা তথ্যাংশে যে একশো ভাগ নিখাদ, এইরকম যেন কেউ না মনে করেন। ইন্ডিয়ানোবল্য বা রাগাদিবশত স্মরণাভিমনে তো অনেক কিছুই ভুলে যাওয়া হয়, চেপে দেওয়া হয়। অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে স্কুলের ছাত্রাবস্থা থেকেই আবদুল করিম সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাখোর ছিলেন, ইংরাজি-বাংলা নানা সাহিত্যপত্রিকার গ্রাহক হতেন, পত্রিকা পড়ার নেশাটি জীবনের শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। তাঁর স্কুলজীবনের পাঠ্যতালিকায় “হোপ” নামে এক ইংরাজি সাহিত্যপত্রিকার নাম পাচ্ছি, এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তেই বাংলা পুথিসাহিত্য নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যমের তারিফ করা হয়।^{২২} সমসাময়িক বাংলা পত্রপত্রিকাতেও বিদেশি ভাষাতত্ত্বের আলোচনা থাকত, আবদুল করিমের অতিপরিচিত পূর্ণিমা পত্রিকার পাতাই তার প্রমাণ।^{২৩} আরো একটু পরে সাহিত্য পত্রিকায় ‘সহযোগী সাহিত্য’ বিভাগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশের সাহিত্যিক চর্চার খবর থাকত; এবং এ সাহিত্য পত্রিকারই নিয়মিত লেখক তালিকার পয়লা নম্বরেই আবদুল করিম ছিলেন। তাই আবদুল করিমের ঘোষিত অতি সারল্যটি একটি উপস্থাপনার ঢঙ, একটি বিশেষ অবস্থানের নির্দেশমাত্র, অতীত অভিজ্ঞতার ছব্ব রিপোর্ট নয়।

‘তাহাদের কথা’ : ‘মোক্ষমূলর করেছে ধার্য’

তত্ত্বগতভাবেও প্রাচ্য সংস্কৃতির বিচারে রদবদল হচ্ছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সেই রদবদলটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রারম্ভে জার্মানিতে রোমান্টিক আন্দোলনে বিশুদ্ধতার জিগির উঠেছিল। কোনো এক শুদ্ধ কল্পলোকের ঠিকানা পাবার লক্ষ্যেই যেন রোমান্টিকের যাত্রা শুরু হয়। হেলেনিক আদর্শের তুলনায় আদি অকৃত্রিম আর্য সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে সেদিন অনেকেই নেমে পড়েছিলেন। এই প্রেক্ষিতে জার্মানির শ্লেগেল দাদাভাইরা সংস্কৃত ভাষাকেই আর্যভাষার অনন্যরূপ বলে ফতোয়া দিলেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত ভাষা তথা প্রাচ্যসংস্কৃতি চর্চার নানা কেন্দ্র খোলা হল।^{২৪} অন্যপক্ষে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ থেকে প্রতীচ্যের বিদ্বৎসমাজে হেগেলিয় সর্বজনীন বিশ্বইতিহাসের তত্ত্ব ধীরে ধীরে কলকে পেতে লাগল। সেই মতানুসারে সত্তাময় যুক্তির ক্রমপ্রকাশই তো ইতিহাস, আধুনিক রাষ্ট্র গঠন ও জাতি নির্মাণেই সেই ইতিহাস চেতনার পরম সার্থকতা। উনিশ শতকের অভিজ্ঞতায় ভাববাদী প্রগতির ছকে তো ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও জাতিসংস্কৃতির প্রাধান্য আর প্রভুমন্যতা তত্ত্বে এবং বাস্তবে স্বাভাবিক বলেই মনে হতে পারত। আধুনিক সভ্যতার মানাঙ্কে ভারতের স্থান তো অনেক নীচে, দেশটি ইংলন্ডের উপনিবেশ মাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।^{২৫}

প্রাচীন ও বর্তমানের মধ্যে এহেন বৈপরীত্য জার্মানি তথা প্রতীচ্যের ভারততত্ত্ববিদগণের কাছে দুটি বড় প্রশ্ন তুলেছিল। প্রথমত, প্রাচীন ভারতের আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে উনিশ শতকীয় ইউরোপের যুক্তিবাদী সংস্কৃতির দাপুটে রূপ ও খ্রিস্টীয় মিশনারিদের সংস্কারবাদী নীতির মধ্যে কোনো ঐতিহাসিক যোগসূত্র বা সাংস্কৃতিক সৌসাম্য আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই উভয় সংস্কৃতির তুলনামূলক তৌলমান তৈরি করা একটি পদ্ধতি বলে বিবেচিত হল। সাম্প্রতিক ধর্মতত্ত্বে সেই তুলনাটি চলতে পারে, আবার নৃতাত্ত্বিক বিবরণে বা ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমেও সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ছক টানা যেতে পারে। দর্শনতত্ত্বের চাপে প্রাচ্য সম্পর্কে গবেষণা এবার নানা বিভাগে বিভক্ত হল, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার রীতি ও প্রকরণগুলি রূপ নিতে আরম্ভ করল, তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বচর্চার রমরমা শুরু হল। দ্বিতীয়ত, এই তৌলবিচারের সূত্র অনুমত ভারতে তথা প্রাচ্যে আধুনিক খ্রিস্টীয় সভ্যতার প্রসারে কতদূর কার্যকর হবে, সেই হিতবাদী চিন্তাতেও তখনকার পণ্ডিতরা ভাবিত ছিলেন। সভ্যতার নিরিখে ভারতকে টেনে তুলতে ইউরোপীয় জাতিসংস্কৃতির দায়িত্ব আছে, ঐ কর্তব্যের টানেই নানা সভ্য প্রকল্প নেওয়া উচিত, স্থানীয় প্রেক্ষিতে খাপ খাইয়ে সেইগুলিই প্রগতির মডেল হিসাবে দেশজ সমাজে কাজ করবে, এই চিন্তা ও আশা কমবেশি সব সাহেবি প্রাচ্যবিদ্যাভিষারদদের গবেষণা কার্যকে অনুপ্রাণিত করেছিল। অবশ্যই উন্নতি তথা অবনতির দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে পণ্ডিতরা আদৌ ঐকমত্য ছিলেন না, কিন্তু সভ্যতা প্রসারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কারুর আপত্তি ছিল না। আর্য সংস্কৃতির আদি রূপের খোঁজ পাবার জন্য আকুলতা এবং উপনিবেশের নিজস্ব পরিস্থিতি মাফিক ইউরোপীয় সভ্যতা প্রসারের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও উদ্বিগ্ন সাহেবি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার বৈশিষ্ট্য। এই সব ক্ষেত্রে আগ্রাসী আধিপত্যবাদের শরিক হতে রোমান্টিকরা আদৌ দ্বিধা করতেন না।

একধেয়েমির ঝুঁকি নিয়েও জানা এই আউড়ে কথাগুলি আরেকবার নেওয়া হল কারণ তুলনায় খোদ উপনিবেশে ভারতবিদ্যার নিজস্ব বাঁকগুলি বুঝতে সুবিধা হতে পারে। প্রাচ্যবিদ্যার অনেক তত্ত্বই জার্মান থেকে ইংলন্ডের মাধ্যমে ভারতে আমদানি হত।

জার্মান প্রাচ্যবিদ্যাভিষারদের তাত্ত্বিক কুটকচালি ভারতের জ্ঞানঙ্গনে চারিয়ে দিয়েছিলেন ইংলন্ড প্রবাসী জার্মান পণ্ডিত ফ্রীডরীখ ম্যাকসমূল্যর। ঋগ্বেদের এই বিশ্রুত অনুবাদক একবারও ভারতে পা দেননি। অথচ লেখালিখি, অধ্যাপনা, সামাজিক যোগাযোগ ও সরকারি খাতিরদারির সূত্রে উইলিয়ম জেনসের পরে আর কোনো প্রাচ্যবিদ ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে এত সম্মান পাননি। ভারতে তাঁর আদরের ডাকনামটি ‘ভট্ট মোক্ষমূলর’ ছিল, দেবনাগরীতে সেই বাজারি নামটিই মুদ্রিত ও অনূদিত ঋগ্বেদের আখ্যাপত্রে ব্যবহৃত হত। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনি ইংরাজিতে নানা বক্তৃতা দেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও সুহৃদদের মাধ্যমে ইংরাজি সেবিত সেই জার্মান তত্ত্বই ভারতীয় গবেষক ও আমলাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব যে স্বতন্ত্র বিষয়, ভাষার যে নানাভাবে বিবর্তন হয়, এটাই তাত্ত্বিক সূত্র। ভাষায় শব্দগুলি সেই বিবর্তনের নিশানা, শব্দ বিচার করে ভাষার নাড়িটি দিবা বোঝা যায়। এই ধরনের বিচার পদ্ধতি বিজ্ঞানসিদ্ধ। ফলে শাস্ত্রটির প্রয়োগ সর্বজনীন, নানা ভাষার ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রয়োগ করে ভাষা বিশেষের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। এই তুলনামূলক শব্দতত্ত্ব উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে জাঁকিয়ে বসে, ম্যাকসমূল্যরের বক্তৃতামালার একাধিক সংস্করণ হয়। ভারতীয় সরকারের দপ্তরগুলি বইটি কেনে, এমনকি বঙ্গের আদমশুমারির অধিকর্তা হারবার্ট রিজলি

জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের ভূমিকা নিয়ে ম্যাকসমুল্যারের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করেন।^{২৬}

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দাবি মেটাতেই পুথির তথ্য নিখাদ হওয়া দরকার। তালিকায় পুথির পৌর্বাপর্য ঠিক করা প্রয়োজন, তা না হলে শব্দ বিবর্তনের ক্রমটি গুলিয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি তুলনাও সম্ভব হবে না। তালিকায় পরিবেশিত যথার্থ সময়াক্ষিত পুথিই তো সঠিক তুলনার প্রথম শিশু। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা ব্যুল্যারের লেখা বাৎসরিক প্রতিবেদনে এই বৈজ্ঞানিক দাবির চাপটুকু স্পষ্ট।^{২৭} পুথির সংগ্রহ তো কিছু নতুন নয়, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে সংস্কৃত পুথির সংগ্রহ ছিল, তাঁদের রিপোর্টে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও গেওর্গ ব্যুল্যার সেই সংগ্রহশালায় প্রবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বলেছেন। রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছিলেন যে, পূর্বভারতে বাঙালি টুলো পণ্ডিতরা পুথিগুলি কাঠের পেটিকায় রাখতেন। ১৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে কালিদাস বিদ্যাবাগীশের বাড়িতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র হাজারটির বেশি সংস্কৃত পুথি দেখেন। পাথুরেঘাটার রাজবাড়িতে বা ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের মতো বিখ্যাত লেখকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও পুথি থাকত। তালিকাও অলভ্য ছিল না, নেপালের রাজদরবার থেকে নানা সংগ্রহের তালিকাও ছাপা হয়েছিল। তবে পুথির নামগুলি সংস্কৃত তৎসম শব্দ, আলঙ্কারিক, নাম অনুযায়ী তালিকা বিন্যস্ত, বিষয় অনুযায়ী নয়। নাম থেকে পুথির বিষয় বোঝাবার উপায় নেই। ‘ইতিহাস সমুচ্চয়ম্’ বা ‘রত্নাবলী’ প্রভৃতি একই নাম ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। ‘রত্নাবলী’ তো নাটক বিশেষও হতে পারে, সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহের নাম হিসেবেও সেটা মানানসই, আবার বাঙ্গাবোধিনী ব্যাকরণের নামও রত্নাবলী। কেবল ব্যবহারকারীই বিষয় বলতে পারেন।

পশ্চিমভারতে ব্যুল্যার ও তাঁর সঙ্গীদের অভিজ্ঞতাও এক গোত্রের। ধর্মসূত্র গ্রন্থের অনুলিপি করাটা জৈন গ্রন্থের পুণ্য কাজ, সেই অনুলিপিগুলি জৈন ভাণ্ডারে জমা পড়ত। সেই কারণে একটি একটি ভাণ্ডারে দশহাজারের বেশিও পুথি থাকতে পারে, অনেকগুলিই কোনো না কোনো ধর্মসূত্রের এক একটি অনুলিপি। এই অজস্র একই ধরনের অনুলিপির মধ্যে মূল ও দুর্লভ একক পুথি বাছাই করাটা ব্যুল্যারের তালিকার উদ্দেশ্য।

জৈনদের নানা প্রতিষ্ঠানও পুথি রাখত। যতি বা শ্রমণদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, গচ্ছ বা নানা গুরুকুল গোষ্ঠীদের নিজস্ব শাস্ত্রসমূহ বা পণ্ডনের নগরশেঠদের পুথিভাণ্ডার, অনেক সময়ই একাকার বলে মনে হত। গুজরাতে পাটিন বা অনহিলপত্তনে ব্যুল্যারের আবিষ্কৃত হেমচন্দ্র সূরির তথাকথিত পুস্তকভাণ্ডারটি আদতে অন্য এক গুরুকুলের সম্পত্তি। ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ব্যুল্যারের মতো অভিজ্ঞ পণ্ডিতও বিভ্রান্ত হন।

ব্যুল্যার বা রাজেন্দ্রলালের মতো প্রাচ্যবিদ্যাভিষারদের কাছে এই পুথিসংগ্রহগুলির চরিত্র ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক, সাধারণ লভ্য বা সর্বজনীন নয়। লভ্য তালিকা বা পুথিবিন্যাসও তথৈবচ, ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব অভ্যাস ও রুচির পরে নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে এইসব পুথির মূল্য ও ব্যবহার নানা সামাজিক আচার ও রীতিনিষ্ঠ, সেই সমাজে পুথির ঐতিহাসিক মূল্যটিই কেবল বিচার্য নয়। ফলে আধুনিক বিদ্যাচর্চার প্রেক্ষিতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুথিতালিকা ভিন্ন রীতিতে বিন্যস্ত হবে, সেটাই তো প্রত্যাশিত। তুলনামূলক শব্দতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্ব বিচারের তাগিদে নতুন বর্গে তো তালিকা সাজাতে হবে, আউফ্রেস্ট সেই বিদ্যারই গুরু।

তাহাদের আশা : ভূতভাষা না দেবভাষা ?

উনিশ শতকের শেষে তত্ত্বের দাবি ও অভিজ্ঞতার চাপে ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে রদবদল ঘটল। তাত্ত্বিক বিচারে তুলনামূলক শব্দতত্ত্বে কোনো ভাষাই একেবারে তুচ্ছ নয়, প্রাচীন ভাষাগুলির সঙ্গে আধুনিক নানা ভাষা ও উপভাষার গোত্র নির্ণয় সম্ভব। শব্দতত্ত্বের বিজ্ঞান তো নির্মোহ, বৈজ্ঞানিক বিচারে অপাঙক্তেয় কিছুই নেই। এই বিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। একাধারে তিনি ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষায় সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ছাত্র এবং বিহারের আফিম ও শুল্ক বিভাগের জবরদস্ত কর্তা। পূর্ব ও উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চল তিনি চষে বেরিয়েছেন, ভোজপুরী থেকে কাশ্মীরি দরদ ভাষা পর্যন্ত তাঁর নখদর্পণে। ম্যাকসমূল্যের বিপরীতেই যেন তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা। তাঁর ধারণা যে মার্গভাষার পরিবর্তে দেশজ ভাষাই স্বাভাবিক। দেশজ ভাষায় স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশই নান্দনিক, কৃত্রিম ভাষাতে সেই ভাবপ্রকাশ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। অতএব লোকভাষার ঠিকজি নির্ণয়ই তৃপ্তিদায়ক। মহকুমা ও জেলাশাসক হিসাবে এই তথ্যও তাঁর অজানা নয় যে আদমশুমারির কাজ চালাতে হলে এবং জাতপাতের বিবরণ লিখতে হলে দেশি ভাষা জানা ও বোঝাটা অপরিহার্য। বিমস প্রমুখ পূর্ববর্তী দেশজ ভাষা বিশারদ আমলাদের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাকে গ্রিয়ারসন নির্দিষ্ট প্রকল্পে রূপ দিলেন। বিপুল উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে রঙ্গপুরের মানিকচন্দ্রের গীত থেকে কাশ্মীরের লালদেদের *লালবাক* সংকলনের মাধ্যমে নানা লোকভাষায় গবেষণা করে ভারতীয় কথ্যভাষার মধ্যযুগীয় সূত্রগুলি তিনি স্পষ্ট করে তুললেন। ভূতভাষায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহের পেছনে কেবলমাত্র নান্দনিক উৎসাহ বা প্রায়োগিক প্রয়োজন খোঁজা ভুল হবে। গ্রিয়ারসনের মাথায় তত্ত্বও ছিল। সংস্কারবাদী খ্রিস্টীয় নানা প্রটেষ্ট্যান্ট তত্ত্ব-এর অন্তর্লীন সাদৃশ্যটি ভক্তিমূলক দেশজ সংস্কার আন্দোলনে পাওয়া যাবে, এই ভরসা তাঁর বরাবর ছিল। এই প্রেক্ষিতে তুলসীদাস, জায়সি বা লালদেদ-এর রচনা তো অবশ্যপাঠ্য। এভাবে প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম শাখা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব লোকধর্মের চর্চায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। পরন্তু নানা জনগোষ্ঠী তো লোকভাষার মাধ্যমেই দিন গুজরান করে। অতএব প্রাচ্যবিদ্যার আরেকটি খুঁটি নৃতত্ত্বের কুলজিতেও ভাষা ও উপভাষার ছকটি টানা যেতে পারে। তাই প্রাচ্যবিদ্যার মূল প্রকল্প থেকে গ্রিয়ারসন আদৌ সরে আসেননি। বরং শব্দতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ত্রিধারাকে একমুখী করে প্রাচ্যবিদ্যার অখণ্ড ক্ষেত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই যেন তিনি দেশজ ভাষার গাঁই-গোত্র অনুসন্ধানের প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিলেন।^{২৮}

এই সময়ে প্রাচীন ভারতবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে থেকে ব্যাল্যরও প্রাকৃত ভাষা চর্চার দিকে এগিয়ে এলেন। জৈন সাহিত্য ও নানা শিলালিপি পড়ে তৎকালের শ্রেষ্ঠ জার্মান ভারতবিদ্যা বিশারদ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষা কৃত্রিম, ব্রাহ্মণদের তৈরি; প্রাকৃতই আপামরের বুলি। প্রাকৃত ও দেশজ শব্দের মিশেলেই এক ধরনের কথ্য ও মিশ্র সংস্কৃত তৈরি হয়েছিল। সেটাই নানাভাবে সংস্কৃত হয়ে ব্রাহ্মণদের প্রভাবে ও প্রতাপে বিশুদ্ধ ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা অর্জন করেছে। ভারত সংস্কৃতির উৎসটি আছে ভূতভাষা তথা লোকভাষায়, দেবভাষায় নয়।^{২৯}

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনায় প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মেলনে মূলত ব্যাল্যরের সমর্থনে আধুনিক ভারতীয় ভাষাচর্চার জন্য গ্রিয়ারসনের প্রকল্পটি গৃহীত হল। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারি আনুকূল্য পাওয়া গেল, তৈরি হতে লাগল নানা খণ্ডে ঔপনিবেশিক ভারতের ভাষার বৃহত্তম খতিয়ান (*Linguistic Survey of India*)। অর্ধ শতকের বেশি সময় ধরে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ বিভাজন থেকে দেশজ ভাষার ব্যাকরণচর্চায় নানা কর্মকাণ্ডে গ্রিয়ারসনের রচনার প্রামাণিকতাই প্রতিমান

হয়ে রইল, ঐ বুড়িটি না ছুঁয়ে পেশাদার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা অ্যামেচার আবদুল করিম কেউ এগোতে পারবেন না। উইলিয়ম জোনস থেকে যে বিদ্যা শুরু হয়েছিল, ম্যাকসমুল্যারের মধ্য দিয়ে গ্রিয়ারসনে তার একটি বিশেষ পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি।

আমাদের ভরসা : ‘আ মরি বাড়লা ভাষা’

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ধারণা হতেই পারে যে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণার কাঠামোটি নিরেট খিলানের মতো, অর্ধবৃত্তে সুবিন্যস্ত ও আড়ে বাঁধা। আপাতত তাই মনে হতে পারে, কিন্তু এই খিলানের তলাতে অনেক ফাঁকফোকর আছে, গলে বেরোনো সম্ভব। সংস্কৃত পুথি খোঁজার ফাঁকে ফাঁকেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষার উচ্চারণ ও লিপান্তর নিয়ে ভাবছিলেন, সেই সূত্রেই এই দুটি ভাষার উৎস ও বিবর্তনের ছকও করার চেষ্টা করলেন। পদ্ধতিটা সেই শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের তুলনা, কিন্তু অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেটা দেশজ কথ্য বুলি।^{৩০} বিশ শতকের অন্যতম সেরা পুথিসংগ্রাহক তো স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলালের হাতে গড়া শিষ্য। তাঁর ধারণা, সংস্কৃত পুথি খোঁজার অবসরেই বাংলা ভাষার পুথি খুঁজতে হবে, সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা ভাষারও ঠিকুজি তৈরি করতে হবে। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার হাওয়া বদলের জন্য বঙ্গবিদ্যার গুরুত্বও স্বীকৃত হতে লাগল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা নাগরী প্রচারিণী সভাও নিজের নিজের ভাষা ও এলাকার পুথি সংগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্প নিতে শুরু করল। পুথিসংগ্রহের বৌকে পরিবর্তনের সঙ্গে দেশি সংগ্রাহকদের মেজাজেও বদল এল। সেই রদবদলের চরিত্রটুকু বোঝাটা জরুরি।

এই রদবদলের প্রকার বিষয়ী ও বিষয়ের সম্পর্কে, পুথিসংগ্রাহক ও পুথির সম্বন্ধে নিহিত আছে। পুথিটি বাংলা, সংগ্রাহক বাঙালি। ফলে বিষয়টি আর বিষয়ীর পরকীয় নয়, বরং স্বকীয়। এই স্বকীয়তার প্রকাশ ভাষাতে নানাভাবে ছড়ানো ছিটোনো, বহুধা প্রকীর্ণ। নানা উপমা, রূপকল্প ও শব্দবন্ধে সেই স্বকীয়তার বোধটি ধরা পড়ে, প্রাচ্যবিদ্যার গ্রাহ্য প্রকরণ ও পদ্ধতি ছাপিয়ে বিষয়ীর মনোভাবটি স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট হয়। কয়েক ধরনের উদাহরণে এই স্বকীয়তার প্রকীর্ণ চরিত্র বোঝা যেতে পারে।

উনিশ শতকের নব্বই-এর কোঠায় সিংহাবলোকন করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জানান যে ভারত ইতিহাস বা ঐতিহ্যের সাধনায় বাংলা পুথিচর্চার সেরকম কোনো মর্যাদা নেই। কোনো জ্বরদন্ত সংগ্রহশালায় বাংলা বই তথা পুথির হদিশ পাওয়া যাবে না। সেগুলির শৌজ রাখে গৃহস্থ মেয়েরা, সেগুলির আদর নিম্নবর্ণের সমাজে, কেবল বটতলার ফেরিওয়াল সেগুলির কেনাবেচা করে। হরপ্রসাদের বক্তব্যের ঝোঁক স্পষ্ট। বিদ্বৎসমাজে অতীতের ফসিল হিসাবে কেবল বাংলা পুথিগুলি বিচার্য নয়, বরং সেগুলি যেন দৈনন্দিন জীবন্ত কর্মকাণ্ডের অঙ্গ। অথচ কালিক ব্যবধান ও ব্যবচ্ছেদের দাবি জোরদার না হলে বঙ্গবিদ্যা কীভাবেই বা প্রাচ্যবিদ্যায় কলকে পাবে?^{৩১}

বাংলা পুথিচর্চার তাগিদও অন্য রকম, বাঙালির কাছে নিছক বিদ্যাচর্চার নিগড়ে সেই ইচ্ছাটি আবদ্ধ নয়। এই বয়ানটি ক্রমে দানা বাঁধছিল যে, জাতি এবং ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ, ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপেই জাতিলক্ষণ ধরা পড়ে। ইউরোপের জাতিরাষ্ট্র বা নেশন স্টেটের অভিজ্ঞতার সূত্রেই ধারণাটি আসে। কিন্তু বঙ্গবিদ্যাচর্চার বয়ানে উপমার প্রয়োগে ও উপমিত্তির অনুভবে ধারণাটি জমতে বাঁধে, ফুটে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দশকে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আরম্ভেই প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কিত একটি দফাওয়ারি প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্পকে

প্রবন্ধের আকারে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পেশ করেছিলেন, বাংলা পুঁথি তথা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা ও প্রকাশনের ত্রিকাল দর্শনই সেই নিবন্ধের বিষয়।^{৩২} তুলনা দিয়েই প্রবন্ধটির আরম্ভ, ‘ভাষার প্রবাহ নদীর গতির সহিত তুলনীয়।’ তুলনাটি যেন স্বতঃসিদ্ধ। তাই তৃতীয় অনুচ্ছেদও শুরু হয় বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ, “সকল নদীই জলস্রোত; কিন্তু নদীতে নদীতে কত প্রভেদ।” ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নদীর তুলনাটাই প্রবন্ধটির ধরতাই, আলোচনায় উপমাটি ঘুরে ফিরে আসে। নদীর উৎস ও প্রবাহের সাদৃশ্যে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশক্রমের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ভাষা আলোচনা ও প্রাচীন সাহিত্যের উৎস সন্ধান নৌযাত্রা বা উজ্জান বাওয়ার সমতুল্য হয়ে পড়ে। বিংশ শতকের তিন দশক জুড়েই ভাষা ও সাহিত্যকে ঘিরে কর্মকাণ্ডের এ জাতীয় আলোচনা প্রাকৃতিক উপমায় ভরপুর হয়েছিল। নদীর উপমার পরিবর্তে কেউ পছন্দমতো গাছ বা ফুলকেও ব্যবহার করতে পারে, একই প্রবন্ধে তো হীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিজেই নদীর সঙ্গে গাছকেও ভাষার উপমান হিসাবে হাজির করেছিলেন। এইসব উপমার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা ইতিহাসনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। যা ঐতিহাসিক ও কালিক তা যেন আগেভাগেই অভিব্যক্তিবাদের নিয়মে প্রকৃতিতে প্রমাণসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি খুঁজে বার করতে পারলেই তো কেমনা ফতে। এই চিন্তাতেই সাহিত্য পরিষদের পত্রিকার আদি সংখ্যাতেই বাংলাভাষায় প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার ভবিষ্যতের প্রতিমানটি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত নির্দিধায় ঠিক করে দেন, “ইংরাজী ভাষার ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানেন যে গথিক হইতে স্যাকসন, স্যাকসন হইতে অর্থ স্যাকসন, অর্থ স্যাকসন হইতে আদ্য ইংরাজী, আদ্য ইংরাজী হইতে মধ্য ইংরাজী, মধ্য ইংরাজী হইতে পুরাতন ইংরাজী, পুরাতন ইংরাজী হইতে আধুনিক ইংরাজীর প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রকাশের ক্রমই ইংরাজী ভাষার ইতিহাস। এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার।”^{৩৩}

অভিধানকার মারে ও মোক্ষমূলরকে শিরোধার্য করে পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ তিন ধাপে একটা জ্বরদস্ত সমীকরণ সেরে ফেলেন। নদীর প্রবাহ বা গাছের বিকাশের উপমার টানে ভাষার ইতিহাস আসে, প্রাকৃতিক নিয়মের পর্যালোচনার সূত্রে ইতিহাসের পাঠ তৈরি হয়, সেই সর্বজনীন পাঠের যুক্তিতে ইংরাজি ভাষার বিবর্তনের খোপে বাংলা ভাষাটি দিকি ঢুকে যায়।

তুলনাটা তো বস্তুধর্মের বিচারে সিদ্ধ, কোনো না কোনো ধর্মের মাধ্যমেই তো সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের সন্ধানটি হয়। মেকলে বা ম্যাথু আর্নল্ডের সমালোচনা তত্ত্বটি হীরেন্দ্রনাথের পড়া ছিল। সেই পড়ার জোরেই তিনি লিখে গেছেন,

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ তুল্য; যে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব—জাতির যাহা রীতি নীতি প্রণালী পদ্ধতি—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়।...এ হিসাবে কবি সমসাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক।^{৩৪} [নজরটান সংযোজিত]

দর্পণের উপমাটি দুটি দিকেই খাটে। পাশ্চাত্যে সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যিক উপস্থাপনা ও কবিপ্রতিভার সম্বন্ধ স্থাপনে প্রদীপ ও দর্পণের বিপরীত উপমা দুটি বহু ব্যবহৃত,^{৩৫} সেই সূত্রেই হীরেন্দ্রনাথ কবির হৃদয়দর্পণের উপমায় জাতীয় সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের প্রতিবিশ্ব করে তুললেন। সাহিত্য ও জীবনের এই বিশেষ উপস্থাপিত সম্পর্কের সুবাদে সাহিত্য “জাতীয় জীবনের অতীত ইতিবৃত্ত জ্ঞানে” রূপান্তরিত হল।

কিন্তু ‘দর্পণ’ উপমাটি পাশ্চাত্য সমালোচকদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, সংস্কৃত রসশাস্ত্রেও

এই উপমাটি রসস্বনিকারদের প্রিয়। সেখানেই প্রতিসরণ ঘটে, অন্য একটি মোচড়ের সুযোগ থেকে যায়। স্বনিকারদের লক্ষ্য কবি নয়, রসিক পাঠক, সহৃদয় সামাজিক। তাদের আলোচ্য বিষয় লেখা নয়, পড়া। রসভুক্তির অন্যতম শর্ত তো রসিকের পরিশীলিত হৃদয়, সেটা ঝকঝকে আয়নার মতো স্বচ্ছ, সেখানেই রস প্রতিভাত হয়, বিকারে রসাতাস ঘটে। রস উপভোগের আলোচনায় ‘মনোমুকুর’, ‘সহৃদয় হৃদয়দর্পণমধ্যান্তে’ এইসব তুলনা অভিনবগুণ্ড প্রয়োগ করেছেন, ভারতীয় রসশাস্ত্রের মধ্যযুগীয় নানা টীকা, ভাষ্য ও পাঠ্য বইতে শব্দগুলি ছড়িয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে রসভুক্তির মাধ্যমেই সহৃদয় সামাজিক সাহিত্যের মরমী হয়ে ওঠে, তন্ময়তা বা অন্তরঙ্গতাই তাঁর কাম্য।^{৩৬}

জাতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে অভিনবগুণ্ডদের কোনো বক্তব্য থাকার কথাই নয়, ঐতিহাসিক প্রকল্পের ধারণা তো দূর অস্ত। তাঁদের রসশাস্ত্রের যাত্রা তো প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের দিকে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে কোনো কোনো বাঙালি বুঝছেন যে সাহিত্যে জাতির স্বভাব চিনতে হলে, সহমরমী হতে হবে, সহৃদয়তার দাবিই সেই উপায়। ঐ বর্গীয় অর্থেই কোনো কোনো সংগ্রাহকের কাছে জাতি ও ভাষার সম্পর্কটি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

প্রাচীন বাংলা কবিতার রসিক পাঠক হিসাবেই ইংরাজি সাহিত্যের অভিজ্ঞ পড়ুয়া দীনেশচন্দ্র সেন ইতিহাসচর্চার দাবিটি তুলে ধরেন। তাঁর লেখা *বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের* প্রথম ছত্রটিই তো এইরকম,^{৩৭} “অদ্য ছয় বৎসর হইল, একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ, গলিত পত্র, প্রেমাত্মক নীরবনিকেতন চণ্ডীদাসের গীতিকবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে।” ফলে জ্ঞানাত্মক ও রসাত্মক দুটি কোটিতেই সাহিত্য ও জাতি সম্পর্ক সিদ্ধ হতে পারে, কেবল কোটি বিশেষে বয়ানের বিন্যাসটি আলাদা হবে।

প্রাচীন স্বনিকারদের মতে, সহৃদয়ের রসাস্বাদন অলৌকিক। অথচ জাতীয় সাহিত্যরসিকের আন্তরিক বোধটি লোকগত, জাতিগোষ্ঠীতে নিবদ্ধ। এ ক্ষেত্রেও প্রাচীন স্বনিশাস্ত্র অনুমোদিত উপমাটির তাৎপর্য আধুনিক ব্যবহারে প্রতিসরিত হল। প্রাচীন জাতীয় সাহিত্যের আলোচনায় হৃদয় দর্পণের উপমার মাধ্যমে কোনো বিশেষ একটি রসভাবের মধ্যে জাতি ও লোক স্বভাবের ঐকান্তিক ও আন্তরিক চিহ্নটি ধরা পড়ে, সেটাই অকপট ও স্বাভাবিক। হীরেন্দ্রনাথ সেই রসাস্বাদকে ‘ভূমানন্দ লাভের’ তুলনীয় বলেছেন। রসভুক্তির ভারতীয় তত্ত্বটি তাঁরও একেবারে অজানা ছিল না।

এই অন্তরঙ্গতার তাগিদেই নানা আবেগের আবেদন ওঠে, ঐ আবেগের দাবিতে বঙ্গভাষা ও বিদ্যাচর্চা আর নিছক প্রাতিষ্ঠানিক সীমায় আবদ্ধ থাকে না, আবেগের অতিরেকেই এই বিশেষ বিদ্যাচর্চাটি গোষ্ঠীসত্তা নিমিত্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের গোড়ায় তরুণ বুদ্ধিজীবী বিনয়কুমার সরকার পুঁথিবিদ ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেনের রচনাকে এই তৌলেই বিচার করেছিলেন। অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলা তাঁর রচনার অংশবিশেষ পড়া যেতে পারে। যেমন,

এই বইটার (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) প্রভাব মালদহ হতে চাঁটগাঁ পর্যন্ত আর জলপাইগুড়ি হতে মেদিনীপুর পর্যন্ত হাজার হাজার লিখিয়ে-পড়িয়ে লোককে সজ্ঞানে “বাঙালী” করে তুলেছে। আমরা এত বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন আবহাওয়ার নর-নারী যে সকলেই বাঙালী এই চেতনাটা জোরের সহিত আমাদের মগজে বসতে পেরেছিল “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” বইয়ের দৌলতে;....আজকাল আমরা হাতে মাঠে বাজারে যত মিঞা ঘোঁটমঙ্গল করে ‘বাঙালী’, ‘বাঙালী’ কপচাই, তাদের প্রত্যেকেরই অন্যতম জন্মদাতা “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” বইয়ের লেখক দীনেশচন্দ্র সেন।^{৩৮}

বিনয়কুমার সরকারের কাছে দীনেশচন্দ্র সেনের পুথিচর্চা ও সাহিত্য রচনা ‘বঙ্গোপনিষদ’ পদবাচ্য, তাঁর কাছেই ধরা পড়েছে বঙ্গজিজ্ঞাসার ‘জ্যাস্ত বস্তুনিষ্ঠ সরস’ রূপ। এই বিশেষণগুলির তাৎপর্য স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আরো জোরদার হয়েছিল, একজনের সাহিত্যচর্চা তথা পুথি হয়ে উঠেছিল বহুজনের ‘প্রাণের কথা।’ ফলে, এই স্বকীয় ক্ষেত্রে যে-কোনো বাঙালি আসতে পারত, কোনো বিশেষ ছাড়পত্রের প্রয়োজন ছিল না। এই ভাষা তো বাঙালির নিজস্ব, পুথির সেবা তো তার নিজের কাজ। বৈজ্ঞানিক প্রকরণ শেখা বা প্রাচ্যবিদ্যার ক্রমনির্ণয়ের কূটকচালিতে জড়িয়ে পড়াটা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়। বরং পুথিচর্চা, ভাষাবিশ্লেষণ তাকে আরো স্বনিষ্ঠ ও আত্মনিষ্ঠ করে তুলবে। বাঙালি হবার তাগিদেই পেশাদার ও অ্যামেচারের গণ্ডি যেন বার বার মুছে যেতে লাগল, গণনিষ্ঠ হয়ে ওঠাই যেন বাংলা পুথিচর্চার প্রত্যাশিত ভাগ্য।

কালিক ব্যবধান যেমন ফিকে হতে লাগল, দৈশিক ব্যবধানও বদলাল, পুথি খোঁজার অভিজ্ঞতায় দেশটি চিরকালীন হয়ে উঠল। পুথি খোঁজার নানা ইঁটাপা আছে, সহজে কেউ পুথি দিতে চায় না, পুথিসংগ্রাহককে নানা শারীরিক ও প্রাকৃতিক ঝামেলায় পড়তে হয়। দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু বা আবদুল করিম প্রমুখ পুথিসংগ্রাহকের স্মৃতিকথায় এই সব ঝামেলার কথা আছে, পড়তে পড়তে খানিকটা একঘেয়ে লাগতেই পারে। কিন্তু এই পুথি তো দেশজ, মাতৃভাষায় লেখা। এদের প্রাপ্তিই বাংলাভাষী দেশের ঐকান্তিক রূপকে তুলে ধরে। হাজারো ঝামেলার মধ্যে স্বদেশের রূপটি চিরন্তন হয়ে থাকে। সেই অভিজ্ঞতাটি আর তাৎক্ষণিক থাকে না, একটি ধ্রুব রূপকল্পে দানা বাঁধে। বাংলা পুথি খুঁজতে গিয়ে ত্রিপুরার জঙ্গলে কুমিল্লার স্কুলের শিক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন ঝড় বৃষ্টিতে পথ হারান। ঐ বিপদের বর্ণনার পরেই তিনি শান্তি খোঁজেন স্বদেশের এক শান্তশীল প্রাকৃতিক চিত্রে,

পাহাড়বেষ্টিত দেশের পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ মধ্যে মধ্যে বড় প্রীতিকর হইয়াছে। ঘন শ্যামপত্রাচ্ছাদিত চিত্রপটের ন্যায় সারি সারি তরুশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে নির্মল পুকুরের জলে ঝাপটা বাতাসে নির্মল টেউ উঠিতেছে।...দূর নীল গগনের সঙ্গে মিশিয়া ভূসংলগ্ন মেঘবর্ণিনীর ন্যায় পাহাড়রাজি বিরাজিত; পর্বতলনাগণের সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্য, পর্বতকৃষ্ণগণের সরল কৌতুহলাক্রান্ত দৃষ্টি, ওই সব এখনও কোন অভিনয়ের দৃশ্যপটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে।^{৪০}

একেবারে পটে আঁকা বিদেশি ল্যান্ডস্কেপ, পুথি খোঁজার সূত্রে পাওয়া। কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা এই স্মৃতিরূপেই দেশচিন্তায় গ্রথিত হয়। এই চিন্তায় যে ছবিটি ফলা হয়, সেই বর্ণনা যে কোন ভিক্টোরীয় প্যাস্টোরাল (pastoral) চিত্রের যেন একটি লৈখিক বিবৃতি। সেই ফ্রেমেই স্বদেশ ও স্বকালের অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়, বিদেশি প্রকরণে স্ব-অভিজ্ঞতাকে ঐকান্তিক বলে হাজির করা হয়। এভাবে স্বদেশকে হাজির করার চিন্তাটিই স্বকীয়, ফ্রেমটি পরকীয় মাত্র।

সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে যায় বিষয়ী ও বিষয়ের সম্পর্কে, পুথি কেবলমাত্র বিষয়-বস্তুর আধারমাত্র থাকে না। বরং বিষয়ীর আকাজক্ষার চাপে বাংলা পুথিও সত্তা পায়, পুথির সত্তাটি যেন সংগ্রাহকের সত্তার প্রসারিত রূপের অংশে পরিণত হয়। বাংলা পুথির জন্য নিজের আগ্রহকে উৎকট বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশেষিত করেছিলেন।^{৪১} আমরা জানি যে আবদুল করিম উপমা দিতে স্বীকা করেন না যে, তেঁতুল লোভাতুর বাচ্চার সঙ্গে তাঁর মতো পুথি লোভাতুর বৃদ্ধের কোন তফাৎ নেই।^{৪২} ইংরাজিতে লেখা এক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চট্টগ্রামে আবদুল করিমের পুথি সংগ্রহকে মূল্যবান প্রত্নসম্পদ (valuable relics of past) বলেছিলেন।^{৪৩} যেন সেই কথার

খেই ধরেই জীবন সায়াফে আবদুল করিম ফুকরে ওঠেন :

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমি কঙ্কালের ব্যবসায়ী, পুরাতন পুথি কঙ্কালের মতই। কিন্তু আমি তাহার ভিতর যুগযুগান্তের রক্তধমনী ও নিঃশ্বাসের প্রবাহ ফনি শুনিয়াছি। আমার বিশ্বাস সে যুগের শিল্পকলাদের পক্ষে যাহা সত্য ছিল, আজ তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই।...তাহার আত্মদ যুগযুগান্তের অতিক্রম করিয়া আজও অবিকৃত অম্লান রহিয়াছে।^{৪৪}

কঙ্কালের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব, বর্তমানে সজীব অতীতকে অনুভবে আনা তো অন্য এক সময়বোধের ধারণা, কান পেতে শোনার এক বিশেষ তরিকা। পুথিও সন্তানময়, সত্যে বিশিষ্ট, সেই সত্যটুকু আবদুল করিম নিজে বোঝেন। পুথিসংগ্রাহকের আপন হৃদয়েই রসসিক্ত হয়ে উঠেছে পুথি।

জীবনের শেষে নিজের ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের শর্তই যেন পুথি খোজা ও পুথি পড়া। মূল্যায়নে আত্ম-উপস্থাপনের ভঙ্গিটাই তো সেইরকম, গাছ ও মাটির অনুবঙ্গে ভরা :

আমি পূর্ব বাংলার একজন গ্রাম্য লোক, গের্মো মানুষ, চট্টগ্রামী ভাষায় যাহাকে বলে ‘গাঁইয়া’। পশ্চিমবঙ্গের ভাইরা আমাকে বাঙ্গালও বলিতে পারেন। তাই আমার জীবনযাত্রা ও চালচলনে যেমন নাই চাকচিক্য, তেমন আমার ভাব ও চিন্তায়, আমার ভাষা ও লেখায় এক কথায় আজীবন আমি যে সাহিত্যের সাধনা করিয়াছি, তাহাতেও নাই কোন চাকচিক্য এবং নাই আধুনিক সাহিত্যপাঠের আকর্ষণীয় ঔজ্জ্বল্য। আমি পূর্ববঙ্গের মাটির মানুষ, সেই মাটিতে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সাহিত্য সেই মাটির বাসিন্দাদের মনের অনন্দরসে হইয়াছে পুষ্ট ও যুগ যুগ ধরিয়া জেগাইয়াছে মনের খোরাক—আমি সেই সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক, সেই সাহিত্যের রসেই আমার মনের রসভাণ্ডার হইয়াছে পূর্ণ, আমি সেই পুথি সাহিত্য রসের রসিক, তার ভাণ্ডারী ও প্রেমিক। আজীবন তিল তিল করিয়া আমি এই রস আহরণ করিয়াছি, সঞ্চয় করিয়াছি এবং সেই রসপাত্র পুথিসংগ্রহ আমার জীবনের ব্রত করিয়াছি।^{৪৫}

কালচার যেন নেচারের ভাষায় কথা বলছে, কৃষ্টি হয়ে দাঁড়াচ্ছে স্বভাব। যেন যেমন মানুষটি তেমনই তাঁর কাজ, ব্যক্তিত্ব ও জীবনচর্যা পরস্পর অনুগত। মনের প্রকার এবং সাধনার ধরনে বিবাদ নেই, দুটোই অন্যোন্ময় সম্বন্ধে আবদ্ধ। আর এই সম্বন্ধ রসের সম্পর্ক, হার্দিক। পুথির ভাণ্ডারি নিজেই রসিক, চিনির বলদ মাত্র নন। পুথির সংগ্রহশালাও রসের আধার, অতীত ও মৃতজ্ঞানের আগার মাত্র নয়। এই আত্মবোধেই কর্মিষ্ঠ ও রসগ্রাহী আবদুল করিমের চেতনা বিধৃত।

বাংলা পুথিজগতে সমতুল্য জ্বরদত্ত উদাহরণ দীনেশচন্দ্র সেন। মনসামঙ্গলের পুথির কাহিনিকে *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*-এ যথাযথ পরিবেশন করার চিন্তায় দীনেশচন্দ্র সর্পভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। পুথি সংগ্রহ ও সাহিত্য রচনার পরিশ্রমজনিত উৎকট পীড়ার ঘোরে তিনি স্বর শোনে, স্বয়ং মা মনসার কণ্ঠস্বর, “তাহা কঠোর হইয়াও কোমল, ক্রুদ্ধ হইয়াও মেহর্দ, বাহিরের হইয়াও একান্ত আপনার জনের মত”। মনসাদেবীর নির্দেশে পুথির বিবরণকে ছাপা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণে দীনেশচন্দ্র নতুনভাবে লিখলেন, “চোখের জল মুছিতে মুছিতে সেগুলি কাটিয়া চলিলাম।” কারণ ইতিহাসনিষ্ঠ অসুস্থ দীনেশচন্দ্রকে স্বয়ং মনসাদেবী ধমক দিয়েছেন,

যে পাদ-পীঠ শত শত ভক্তের অশ্রুতে সিক্ত, শত শত লোক যে মঙ্গলঘণ্টে অর্ঘ্য দিয়ে শান্তি পায়, তুই স্পর্ধা ও হঠকারিতার সহিত তাকে ব্যঙ্গ করেছিস, সোকের প্রাণ যেখানে আর্ত হয়ে, অসহ্য কষ্ট পেয়ে, ফুল বিধ দল নিয়ে একান্ত নির্ভরশীল হয়ে তীর্থযাত্রী হয়, তখনকার তাদের শুচিতা, ভক্তি ও বিশ্বাস তুই দেখলি না, সেইখানে বুট জুতা পায়ে হঠকারিতার সঙ্গে পূজার ফুল মাড়িয়ে এলি।^{৪৬}

পুথি পাঠ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়ায় দীনেশচন্দ্র সেন এই ঘোরের অভিজ্ঞতা আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতাটি পুরোদস্তুর ঘটনা, মানসিক দুর্বলতা নয়। এই ভাবের কথাই পুথিসংগ্রাহককে ইতিহাসকারের সঠিক দিশা দিয়েছিল, পুথির কাহিনিতে দেবী-মহাশূর্য্যর দোহাই দিয়ে রসিকের বোধকে শুধরে দিয়েছিল।

ফলে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে নির্মোহ ভেদবোধ থাকলে পুথিপাঠে নৈর্ব্যক্তিক প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চা করা যায়, নানা তুলনার বৈজ্ঞানিক ছক টানা যায়, আবদুল করিম বা দীনেশচন্দ্র সেন ঠিক সেই বোধের পক্ষে সব সময় সওয়াল করেননি। কারণ তাঁদের কাছে পুথিগুলোর আখ্যান বড়ো জীবন্ত, সেই জৈবনিক রসে তাঁরা ও তাঁদের প্রতিবেশী সমাজ মগ্ন। এই রসবোধে ও আত্মদে বিষয় আর বিষয়ীর সত্তা সংলগ্ন হয়ে ওঠে, ঐতিহ্যের পরিবর্তে সেই রসসংলগ্নতাত্ত্বিক পুথিপাঠের দাবি হাজির হয়। এসব ক্ষেত্রে মহান ‘মোক্ষমূলর’ বা যশস্বী গ্রিয়ারসনের সাটিফিকেট যেন ‘অধিকন্তু ন দোষায়’। দীনেশচন্দ্র সেন স্পষ্টই জানান, “বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে (সাহিত্য পাঠে) বিশেষ রূপ উপভোগের সামগ্রী পাইবেন কারণ বাঙ্গালীর মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানে কাব্যশুলিও গঠিত।”^{৪৭}

ধুরন্ধর পণ্ডিত ম্যাকসমুল্যার ও গ্রিয়ারসনের নাম তর্কের খাতিরে সাহেবি বাজারে বিকোবার জন্য নেওয়া অতি আবশ্যিক, ঐ অবস্থায় তাঁরাই বিপদতারণ। কিন্তু প্রাচীন বাংলা পুথি ও কাব্যের বৈশিষ্ট্যের উপভোগের ক্ষণে যে কোনো বাঙালি পাঠকের দাবি অগ্রগণ্য, এতে দীনেশচন্দ্র বা আবদুল করিমের সন্দেহ ছিল না। স্বকীয়তার আদত শক্তি তো এই বাঙালিয়ানার দাবিতেই আছে।

ব্যক্তি ব্যক্তিতে অবশ্যই ঝোঁকে তফাত থাকবে, প্রত্যেকের জীবন-অভিজ্ঞতা এক নয়, কেউ বা কুমিল্লার মাস্টার, কেউ বা চট্টগ্রামের সরকারি সেরেস্তার কেরানি। কেউ রাঢ়ে চণ্ডীদাস ও রামি রজকিনীকে খোঁজেন, আর কেউ চট্টগ্রামে আলাওলের পদ্মাবতীতে বিভোর। তবে প্রত্যেকের আত্মবোধেই চণ্ডীদাস বা আলাওল হাজির, নিজের ঘরের জিনিস বলেই তারা এঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের মঞ্চের বাঙালি সমাজের কাছে সেটুকুই এঁদের ওকালতির দাবি। পুথির বৈজ্ঞানিক বিচারে এঁরা সবাই ম্যাকসমুল্যার বা গ্রিয়ারসনের কাছে অধর্মণ কিন্তু আত্মবোধের অন্তরঙ্গ উপভোগে এঁদের স্বরাজী মারে কে?

ভাবনার ফেরফার

নানা পরিষদীয় কৌদলের মধ্যেও আবদুল করিমের কর্মকাণ্ড রামেন্দ্রসুন্দর বা হরপ্রসাদের মতো কর্তাব্যক্তিদের চোখ এড়ায়নি, ১৩০৭-১৩১২ বঙ্গাব্দের মধ্যে পরিষদ পত্রিকার পাতাতে তাঁর পুথিবিবৃতিগুলি ছাপা হয়েছে। এসব বিবরণ সঙ্কলিত করে সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী সিরিজে মুনশী আবদুল করিমের নামেই দুই অংশ *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ* ছাপা হয়। সিরিজের ৪৩ নং মার্কামারা তালিকায় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফীর লেখা একটি নিটোল ভূমিকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।^{৪৮} সেই পরিচিতিতে আবদুল করিম আদৌ ভুঁইফোড় নন, বরং পরিষদের অসংখ্য ‘হিতকামী উৎসাহশীল সদস্যের একজন’, দেশব্যাপী প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সগোত্র। এই ভূমিকায় পুথিসংগ্রাহকদের নামের লস্বা চওড়া ফিরিঙ্গি

আছে, পুথিসংগ্রহের তৎকালীন হাল হকিকত সবই লেখা হয়েছে। ঐ পরস্পরাতেই মুনশী আবদুল করিম ধর্তব্য, এই কথাটি জানাতে ভূমিকাকার ভোলেন না।

সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য : ‘Notices of Sanskrit Manuscript-এর আদর্শেই প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রকাশ করা। কাজের ফ্রেমটি নিয়ে কোনো সন্দেহের সুযোগ ব্যোমকেশ দেননি, পত্রিকায় প্রকাশিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল বিবরণকে পুস্তিকাকারে সাজিয়ে শুছিয়ে হাজির করাটাই পরিষদের কাজ।

ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতো সুধীদের বিবেচনায় প্রাচীন সাহিত্য একটি ‘গোলকধাঁধা’, এর থেকে বেরোনোর রাস্তা পুথিবিচার, তালিকাটি সূত্র মাত্র। কিন্তু সাহিত্যই একাধে ইতিহাস, জাতির ইতিহাস সাহিত্যেই আছে, সংস্কৃতির বিচারও সাহিত্যে হয়েছে। বাঙালির ঐতিহ্যের নির্মিতি যে মূলত সাহিত্যের রূপ নেবে, তার সংস্কৃতির কুলজি যে অক্ষরনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এতে আর সবার মতো ব্যোমকেশেরও সন্দেহ নেই। তাঁর লম্বা বিবৃতিটা নজর কাড়ে,

বঙ্গ সাহিত্যই বলিয়া দেয়, বাঙ্গালার পাঠান নৃপতিরা যেমন হিন্দুর দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করিতেন, তেমনি আবার হিন্দু দেবদেবীরই মঙ্গল-গীত লেখাইতেন, বাঙ্গালী কবিকে প্রতিপালন করিতেন, শিরোপা দিতেন। মুসলমান কবিরও বাঙ্গালা ছন্দে হিন্দুদেবতার লীলা, হিন্দু সতীর মহিমা, হিন্দু নায়ক-নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিতেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের হৃদিস লইয়া সাধকের ভাবে সাধনগীত করিতেন।

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় সে কালের সামাজিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস; সে কালের ভাষার নমুনা, ছন্দের নমুনা, অক্ষরের নমুনা; দেবায়তন, গোশালা, রক্ষণশালা, শয়নঘর, বিলাস কক্ষ, কেলিকুঞ্জ প্রভৃতির বিবরণ।^{৪৮}

এই সাহিত্য পাঠ তো অখণ্ড বাঙালির জাতীয় ইতিহাস রচনার সমতুল্য। কিন্তু সমন্বয়ের ঐক্য অবশ্য হিন্দু সংস্কৃতির দাপেই আছে, সেটাই যেন একমাত্র প্রতিমান। অখণ্ড বাঙালি জাতির স্বপ্নদর্শনে মুনশী আবদুল করিমও মশগুল, ঐ এক পুথিসাহিত্যই তাঁর বক্তব্যের সাবুদ। ব্যোমকেশের বক্তব্যের মুদ্রায় আবদুল করিমের আপত্তি থাকার কথা নয়। কেবল ঐক্যে ফারাক আছে। যেমন,

ভাষায় এই সাহিত্য পুরাদস্তুর বাঙ্গালী, প্রাণের স্ফূরণে এই সাহিত্য হতে বাঙ্গালার ভিজ়ামটির সম্মোহন গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা মস্তিষ্কে আরবী ও ভাবসম্পদে অনেকখানি পারসীক।^{৪৯}

তাই অখণ্ড বাঙালা সাহিত্যে এই বাংলাভাষী মুসলিম সাহিত্য চিন্তা ও ভাবে বৈচিত্র্য আনে, একঘেয়েমি ঘুচিয়ে দেয়। সেই বৈচিত্র্যকে যথাযথ স্বীকৃতি দেবার পক্ষপাতী সঙ্কলক আবদুল করিম। নানান্তরে যেমন তিনি এই বৈচিত্র্যের অনুগামী, বৈচিত্র্যকে চেনাবার নানা প্যাঁচ পয়জারে তিনি উৎসুক। কেননা সেই সাহিত্য পাঠই কেবলমাত্র “রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে আমাকে মাতাইয়া তুলিয়া আমার নিজের সহিত পরিচিত করাইয়া দেয়।” জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে বাঙালির অংশভাক্ নিয়ে কারুর দ্বিমত নেই, শব্দের মধ্যেও অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতির কাঠামোকে খাড়া করাই দুইজনের লক্ষ্য। শুধু নানা উপাদান বিন্যাসের আনুপাতিক হিসাব নিকাশে দুইজনের পার্থক্য আছে, প্রভাবের তৌলবিচারে বৈমত্য থাকবে। এই বৈমত্যের ছাপ ধরা পড়ে তালিকার ভাষায়, শব্দযোজনায় ও একক পুথি বিচারে।

‘মাঘ নিশীথের কোকিল’

তখনও দীনেশচন্দ্র সেন কুমিল্লা থেকে ডেরাডাঙ্গা গুটিয়ে কলকাতায় একেবারে চলে আসেননি, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যতখনও বোরোয়নি, ছাপাখানায় ছাপা চলছে; ঠিক এই সময়ে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মফসসল হুগলীর কাগজে একটা আত্মবিজ্ঞপ্তি বেরোয়, আত্মবিজ্ঞপ্তিই কতগুলি অনাবিস্মৃত পদাবলীর ভূমিকা। আত্মবিজ্ঞপ্তিটি মন দিয়ে পড়ার মতো :

পার্বত্যমাতা চট্টগ্রাম তিরদিনই কবিত্বের লীলাভূমি। এই চট্টগ্রামে কত কবি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল কোহিনূর ‘পদ্মাবতী কাব্য’ ও ‘লোর চন্দ্রাণীর’ কাব্য এই চট্টগ্রামেই রচিত হইয়াছে।

কিন্তু তবুও চট্টগ্রাম বা চাঁটিগার সংস্কৃতি বঙ্গের উচ্চবর্গীয়দের কাছে স্বীকৃতি পায় না। লেখক আবদুল করিম জানান,

চট্টগ্রাম বাঙ্গালার দেশ বলিয়া ঘৃণিত। চণ্ডীদাসাদির কবিতার জন্য কত গবেষণা চেষ্টা হইতেছে। এই ঘৃণিত দেশের কাব্য কবিতার জন্য কে মাথা ঘামাইয়া তথ্য সংগ্রহে যত্নপর হইবেন?

তাই চট্টগ্রামের বাসিন্দা আবদুল করিমই এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। নিকট প্রেক্ষাপটটি লক্ষ করার মতো। বাবু রমণীমোহন মল্লিক মুসলমান বৈষ্ণব কবি প্রকাশ করেছেন। সামান্য উদ্যোগ, কিন্তু সম্ভাবনায় ভরপুর। সেই উদ্যোগকেই সমৃদ্ধ করার জন্য নগণ্য আবদুল করিমের যাবতীয় চেষ্টা।

আজ তাহার মত একজন হিন্দুর নিকট মুসলমান কবিগণ আদরণীয় হইয়াছেন দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে সমগ্র হিন্দু সমাজই মুসলমান কবিদিগের আদর করেন। বস্তুতঃ কবি যেই হউন, কাব্য আদরণীয় হওয়া উচিত। “গুণাঃ সর্বাঙ্গিয়ন্তে।” এই বিশ্বাসে ও সাহসে আজ আমি কতকগুলি প্রাচীন পদাবলী সুপ্রাচীন হস্তলিখিত পুথি হইতে সংগ্রহ করিয়া সাধারণ্যে গোচরকরিতে ইচ্ছা করিতেছি।

গ্রামে গঞ্জের অন্ত্যজ পরিবারের কাছ থেকে পদাবলী আবদুল করিম সংগ্রহ করছেন। তিনি দরিদ্র, বাবু রমণীমোহনের মতো পুস্তক ছাপাবার সামর্থ্য তাঁর নেই। তিনি জানাচ্ছেন,

বলিতে যুগপৎ দুঃখ ও লজ্জা হয় যে এই সফল কবিতা আমি সামান্য হাড়িদিগের নিকট পাইয়াছি। তবে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কিনা ভগবান জানেন। আমার নিজের এমন সম্বল নাই যে সেগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিতে পারি। অতএব অনন্যোপায় হইয়া কবিতাগুলি বিলুপ্ত হইবে ভয়ে আজ এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে প্রেরণ করিলাম।

পরে আবদুল করিম স্পষ্ট ভাষায় প্রতিশ্রুতি দেন,

“যদি এইগুলি ছাপা হয় তবে ভবিষ্যতে আরো অপ্রকাশিত নতুন পদাবলী সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়া আশা আছে। নতুবা এইখানেই যবনিকা পতন। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি আমার নিজের সম্বলভাবে নিবন্ধ আমি নিজে প্রকাশিত করিতে পারিব না।”

চট্টলবাসী, বাংলা ভাষার মুসলমান সাহিত্যসেবক ও দরিদ্র—এই তিনটি পরিচয় আবদুল করিম নিজের গায়ে দেগে দিয়েছিলেন। তাঁর অজস্র লেখার মধ্যে ঠিক এই বিশেষণগুলি নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। নানা অর্থে তিনি যেন প্রান্তবাসী, বঙ্গভাষা দরবারে একটু কুণ্ঠিত, সম্ভুচিত। অন্যপক্ষে, সাময়িকপত্রই তাঁর রচনার প্রধান বাহন, বৃহত্তর সমাজে পৌছাবার সেতু। নতুন যে সব সাহিত্য পত্রিকা সদরে ও মফসসলে বার হচ্ছে, তার সম্ভাবনা সম্পর্কে আবদুল করিম

ওয়াকিবহাল। প্রাচীন ও বর্তমান, হাড়ি বা মুসলমানদের অল্পজ্ঞাত কবিদের সঙ্গে চণ্ডীদাসপ্রেমিক শিষ্ট সমাজের পরিচয় ঘটাবার গরজ যেন তাঁরই। পুথিসংগ্রহের যে উদ্যোগ তাঁর সময়ের সারস্বত সমাজে চলছে, তারই মধ্যে নিজের জায়গাটি আবদুল করিম ভালোভাবেই খুঁজে নিলেন।

সমসাময়িক রকমারি সাহিত্যিক পত্রিকাতে আবদুল করিমের লেখা ছাপা হত, বাংলা ভাষায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মতো পেশাদারি কাগজ তখনো ব্যতিক্রম। পত্রিকা বাছাইতে সাহিত্যবিশারদের ভেদবিচার কম ছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদিত ওজ্জনদার সাহিত্য পত্রিকায় বেশ ভালো মতোই তিনি কলকে পেতেন। আবার আশা বা জ্যোতির মতো স্থানীয় পত্রিকায় লিখতেও তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। প্রবন্ধগুলি আকারে নাতিদীর্ঘ, কাঠামোতেও বৈচিত্র্য নেই। ঢঙটা পুথি পরিচিতির, টুকরো টুকরো প্রবন্ধগুলিকে পর পর সাজালেই চটজলদি বড়ো একটা পুথিতালিকা পাওয়া যায়। গোড়াতে পরিচিতিমূলক নোট, তার পরে পুথির পাতা থেকে মোক্ষম নিদর্শন হিসাবে কয়েকটা উদ্ধৃতি থাকত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রিয়ারসনি ঢঙে আঞ্চলিক ও কথ্য শব্দপঞ্জি আর স্বনি ও অর্থ বিচার দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করা হত। লেখকের কাজ যেন বাংলা পুথি-বস্তুকে লোকনজরে আনা, সাহিত্য বিচারটি পরের কথা।

কিন্তু এত সব প্রকীর্ত প্রবন্ধে দুয়েকটি শব্দবন্ধের পুনরুজ্জীবিত বোঝা যায় যে সুরের একটা বাঁধা ধরতাই আছে। পুথির পাতায় স্বদেশ জরিপ করাই উদ্দেশ্য, এক একটি নগণ্য পুথিও যেন ‘বঙ্গ জিজ্ঞাসার’ এক একটি খুপরি খোলা জানালা। পুথিকল্পনায় চট্টগ্রামের বাঙালি মুসলমানের দেশগাঁটি বঙ্গের মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, পুথি পরিচিতি ও স্বদেশ পরিচিতি একাকার হয়ে গেছে।

সাধনা আমার, আমার দেশ

তার পুথি সম্পর্কিত রচনায় আত্মপরিচিতির যে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে আবদুল করিম বার বার খেতাব বা উপাধির মতোই ব্যবহার করেছিলেন, সেই তিনটিকে ঘিরে তিনি স্বতন্ত্র বয়ানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার ঐ তিনটি বয়ানের সমাবেশে একটি নিটোল বাচনিক বিন্যাস তৈরি হয়, তাঁর প্রকীর্ত লেখায় বাচনিক অভ্যাসের মতোই ঐ বিন্যাসটি বার বার ফিরে আসে। ঐ বয়ানগুলি যেন তাঁর ঢাল, আর বাচনিক অভ্যাসটি তাঁর তলোয়ার। একান্তই আমার ব্যবহৃত উপমা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সব বয়ান ও বাচনিক বিন্যাসের মাধ্যমেই তিনি পুথিসংগ্রহের রাজনীতির একটি মডেল দেন, মডেলের সঙ্গে মোকাবেলাও করেন। যেটা তাঁর দৌর্বল্য বলে প্রতিভাত হয়, সেখানেই থাকে তাঁর বস্তুব্যবহার আসল জোর।

পুথিসংগ্রহের আদিপর্বে ‘বিদ্যাভূষণী মনসা’ নামে পুথির পরিচিতি দিতে গিয়ে আবদুল করিম স্বচ্ছন্দে লিখেছেন,

হতভাগ্য চট্টগ্রামে সাহিত্যব্যবসায় কত কঠিন, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না। নিজে না করিলে অপরের দ্বারা কেন কাজই সম্পন্ন করিয়া লইবার উপায় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা একরূপ সখের কাজ; অথচ দেখা যায় এ কার্য উদয়-চিন্তাশূন্য লোকদিগের যোগ্য ও গ্রহণীয় হইলেও, যত অন্নচিন্তা-বিষয়-সংশয় কাতর শ্রীহীন ব্যক্তিরাই ইহাতে উদ্যম। এই প্রবন্ধের অধম লেখকও শেষোক্ত শ্রেণীর একজন...এই কবির বিবরণ সংগ্রহের জন্য আমরা কতজনকেই না বিফল অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার এমন দুর্ভাগ্য যে এ পোড়াদেশে কেহ সৎকার্যের সহায় হয় না। এই কারণে আমরা পাঠককে এতদ্বিষয়ে আর কোনও সমাচার দিতে পারিলাম না।^{৫১}

একালে ব্যক্তির পুঁথি সংগ্রহ করা একটি আয়াসসাধ্য কাজ, একাধারে শখের কাজ ও সৎকাজ। গরীবের ঘোড়া রোগ বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার মতো কাজটা আবদুল করিমের মতো লোকদের ঘাড়ের চেপে বসেছে। শখের কাজটা সৎকাজও বটে, আর এদেশে সৎকাজ তো হাতে গুনতি চরিত্রবান লোকেরাই করে। দরিদ্রও চরিত্রবান হতে পারে, সৎকাজ করার শখ তারও থাকতে পারে।

পুঁথি খোঁজা বিশেষ স্বদেশিক কাজ, অতএব কাজেই যেন কাজের প্রাপ্তি। সংগ্রাহককে হতে হবে শীলব্রতী। ‘শীল’ কথাটির মধ্যে সদ অভ্যাস, গুণ, চরিত্র সব নিহিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে ‘সখ’ কথাটি থাকার ফলে কাজটি হয়ে ওঠে আনন্দজনক, পুঁথি খোঁজার তাগিদটা যেন ভেতর থেকে আসে। এই তাগিদের ফলেই বাংলা পুঁথিসংগ্রহও স্বতন্ত্র মর্যাদা পায়, পুঁথিসংগ্রাহক হয়ে ওঠেন স্বদেশপ্রেমিক। একজন ব্যুল্যার হয়তো বা জ্ঞানতাপস বা ভারতপ্রেমিক কিন্তু দীনদরিদ্র আবদুল করিম তো তাঁর পোড়া মাতৃভূমি চাটগাঁর সেবক মাত্র।

তিনি নিজে ‘ক্ষুদ্রশক্তি’ দরিদ্র সাহিত্যসেবক কিন্তু একক চেষ্টাতেই ‘পাঁচশতের অধিক হস্তলিখিত পুঁথি’ তিনি জোগাড় করেছেন।^{৫২} এই পুঁথিভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত কিন্তু যোগ্যতা নয়, বরং চরিত্র। দরিদ্রের ঐকান্তিক সেবাই তো সেই চারিত্রিক জোরের প্রমাণ। এই কথা মাথায় রেখে তিনি বলে ওঠেন,

এ পর্যন্ত যাঁহারা এই মহৎ কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর না থাকিলেও তাঁহাদের কেহই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এই কার্যসাধনে ব্রতী হইতে পারেন না। এক দীনেশবাবু ভিন্ন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এ কার্য আর কেহই করেন নাই। তাঁহারা সকলেই নানা বিষয়ে ব্যস্ত এবং বিষয়ী সুতরাং তাপদম্ব লোক। তাহাদের পক্ষে এই কার্যে সমস্ত প্রাণমন নিয়োজিত রাখাই অসম্ভব।

পুঁথিসংগ্রহ ও চর্চা বিশেষ অনুশীলন সাপেক্ষ, নিছক লক্ষ্মীর বরপুত্ররা এই অনুশীলনের ধকল সহ্য করতে পারেন না। বিশেষ মানসিক গড়ন নিয়ে পুঁথিসংগ্রাহক হতে হয়। সাহিত্যবিশারদ স্পষ্টই জানান,

অপর প্রকারে সাহিত্যানুশীলন করিতে গেলেও পরিশ্রম ও অভ্যাসের দরকার হয় বটে, কিন্তু প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতির উদ্ধারে যে পরিশ্রম হয়, তাহা স্বতন্ত্র আকারের। এ স্থলে আশা ও নিরাশাকে মাত্র সঙ্গী করিয়া গ্রামে গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।^{৫৩}

পুঁথি খোঁজার বামেলা পোয়ানোটাই একজনের পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ঝুঁকি একালের কোনো বিষয়ী লোক ঘাড়ের নিচে চায় না। এই বয়ানে ঐতিহাসিক আবদুল করিম এবার একটি মোচড় দিলেন। তিনি সোজা চলে গেলেন সেকালের চট্টগ্রামে। বিষয়ী লোকদের ধরনধারন তখন আলাদা। সেকালের সমাজে পুঁথিচর্চাটি আত্যন্তিক, চট্টলবাসীর সাংস্কৃতিক অভ্যাসই তো নিরলস পুঁথিপড়া। মাত্র অর্ধশতাব্দী আগের চট্টগ্রামের সাহিত্যচর্চার অভ্যাস প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি এইরকম,

তখন শিক্ষিত লোক মাঝেই সাহিত্যানুশীলন করিতেন এবং অপর সাধারণে শিক্ষিত লোকদের ভিতর দিয়া সাহিত্যসুখ উপভোগ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। সেই আগ্রহের ফলে মুসলমান সমাজে পুঁথি

পড়ার একটা মস্ত সখ জন্মিয়া যায়। সে সখ ক্রমে একটা প্রণয় পরিণত হয়।^{৫৪}

এই সামাজিক শখ ও প্রথারই তো উত্তরাধিকারী আবদুল করিম নিজে। তবে সময়টি বদলেছে। ঐ ঐতিহ্যের জোরেই চট্টগ্রাম বিশিষ্ট গৌরবান্বিত। মধ্যযুগে বিশেষ চট্টলি ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের কর্মকাণ্ডকে সংলগ্ন করে চট্টলবাসীরূপে এবার আবদুল করিম আত্মসন্তার বয়ানে দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করলেন,

চট্টগ্রামবাসীদের কাব্যরসপিপাসার তীব্রতা সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করিবে, একথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।...এই কারণে চট্টগ্রামের প্রাচীনসাহিত্য সুদূরপ্রসারী; সে বিষয়ে বঙ্গের অন্য কোন জেলার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়।^{৫৫}

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বদেশিয়ানার জিগিরি আদৌ অভিনব নয়, পুথিসংগ্রহ ও বিচারে অঞ্চলপ্রীতি মাঝে মাঝে ধুমুকার কাণ্ড বাধাতে পারত।^{৫৬} ঐ পাকে চক্রে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বা যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য একবার না একবার পড়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এক দরিদ্রের সাহিত্যসেবা ও অতীতে চট্টলবাসীদের পুথিচর্চার ঐতিহ্যের দাবির বয়ানকে একজায়গায় এনে সাহিত্যবিশারদ সমসাময়িক মুসলমান সমাজের কাছে কর্তব্যের ডাক দিলেন। আবদুল করিমের বয়ানে যা সেকালে ছিল এস্‌থেটিকস বা রসভুক্তির পরিসর, তা একালে হয়ে উঠল ‘এথিকস’ বা জাতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব। অন্য সমাজ বা জেলার অভিজ্ঞতার তুলনায় এই প্রতিসরণটি আরো চোখে পড়ে। দীঘাপতিয়ার জমিদার শরৎকুমার রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম গড়ে ওঠে, অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ চন্দ ও রাধাগোবিন্দ বসাক কাজে নেমে পড়েন। হেতমপুরের জমিদার মহিমানিরঞ্জনর সাহায্যে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ‘বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি’ স্থাপন করেন, হরেকৃষ্ণও তো অ্যামেচার, ইংরেজি জানেন না। অথচ চট্টগ্রামে আবদুল করিমের সাংগঠনিক চেষ্টা সফল হয়নি। জজ আদালতের উকিলপুত্র নলিনীকান্ত সেনের পোষকতায় আলো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর পুথিসংগ্রহের কাজ শুরু হয়। তখনই ‘চট্টগ্রামে প্রাচীন সাহিত্য সংগ্রহ সমিতি’ নামে সংস্থা গড়ে তোলারও প্রকল্প নেওয়া হয়। নলিনীকান্ত সেনের মতো যুবক আবদুল করিমের আদর্শ; শহর কলকাতায় পড়াশোনা করার পর আইনব্যবসায়ী হবার সুযোগ ত্যাগ করে চট্টগ্রামে তিনি হাই স্কুলের হেড মাস্টারি নিয়ে ফিরে আসেন। আবদুল করিমের ভাষায়, “মাতৃভূমির সেবারতাবলম্বনের জন্য তাঁহার অন্তরে যে প্রবল অনুরাগ ছিল, সেই অনুরাগের নিকট তাঁহার স্বার্থ বলিদান করিয়া গত বৎসর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।”^{৫৭} এই দৈশিক চেতনায় স্বদেশ ও মাতৃভূমি তো চট্টগ্রাম, বিদেশটি কলকাতা শহর। কলকাতায় যাওয়া অর্থ জীবনে নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য পরিশ্রম করা। এই চৈতন্য গ্রামভদ্রদের জীবনে অস্বাভাবিক নয়, ভিটেমাটিই শেষ পর্যন্ত জন্মভূমি, গোত্র ও বংশের পরম্পরাতাই সেই এলাকাটা ধৃত। কিন্তু নলিনীকান্তের অকালমৃত্যুর ফলে সাহিত্যবিশারদের সব চেষ্টা মাঠে মারা গেল, চট্টগ্রামে আর কোনো পৃষ্ঠপোষক তিনি পেলেন না। অথচ আবদুল করিম জানেন যে সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে পুথির ব্যবহারিক ধারণা পালটাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক স্তানচর্চার সঙ্গে পুথিচর্চা সংলগ্ন করা আবশ্যিক, তবেই ইসলামি তমদ্দূনের চট্টলি বাঙালি প্রেক্ষিতটি বোঝা যাবে। এবারে একলাফে চট্টলবাসী দরিদ্র আবদুল করিমের একক সাধনার বয়ানটি বৃহত্তর বাঙালি মুসলমান সমাজের কৃৎকর্মের নীতিনির্দেশক দাঁড়ায়। একপক্ষে একক ব্যক্তির ঐতিহ্য-সাধনা, অন্যপক্ষে, সমকালীন মুসলমান সমাজের সার্বিক

ওদাসীন্য। এই বৈপরীত্যে তৈরি বাচনিক বিন্যাসটি বার বার তাঁর রচনায় ফিরে আসে। যেমন, আমাদের মুসলমান সমাজে কি জমিদার বা ধনী লোক নাই? গত যুদ্ধের বাজারে বহু লোকই তো অল্প আয়াসে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকও আছেন। কই তাহারা ত একটা সাহিত্য পরিষদ একটা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান বা একটা সার্বজনীন পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আগাইয়া আসেন নাই। দরিসের অকিঞ্চিৎকর সম্বল লইয়া আমি সাধ্যানুসারে অর্থ ও শরীরের রক্ত ব্যয় করিয়া একটার পর একটা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি এবং আজীবন যশ্দের ধনের মত এই সবকে আগলাইয়া রহিয়াছি—নষ্ট হইতে দেই নাই।

দরিসের আজীবনব্যাপী নিষ্ঠা তাঁকে অভিযোগের আঙুল তুলতে সাহস দিচ্ছে। তাই,

কতবার কতভাবে আমি সমাজের দ্বারে আমার সংগৃহীত পুঁথিগুলির বিবরণ প্রকাশের জন্য ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করিয়াছি, কিন্তু কেহই তো সাড়া দেন নাই। কোন মুসলমান ধনী আগাইয়া আসিয়া বলেন নাই—আমি আলাওলের পদ্মাবতী প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিব অথবা জঙ্গনামার অথবা রসুল বিজয় কাব্যের। কাজেই, ইসলামী সাহিত্যের প্রতি যে আমাদের সমাজের দরদ আছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? ^{৫৮}

ব্যক্তি-সাধনাকে সামাজিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করা দরকার, আত্মসত্তা তো তবেই জাতিসত্তায় বাস্তব অবয়ব পাবে। পুঁথিচর্চার পুরনো প্রেক্ষিত নেই। কিন্তু সমাজ হিতৈষণা তো কালধর্ম, সমসাময়িক ‘পাবলিক’-এর কাছে স্বীকৃত। ইসলাম বা মুসলমান পরিচয়েই ঐ গুণটি চর্চিত হওয়া দরকার। এই ‘public virtue’-র পরাকাষ্ঠার জন্যই তো বঙ্গবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে বাঙালি হিন্দুর পুঁথিচর্চা জাঁকিয়ে বসেছে। অথচ মুসলমান সমাজে কোনোরকম হেলদোল নেই, তারা ঐতিহ্যভ্রষ্ট। এভাবেই আধুনিকতার দরবারে যে-কোনো ঐতিহ্য পোষকতার দাবিদার হয়, রসভুক্তি ও কর্তব্যবোধের মিশেলই দাবিকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলে। আবদুল করিমের মতো ব্যক্তির দারিদ্র কাহিনি ও সাধনার ইতিবৃত্ত সেই দাবিকেই প্রার্থ্য দেয়। আত্মগত বিলাপে যে দাবির গুরু, সামাজিক জিগিরের প্রত্যশায় তার সমাপ্তি।

পুঁথি ও ‘পারফরমেন্স’

আবদুল করিমের বিবেচনায় ও তালিকায় পুঁথি সমাজেই স্বাক্ষর, সমাজেই যেন পুঁথির ধারক বাহক। পুঁথির লেখক, পত্রসংখ্যা, বিষয় সবকিছুই বিবেচ্য। কিন্তু এই বিবেচনা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসে সিদ্ধ। তাঁর কোনো পুঁথি আলোচনাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসের বর্ণনা থেকে ছাড় পায়নি। পুঁথিকে ঘিরে সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথাই যেন এক কাহন করে বলা হয়। পুঁথির কাল অনির্ধারিত, কাগজ ও ভাববিচার থেকে কেবল একটি সময়পরিসর জানা যায়। লেখকের নামও অনেকসময় অজানা, অনেকসময় আত্মপরিচয়ের ছত্রে বিধৃত। আত্মপরিচয়গুলিও বিতর্কিত। কৃতিবাসের আত্মপরিচয় নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই, আলাওলের আত্মপরিচয়ের সঠিক পাঠ ও ব্যাখ্যা নির্ণয়ে পণ্ডিত লড়াই করতে আবদুল করিমকে কম সময় ব্যয় করতে হয়নি। ^{৫৯} কিন্তু লোকসমাজ তো প্রত্যক্ষ বাস্তবে বহালতরিতে হাজির। পুঁথি বিচারে সেই সামাজিক অভ্যাসগুলি নিয়ে তো বিতর্ক নেই। সেক্ষেত্রে মুসলমানি তথা চট্টলি সংস্কৃতি ও সমাজ-এর যৌথ উপস্থিতি পুঁথিচরিত্রকে নির্ধারিত করে। দেখার চোখ থাকলে বা শোনার কান থাকলে সেই প্রেক্ষিতেই পুঁথির মর্ম উদ্ধার হয়, গুরুত্বটি বোঝা যায়।

তঁার তালিকায় প্রদত্ত ৫০৬ নং পুথি ‘জয়নাবের’ চৌতিশা। পদসংখ্যা ৬৮, কাগজ একেবারে ‘তাম্বকুটপত্র’ আর কি। ভগিতাটি নিপাত্তা, তারিখ ও লিপিকরে নাম নেই। চৌতিশা কি, তাই নিয়ে আবদুল করিম কোনো ব্যাখ্যা দেননি, কোন গোত্রবিচারও করেননি। কিন্তু এহেন এক পুথির আগে আবদুল করিম মুখবন্ধে লেখেন,

বিবি জয়নব হজরত ইমাম হাসেনের স্ত্রী। তাঁহাকে লইয়া পাপমতি এজিদের নিষ্ঠুর অন্তঃকরণে যে বিদেহবহি প্রজ্জলিত হয়, সে আশুনে হজরত ইমাম হাসন ডগ্মীভূত হইলেন,—সমস্ত নবীবংশ ছারখার হইয়া যায়। সেই মর্মান্তিক দুঃখকাহিনী লিখিতে লেখনী সরে না।^{৬০}

তালিকাকার নিজের পুথিকাহিনির রসভোজনা, বিশেষ সামাজিক সংস্কৃতিতে লালিত, সেই সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মবোধে পুষ্ট। তালিকায় ঐতিহাসিক ক্রমবিচারে পুথিটি নগণ্য কিন্তু আবদুল করিমের চোখে তার সাংস্কৃতিক অনুসঙ্গের পরিসরটি অনেক বড়ো।

সৈয়দ আলাওলের বৃহৎ কাব্য *পদ্মাবতী*, ও *সয়ফুল বদায়ুজ্জামাল* পুথি দুটির নানা অংশ-বিশেষ পালা হিসাবে পাওয়া যায়। কুস্তিবাসের কাব্য পাঠেও এই রীতি প্রচলিত আছে। *পদ্মাবতী* ও *বদায়ুজ্জামালের* রূপবর্ণনা সংক্রান্ত ৫২৭ নং পুথি পরিচিতিতে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পুথিপাঠের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সাতকান্ন করে বলেন।

এই সব ‘রূপ বাখানে’ অন্যান্য কবির মতো আলাওলও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ অংশ সকল সাধারণ মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়। তাহাদের ‘মেলামজলিসে’ ‘পদ্মাবতী’ প্রভৃতি পুথিগুলি গীত হইয়া থাকে। দুই একজন গায়ক বিবিধ রাগরাগিণীর স্বাক্ষরের সহিত বিবিধ ধূয়া ধরিয়া সমস্বরে পুথি পাঠ করিতে থাকে আর পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তি পঠিত অংশের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া থাকেন।

পুথিপাঠের লোক অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে আবদুল করিম পুথিবিচারের কথা ভাবতেই পারেন না। এর পরই তঁার নিজস্ব মন্তব্য শোনা যায়।

অধুনা স্বীকনসংগ্রামের কঠোরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নির্দোষ আমোদপ্রবণতা লোকসমাজে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অদূর-ভবিষ্যতে ইহা স্বপ্নের কাহিনীতে পরিণত হইতে পারে।

আবদুল করিমের সমালোচ্য পুথি একটি নোটবহি, *পদ্মাবতী* ও *বদায়ুজ্জামালের* রূপবর্ণনার ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ, উদ্ভট শব্দার্থে ভর্তি। নমুনা হিসাবে দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেই আবদুল করিম পরিচিতিটা শেষ করেন এইভাবে,

আর বেশি উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। আলাওলের পাণ্ডিত্যের কি চমৎকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা এই দুই ছত্র হইতেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। পণ্ডিতগণের মুখে এই ভাবের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বাহবার উচ্চরোল পড়িয়া যায়; পাণ্ডিত্যের দৌড় দেখিয়া অনেকে আবার বিস্ময়ে হা করিয়া থাকে।^{৬১}

এই রসের বোধে যে কোনো গোঁয়ো পুথিই সিন্ধু, সেই বিচারেই পুথি পরিচিতি সার্থক। তঁার পুথি পরিচিতির তালিকা শেষ হচ্ছে ৬০০ নং-এর এক নামহীন পুথিতে, আবদুল করিম নিজের জানাচ্ছেন, “ইহা যে কি পুথি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আদ্যন্ত খণ্ডিত।” তিনি পুথিটির নাম দিয়েছেন ‘জাগরণ গানের যোষা’, কারণ এই পুথিতে অনেক সুন্দর ধূয়ার দুই একটি পংক্তির সংকলন দেখা যায়। পরের মুহূর্তে অভিজ্ঞতার সূত্রে মানছেন যে ‘ইহা’ যে কিরকম পুথি, লেখনী

যোগে তাহা বুঝা অসম্ভব', কারণ তাঁর মতে পুথির মর্মবস্তু আছে গানের অনুষ্ঠানে, প্রকৃত গায়কী রীতিতে। তিনি লেখেন,

তান লয় সহকারে জাগরণ পাঠ বা গান করিবার সময় ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল ঘোষা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। জাগরণের এক এক পালা গাহিবার সময় এক এক দিন যে সকল ঘোষা গান করা আবশ্যিক বা উচিত বলিয়া বিবেচিত তন্মতেই ইহাতে ধ্যানগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকিবে।

তালিকায় আবদুল করিম পর পর কিছু ঘোষা উদ্ধৃত করেছেন, এই 'সুন্দর ও মধুর প্রাণ জুড়ানো সঙ্গীতে' তিনি বিমোহিত। তিনি তো পুথিরসিক, 'মাতৃভাষার অফুরন্ত সুধার ভাণ্ডার আলোড়ন' করে জীবন ব্যয় করেছেন। কিন্তু এই ঘোষা গানের বর্ণনায় তাঁর দাবি আমিত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য এক বৃহত্তর দাবি তোলে : "বাঙ্গালীর ঘরে কে এমন মরু শুষ্ক হৃদয় আছেন, যিনি এই অমিয়-মদিরা-পানে আত্মবিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার জয় ঘোষণা না করিয়া পারেন?"^{২২}

বিশেষ পুথিবিচার থেকে আবদুল করিম একটি সাধারণ বৈচারিক নীতিতে চলে গেলেন। পুথির রস আন্বাদনের কাছে পুথির কেজো প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য তুচ্ছ হয়ে গেল। এই রসবিচার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই রসবিচারের বিশেষ শর্ত আছে। কেবল রসিকের মাতৃভাষাটি বাংলা হওয়া চাই।

সাহিত্যবিশারদ বাঙালি, তাই ঘোষার রসে মজে আছেন, এটাই স্বাভাবিক। এই যুক্তির প্রসারেই অন্য বাঙালিরাও আবদুল করিমের শরিক হবেন, এটাই প্রত্যাশা। বাঙালিদের একটা দাবি আছে। সেই ভাষার জোরেই বিদেশি ভাবও স্বদেশি হয়ে ওঠে, অন্য সংস্কৃতির কাহিনিকে আত্মীকৃত করে তোলে। তালিকায় দৌলত উজিরের ৪৬৩ নং *লায়লী-মজনু* পুথির পরিচিতিটাই ভাবা যেতে পারে। আলোচ্য তালিকা সঙ্কলিত করার সময় করিমের সংগ্রহে কুন্সে পুথি একটা, 'তাও বর্ণজ্ঞানহীন মুসলমান লিপিকরের' হাতে পড়ে একেবারে অবোধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পুথিটির কটা পাতা, অক্ষর কি ছাঁদে কিন্যস্ত, এই সব খুঁটিনাটি নিয়ে আবদুল করিম আদৌ মাথা ঘামাননি। এর পরিবর্তে তিনি নিছক পুথি পাঠের অনুভূতি পেশ করেছেন, তালিকাকারকে পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছে এক রসিক। রস-আন্বাদনের ক্ষেত্রে সাহিত্যবিশারদের উপস্থাপনা এইরকম,

ইহার ভাষা বৈষ্ণব কোবিদকুল কুহরিত দূরগত নৈশানিল সঙ্কলিত সঙ্গীতক্ষনিবৎ সুমিষ্ট সেই ব্রজবুলি,—প্রেমপ্রবণ বাঙ্গালী-হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা।

আবদুল করিম বারবার বাংলা ভাষায় অনুরণিত লায়লী-মজনুর কাব্যকে পড়তে বলেন, ফারসি কাব্যগাথার তাৎপর্য বাঙালি বোধেই ধরা পড়বে, সুফিতত্ত্ব জানা অত্যাাবশ্যক নয়। বৈষ্ণবের ব্রজবুলি তো বাঙালি শোনে, আবৃত্তি করে, সেটি তো স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। বৈষ্ণব লীলারসের ভাবনাতেই লায়লী-মজনুর পুথি যেন বাঙালির ঐকান্তিক সম্পদ হয়ে ওঠে। বিবৃতির শেষ অনুচ্ছেদ লক্ষ করার মতো,

সকলেই জানেন, লায়লী মজনু বিয়োগান্ত কাব্য। মজনু ও লায়লীর জন্য বড় দুঃখ হয়। বাস্তবিক বাঙ্গালীর কোমল হৃদয়ে বিয়োগের মর্মভেদী তীব্র যন্ত্রণা অসহ্য। তাই এই গ্রন্থের

লায়লী লায়লী বলি হইল নৈরাশ।

মজনু ঘরেতে রৈল ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥

এই শেষ দুই ছত্র পড়িয়া আমাদের কোমল হৃদয় নৈরাশ্যের গুরুভারে আপনিই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।^{২৩}

অনুচ্ছেদের শুরু 'সকলেই জানেন' বাক্যাংশ দিয়ে, কথাটি তো সর্বজনপ্রযোজ্য। বাঙালির

হৃদয় নরম, সেটাই তার জাতের ধাত। ফলে পুথি পড়ার সময় বেজাত মজমুর নিঃসীম দুঃখে সহৃদয় হতে বাঙালির একটুও বেগ পেতে হয় না। ফারসি আখ্যানের রস বাংলা ভাষার স্বভাবজ্ঞ গুণেই যেন বাঙালি পাঠক তথা আবদুল করিম উপভোগ করেন।

পুথিসাহিত্যই তো চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বড় দাঁড়া। পুথির কিংবদন্তিতেই তো লোকের ইতিহাসজ্ঞানটি ধরা থাকে। *বিদ্যাভূষণী মনসা* পুথির আলোচনা প্রসঙ্গে লোক-বিশ্বাসে নিজের দেশ ও কালজ্ঞানের জরিপটুকু তিনি করে দেন।

চট্টগ্রামের অধিবাসীগণের বিশ্বাস, মনসা ও চাঁদ সদাগরের ব্যাপার এই চট্টগ্রামেই ঘটিয়াছিল। কেবল আন্তরিক বিশ্বাস নয়, অনেকে ঘটনার স্থানাদিও নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। মনসা-পুথির ‘চম্পক নগর’ এখানে চাঁপাতলী নামে পরিচিত। ইহার পাশ্বেই গুণদ্বীপ নামে গ্রাম। তাহাই নাকি ‘গুজ্জরী’ বা গুজ্জুরী। চাঁপাতলাতে চাঁদ সদাগরের প্রকাশ দীঘি আজও বর্তমান। সমুদ্রগামী নাবিকেরা আজও তাহার জল পান করে। তাহার নিকটেই গুজ্জরীর ঘাট ও নেতা খোপানীর ঘাট প্রদর্শিত হয়। প্রবাদ এই যে তাহার অত্যন্ত ব্যবধানে বৈরাগ নামক গ্রামে কালু কামাবের ভিটা ও লখিন্দরের লোহার বাসরঘর অবস্থিত ছিল। কালু কামাবের তথাকথিত ভিটা আমরা দেখিয়াছি। তথায় নাকি আজও ভূগর্ভে লোহার গুড়ি পাওয়া যায়।^{৬৪}

লোকবিশ্বাসের টানে চট্টগ্রাম বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রে চলে এল, মনসামঙ্গলের ঐতিহাসিক বাস্তবভূমি হয়ে দাঁড়াল জেলা চট্টগ্রাম। সাহিত্যের পুথিতে যেন সেই প্রসারণের দাবি আছে যার মাধ্যমে বঙ্গের প্রান্তসীমাতে কেন্দ্র লালিত বড়োসড়ো ঐতিহ্যের দেশস্থল পাওয়া যাবে। এভাবে পুথিসাহিত্যকে ঘিরে আবদুল করিম লোকবিশ্বাসের দোহাই দেন, নিরপেক্ষ সংগ্রাহকের চওে রিপোর্টটি লেখেন, প্রাপ্ত বর্ণনাতে ‘নাকি’ সন্দেহবাচক শব্দটি বসে থাকে।

আরেকটি পুথির প্রতিবেদনে আবদুল করিম নিজেই লোকবিশ্বাসের শরিক, চাঁটগা সমাজের বাসিন্দারূপেই তিনি পুথি পরিচিতির লেখক। পুথিতালিকাতে সৃষ্টি পত্তনের ও মনসা গানের পুথি সংক্ৰান্ত পরিচিতিতে তিনি কিংবদন্তীর নামগুলোর বর্ণনা করে জানান যে

এখানে আরেকটি কথা বলা উচিত যে দেবদেবী বিদেষী মুসলমানদের মুখেই মনসা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়।

তিনিও ঐ সমাজের একজন। তাই নির্ধিধায় তিনি লিখতে পারেন,

এই সকল বিবেচনা করিয়া চাঁদ সদাগরকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না এবং মনসা দেবীর কাণ্ডকারখানা চট্টগ্রামেই হইয়াছিল বলিয়া যেন মনে হয়।^{৬৫}

চট্টলনিবাসী আবদুল করিমের মনে হওয়ার মধ্যে আঞ্চলিক মুসলমান সমাজের কিংবদন্তি ও স্থানীয় পুথির গল্প মিলেমিশে যাচ্ছে, ভাষার বিন্যাসে একে অপরের সাক্ষ্য রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রঙার সাক্ষ্যের বারোয়ারিতলায় যে কোনো ব্যালার, কীলহর্ন, গ্রিয়ারসন বা যদুনাথ সরকার ঝাড়াই বাছাই করে স্থান বা ঘটনা নির্ণয় প্রসঙ্গে সূচিস্থিত অভিমত দিতে পারতেন। কিন্তু নিজ বিশ্বাসের ভরসায় বঙ্গব্যাপী একটি লোকগাথাকে চট্টগ্রাম বা অন্য কোথায় দৈনিক স্থিতি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ভরকেন্দ্রে কে নড়াতে তাঁরা চাইতেন না। পুথিপরিচিতির মাধ্যমে লোকসমাজের সামূহিক বিশ্বাসকে ইতিহাসের বাস্তবভূমিতে রূপান্তরিত করা তাঁদের প্রাচ্যবিদ্যা প্রকল্পের বাইরে ছিল।

স্বভাষাভাষী হিসাবে বাঙালি আবদুল করিমের সব প্রত্যাশা পূরণ করে তা তো নয়।

পুথি-তালিকাতেই তাঁর চিরকেলে আক্ষেপও থাকে। ছতন ময়নামতীর পুথি পরিচিতিতে আবদুল করিম একইভাবে ফুরকে উঠেন,

চট্টগ্রামে প্রাচীন গৌরবের অনেক ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান রহিয়াছে।—নাই কেবল সেই দিন—
নাই কেবল তাহার খোঁজ করিবার লোক। হা মাতঃ জন্মভূমি; যাহারা তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে
সক্ষম, তাঁহারা তোমার প্রতি উদাসীন, তোমাকে ভ্রক্ষেপও করেন না। আর অন্নচিন্তা বিষধর দংশন
কাতর এই অভাগার চিন্তাক্রিষ্ট হৃদয়ে তোমার পদসেবার প্রবল বাসনা থাকিলেও তোমার কি কাজই
বা করিতে পারিবে? ^{৬৬}

ধূয়ার মতো ঘুরে ফিরে আসা এই আক্ষেপ তো আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর, অভাবের মাধ্যমে
ভাবের কামনাই দ্যোতিত হচ্ছে।

আবদুল করিমের সঙ্কলিত পুথি পরিচিতি যেন কেবল অতীত পুথির তালিকা নয়, মাঝে
মাঝে সেটা ম্যানিফেস্টোর আকার নেয়, মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গভাষীর স্পষ্ট কৃৎকর্তব্যের নির্দেশও
পুথি পরিচিতিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ও নবীন : আবদুল করিম, নগেন্দ্রনাথ বসু ও আহমদ শরীফ

আমাদের আলোচনায় স্পষ্ট যে আউফ্রেখট ঘরানার তালিকা আবদুল করিম-এর উদ্দিষ্ট নয়,
এমনকী মিজ্রাজ রচিত সংস্কৃত পুথির তালিকাও তিনি অনুসরণ করেননি। অথচ জানাই আছে
আবদুল করিমের তালিকার প্রকাশকের অর্থাৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তাব্যক্তিদের মাধ্যম
ধরনের তালিকাই আদত আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের নামের বুড়িটুকু ছুঁয়েই আবদুল করিমের
পুথির বিবরণটি ছাপা হয়। পত্রিকায় আবদুল করিমের পূর্বসূরি পুথিসংগ্রাহকদের টুকরো তালিকাও
ছাপা হয়। ^{৬৭} বাংলা পুথিসংগ্রহে নগেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম পথিকৃৎ, আবদুল করিমের রচনার
আগেই পরিষৎ পত্রিকাতে তিনি সংক্ষিপ্ত তালিকার ছকে ২১৩টি বাংলা পুথির পরিচয় দেন। এই
তালিকায় লিপিকাল, প্রাপ্তিস্থান, পুস্তিকার উল্লেখ করে পরিচিতি সাজা হচ্ছে, মাঝে মাঝে
শ্লোকসংখ্যাও বলা হচ্ছে। ^{৬৮} হরগোপাল দাসকুণ্ডুরও লেখার ঝোঁক ঐ গোত্রের, আরম্ভ, ভগিতা,
পত্রাঙ্ক, বিষয়, প্রাপ্তিস্থান, কাগজের অবস্থা ও লেখক পরিচিতি দিয়েই তিনি ফিরিস্তিটি শেষ
করছেন। ^{৬৯} সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাস ও রীতির সঙ্গে পুথি কীভাবে যুক্ত, সেই বোধের
রেশ তালিকাগুলিতে নেই। এইসব ফিরিস্তি কেবল পুথির লেখ্যরূপের চৌহদ্দিতেই আবদ্ধ,
সংগ্রাহক কেবল পুথির অতীত পরিচয় নির্ণয়ে আগ্রহী। সেই পরিচয় যতই নির্দিষ্ট হয়, পুথিসংগ্রহ
ততই যেন সঠিক ও মজবুত হয়ে উঠবে।

সবাই ঐরা আবদুল করিমের প্রজন্মের লোক, পুথি ও লোকজীবনের অন্তর্লীন সম্পর্ক
ঐদের অজানা থাকার কথা নয়, নিজের নিজের অঞ্চল ও দেশের ঐতিহ্য-মাধুর্যে ঐরাও কমবেশি
মুগ্ধ। তবে উপস্থাপনার ঝোঁকে পার্থক্য থেকে যায়। বিশ্বকোষের সঙ্কলনের কাজে নগেন্দ্রনাথ বসু
পুথি সংগ্রহ করেছেন, আধুনিক অর্থে প্রথম বাংলা পুথিশালা যেন তিনিই ব্যক্তিগত উদ্যোগে
গড়ে তুলছেন। ‘বিশ্বকোষ কার্যালয়ই’ সেই পুথিশালা, এই কথা ব্যোমকেশ মুস্তাফি নিজেই স্বীকার
করেছেন। ^{৭০} তাঁর একটি স্মৃতিচারণে নগেন্দ্রনাথ বসু জানাচ্ছেন যে তাঁর প্রদত্ত পুথিবিচারে বাংলা
সাহিত্যের ক্রমিক অবয়ব তৈরি হবে, প্রাচীন বাংলা শব্দাভিধানও নির্মিত হবে। ^{৭১} দ্বিতীয় কাজে

তিনি হাত দিতে পারেননি। কিন্তু তিনি *বিশ্বকোষ*-এর অষ্টাদশ খণ্ডে (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) ‘বাঙ্গালা সাহিত্য’ শিরোনামে দ্বিশতাধিক পৃষ্ঠায় তাঁর প্রথম প্রকল্পের বিবৃতি পেশ করেন। সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম আদি রচনা হিসাবে নিবন্ধটি নানা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, আজও অল্প আলোচিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রভাবে তিনি পুথির সংগ্রহকে ধর্মপ্রভাবের ক্রমিক বর্গে সাজিয়েছিলেন, যেমন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, মুসলমান, পৌরাণিক, বৈষ্ণব ইত্যাদি। তাঁর মতে সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্প্রদায়গত, সেই তালিকাতে কৌশলে তিনি কুলজীর প্রভাবও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।^{১২} এই বিবৃতিতে মুসলমান প্রভাবের অংশবিশেষটি আবদুল করিমের পুথি পরিচিতিরই পুনর্লিখন। তাঁর লেখায় অবশ্য স্পষ্ট ঋণ স্বীকারটুকু নেই।^{১৩} পুথির বর্গ বিভাগে তিনি বিষয় বিন্যাস করে কতকগুলি খোপ করেছেন, যেমন তত্ত্ব শাখা, ইতিহাস শাখা, উপাখ্যান শাখা ইত্যাদি। এই বিষয় বিন্যাসের চর্চাটি প্রাচ্যবিদ্যার গ্রাহ্য তালিকার অনুকৃতি, এই ধরনের কোনো খুপরি আবদুল করিম তাঁর তালিকায় করেননি। মুসলিম ধর্মাবলম্বী কবিরা বাংলাভাষাকে পুষ্ট করেছেন, এই বিষয়ে নগেন্দ্রনাথের সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর মডেলটি হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধর্মগোষ্ঠী, সেই ছাঁচে মুসলমানি সাহিত্য লিখিত হয়েছে, তাতে অবশ্যই দো-আঁশলামি রয়েছে, সঙ্করতায় ভরা সাহিত্য। “এমামযাত্রী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের বিশেষ পার্থক্য ছিল না”, “হিন্দু দেবতার স্তুতিবাদে তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না”, পুথিসাহিত্যে তো এটাই প্রমাণিত হয়। কাশিম ও সকিনা বিবি সংক্রান্ত পুথি প্রসঙ্গে কাশিমের যুদ্ধ বর্ণনা বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু সরাসরি আবদুল করিমের ভাষায় লেখেন “সেই দুঃখের কথা লিখিতে লেখনী সরে না।” দৌলত কাজির ‘লায়লামজনু’ উপাখ্যান শাখার অঙ্গ, “এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছাঁদও দৃষ্ট হয়।” সেই প্রসঙ্গেই নগেন্দ্রনাথের কাটা কাটা বর্ণনাটি প্রণিধান-যোগ্য,

একখানি মুসলমানী প্রেমকাহিনী, কাব্যশানি বিয়োগন্ত। মজনু ও লায়লার বিরহ ও বিচ্ছেদ গাথা মনে করিলে স্বভাবতই হৃদয়ে বিয়োগের মর্মস্বন্দ যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে।...গ্রন্থমধ্যস্থ মজনুর নিলাপ ও স্বতুবর্ণন সাহিত্যসৈরীর আদরের যোগ্য; স্বতুবর্ণনের ভাষা প্রেমপ্রণয় বাঙ্গালী হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। তন্মধ্যে বৈষ্ণব কবিকুলের রাধাবিরহগীতির ঝঙ্কারবৎ সুমিষ্ট ব্রজবুলিও শুনিতে পাওয়া যায়।^{১৪}

আবদুল করিমের তালিকায় দেওয়া বিবৃতিটিই সামান্য সম্পাদনা সহকারে নগেন্দ্রনাথ তাঁর বাক্যবিন্যাসে ব্যবহার করেছেন। সারগ্রাহী বক্তব্যে ও রসবিচারে দুইজনের কোনো বৈমত্য নেই। কেবল আবদুল করিমের উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নগেন বসুর লেখায় নেই। অথচ আবেগের আতিশয্যেই আছে ভাবিত হবার কৃৎকৌশল, পুথি পড়ার সূরে তা অনুরণিত। ভাষার ঝোঁকে, পয়ার ছন্দে ধৃত ছত্রের উদ্ধৃতিতে, উত্তমপুরুষের জবানিতে সাহিত্যবিশারদ প্রতিসরণের খেলা খেলেন। এই খেলায় পুথির পাতা থেকে গাথাটি যেন পড়ার মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে। ঐ চণ্ডের পড়াতেই যেন বাঙালি তার স্বভাবরস আনন্দন করতে পারবে। শব্দবিন্যাসে আবেগের অতিরেককে পরিহার করে সরল বাক্যে বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিতে নগেন্দ্রনাথ বসু সেই একই পুথিবিচারকে তাঁর সাহিত্যনিষ্ঠ ইতিহাসচিন্তার বর্গলক্ষণে সাজালেন। ক্যাটালগের কাজ তো ক্যাটিগরি তৈরি করা। ঠিক লক্ষণ অনুযায়ী সাজানো না হলে ক্যাটালগই বা কীভাবে ঐতিহাসিক ফ্রেমের সঙ্গে সাযুজ্যে যাবে?

আবদুল করিমের হাতে গড়া শিষ্য পুত্রপ্রতিম আহমদ শরীফ, তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত আবদুল করিমের পুথি সম্ভারের নূতন করে সাজানো তালিকা ও পরিচিতি তিনিই তৈরি করেন, গত অর্ধ শতক ধরে বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে ঐ গ্রন্থটিই বহুল

ব্যবহৃত।^{৭৫} নগেন্দ্রনাথ বসুর মতো আহমদ শরীফের মাথাতেও একটা ছক কাজ করছিল।

পুথি পরিচিতিতে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। কেবল কালানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

এই কাজ করতে গিয়ে আহমদ শরীফ জানিয়েছেন যে আবদুল করিমের রচিত নিজস্ব মৌলিক গ্রন্থ নেই। তাঁর পুথি পরিচিতিতে ‘বর্তমান রূপ দেবার জন্য প্রায় সব পুথির বিবরণ আমাকে নতুন করে লিখতে হয়েছে’, ‘কুণ্ডিকাটা’ আবশ্যই আবদুল করিমের। কিন্তু ক্যাটালগটির আদর্শ Rieu ও Ette কৃত পাণ্ডুলিপির প্রখ্যাত তালিকা।^{৭৬}

এজন্য আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রতিসরণ ঘটেছে, আবদুল করিম প্রদত্ত সব তথ্যই নতুন করে সমীক্ষিত আছে, তবে সাজানোর চণ্ডটি পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে আবদুল করিমের নিজস্ব কণ্ঠস্বরটি চাপা পড়ে গেছে। বদিউজ্জামালের রূপবর্ণনার পুথি পরিচিতিতে আহমদ শরীফ আবদুল করিমের পুথিপাঠের মজলিসি বর্ণনাটি একেবারে বাদ দেন, সামাজিক অভ্যাসের কাহিনীটি একেবারে উবে যায়। পুথি সংক্রান্ত তথ্যগুলি অবশ্য অবিকৃত থাকে, পুথির বিন্যাসটিও স্পষ্ট করে লেখা হয়

আলাউলের পদ্মাবতী ও সময়ফুলমূলক বদিউজ্জামালের নায়িকাদ্বয়ের রূপবর্ণনাংশ কবিত্ব পাণ্ডিত্যময় বলিয়া বহুল পঠিত হইত। ফলে পঠন, পাঠন ও নাড়াচাড়ার সুবিধার জন্য ঐ অংশটুকু পৃথক পুথি হিসাবে প্রচলিত ছিল।...প্রতি পংক্তির শব্দাবলীর অর্থ তির্যকভাবে পংক্তির নীচেই লিখিত আছে এবং মূল পাঠ ও টীকার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মূল পাঠ বড় হরফে লিখা আছে।^{৭৭}

পুথি পরিচিতিতে তো খোদ পুথিই অগ্রাধিকার পাবে, সমাজ নয়; পুথি থেকেই তো সমাজটি জানা যাবে। কার্যকারণ সম্পর্ক তো সেভাবেই সাজানো বিদ্বৎসমাজের গৃহীত নীতি।

নিজের লেখা ‘পুথি পরিচিতি’তে সাহিত্যবিশারদ মধ্যযুগের ‘প্রাচীন মুসলমানি গ্রন্থ’ ‘নূর ফরামিস নামা’ (৫১৯ নং) আলোচনা করেছেন, *নূরনামা* বলে আরেকটি কেতাবের সঙ্গে পুথিটি যুক্ত। পুথির লেখক আবদুল করিম বাংলায় মুসলমানি শাস্ত্রগ্রন্থ লিখতে গিয়ে একটি দোহাই দিয়েছেন। নূর নবি হজরত মহম্মদের সভায় যেন তিনি বহালতবিয়তে হাজির ছিলেন। তখন রসুলা নিজে পড়ছেন, পালাকার আবদুল করিম যেন সেই ব্যাখ্যা শুনে লিখছেন।

একদিন সভামধ্যে নির্জনে বসিয়া।
পুণ্যপন্থ্যাব কথা সুনাইল পড়িয়া ॥
তা সুনিয়া সবে মিলি হরসিত হইল।
কহিল কিতাববাণী নিশ্চয় জানিল ॥
কিতাব অভ্যাস নাহি পড়িতে না পারি।
নিসি দিসি পড়ি সুনি মনে শ্রদ্ধা করি ॥
বুদ্ধি ক্রমে তোমা কৃপা থাকে জদি মনে।
বাক্বালা ভাসে রচি দেয় পড়ি সর্ব জনে।

পুথি সাহিত্যে এই জাতীয় দোহাই পরিচিত, ‘ফারসি ভাসের’ পরিবর্তে বাংলা ভাষায় পবিত্র শাস্ত্রালোচনার পরিচিত মুখবন্ধের একটি রকমফের ছত্রগুলিতে পাই। পুথিপ্রেমিক মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ নিজের মতো করে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন,

সে কালের গ্রন্থরচয়িতারা স্বীয় গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য কতরূপ মিথ্যা বুজুর্কির

ভান করিতেন, প্রাপ্তকৃত অংশটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোথায় ইসলাম ধর্ম প্রচারক হজরত মোহাম্মদ, আর কোথায় বাঙ্গালা ভাষা এবং বঙ্গভাষাভাষী এই লেখক। দেশকালের ব্যবধান পরিস্ফুট থাকিলে এই সরলচিত্ত লেখক কখনই এইরূপ অনৃতবাদে আপন লেখনী কলঙ্কিত করিতেন না।^{৭৮}

সাহিত্যবিশারদ পুথি লেখার রীতির কথা বলছেন, মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় ইসলামি তত্ত্ব-জ্ঞানের হাল নিয়েও মন্তব্য পেশ করেছেন। সেই মন্তব্যটি তাঁর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি সম্মত। সম্পাদিত তালিকায় আহমদ শরীফ ‘নূর ফরামিস নামা’ নিয়ে কোনরকম আলোচনাই করেননি, বরং পরবর্তী পুথি *নূরনামার* বিখাত অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর কাছে পুথি উপস্থাপনাই যেন সংকলকের কাজ, বিচারের জন্য স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে।^{৭৯}

পুথিতালিকায় সাহিত্যবিশারদ যে প্রেক্ষিত তৈরি করেন, একাধারে সেই প্রেক্ষিতটা চিন্তাকর্ষক, নানা কথায় ভরতি। পুথির অনুপুঙ্খ থাকে সামাজিক অভ্যাসে, সেই সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মুনশী আবদুল করিম সচেতন। পুথির সামগ্রিক বিচারে তিনি সেই সামাজিক অভ্যাসের কথা বারবার বলেন, অভ্যাসগুলি তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ, দৈনন্দিন জীবনচর্য্য সিদ্ধ। ফলে প্রত্যক্ষের দাবিদার তিনি। অন্য পক্ষে, নগেন্দ্রনাথ বসু বা আহমদ শরীফের কাছে বিদ্বৎসমাজের সর্বগ্রাহ্য মডেল আছে, তার নিরিখেই প্রাসঙ্গিক তথা অপ্ৰাসঙ্গিক বিচার বিধেয়। পুথির রচনাকালনিষ্ঠ নির্দিষ্ট রূপের নিরপেক্ষ বিবৃতিটুকু কাম্য, বার বার উত্তমপুরুষের জবানীতে সংকলকের অবস্থানের ঘোষণাটি সেই পুথির প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য ক্ষুণ্ণ করে। বিষয় থেকে বিষয়ীর দূরত্বই তো বস্তুনিষ্ঠতার লক্ষণ; ভাষায় যেন দূরত্বের খামতি না ঘটে। ফলে আবদুল করিমের আবেগের মাত্রাকে কাটছাট করে অন্য ঢঙে তথ্যগুলির উপস্থাপনাই কাম্য।

আবেগ বা অতিরিক্ত ব্যক্তি অনুভূতি বাদ দেওয়ার রীতির মধ্যে ক্যাটালগ বা তালিকা বানানোর সার্বত্রিক বিধির দায় আছে। বিদ্বৎসমাজের যে-কোনো সদস্যই সেই বিধিসম্মত উপায়ে পুথিকে চিহ্নিত করতে পারেন, নিজস্ব বিচারের পদ্ধতিতে আনতে সমর্থ হন। এই প্রকল্পে আবদুল করিমের আপত্তি থাকার কথা নয়।^{৮০} কিন্তু তাঁর সময়ে তিনি লেখেন বাঙালি পাঠকের জন্য, চট্টগ্রামের সমাজের প্রতিও তাঁর দায় আছে। তাঁর রচনার মক্কেল ও প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার পাঠকের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। ফলে ঐ দায়ের তাগিদেই তাঁর রচনাতে হৃদয়তার সৃষ্টি হয়। নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসই বাংলা পুথিকে বিশেষ গতি দেয়। তাঁর কাছে এই গতিই কঙ্কালের প্রাণস্পন্দন। হৃদয়তার উত্তাপে যে-কোনো সহৃদয় বাঙালিই সেটা অনুভব করতে পারে। তাদের হয়েই তো আবদুল করিমের সাধনা। এইভাবে কেজোমি ও নিজের বোধি তালিকায় মিলে মিশে যায়।

আবদুল করিমের পুথিতালিকায় পুথিবিচারের এক স্বতন্ত্র ঝোঁক ফুটে বেরোচ্ছে। পুথির তৌলবিচারে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব বা তুলনামূলক শব্দতত্ত্ব একেবারে বাদ যাচ্ছে না, কিন্তু কোষ্ঠীবিচারের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অভ্যাসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই অভ্যাসগুলি হয়তো বা নির্দিষ্ট এলাকায় অনুসৃত হয়, কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর রুচির মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবদুল করিমও সেই গোষ্ঠীর লোক। পুথি পড়া বা লেখা তো এলাকার সার্বিক জনরুচির ফসল, অন্তত পুথিরসিক আবদুল করিম তাই মনে করতেন। ঐতিহাসিক সালতামামিতে গড়বড় থাকা সম্ভব, আলাওলের আদি নিবাস কেউ নাও জানতে পারে, কিন্তু পদ্মাবতী তো চট্টগ্রামে লেখা, লোকসমাজে কাব্যটির পঠন পাঠনই তো সবচেয়ে সাবুদ। পুথিবিচার শুধু সালতামামির হিসাব নয়, বরং তা

সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়বেদ্য, নানা রসকৃতির অনুভবেই তাকে বোঝা যায়। জনরুচি আজও আছে, তার রদবদলও হয়। আবদুল করিম ভালোমতই সেটা বোঝেন। পুথির তাৎপর্য বিচার এই রুচির মাপকাঠিতেই বিচার্য। বহিরঙ্গ বিচারে পুথির গোত্র ও কুলজি নির্ণয়ে শব্দের কুললক্ষণ অপরিহার্য, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের কেতাবি কানুননামা জানা থাকলে পুথিকে সহজেই একটি গোত্রে বসানো যায়। অথচ সমাজ ও পুথির আন্তঃসম্পর্ক বিচারে যে-কোনো পুথি প্রকীর্ত্তি অভিজ্ঞতার সূত্রে ব্যবহৃত, অভিজ্ঞতাগুলিও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিন্যস্ত, গোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সংলগ্ন। সেই নাড়িঙ্গানটুকু আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ছিল, ফলে তাঁর মস্তব্যে প্রত্যেক পুথিই যেন বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। টানা পড়েনি এই ক্ষেত্রেই। বিদ্বৎসমাজে প্রাচ্যবিদ্যা বা বঙ্গবিদ্যার সাধারণ মর্যাদা আছে, এই স্বীকৃতি বিশারদদের গ্রাহ্য অ্যাকাডেমিক নীতির পরে স্থাপিত। সেই অক্ষে কোনো তালিকা বিন্যস্ত হলেই তালিকাটি মান্য ও আধুনিক হবে। গোত্র ভাগের মান্য পদ্ধতি নির্দিষ্ট, আউফ্রেখট বা গ্রিয়ারসন অনুমোদিত, সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামী বা বাঙালি মুসলমানী রীতির হাদ্যবোধ অচল। অথচ পুথিতালিকায় ঐ হাদিক বোধেই তো আবদুল করিম স্বকীয় ও স্বরাট।

পুথিসাহিত্যের রাজনীতি : ভর্তৃহরির বৃত্তিবিচার

বোঝার উপর ঠিক শাকের আঁটি নয়, বরং উলটোটাই যেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মাথায় চেপে বসেছিল, শাকের আঁটির উপরে এক বিরাট বোঝা। একাধারে চট্টগ্রামদেশের পুথি-সাহিত্যের সংগ্রহ ও তালিকা বাঙালি মুসলমানের দায়বোধের ভার বহন করেছিল, ঐ দায়িত্ববোধের বোঝা ঘাড়ে করার জন্যই তো আবদুল করিম বাংলাদেশি জাতীয়তাবোধের এক আদি কল্প-পুরুষ। জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে বাঙালি ও মুসলমান তথা বাঙালি মুসলমানের ওজন এবং ভারসাম্য নানা ভাবে বজায় রাখাটাই তাঁর পুথিসংগ্রহ ও পর্যালোচনার রাজনীতি, তালিকা নির্মাণ ও পুথি পরিচিতি নির্ণয়ে সেই রাজনীতিটি নানা সূত্রে ও বিতর্কে, শব্দবন্ধে ও আবেগের অতিরেকে ধরা পড়েছে।

চট্টগ্রামের বাঙালি গ্রামবাসী আবদুল করিম মধ্যযুগের বাংলা পুথি সংগ্রহের ঐতিহাসিক প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যে-কোনো সিংহাবলোকনের সময় ঐতিহাসিক প্রকল্পের প্রেক্ষিতে তিনি নিজের কৃতির সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার করতেন, তখন স্বঘোষিত সারল্য ও দীনতাটি কোথায় উবে যেত। বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিজের আবির্ভাবকে একসময় তিনি ‘ধুমকেতুর’ সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর ‘বিরামহীন লেখনীর পরোক্ষ প্রেরণায়’ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে জাতীয় সাহিত্য সাধনার নাদীমুখ পাঠ হয়, নির্ধিধায় তিনি এই ঘোষণা করেন।^{১১} তাঁর পুথি সংগ্রহ ও পুথিসাহিত্য পরিচয়ে বাঙালি মুসলমানের ‘হীনমন্যতা’ ঘুচেছে,—এইটিই তাঁর ঐতিহাসিক দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের আদিপর্বে অশীতিপর বৃদ্ধের তোলা এই দাবিকে আজকের বাংলাদেশে আহমদ শরীফের মতো উত্তরসূরীরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়েছেন।^{১২}

‘হীনমন্যতা’ শব্দটিই তো তুলনামূলক, ক্ষমতাবাচক, আত্ম অবমাননার দ্যোতক। এই শব্দটির মধ্যে দুটি ফ্রন্ট খোলার ইঙ্গিত আছে, লড়াইটা যেন দ্বিমুখী। আবদুল করিমের মতে, একটি ক্ষেত্র উনিশ শতকীয় ‘হিন্দু জাগরণ’, সেটি বলবান, দাপুটে ও প্রভুমান্য সম্ভেদ নেই, কিন্তু

সাহিত্যের প্রতিমান তো সেখানেই তৈরি হচ্ছে, আধুনিক উন্নতি ও প্রগতির গ্রাহ্য ছকটি সেই ক্ষেত্র থেকেই নিতে হবে। অন্য ফ্রন্টটি তাঁর স্বসমাজ ও স্বকাল, ‘মুসলিম জাগরণ’-এর উন্মেষ পর্ব বলে তিনি স্বকালকে চিহ্নিত করেছেন।^{৮৩} এই ক্ষেত্রে প্রত্যাশা আছে অথচ যেন চরিতার্থতা নেই, তাঁর অসন্তোষ এখানেই। তাঁর মতে, বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধের ভুক্তিতে যেন বারবার রসাতাস ঘটছে।

হিন্দু জাগরণের ফ্রন্টে দেশজ মুসলমানদের পক্ষে তিনি স্বীকৃতিটুকু চেয়েছিলেন, বঙ্গ-সাহিত্য সাধনায় যৌথ উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি। তাঁর পুথিতালিকাই তো মধ্যযুগের দেশজ বাঙালি মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য সাধনার সাবুদ, ইতিহাসের ঘরানায় তো তাদেরও দাবি আছে। বৈষ্ণব কবিদের পংক্তিদের তুলনীয় পংক্তি আলাওল বা দৌলত কাজিও লিখে থাকেন, ‘লোর চম্পাণীর’ গীতের পুথি পড়লেই তা বোঝা যায়। “স্থানে স্থানে কথার বাঁধুনি দেখিয়া অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির কথা মনে হয়। মুসলমানের লেখনীও এতটা মধুবর্ণণ করিতে পারে, দেখিলে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় হয়।”

কবিতা ধর্মে মুসলমান কিন্তু কুশলতায় বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, এ বড়ো কম কথা নয়। এই চঙেই যুবক আবদুল করিম পুথি পরিচিতিটা লিখতেন। তাঁর ভাষাও আবেদন নিবেদনের,

আমাদের মাননীয় দীনেশবাবুর দক্ষ হস্তে পতিত হইলে, এই গ্রন্থখানিও তাঁহার অমরকীর্তি ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের’ একপ্রাপ্তে একটু স্থানাধিকার করিতে পারিত। মুসলমান সমাজের পরম হিতৈষী ও গুণগ্রাহী দীনেশবাবু তাঁহার অমূল্য গ্রন্থের ভাবী সংস্করণে আমাদের এই কবিকেও একটু স্থান দান করিয়া এই অধঃপতিত সমাজকে আরো উপকৃত ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন না কি?^{৮৪}

১৯৩০-এর দশকে আলাওল বহুকথিত, রোসাঙ, বা আরকান রাজসভার সাহিত্য নিয়ে এনামুল হকের সঙ্গে আবদুল করিম স্বতন্ত্র বই ছাপিয়ে ফেলবেন, ভূমিকাটা স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা। ততদিনে আলাওল ‘ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ’ বলে স্বীকৃত, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, হিন্দু-মুসলমান সবাইয়ের সেবা। ঐতিহাসিক তুলনায় আর অনুকৃতি নয়, বরং সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যই বড়ো হয়ে ওঠে। প্রৌঢ় আবদুল করিম লেখেন,

ইহাদের পূর্বে বঙ্গসাহিত্য একটানা স্রোতে চলিতেছিল—উহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য ছিল না।...রোসাঙ রাজসভার কবিগণই সাহিত্যের এই একটানা স্রোতকে বিভিন্ন মুখে ফিরাইয়া উহাকে নানাদিক প্রসারী করিয়া তোলেন। দেবদেবীর সহায়তা ভিন্নও মানুষ পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারে, এই সত্য কখনও হিন্দুকবির কল্পনায় আসে নাই। মুসলমান কবিরাই সর্বপ্রথম বঙ্গ-সাহিত্যে নিছক আনন্দদানের সঙ্গে পুরুষকারের চিত্র প্রদর্শন করেন। এ ক্ষণ্য বঙ্গসাহিত্যের দরবারে ইহারা সর্বোচ্চ আসনে বসিবার উপযুক্ত।^{৮৫}

বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যবিশারদের গুণ বিচার কতটা ঘাতসহ, সেইটি আদৌ আলোচ্য নয়। লক্ষণীয় যে উপস্থাপনাই পালটে গেছে, মানবিচারে দৌলত কাজি, কোরেসী মাগন, আলাওল ও মর্দনরা আর প্রান্তিক কবি নন, বরং শীর্ষস্থান লাভের যোগ্য। কবিদের ভাগটি হিন্দু ও মুসলমান; সাহিত্যে গোত্রবিচারের লক্ষণ ধরে হচ্ছে, সাহিত্যে দুই ধর্মানুগ কবিদের দান দুই ধরনের। হিন্দু কবিদের তুলনায় মুসলমান কবিরা কোথায় স্বতন্ত্র, কী বিশেষ গুণে তাঁরা প্রতিস্পর্ধিতা দাবি করতে পারেন, এই বিষয়ে সাহিত্যবিশারদের টনটনে জ্ঞান আছে। তাঁর নির্বিশেষ মধ্যযুগের

পুথিতালিকাটি ক্রমে সমকালীন রাজনীতির দিশায় বিশেষ সাহিত্য বিচারে পরিণত হয়েছে। সেই বিচারে মধ্যযুগেও ধর্ম-বিভাজনের স্বীকৃতিতেই যেন বঙ্গ-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিকাশটি স্বীকৃত।

দ্বিতীয় ফ্রন্টে লড়াইটা বেশ জটিল, বাঙালিত্ব ও মুসলমানত্বের মধ্যে টানাপড়েন আছে। মাতৃভাষা বনাম জাতীয় ভাষার বিতর্কে টানাপড়েনটি স্পষ্ট। ঐ বিতর্কে সাহিত্যবিশারদের নিজস্ব অবস্থান দ্বিধাহীন। তাঁর মতে, বাংলার শিক্ষিত মুসলমানরা দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিধাগ্রস্ত। মাতৃভাষা স্বাভাবিক, জন্মগত, প্রকৃতিদত্ত। মুসলমান ও হিন্দুর কাছে বাংলাটাই মাতৃভাষা, ‘বঙ্গদেশবাসী হিন্দুর ন্যায় বঙ্গদেশবাসী মুসলমানদিককেও বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না।’ হিন্দু বাঙালির কাছে প্রশ্নটি জরুরি নয়, তাঁদের কাছে বাংলা ভাষাই জাতীয় ভাষা, সেটাই তাঁদের জাগরণের কারণ। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে মাতৃভাষা ও জাতীয়ভাষার সমীকরণে বাংলা ভাষা সর্বজনীনরূপে স্বীকৃত নয়। এই সমীকরণটি তৈরি করতে হয়, এই সমীকরণের বড়ো সাবুদ তো ইতিহাস। “পুরুষাণুক্রমে বাঙ্গালি মুসলমানরা বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।”^{৬৬} অতএব মুসলমানের মাতৃভাষা তো ইতিহাসে সিদ্ধ; পরম্পরার দায়েই মাতৃভাষা জাতীয় ভাষা, ইতিহাসই যেন বাংলা ভাষাকে বেছে নেবার পক্ষে অমোঘ রায় দিয়েছে। মধ্যযুগের পুথিসাহিত্য তালিকা এই প্রকল্পের ভিত্তি। “বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা ও জাতীয়ভাষা হইতে পারে না, ইহা আমাদের পূর্বপুরুষগণ বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন এবং তদনুসারে সেই কাজে ত্রুটি হইয়াছিলেন।” মধ্যযুগের পুথির পাঠক্রমে এই সমীকরণটি তুলে ধরাটা সাহিত্যবিশারদের নিজস্ব পড়া, নির্মিতিটা তাঁর দান। তাঁর মতে, অধুনা ঐতিহাসিক ক্রমটি ছিন্ন, রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সমীকরণের বোধটিও নষ্ট হয়েছে, উনিশ শতকে হিন্দুদের জাগরণ দেখে ও শুনেও অনেক হাবুলদের মতোই বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানরা কিছুই শিখছে না। আবদুল করিমের পুথিতালিকাটি হারানো ঐতিহাসিক ক্রমকে খুঁজে বার করে পুনঃস্থাপিত করেছে। তাঁর খুঁজে পাওয়া ইতিহাসে মুসলমান কবিদের সওয়ালে ও কৈফিয়তে আরবি, ফারসি ও উর্দু হেরে যায়, বঙ্গভাষাতেই স্বাভাবিক ও সুন্দর ‘আত্মভাব’ প্রকাশিত হয় বলে সেটাই জাতীয় ভাষা হয়ে ওঠে। স্তনাস্বাক ও রসাস্বাকের ধারণা এই ক্ষেত্রে দিকি মিলেমিশে যায়। আলাওল দরবারের কবি, অথচ তাঁর বাংলা পুথি চট্টগ্রামের নানা আসরে পড়া হয়, শিক্ষিতের বা অর্ধ শিক্ষিতের মুখে শুনে আমজনতা রস উপভোগ করে। নির্মীয়মান জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গনে তো সবাইয়ের আমন্ত্রণ থাকা চাই। ইতিহাসে ‘পারফরমেনসের’ ভূমিকা না থাকলে দরবারি সাহিত্য কীভাবে ছড়িয়ে যাবে, মাতৃভাষার দোহাইতে জাতীয় সাহিত্যের অনন্য নজিরে পরিণত হবে?^{৬৭}

গোল বাঁধে এখানেই। লিপিকরের অশিক্ষায়, পাঠকের ভ্রমে ও বটতলা প্রেসের দৌরাণ্ডো জনপ্রিয় আলাওলি পুথির হাঁড়ির হাল হয়। মুদ্রিত আকারে আলাওলি পুথির শুদ্ধ পাঠ সংস্করণ প্রকাশ করাই তো সাহিত্যবিশারদের আবাল্যের সাধ। তিনি ‘বিশুদ্ধ ভাষার পক্ষপাতী’। জাতীয় ভাষার মর্যাদাকামী সাহিত্যিক ভাষার তো আদর্শ রূপ ও শুদ্ধ প্রতিমান কাম্য। আদর্শ পুথি নির্বাচিত করাই তালিকার কাজ, না পেনে বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে পুথির যৌগিক নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ঠিক করতে হবে। এই নিয়ে আবদুল গফুর সিদ্দিকি বা স্বয়ং শহীদুল্লাহের সঙ্গে তাঁর বিতর্কে জল কম ঘোলা হয় নি। ‘অন্ধভক্তির ধুম দেখে আরেক চট্টলবাসী ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো জায়সীর ‘পদ্মাবতের’ চণ্ডে আলাওলের একটি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল পুথি নিজেই বানিয়ে ফেলেন, সেটা পড়ে স্বয়ং আবদুল করিমও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।’^{৬৮} কেবল আদর্শ পুথিকেই জাতীয় সাহিত্যের

নিদর্শনরূপে পেশ করা যেতে পারে, সেই পুথিপাঠেই জাতীয় ভাষার বর্তমান রূপের আদি যথার্থ অবয়ব পাওয়া যাবে, এরই নিরন্তর অনুসন্ধান পুথিতালিকায় চলেছে, যোগ বিয়োগের রাজনীতির কারণ তো সেটাই।

অপরপক্ষে, বাঙালি মুসলমানের মুসলমানি সত্তা কোন ঐতিহাসিক থাকে বিন্যস্ত থাকবে? সাহিত্য সাধনায় আবদুল করিম সমন্বয়বাদী, বঙ্গের দুই ‘সহোদর সমাজ’ ভাষায় আবদ্ধ, বাঙালির কাছে ভাষার পরিচয়ই অগ্রগণ্য। অগ্রাধিকার বিচারে তাঁর মতের জন্য তিনি কম গালমন্দ শোনে নি।^{১৩} অথচ সমসাময়িক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদীরাই জয়ী, ধর্মনুগত্যই প্রাধান্য পেয়েছে, এই বাস্তব সত্যকে নিজের মতো করে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন।^{১৪} সত্তা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত চট্টগ্রামের ইতিহাস ‘ইসলামাবাদ’ নামে প্রকাশিত হয়, নামকরণের ব্যাখ্যায় আবদুল করিম লেখেন, “আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যদি কোথাও ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণ আবাদ বা জারি থাকে, তাহা একমাত্র এই চট্টগ্রাম।”^{১৫} তাঁর চিন্তায় ইসলামের রূপ উদার ও সহিষ্ণু, ইসলামের প্রভাবেই যেন হিন্দুর হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁর পুথিসংগ্রহে হিন্দু ও মুসলমান কবি উভয়ের রচনাই স্থান পেয়েছে। বিভাজন আছে কিন্তু উভয়েই রসমুদ্র, ধর্মসরণিতে গতায়াতও বন্ধ নয়। সাহিত্যবিশারদের মতে, পুথিসাহিত্যে রসভুক্তিই বড়ো কথা। সাহিত্য তো ‘দিলী জিনিস’, ইসলামের রঙে দিল রাঙলেই মুসলিম বাংলা সাহিত্যকে চেনা যাবে। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ রূপেই ধর্ম পুষ্টি লাভ করে।^{১৬} এই পুষ্টিবাদী তত্ত্বে দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবই রসাতাস ঘটায়, বিপর্যয় ডেকে আনে।

আবদুল করিমের সমস্যা তো দ্বন্দ্বের, ভাষায় হিন্দুমুসলমান এবং বাঙালি মুসলমানের দ্বিবিধ সত্তার সম্পর্কে কীভাবে নিরসন করা যায় তাই নিয়ে তিনি চিন্তিত, পুথি পরিচিতি ঐ দ্বিমুখী অক্ষে বিধৃত। হিন্দু-মুসলমান এবং বাঙালিমুসলমান শব্দ দুটিও দ্বন্দ্ব সমাসে নিষ্পন্ন। আভিধানিক অর্থে দ্বন্দ্ব মিলন ও বিরোধ দুটোকেই বোঝায়। এই দ্বন্দ্ব সমস্যা চিন্তা ভারতীয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। সেই কবে আনন্দবর্ধন মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আদি বিদ্বান তো বৈয়াকরণিকরা, সব চিন্তার মূলেই থাকে শব্দজ্ঞান। সাহিত্যবিশারদের দ্বন্দ্ব সমস্যার সূত্রে বৈয়াকরণিকের শরণাপন্ন হলে হয়তো সমাজ ও সাহিত্যবিজ্ঞানের মহাভারতটি অশুদ্ধ হবে না।

একপদী গড়ে তোলার সূত্রে (‘সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ’) পাণিনির একশেষের ধারণা পতঞ্জলির ভাষ্যে বৈপ্লবিক হয়ে উঠেছিল।^{১৭} একটি নির্দিষ্ট অর্থবস্ত্ত বোঝাতে একটি স্বতন্ত্র শব্দ আবশ্যিক, শব্দপিছু মানে, এই সাধারণ নিয়মই একশেষে বাতিল হয়ে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে একবিভক্তি সরূপ (সমানাকার) যুগ্ম বা ততোধিক পদসমূহের মধ্যে একমাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে, বাকি পদগুলি নিবৃত্ত হয়। ঐ একশেষেই বা একটিমাত্র অবশিষ্ট পদেই লুপ্ত একাধিক শব্দে বিধৃত সমুদায় ভাব প্রকাশ পায়। যেমন ‘মাতা চ পিতা চ’ মিলেই ‘পিতরৌ’ সমস্ত পদটি সিদ্ধ অথচ একশেষের নিয়ম অনুসারে মাতা পদটি নিবৃত্ত হয়েছে, খসে গেছে, ‘পিতা’ শব্দের দ্বারাই উভয়ের অর্থ ব্যক্ত হচ্ছে। পদ সমাহারে একটি পদের আগ্রাসনে সমস্ত পদটি নিষ্পন্ন হচ্ছে, ঐ আগ্রাসনে অন্য পদ বারিত হয়ে একপদেই সমুদায় সংহত হচ্ছে ও অর্থও প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। অতএব প্রতি অর্থবস্ত্ত পিছু একটি একটি শব্দ, এই গোন-গুণতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

পরম্পরায় গ্রাস্য এই একশেষ বনাম দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে ভর্তৃহরি আরেকটু মুচড়ে দিয়েছিলেন,

একশেষের ধারণা তো সমাসবৃত্তিতে আবদ্ধ নয়। ‘সহবিবক্ষা’র ধারণায় একশেষের পাশে তিনি সমাহার ও ইতরেতর দ্বন্দ্বের বর্গকে একটু বাজিয়ে নিলেন।^{১৪} ‘বিবক্ষা’ কথাটির অর্থ ‘বলার ইচ্ছা’, একপদ মাধ্যমে একই সঙ্গে বহু কিছু বলার ইচ্ছে সহবিবক্ষা, দ্বন্দ্ব সমাসেই সেটা নিষ্পন্ন হয়। দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার দুইটি, সমাহার ও ইতরেতর, কোনটাতেই সমস্যমান পদ বারিত হয় না, কেবল নিষ্পন্ন সমস্ত পদের সঙ্গে সমস্যমান পদের অর্থ সম্বন্ধে হেরফের ঘটে। টীকাকার হেলারাজ বলবেন, ‘সংঘ প্রাধান্য’ সমাহার সিদ্ধ ও ‘অবয়ব প্রাধান্যে’ ইতরেতর নিষ্পন্ন।^{১৫}

‘সমূহঃ সমাহারঃ’। এই গোত্রের সমস্ত পদে সমস্যমান পদগুলির নিজ নিজ একক অর্থ অপেক্ষা পদসমূহত্বের ধারণাই ব্যক্ত হয়। লক্ষণটিও স্পষ্ট, সমূহের একত্ব হেতু সমস্ত পদটি ক্রীবলিঙ্গের একবচনান্ত হয়, সমস্যমান পদগুলির লিঙ্গ ও বচন অবাস্তর হয়ে পড়ে। ‘পাণী চ পাদৌ চ তেযাং সমাহারঃ’ অর্থে ‘পাণীপাদম্’ বোঝাবে। ‘হাত পা ধোওয়া উচিত’ বললে অঙ্গগুলিই একত্রে পরিষ্কার করা বোঝায়, কাজে সামূহিকতাই বিচার্য। যেমন বাংলা ভাষায় ‘জামা কাপড়’ দ্বন্দ্ব সমাহারে পোশাকের সমুদায়ত্ব ফুটে ওঠে, জামার অর্থ বা কাপড়ের অর্থ আলাদাভাবে একটু পেছনে পড়ে থাকে।

ইতরেতর দ্বন্দ্বের সমস্যা নিয়েই ভর্তৃহরি যেন একটু বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। ‘ইতরেতর’ অর্থাৎ এক অপরের অপেক্ষা রাখে। অধুনা ‘অস্বাকর্ষী’ ব্যাখ্যায় রঘুনাথ শর্মা বলেছেন যে এই অম্বয় সাক্ষাৎ পরস্পরারহিত হতে পারে, ক্রিয়া বা গুণ দ্বারা ইতরেতর মিলন সিদ্ধ হয়। (‘একস্যাং ক্রিয়াম্ একস্মিন্, গুণে বা’)। বিখ্যাত উদাহরণ ‘ধব খদিরপলাশাঃ দৃশ্যন্তে’। তিনটি ভিন্ন প্রকারের গাছের অর্থ সমস্যমান পদগুলি বহন করছে, ধব হরিতকী বর্গের গাছ, খয়ের গাছই তো খদির, পলাশ বা কিংশুক শিহাদি বর্গের গাছ। এক্ষেত্রে ‘দেখা যাচ্ছে’ ক্রিয়ার মাধ্যমে ভিন্ন গাছগুলির মধ্যে অম্বয় স্থাপিত হচ্ছে, বহুবচনান্ত সমস্ত পদে তিনটি গাছের অর্থই একই সঙ্গে সমভাবে ব্যক্ত হচ্ছে, প্রদর্শন কালে বা দেখার সময়ে কেউ কারুর চেয়ে পিছিয়ে নেই। সমস্ত পদনিষ্পত্তির লক্ষণে পার্থক্য নজর টানে। সমূহত্ব বড়ো কথা নয়, তাই সমস্যমান পদের সংখ্যা অনুযায়ী সমস্ত পদটির বচন নির্ধারিত হয়, সমস্ত পদটি পরপদের লিঙ্গ নেয়। ধব ও খদির হলে দ্বিবচনান্ত ‘ধব খদিরৌ’, পলাশ যোগ হলে বহুবচনান্ত ‘ধবখদিরপলাশাঃ’।

‘যুগপদধিকরণবচনতাই’ সহবিবক্ষার ভিত্তি। তিনটি ভিন্ন ধরনের গাছ যেন সমভাবে পরস্পরের অর্থকে ক্রিয়া সম্বন্ধ সাপেক্ষক ঘাড়ে করে তুলে সমস্ত পদে অবয়ব প্রাধান্যটি বজায় রাখছে।^{১৬}

একশেষের বিপরীতেই যেন ভর্তৃহরি অবয়ব প্রাধান্যের ধারণাকে ঠেলে দিলেন।^{১৭} ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো পদ বারিত হবার কোনোরকম সম্ভাবনা নেই। সমস্ত পদের সমুদায়ত্বটি ক্রিয়া বা গুণের সম্বন্ধে সব সমস্যমান পদগুলির মধ্যে সমভাবে স্ফুটিত হয়, অংশেই সমগ্রের ধারণা উপস্থিত থাকে। এই সমুদায়ত্ব ভাবের অর্থ প্রত্যেক অবয়বেই তুল্যমূল্যভাবে উপস্থিত থাকে বলেই ব্যাসবাক্যে ‘ধব’ সমস্যমান পদে ধবের অর্থ প্রতীতির সঙ্গে ‘খদির’ ও ‘পলাশের’ অর্থবিবক্ষার আভাস থাকে, ‘খদির’ বা ‘পলাশে’ও অন্য সমস্যমান পদের সহবিবক্ষা আভাসিত হয়।

শব্দতত্ত্ববিচারে পতঞ্জলি ভর্তৃহরির অগ্রজ, তাঁর ভাষ্যের উপরে ভর্তৃহরি একটি টীকাও লিখেছিলেন। ‘যুগপদধিকরণবচনতার’ ধারণাটি পতঞ্জলি ‘দুঃখা দুরূপপাদা’ অর্থাৎ কষ্টকল্পিত ও

অপ্রামাণিক বলেছেন, এই আপত্তিটি আচার্যের অজ্ঞানা ছিল না। জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে পদসম্বন্ধে এই যুগপদ-অধিকরণবচনতার সূত্রে এক পদে অন্য পদের অর্থ বিবক্ষা যে নিছক আরোপ বা অধ্যাস, বিগ্রহবাক্যে বিন্যস্ত সমস্যামান পদগুলি নিজ নিজ অর্থ বিবক্ষিত করেই প্রকৃত অর্থে ক্ষান্ত থাকে, কেবল সমস্ত পদেই যৌগিক অর্থ সিদ্ধ হয়, পতঞ্জলির এই বক্তব্য স্বীকার করতে ভর্তুহরি বা হেলারাজের মৌলিক আপত্তি থাকবে না। তাঁরা মানবেন যে এই পৃথক বা সমষ্টিগত উপলব্ধি, এটা বস্তুর ইচ্ছাধীন, তার বিবক্ষা। এজন্যই ইতরেতর বা সমাহারের মধ্যে যাতায়াত আছে, সাধারণত এরা বৈকল্পিক, “সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষিকবদ্ভবতি।” কিন্তু ‘প্রকীর্ণক’ কাণ্ডের উপজীব্যই তো ‘বৈখরি’ বা লোকব্যবহারসিদ্ধ ভাষার আলোচনা। ইতরেতর সমাসে দ্বন্দ্বত্বের জ্ঞান লোকবুদ্ধিতে সহবিবক্ষারূপেই উপলব্ধ হয়, সাপেক্ষতায় সমস্যামান পদগুলি নিজের ও সমস্তপদের অর্থকে সমভাবে বহন করে। অবয়ব প্রাধান্যের সিদ্ধিতে সন্দেহ করলে বৈখরির আলোচনা তেমনভাবে জমবে না।^{১৮}

একশেষ, সমাহার ও ইতরেতর, ভারতীয় ব্যাকরণবিদদের এই বিশ্লেষণী শাব্দিক বর্গগুলি সমগ্র ও খণ্ডের পারম্পরিক সম্পর্কবিচারের প্রেক্ষিতে প্রযুক্ত হতেই পারে। তাহলে সাহিত্যবিশারদের দ্বন্দ্ব সমস্যাকে ঘিরে আমাদের চিন্তা নতুনভাবে উসকে উঠলেও উঠতে পারে। একশেষীরা তো একান্তবাদী ও নিরবকাশী।^{১৯} বিগ্রহবাক্য বা ব্যাসবাক্যের তোয়াক্কা না রেখেই নানা ‘অপবাদ’ (ব্যতিক্রম) সূত্রের দোহাইতে একপদী বর্গেই বহুত্বের ধারণাকে নিটোলভাবে সংহত করার পক্ষপাতী তারা। এই প্রক্রিয়াতে অন্য সব পদ খারিজ হয়ে গেলেও ইতরবিশেষ নেই, অবশিষ্ট মাত্র পদে সমুদায় ও সংহতির ধারণা বজায় থাকলেই হল। কান্নার মনে হতেই পারে, এই চিন্তা লাঘব শুণে সমৃদ্ধ কিন্তু একশেষ যেন বিকল্প বিরোধী ও প্রাধান্যকামী। এই বর্গে আউফ্রেখটের পুথিতালিকার সার্বত্রিক ধারণাটি বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

আবদুল করিম আদৌ একশেষপন্থী নন, পুথিবিচার ও সংগ্রহের ধারণায় তিনি সমাহার ও ইতরেতরের অনুগামী। বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গে বাংলা পুথিবিচারে তিনি সমুদায়ত্বই, বাংলা ভাষা ও ইসলামি তমদ্দুনের সংঘপ্রাধান্যেই পুথিসাহিত্য নির্মিত, অবয়বের সমাবেশত্বই এসব পুথির লক্ষণ। প্রবন্ধ বহনকারী পত্রিকার চরিত্র, অবস্থার প্রেক্ষিত বা পুথির বিষয়বস্তুর খাতিরে তাঁর লেখা কোনো কোনো পুথি পরিচিতিতে কোনো একটি অবয়ব বিশেষ প্রাধান্য পেলেও সাহিত্যবিশারদ বাঙালি মুসলমানের আত্মসত্তায় সমাহার দ্বন্দ্বত্বই খুঁজে পেতেন। অবয়বের যোগে মিলিত অবয়বীর সন্ধানই তাঁর লক্ষ্য। কবির আত্মপরিচয় ও ভণিতাগুলি সমাহারত্ব বোঝাতেই সচাচর তালিকায় সন্নিবেশিত হত। অন্যপক্ষে, বঙ্গসাহিত্যের বৃহত্তর দরবারে হিন্দু ও মুসলমানের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাঁর পুথি পরিচিতি ইতরেতরের ধর্মে আচ্ছন্ন, সাহিত্য বিচারে সব সমস্যামান পদগুলিই সমপ্রাধান্যের দাবিদার। নিজেদের পুথি পরিচিতিতে ব্যোমকেশ মুস্তফি ও নগেন্দ্রনাথ বসু সমাহারত্বের জিগির তুলবেন, ঐ সমাহারত্ব হিন্দু প্রাধান্যমুখী। বিপরীতপক্ষে, ইতরেতরের বর্গে আবদুল করিম নিজের পুথি পরিচিতি ও আলোচনায় উভয়ের সমপ্রাধান্যটি বজায় রাখবেন।

আচার্যরা বার বার সাবধান করে দিয়েছেন, এহ বাহ্য, দ্বন্দ্ব বিচারের অনেক কিছুই আরোপ, অধ্যাস, প্রাতিভাসিক। কিন্তু ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে লোকবুদ্ধি, লোকব্যবহার ও লোকভাষাতেই প্রতীতির আভাসের সার্থকতা, নির্মিতিতে অধ্যাস বা আরোপ তো আদৌ নিরর্থক নয়।^{২০} একাধে

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদও ভাষার কারবাবী, পুথিসংগ্রহ ও পুথিতালিকায় তিনি বঙ্গভাষা নির্মিতির রূপ ও রসসম্পন্ন। ব্যাকরণবিদদের মতে শব্দের অতীত কোন জ্ঞান নেই, জ্ঞানমাত্র সবিকল্পক, বাগ্‌রূপে প্রকাশিত, ভাষাবিন্দু ; নির্মিতিও বৃত্তিনিষ্পন্ন। এই চিন্তার সরণিতেই অনেকের মতেই হয়তো বা সাহিত্যবিশারদও ভর্তৃহরির হাতে ধরা দিলেন। তাই ভর্তৃহরির বৃত্তিবিচারের বর্গেই তাঁর আপাত নিরীহ পুথি পরিচিতি, পুথিসংগ্রহ ও পুথিসাহিত্য চর্চার দ্বন্দ্বিক মাত্রাগুলি প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে।

টাকা

সমাজ রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্রের আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ স্মারক বক্তৃতার (২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৩) প্রথমার্শের আদ্যন্ত মার্জিত ও পরিবর্ষিত রূপ। সুশীলকুমার দে, কালিকারঞ্জন কানুনগো, নজীনীকান্ত ভট্টশালী, আহমদ শরীফ, আবু মহম্মদ হবিবুল্লাহ, মমতাজুর রহমান তরফদার প্রমুখ অধ্যাপকদের সারস্বতসাধনার পীঠভূমিতে আমন্ত্রণ পাবার সৌভাগ্যের জন্য বন্ধু আহমেদ কামাল, শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মহাশয়, অধ্যাপক নেহাল করিম ও সাহিত্যবিশারদের পরিবারের অন্যান্য মান্যবর সদস্য এবং উপর্যুক্ত সংস্থার অন্যান্য উদ্যোক্তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজসাহী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আমি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সাহায্য পেয়েছি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান ল্যানগুয়েজ ও সিভিলাইজেশন বিভাগে এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান্টা বারবারাতেও আমন্ত্রিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আমি প্রবন্ধের অবশিষ্ট পেশ করি। আমার কর্মক্ষেত্র সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেজ কলকাতার আলোচনা চক্রও প্রবন্ধটি পড়া হয়। আলোচনায় উপস্থিত শ্রোতাদের মন্তব্যে আমি উপকৃত হয়েছি। রাজসাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও চিন্তার প্রাণবর্তক মামুলি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছোট করার ইচ্ছা আমার নেই। মূল্যবান মন্তব্যের জন্য দীপেশ চক্রবর্তী ও বিশ্বজিৎ রায়ের কাছে আমি স্বণী। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কাজে ইন্দিরা বিশ্বাস সহযোগী ছিলেন।

- ১ আবদুল হক চৌধুরীকে লেখা আবদুল করিমের চিঠি, ২।১০।৪৪, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে নিবেদিত প্রবন্ধ সংকলন, ফরহাদ খান ও সৈয়দুর রহমান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৮৪।
- ২ সাহিত্যকে বিষয় হিসাবে পড়ার আধুনিক সঙ্কট নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা, J. Hallis Miller, 'Literary study among the Ruins' Diacritics, Fall, 2001, 57-66. প্রবন্ধটির হাশি সহকর্মী রোসিংকা চৌধুরী দিয়েছিলেন।
- ৩ বাংলাদেশে আবদুল করিমের জীবন ও কীর্তি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার অভাব নেই। কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। Muhammad Enamul Huq ed. Abdul Karim Sahitya Visharad Commemoration Volume, Dacca, 1972. মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ১৩৭৬। আজহার উদ্দীন খান, "মাঘ নিশীথের কোকিল", কলিকাতা, ১৯৮৬। আহমদ শরীফ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭/২০০২। ফরহাদ খান ও সৈয়দুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ, আবদুল করিম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, জীকন ও কর্ম, ঢাকা, ১৯৯৪। তাঁর প্রকীর্ণ রচনার দুটি সংকলন উল্লেখযোগ্য, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, নির্বাচিত রচনা : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ঢাকা, ১৯৯৪। আবদুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

- ৪ G.N. Reddy ed. *Literary Autobiography of C. P. Brown* (1798-1884), Tirupati, 1978, 76
তেলেগু সাহিত্যের ইতিহাস রচনা, অভিধান ও ব্যাকরণ সম্পাদনা এবং পুথিসংগ্রহ গড়ে তোলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিজীবী ব্রাউনের দান অনস্বীকার্য। নিম্নবর্ণের কবি বেমানার কাব্যসংগ্রহ ও প্রকাশও তাঁর কীর্তি। ব্রাউনের প্রদত্ত আদিকল্পের সঙ্গে মোকাবিলা না করে তেলেগু সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সংগৃহীত প্রায় আড়াই হাজার পাণ্ডুলিপি তিনি মাদ্রাজ লিটারারি সোসাইটিকে দান করেন। এর মধ্যে ১, ১৭৬ টি তেলেগু ভাষায় লেখা পুথি ও ১, ২৭৩ টি তেলেগু অক্ষরে লেখা সংস্কৃত পুথি। ভারতে তেলেগু ভাষা ও অক্ষরের বৃহত্তম পুথিসংগ্রহটি ব্রাউনের তৈরি করা।
- ৫ Jadunath Sarkar, *The Historian Rajwade*, House of Shivaji, Calcutta, 1955, 276-293.
- ৬ প্রাচ্যবিদ্যাতত্ত্ব গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে বিদেশি ও দেশি উদ্যোগে পুথিসংগ্রহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা নজরে পড়েনি। প্রাচ্যবিদ্যার তাগিদে কীভাবে অতীতের 'অবশেষ' মিউজিয়ামে কী প্রক্রিয়ায় রক্ষিত হয় ও কী অর্থ বহন করে, ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বে সেই স্থান কোথায়, সেই প্রসঙ্গে Bernad S. Cohn-এর প্রবন্ধ অবশ্যপাঠ্য। 'Transformation of Objects into Artifacts, Antiquities and Art in Nineteenth Century India,' in *Colonialism and Its Form of Knowledge*, Delhi, 1997, 76-106.
- ৭ Philip B. Wagoner, 'Pre-colonial Intellectuals, and Production of Colonial Knowledge', *Comparative Study in Society and History*, Oct, 2003, 783.
- ৮ 'পশ্যন্তী', 'মধ্যমা' ও 'বৈশ্বরী' নামে ত্রয়ী বাকের বিশ্লেষণী কাঠামোয় যেন ভর্তৃহরি বাক্যপদীযের তিনটি কাণ্ডকে সাজিয়েছেন যথা ব্রহ্ম কাণ্ড, বাক্যকাণ্ড এবং প্রকীর্তক কাণ্ড। হেলারাজের টীকা অনুসারে 'প্রকীর্ত' বা পদ কাণ্ডের তাৎপর্যটি আলোচনা করেছেন, K.A. Subramania Iyer, Bharatdhan, Poona, 1969, 66-68.
- ৯ ফরহাদ খান সম্পাদিত, পূর্বোদ্ধৃতি, ১৬।
- ১০ ভারতবিদ্যাচর্চায় সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের ধারণা ও বিবর্তন নিয়ে শ্রীপাদ বেলবলকরের আলোচনাটি আমি কলকাতার লাইব্রেরিতে খুঁজে পাইনি। সংস্কৃত পুথিসংগ্রহ ও অনুসন্ধানের প্রতিবেদনগুলির সালগুয়ারি তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, P.K. Gode লিখিত 'A Brief Note on the History and Progress of Cataloguing of Sanskrit and other Mss in India and abroad (Between A.D. 1000-1941) Appendix II Introduction to Indian Textual Criticism by S.M. , Katre, Poona, 1954, 100-29.
উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদটির তথ্যসূত্র, Note by WhitLey Stokes 6 Aug, 1868 and Minute by Major General Sir H.M. Durand, Simla, 13 August, 1868. in A.E. Gough ed. *Papers relating to the Collection and Preservation of Ancient Sanskrit Literature in India*, Calcutta, 1878.
(Papers বলে উদ্ধৃতি), ২০৯। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত পুথিসংগ্রহের সরকারি নীতির তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Donald Clay Johnson, *Government Concern for the Development of the Libraries : Sanskrit Manuscript Libraries in India 1858-1957*, University of Wisconsin, Madison, 1980, অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ।
- ১১ R.L. Mitra, *Notices of Sanskrit Manuscript*, No. 1, Baptist Mission Press Calcutta. 1871, 255-256.
- ১২ R.L. Mitra, *Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of the Asiatic Society of Bengal, Part first—Grammar*, Calcutta, 1877, 163.
- ১৩ G. Buhler, acting Educational Inspector to J.B. Peile, D.P.I, 5 July, 1869, Papers, ওই, 50-51।

- ১৪ Babu Rajendra Lal Mitra to J. Waterhouse, 15 Feb. 1875, ওই, ২৩।
- ১৫ F. Kielhorn to J.B. Peile, 20 June, 1869 Papers, ওই 5, 53-54.
- ১৬ Buhler to Peile, 30 Aug, 1872, ওই, 82-84.
- ১৭ Kielhorn to Peile, 25-March, 1870, ওই, 195.
- ১৮ Theodor Aufrecht, *Catologus Codicum Sanskritorum* ইত্যাদি, Oxford, 1884.
- ১৯ R.L. Mitra, Notices of Sanskrit Mss. under the order of the Government of Bengal, No. 1, Calcutta, 1871, 301.
- ২০ T. Aufrecht, *Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors*, German Oriental Society, Leipzig, part II, 1896.
- ২১ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিমের বিবৃতি, দ্রষ্টব্য, আবদুল করিম, প্রাণ্ডক্ত, ১১৯।
- ২২ আহমদ শরীফ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, প্রাণ্ডক্ত, ১৫।
- ২৩ ইউরোপে প্রচলিত তুলনামূলক শব্দভাণ্ডার ব্যাকস্বক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, অমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'ভাষার নমনীয়তা', পূর্ণিমা, ১৩১১, শ্রাবণ-ভাদ্র, ৭১-৭৫।
- ২৪ জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের কর্মকাণ্ড ও প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, A Leslie Willson, A Mythical Image. the Ideal of India in German Romanticism, Duke University Press, 1964. Walter Leifer, India and the Germans, Bombay, 1977. রোমান্টিক আন্দোলন ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্যার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, Wilhelm Halbfass, India and Europe, An Essay in Philosophical Understanding, Delhi, 1990. 69-83.
- ২৫ হেগেলের দর্শন ও প্রাচ্যবিদ্যার বিবর্তন Halbfass, ওই 84-99. G.W.F. Hegel, *Lectures on the Philosophy of World History*, Cambridge, London 1982.
- ২৬ F. Max-Mueller, *Lectures on the Science of Language*, Delivered at the Royal Institute of Great Britain, April-May, June 1861. Fifth edition, London 1866. এই সংস্করণটি ভারতীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ক্রয় করেছিল, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বিতরিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্করণটি দ্রষ্টব্য। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে জার্মান ও ফারাসী পণ্ডিতদের রচনার সারসংকলন প্রথম অধ্যায়ে সম্মিলিত হয়েছিল। ভাষাতত্ত্ব ও জার্মানতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে ম্যাকসমুল্যের ধারণার জন্য দ্রষ্টব্য, F. MaxMueller, *Biographies of Word and the Home of the Aryans*, London, Longmans. Green and Co. 1888. রিজলির Ethnological Survey of India-র উপর ম্যাকসমুল্যের দীর্ঘ আলোচনা এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিশিষ্টে সংকলিত আছে।
- ২৭ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত, Rai Rajendralal Mitra's report to A Pedlar, Secretary, Asiatic Society of Bengal, 1880 রাজদরবারের পুথি সংগ্রহ ও তালিকা, R. Lawrence, List of Sanskrit works supposed by the Nepalese to be rare in the Nepalese Libraries at Kathmandu, August, 1868. ব্যুৎপত্তির বিবৃতি, Report on Sanskrit Manuscript, Bombay, 1872-73 : জৈন পুথিশালার ইতিবৃত্তের তথ্যসূত্র, John E. Court, 'The Jaina knowledge Warehouse : Traditional Libraries in India', Journal of American Oriental Society, Jan to March, 1995, 77-87.
প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের চোখে প্রাক-আধুনিক আরবি ও ফারাসি পাণ্ডুলিপির দরবারি সংগ্রহের কাঠামোও এক গোত্রের মনে হয়। দ্রষ্টব্য, A. Sprenger, M.D., A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindustany Mss of the Libraries of the King of Oudh, Compiled under the orders of Govt. of India, Vol 1, Calcutta, 1854.
- ২৮ দুঃখের বিষয় জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ও তাঁর নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন প্রকল্পের উপর কোনোরকম সার্বিক আলোচনা নেই। ইংরেজ শাসনের প্রশাসনিক কাঠামোয় ভাষা আলোচনার পরম্পরা সম্পর্কে গ্রিয়ারসনের বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, G.A. Grierson, 'Obituary on John Beames' Journal of Royal Asiatic Society 1902, repr. in Indian Studies : Past and Present Jan. 1960, 336-

38. F.L. Thomas 3 R.L. Turner লিখিত গ্রিয়ারসনের চরিত্রকথা Proceedings of British Academy-তে মুদ্রিত হয়। রচনটি পুনর্মুদ্রিত হয় *History of Printing and Publishing in India*, ed. by B. Kesavan, National Book Trust, India, Vol III, 1997, 321-323.
- ১৮৫৭ সনের পরে ভারতে জেলাশাসকদের শাসনসংস্কারের প্রেক্ষিতে গ্রিয়ারসনের লোকভাষাপ্রীতি ও আঞ্চলিক জনজীবনে আগ্রহ নিয়ে আলোচনা, C.A. Bayly, *Empire and Information*, Cambridge University Press, 1996. ব্রিস্টল, ভক্তি আন্দোলন ও গ্রিয়ারসনের ভাষাতত্ত্ব-এর সম্পর্ক নিয়ে নিবন্ধ, Vijay Pinch, C Bhakti and the British Empire, Past and Present, May, 2003, 160-196.
- ২৯ ইংরেজি ভাষায় ব্যাল্যরের প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক চিন্তা নিয়ে আলোচনা চোখে পড়েনি। আমার পর্যালোচনার তথ্যসূত্র ব্যাল্যরের মন্তব্য, *Epigraphia Indica*, Vol I, (1892), 4-5, 373-77.
- ৩০ Rajendralal Mitra, 'On the Origin of Hindvi Language and its Relation to Urdu Dialect', Journal of Asiatic Society, No. V. 1864. পুনর্মুদ্রিত, বাংলা ভাষা চর্চা, (বঙ্গদর্শন থেকে সংকলন) বিশ্বজিৎ রায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৪১০, পরিশিষ্ট, ২।
- ৩১ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে চর্যাচর্যবিশিষ্ট্য আবিষ্কারের সূত্রে ১৮৯১ সনে কম্বুলেটোলা লাইব্রেরিতে পঠিত একটি প্রবন্ধের কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উল্লেখ করেন। সেই প্রবন্ধে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ও পুথি সংগ্রাহক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষায় লেখা বই ও পুথির সামাজিক গ্রাহ্যতার একটি পর্যালোচনা করেন। মুখবন্ধ, *হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষা বৌদ্ধ গান ও দোহা*, (১৩২৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮৮।
- ৩২ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রাচীন সাহিত্যালোচনা', *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা*, ১ম বর্ষ (১৩০১), ১ম সংখ্যা, পুনর্মুদ্রিত, জয়ন্তী উৎসব স্মারক গ্রন্থ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত, সাহিত্য. পরিষৎ, ১৩৮০, ৫৭-৬৬। মনে রাখা দরকার যে কৃষ্ণিবাসের রামায়ণের পুথি বিচার ও প্রামাণিক সম্পাদনার ভার হীরেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে তাঁর সম্পাদিত কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের উত্তরকণ্ঠটিও ১৩১০ সনে প্রকাশিত হয়। ঐ সংগ্রহ ও সম্পাদনার প্রেক্ষিতে তিনি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 'কৃষ্ণিবাস' সংক্রান্ত প্রবন্ধটি লেখেন, 'প্রাচীন সাহিত্যালোচনা'টি সেই প্রবন্ধেরই কথা।
- ৩৩ ওই, ৬১।
- ৩৪ ওই, ৬৪-৬৫।
- ৩৫ পাশ্চাত্য সাহিত্যে উপমা দুটির ব্যবহার নিয়ে বিখ্যাত আলোচনা, M.H.Abrams, *The Mirror and the Lamp*, Romantic theory and the Critical Tradition, (1953), London, 1971.
- ৩৬ উৎসাহী পাঠক 'ক্ষণ্যালোকের'। প্রথমোদ্দ্যোতের লোচন টীকা দেখতেই পারেন। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ তর্কচর্চা কর্তৃক মূল ও সটীক অনুবাদ ক্ষণ্যালোক ও লোচন, কলিকাতা, ১৯৮৬, ১১-১৯।
- ৩৭ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১৮৯৬, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯১, ১৬।
- ৩৮ তুলনীয়, Homi Bhaba, "Dissemination : Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation", in the *Location of Culture*, New York, 1994, 139-70.
- ৩৯ দীনেশ সেন ও বঙ্গোপনিষদ' বিনয় সরকারের বৈঠকে, প্রথম ভাগ, হরিন্দাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, (১৯৪২), দেব্র সংস্করণ, ২০০৩, ২৮৭।
- ৪০ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (১৮৯৬), ১৭-১৮।
- ৪১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুখবন্ধ, প্রাগুক্ত, ২।
- ৪২ আবদুল হক চৌধুরীকে লেখা আবদুল করিমের চিঠি, ২। ১০। ৪৪, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদকে নিবেদিত প্রবন্ধ সংকলন, প্রাগুক্ত, ৮৪।

- ৪৩ . ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য, উদ্ধৃত, আবদুল করিম, প্রাণ্ডু, ১৬৭।
- ৪৪ . ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সংস্কৃতি সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ উদ্ধৃত আহমদ শরীফ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, প্রাণ্ডু, ৩১-৩২।
- ৪৫ . ১৯৫০ সনে ২১-২২ জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান প্রদর্শনী উপলক্ষে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের ভাষণ, উদ্ধৃত, মাঘনিশীথের কোকিল, প্রাণ্ডু, ১২২-১২৩।
- ৪৬ . দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯, ১৬৫-১৬৮। দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্যিক প্রকল্প নিয়ে চিন্তাকর্ষক আলোচনা, Dipesh Chakraborty, 'Romantic Archives: Literature and Politics of Identity in Bengal', Critical Enquiry, Spring, 2004, 654-682.
- ৪৭ . দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রাণ্ডু, ২৬, উল্লেখ্য যে ম্যাকসমুল্যের উদ্ধৃতিতে প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের আরম্ভেই গ্রিয়ারসনের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা রয়েছে। সাক্ষীগোপাল ঝাড়া করতে দীনেশচন্দ্র সেনের জুড়ি মেলা সত্যি ভার।
- ৪৮ . ব্যোমকেশ মুস্তফীর নিবেদন, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, মুনশী আবদুল করিম সঙ্কলিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২০।
- ৪৯ . বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে আবদুল করিমের ভাষণ, ১৯৩৯, উদ্ধৃত, মাঘ নিশীথের কোকিল, প্রাণ্ডু, ১১৭।
- ৫০ . 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' পূর্ণিমা, বৈশাখ, ৩য় বর্ষ, ১৩০২, ২৯৭-২৯৯, আবদুল করিম বর্ণিত পুস্তকটি হল রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত মুসলমান বৈষ্ণব কবি, ১৩০২, সুরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। এই সংকলনে নসীর মামুদ, সেখ ভিখন, সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখদের পদ সংকলিত হয়েছে।
- ৫১ . 'বিদ্যাভূষণী মনসা', সাহিত্য, ১৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১০, ১০-১১।
- ৫২ . 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রামের প্রভাব', (১৩১৩) রচনাবলী, প্রাণ্ডু, ৫৫৭।
- ৫৩ . 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ও বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ' (১৩১০) ওই, ৪৮৩।
- ৫৪ . 'যুগসন্ধির কবি মালেকুল্জমান', (১৩২৫) ওই, ৪৬০।
- ৫৫ . 'বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রাম', (১৩২২), ওই, ৫৬৫।
- ৫৬ . 'চণ্ডীদাস চরিত' নিয়ে বাঁকড়া গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্যদের বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য, নেপাল মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আকাদেমী পত্রিকা, ৪, কলকাতা ১৯৯১, ১৭৬-১৭৯।
- ৫৭ . 'নগ্নীকান্ত সেন', পূর্ণিমা, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩০৭, ৪৩১-৪৩৪। তাঁর আত্মজীবনীতে নবীনচন্দ্র সেন 'নগ্নীকান্ত' দেবশিশু অভিধা দিয়েছিলেন। সাময়িকপত্রের মাধ্যমে দেশসেবা ও সাহিত্যসেবার যোগসূত্র নির্মাণে নগ্নীকান্ত ও আবদুল করিম অগ্রণী, নবীনচন্দ্র তাঁদের উৎসাহ দিতেন। দ্রষ্টব্য, 'আমার জীবন', নবীনচন্দ্র রচনাবলী, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬৬, ৪২৯-৪৩১।
- ৫৮ . 'প্রাচীন বাংলা পুথিসাহিত্য', (১৩৫৭) রচনাবলী, প্রাণ্ডু, ১৭৫।
- ৫৯ . কৃষ্ণবাসের আত্মজীবনী নিয়ে বিতর্ক, মণীন্দ্রমোহন বসু, বাঙ্গালা সাহিত্য ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৭, ৬১-৮১। আলাওলের আত্মপরিচিতি নিয়ে বিতর্ক, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচনাবলী ১ম খণ্ড, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, প্রাণ্ডু, ২৪৯-৩৩৭।
- ৬০ . মুনশী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ওই, ১৩২০, ৪৭।
- ৬১ . মুনশী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ওই, ৬৫।
- ৬২ . মুনশী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ওই, ১১৩-১১৬।
- ৬৩ . মুনশী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ওই, ১৬-১৭।

অনেক বাঙালির মতোই সাহিত্যবিশারদও যেন কমলাকান্তের ভূতকে নিজের ঘাড় থেকে নামাতে

পারেননি, বাঙালি চরিত্রের রসলক্ষণের নিদান তো ঐ আফিমখোরই ভালোভাবে বাতলে দিয়েছিলেন। দ্রষ্টব্য মৎকৃত ‘জালরাজার কথা : বর্ধমানের প্রতাপচাঁদ,’ কলিকাতা, ২০০২, ২১৩-১৫।

গীতিকবিতার গোত্রবিচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির ‘নৈসর্গিক নিয়ম অনুসন্ধান’ে প্রবৃত্ত হন, বাঙালির মধ্যে “জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্যকে” জাতীয় সাহিত্যের পদবাচ্য ধার্য করেন। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক কারণ বশত আর্যভেজ্য বিস্মৃত হয়ে কোমল ও গৃহস্থ পরায়ণ বাঙালিরাই গীতিকাব্যের স্রষ্টা ও ভোক্তা হয়ে ওঠে, ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’, বিবিধ প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সংসদ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০-১৯১। আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের পরম্পরাত্তেই বাঙালি যেন তার জ্ঞাত ও ধাত বৃক্তে পারে।

- ৬৪ ‘বিদ্যাভূষণী মনসা’, ওই, ২২।
- ৬৫ *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, মুনশী শ্রীআবদুল করিম সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২১, ৩০৮-৩০৯।
- ৬৬ *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ৫৩।
- ৬৭ ব্যোমকেশ মুস্তফীর নিবেদন, প্রাগুক্ত, ১।
- ৬৮ নগেন্দ্রনাথ বসু, *বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ*, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২৯৭-৩৪৪, শেষ ভাগ ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩০৬, ৪৬-৮০। নগেন্দ্রনাথ বসুর পুথিসংগ্রাহের উদ্যোগ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য তৎকৃত ‘আমার জীবন কথা’, পুনর্মুদ্রিত, ঐতিহাসিক, ১৪০৯-১৪১০।
- ৬৯ হরগোপাল দাসকুণ্ড, *বাঙ্গালা পুথির বিবরণ*, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩১৩, ১৬১-১৯২।
- ৭০ ব্যোমকেশ মুস্তফীর নিবেদন, প্রাগুক্ত।
- ৭১ মুখবন্ধ, বিশ্বকোষ, দ্বাবিংশ ভাগ, ১৩১৮।
- ৭২ *বাঙ্গালা সাহিত্য, বিশ্বকোষ* (১৩১৪) অষ্টাদশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, নয়াদিগ্গি, ১৯৮৮, ২৯-২৩৮।
- ৭৩ ওই, ১৩৫-১৬১। মনে রাখতে হবে যে মুনশী আবদুল করিমের সম্পাদিত পুথি পরিচয় ধারাবাহিকভাবে *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়* ১৩০৭-১৩১২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ফলে আবদুল করিমের নির্দেশিত পুথি পরিচিতি সম্পর্কে সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তা নগেন্দ্রনাথ বসু ওয়াকিবহাল ছিলেন।
- ৭৪ ওই, ১৫০।
- ৭৫ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।
- ৭৬ ভূমিকা, ওই।
- ৭৭ ওই, পুথি সংখ্যা ৭১৫, ৩১২।
- ৭৮ *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ*, (১৩২০), প্রাগুক্ত, ৫৮-৫৯।
- ৭৯ তুলনীয়, আহমদ শরীফ, প্রাগুক্ত, ২৬০-২৬৩।
- ৮০ তুলনীয়, ‘চৈত্র মাহাত্ম্য’ প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধার, *প্রদীপ*, ৬ ভাগ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩১০, ৪৫৪। বাড়ির মাপজোপের পুথি ‘বিপুলার চৌতিশা’ নিয়ে তাঁর মন্তব্য, “বর্তমান ইংরাজি সভ্যতার দিনে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সেকালের লোকেরা সকলকাজেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন। তাহারা গৃহাদি বন্ধনের যে সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন বর্তমানের বিজ্ঞানবাদীগণ তাহা মানিবেন না, নিশ্চয়ই। যাহা হউক, তাহাদের গৃহবন্ধন নীতিই রক্ষণোদ্দেশ্যে তুলিয়া দিলাম।” একাল বনাম সেকালের বয়ানে পুথি ঐতিহ্যের নস্টালজিয়াকে আবদুল করিম অন্য সংগ্রাহকদের মতোই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। উদ্ধৃত, *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ* (১৩২১) প্রাগুক্ত, ৮৩।
- ৮১ ‘একটি ঝরাফুলের কথা’, (১৩৫৮), রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ৫৩৬।
- ৮২ আহমদ শরীফ, *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ*, প্রাগুক্ত, ৩৫, ৪৯-৫১।

- ৮৩ ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় পূর্ব পাক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সাহিত্য বিশারদের ভাষণ, উদ্ধৃত, *মাঘ নিশীথের কোকিল*, প্রাণ্ড, ১৩১।
- ৮৪ 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' (১৩১০), *রচনাবলী*, প্রাণ্ড, ৪০৬-৪০৮।
- ৮৫ 'রোসাঙ রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৩৪১) *রচনাবলী*, ওই, ৫১৮-৫১৯।
- ৮৬ আবদুল করিম, 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের মাতৃভাষা', সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২১, ৩১৭-৩২৫। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত সাহিত্যবিশারদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি কোথাও সঙ্কলিত হয়নি। তুলনীয় জাতীয়ভাষা ও মাতৃভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মিতির নানা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা, Benedict Anderson, *Imagined Communities* (1983), London, 1985, 67-79, Eric Hobsbawm, *Nation and Nationalism Since 1870*, Cambridge University Press, 1995, 55-57.
- ৮৭ 'কবি আলাওলের কথা', *রচনাবলী*, প্রাণ্ড, ১৮৫।
- ৮৮ কালিকারঞ্জন কানুনগো, 'কবি আলাওলকৃত 'পদ্মাবতী' পুঁথি ও জায়সী কৃত মূল 'পদ্মাবতী' কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, (১৩৫০) ৫০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮-৩২। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত আলাওলের পুঁথি বানানো সম্পর্কে স্বীকারোক্তি, আহমদ শরীফ, 'পদ্মাবতী প্রসঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে লিখিত ডক্টর কালিকারঞ্জন কানুনগো সাহেবের পত্র', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮, ১-৪। প্রথমেই প্রবন্ধে আলাওলি কাব্যের জনপ্রিয়তায় বটতলা সংস্করণের ভূমিকা সম্পর্কে কানুনগোর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "হাবিশী প্রেসের ছাপা পুঁথির লক্ষাধিক শত বাঙালী সাগ্রহে কিনিয়াছে; অর্থ বৃষ্টিতে না পারিলেও প্রতি সন্ধ্যায় আসর জমাইয়া সুর সহযোগে পাঠ করে। গ্রামের গাছীর গায়েন ও মাদুশ বিদ্যাবিশারদ সাহিত্যিকের মধ্যে এ বিষয়ে কোন ইতর বিশেষ আছে বলে মনে হয় না—উভয় শ্রেণীর পাঠকই ভাবগ্রাহী জনার্দন।" মুসলমান জাতীয় সাহিত্যের আবেগে বটতলার আলাওল কীভাবে ছড়াতে পারে, কানুনগোর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণই তার প্রমাণ।
- ৮৯ দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোহলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৬৫, ৮৩-৮৫।
- ৯০ *মাঘ নিশীথের কোকিল*, প্রাণ্ড, ১৩১-১৩২।
- ৯১ ইসলামাবাদ (১৩২৫-২৬), পুস্তিকাকারে প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৬৪, *রচনাবলী*, প্রাণ্ড, ১৫।
- ৯২ *প্রাচীন বাংলা পুঁথি সাহিত্য*, ওই, ১৭৭।
- ৯৩ Kashinath Vasudev Abhyankar and J.M. Shukla, *A Dictionary of Sanskrit Grammar*, Baroda, 1986, 98. অষ্টাধ্যায়ী, ১.২.৬৪, Ramanath Sharma, *The Astadhyayi of Panini* Vol 2, 2000, 133-134. 'একঃ শেবোহবশিষ্টো যস্য স একশেষঃ।' ভর্তৃহরি একশেষ বিষয়ে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করেছেন। [বৃষ্টি ২৮] কিন্তু পাণিনি সম্প্রদায় একশেষের সমাসেই স্বীকার করেননি, একশেষকে স্বতন্ত্র বৃষ্টি বলেছেন। একশেষে 'রামশ্চ রামশ্চ' 'রামৌ' হয়, কারণ একশেষ বিভক্তি নিরপেক্ষ অন্তরঙ্গ বিবিধ আশ্রয় অর্থাৎ বিভক্তি যোগের আগেই একটি 'রাম'পদ অবশিষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে সুবস্ত পদের মিলন হয় না। অতএব 'রামশ্চ রামশ্চ' একশেষের ব্যাসবাক্য নয়, অর্থ মাত্র। দ্রষ্টব্য গুরুপদ হালদার, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৪১ [৭], ১৯৯-২০১।
- ৯৪ ভর্তৃহরির মতের উপর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, K.A. Subramania Iyer, প্রাণ্ড, 371-375, 550-552.
- ভাগীরথ প্রসাদ ত্রিপাঠী সম্পাদিত, ভর্তৃহরি, বাক্যপদীয়ম, পদকাণ্ড, 'বৃষ্টিসমুদ্দেশ', হেলারাজের 'প্রকাশ' টীকা ও রঘুনাথ শর্মার 'অঙ্কাক্ষরী' টীকা সম্বলিত, সম্পূর্ণগান্ধী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৭৭। বৃষ্টি ২৮-৩৪তে দ্বন্দ্ব সমাস আলোচিত হয়েছে। প্রাণ্ড সংস্করণের ৩৪-৪৪ পৃষ্ঠায় প্রাসঙ্গিক অংশটি সঙ্কলিত। বৃষ্টি কথাটি পারিভাষিক, সাপেক্ষ পদসমষ্টির একাদীভূতরূপই বৃষ্টি। পৃথক পৃথক পদ কী সাপেক্ষে একার্থে মিলিত হয় এবং সমন্বয়ের পরে স্বার্থ (নিজের অর্থ) সহ কীভাবে অন্য

অর্থ প্রতিপাদন করে, এটাই বৃত্তির উপজীব্য বিষয়। ('পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ।')

৯৫ বৃত্তি ২৯, হেলারাজের টীকা, ওই, ৩৫।

৯৬ বৃত্তি ৩২, হেলারাজের টীকা। অম্বাকর্ষী, ওই, ৩৫-৩৬।

৯৭ Iyer, প্রাগুক্ত, 373, বৃত্তি ৩২, হেলারাজের টীকা। 'সমুদায়রূপং পরস্পরারোপিতার্থ তদা দ্বন্দ্বো'।

৯৮ বৃত্তি ৩৪, হেলারাজের টীকা ও অম্বাকর্ষী, ৪৪। Iyer, 373-374.

পতঞ্জলির মতে, দ্বন্দ্ববত্ত্ব নিম্নে দুই বা ততোধিক সমসামান্য পদ মিলিত কার্যসাধক হয়, একের অভাবে কেবল অপরের মাধ্যমে সমস্ত পদের অর্থ অভিযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। 'প্লক্ষণ্যশ্রোষো' বা 'পাকুড়বটের' অর্থবোধ কেবল দুইটি সুবস্ত পদের যৌগপদ্যেই সিদ্ধ। এই আবশ্যিক শর্তের অতিরিক্ত আর কোনো তাৎপর্য খোঁজাটি অপ্রয়োজনীয়। পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত থেকে ভর্তৃহরির বিচারটি স্বতন্ত্র। তাঁর মতে, পরস্পর সাপেক্ষতার স্বাতির সমসামান্য পদগুলির একটির অর্থ অন্য পদের অর্থকেও বোধিত ও আভাসিত করছে, পাকুড়ের মধ্যে বট বা বটের মধ্যে পাকুড়ের অর্থও যেন হাজির আছে। পদের এই জাতীয় সহগ অর্থদোষনার তাত্ত্বিক তাৎপর্যটি অপরিসীম, দ্বন্দ্ববৃত্তির স্বভাবের মধ্যেই বৈশিষ্ট্যটি নিহিত আছে। এক 'পদ-অর্থের' মধ্যে অন্য 'পদ-অর্থের' দোষনা 'সম-অর্থের' পরিসরকেই বহুতা বিজ্ঞত করে বৃত্তিতে স্বার্থের মধ্যে পরার্থ স্বভাবতই প্রোমিত হয়। যুগপদ অধিকারণ বচনতার তাৎপর্য বিচার সম্পর্কিত বিতর্কের একটি বিবৃতি পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উপলব্ধ। দ্রষ্টব্য S. D Joshi and J. A. F. Roodberger. *The Astadhyayi of Panini*; Vol. VI, New Delhi, 1997, 72-75.

৯৯ নিরবকাশ অর্থ নিরৈট, নিশ্চিদ্র। নিরবকাশ বা অনবকাশ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত, যেখানে একটি বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা হয় না। এটি বার্ষিক বিধির রূপ, এই বিশি বলে অধিকার সূত্র, শীর্ষ নিয়ম বা সাধারণ নিয়মকে চেকিয়ে বিশেষ নিয়মটিই প্রযুক্ত হয়। বাধকতার শক্তি না থাকলে সাধারণ নিয়মকে প্রতিষিদ্ধ করে ঐ বিশেষ নিয়ম প্রয়োগের সুযোগ থাকে না। উভয় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সমাসকে বারিত করে নিরবকাশী একশেষ বৃত্তিই সিদ্ধ হয়। 'দ্বন্দ্ব প্রতিষেধশ্চ' এই বার্তিক ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি লিখেছেন 'অনবকাশো একশেষো দ্বন্দ্বং বাধিযতে।' [১।২।৬৪] অনবকাশ বা নিরবকাশের কিন্তু তাৎপর্য আলোচনা নাগেশ ভট্ট 'পরিভাষাদ্বেশেষরে' করেছেন। দ্রষ্টব্য, R. Sharma, প্রাগুক্ত, Vol I, 134-35.

১০০ অধ্যাস প্রসঙ্গে কালিদাস ভট্টাচার্যের অসাধারণ আলোচনা, 'অধ্যাস', বঙ্গীয় মহাকোষ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩২-৩৪০। 'বঙ্গীয় মহাকোষ' অসম্পূর্ণ; মুদ্রিত খণ্ডে বর্ণক্রম অনুযায়ী ভারতীয় দার্শনিক বর্গের প্রাঞ্জল আলোচনা সঙ্কলিত রয়েছে।

যোগেশচন্দ্র বাগল স্মরণে

অলোক রায়

রাজনারায়ণ বসুর *সে কাল আর এ কাল* (১৮৭৪) উনিশ শতক সম্বন্ধে আমাদের মনে আগ্রহ জাগিয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৩) সেই আগ্রহকে অনেকটা পুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করেছিল। তবে উনিশ শতককে ভালোমতো জানবার কাজে অপরিহার্য হয়ে ওঠে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (১৯৩২-৩৫) এবং তাঁর অন্যান্য তথ্যমূলক রচনা। ব্রজেন্দ্রনাথের উত্তরসাধক যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯০৩-১৯৭১)। ১৯৩২ সালে যোগেশচন্দ্র লেখেন রুস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনী, সেই তাঁর গবেষণামূলক রচনাকর্মের সূচনা। *প্রবাসী* পত্রিকায় কাজ করার সময়ে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণা এবং প্রকাশনায় সাহায্য করেন। তিনি জানিয়েছেন, 'ব্রজেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া আমার ভিতরের সহজ ইতিহাস-অনুশীলন প্রবৃত্তি একটি সুস্পষ্ট পথ পাইয়াছে। ইতিহাসের গবেষণা যে কত বিপুল শ্রমসাধ্য এবং অধ্যবসায়-সাপেক্ষ তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। বস্তুত গত ও গতপূর্ব শতকে বাঙালি-জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রেরণাও তাঁহারই সাহচর্যের ফল।' (বরণীয়, ১৯৫৯)

যোগেশচন্দ্রের জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে বরিশাল জেলার কুমীরমড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল বরিশাল জেলার চলিশা গ্রামে। যোগেশচন্দ্রের পিতা জগদ্বন্ধু বাগল ও মাতা তরঙ্গিণী দেবী। গ্রামের পাঠশালায় রামু গুরুমশায়ের কাছে শৈশবশিক্ষা, পরে ১৯২২ সালে পিরোজপুর মহকুমা সহরের কাছে কদমতলা গ্রামের উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা ও বাগেরহাট কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইচ্ছা ছিল কলকাতায় এসে কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃবন্ধু অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সাহায্যে সিটি কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভরতি হলেন। বরিশালে থাকবার সময়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত, এবং সিটি কলেজে পড়বার সময়ে হেরস্বচন্দ্র মৈত্র তাঁর চরিত্র-গঠনে বিশেষ সহায়তা করেন। ১৯২৬ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়া হয়ে ওঠেনি। সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁক ছিল। '১৯২৮ সন। সেবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। বৎসর শেষে প্রবাসীর সঙ্গে কার্যত সংযোগ স্থাপিত হইল। নূতন বৎসরের প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর সম্পাদকীয় বিভাগে শিক্ষনবীশ রূপে কার্য শুরু করি।' মাঝখানে কয়েক বছর (১৯৩৫-১৯৪১) দেশ পত্রিকায় কাজ করার পর আবার *প্রবাসী-Modern Review* পত্রিকার কাজে ফিরে আসেন। ১৯৬১ সালে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। তবে পড়ালেখার কাজে বিরতি ঘটেনি। আগে প্রকাশিত বইয়ের সংশোধিত-পরিবর্ধিত

সংস্করণ প্রকাশ এবং নতুন কিছু বইয়ের প্রকাশ এই সময়ে—*বেথুন সোসাইটি* (১৯৬১), *বাংলার নবজাগরণের কথা* (১৯৬৩), *বঙ্গসংস্কৃতি কথা* (১৯৭০)। সাহিত্য সাধক-চরিতমালার জন্য অনেকগুলি জীবনীও তিনি এই সময়ে লেখেন—*উমেশচন্দ্র দত্ত ও মহেশচন্দ্র ঘোষ* (১৯৬৩), *সরলা দেবী ও শরৎচন্দ্র রায়* (১৯৬৪), *ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়* (১৯৬৪), *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়* (১৯৬৫)। *হিন্দুমেলা*র ইতিবৃত্ত বইয়ের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৬৮) যোগেশচন্দ্র লেখেন, ‘আমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইতে হইতে অধুনা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কাজেই এ ধরনের কার্যে যে অপরের উপর আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।’ আরও জানিয়েছেন, ‘যখন বুঝিলাম দৃষ্টিশক্তি অতি দ্রুত হ্রাস পাইতেছে, তখন বিভিন্ন পত্রিকায় ও সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির একটি তালিকা করার কথা আমার মনে উদ্ভূত হয় এবং আমার স্নেহভাজন কয়েকজনকে দিয়া এইরূপ একটি তালিকা করাইতে প্রবৃত্ত হই।’ পরে এই তালিকা ঈষৎ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে গৌতম নিয়োগী রচিত *যোগেশচন্দ্র বাগল* (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১২৭) পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার পুস্তিকাগুলি নিয়ে যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থসংখ্যা ছত্রিশ। গ্রন্থাকারে অসংকলিত প্রবন্ধের সংখ্যাও অনেক। প্রতিকূল পরিবেশে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে এই ধরনের প্রবন্ধ লেখা অত্যন্ত কঠিন ছিল। জীবনে কোনোদিন আর্থিক সচ্ছলতা আসেনি। যৎসামান্য বেতনে সাংবাদিকের কাজ করেছেন সারা জীবন। পরিণত বয়সে পিতৃদেবের স্মৃতিচারণকালে তিনি লেখেন, ‘আমি এম. এ. একবৎসর পড়ি। পিতৃদেবের বড় ইচ্ছা আমি উচ্চতম শিক্ষা সমাপন করিয়া কর্মজীবন শুরু করি। কিন্তু নানারকম দুর্বিপাকে সে আশা পূর্ণ হইল না। কর্ম-জীবন শুরু করিবার পরে তাঁহার ইচ্ছা পূরণের বাসনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা তো আর হয় নাই। গত ত্রিশ বৎসরে এই সংসারে মানুষের মতো বিচরণ করিতে গিয়া কত দুঃখ দুর্গতিরই না সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মনে মনে ভাবি, পিতৃদেবের বাসনা পূরণ করিতে পারিলে হয়তো এ রকম বিপর্যয় ঘটিত না। পল্লীবাসী হইলেও তো পিতৃদেব বাঙালিই ছিলেন। বাঙালির চিন্তাবৃত্তি বা মানসিকতা যে উপাধির গণ্ডি ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই ইহা হয়তো তিনি দিব্য চক্ষে দেখিয়া থাকিবেন।’ যোগেশচন্দ্র জীবিতকালে প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি একেবারে পাননি এমন নয়, তবে আরও অনেক বেশি তাঁর প্রাপ্য ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে তিনি বিদ্যাসাগর বক্তৃতা (১৯৫৬) ও শরৎচন্দ্র স্মৃতি-বক্তৃতা (১৯৬৯) দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার (১৯৫৬), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেরোজিনী বসু স্বর্ণপদক (১৯৬২) এবং অমৃতবাজার পত্রিকা শিশিরকুমার পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করে। *প্রবাসী-Modern Review* থেকে অবসর গ্রহণের পর অর্থক্লেশতা বাড়ে, বিশেষত শেষ জীবনে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অর্ধোপার্জনের পথ বন্ধ হয়। তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ কয়েকজনের অনুরোধে কেন্দ্রীয়-সরকার এই সময়ে সামান্য সাহিত্যিক-পেনশনের ব্যবস্থা করেন। রাজ্যসরকারও সাহিত্যিক-পেনশন দেন। ১৯৭১ সালে ৬ জানুয়ারি তাঁর জীবনাবসান হয়।

যোগেশচন্দ্র বাগলকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা যাবে না যদিও উনিশ শতকের ইতিহাসচর্চায় তাঁর দান অনস্বীকার্য। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক ঐতিহাসিকদের পক্ষ থেকে যোগেশচন্দ্রের গবেষণা-নিবন্ধকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, ‘এখন [১৯৬৮] থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রধানত প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় ত্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও

রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এই দীর্ঘকাল ধরে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক জীবন ও চিন্তনায়কদের তথ্যভিত্তিক বিবরণ সহজলভ্য হয়েছে, গত শতাব্দীর ছবি এই শতাব্দীর পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।... যোগেশচন্দ্রের অসংখ্য কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর দীর্ঘ সাধনা ও নিষ্ঠার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।' (ভূমিকা, *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*)। যোগেশচন্দ্র গবেষণাকর্মের সূচনায় ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য রচনায় অগ্রসর হন। *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৯৪১) সাতজন মনীষী-বা কর্মবীরের জীবনী স্থান পেয়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দশজনের জীবনী (বাদ গিয়েছেন রাধাকান্ত দেব)। উনিশ শতকের শেষের দিকে বা বিশ শতকের সূচনায় ব্যক্তি-জীবনী প্রকাশিত হয়নি তা নয়, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি যথেষ্ট মূল্যবান। রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ উনিশ শতকের স্মরণীয় পুরুষদের এক বা একাধিক জীবনী লেখা হয়েছিল। তবে জীবনী রচনার পদ্ধতি ছিল তখন অন্য রকম। পারিবারিক নানা কাহিনি, স্মৃতিচারণ, সহজলভ্য তথ্যসমাবেশ এবং গ্রন্থালোচনা সেখানে প্রাধান্য পেত। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সাধারণত উৎস-নির্দেশের রীতি ছিল না। তথ্য এবং কল্পনা সেখানে অনেক সময়ে এমন জড়িয়ে গেছে যে তাদের আলাদা করার উপায় নেই। আচার্য যদুনাথ সরকারের স্মৃতিচারণাকালে যোগেশচন্দ্র বলেন, 'গবেষণাকর্ম নূতনভাবে আরম্ভ করিয়াছিলাম। গত শতকে কয়েকজন মান্যগণ্য বাঙালি ও বাংলা-প্রবাসীর তথ্যভিত্তিক জীবনী প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্বেই লিখিয়াছি। সেগুলি *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা* নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইল।' অন্যত্র তাঁর কাজের ধারা সম্বন্ধে লেখেন, 'গবেষণার নূতন ধারা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যিক। সরকারি নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারি রিপোর্ট, সরকারি আনুকূল্যে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, সমসাময়িক সংবাদপত্র, বড় বড় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কার্যবিবরণ, মনীষীদের লেখা চিঠিপত্র, দিনলিপি, আত্মজীবনী প্রভৃতি আকর হইতে তথ্যাদি অনুসন্ধান পূর্বক বাঙালি-জীবনের বিভিন্ন দিকে নূতন আলোকপাত করা সুবিধা হইয়াছে। এই কাজটি দুইভাবে করা যাইতে পারে—প্রথমত মনীষীদের জীবনকেন্দ্রিক; দ্বিতীয়ত শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা কেন্দ্রিক।' জীবনীরচনাকালে তিনি এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছেন, 'যাঁহাদের বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি; অথবা পূর্বে জানা থাকিলেও বর্তমানে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি—তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা ধারণা লইয়াই আমাদের কল্পনার চলিতেছে।' অন্যদিকে যোগেশচন্দ্র দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন 'অতীতের সুকৃতি বর্তমান উন্নতির ভিত্তি। অতীতের সুকৃতি স্মরণে আত্মপ্রত্যয় বর্ধিত হয়।'

জীবনী রচনা ছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস রচনায় যোগেশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ও অভিনিবেশ প্রকাশ পেয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মুন্ডির সঙ্কলনে ভারত (১৯৪০) বইয়ের ভূমিকায় নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন (তার একটি কারণ হতে পারে, বইয়ের প্রথম সংস্করণে উপশিরোনামে 'ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত' কথাটি ছিল)। যোগেশচন্দ্র নিজেও বিশ্বাস করতেন, ইংরেজের সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা হয়। এই ধারণা থেকে তিনি *জাতীয়তার নবমন্ত্র* বা *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত* (১৯৪৫) *বিদ্রোহ ও বৈরিতা* (১৯৪৯), *জাগৃতি ও জাতীয়তা* (১৯৬০), *বাংলার নবজাগরণের কথা* (১৯৬৩), *Peasant Revolution in Bengal* (1953),

History of Indian Association (1953) লেখেন। এমনকি *বেথুন সোসাইটি* (১৯৬০)-ও এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা, এবং ভূমিকায় তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি আজও সমান মূল্যবান—‘বাঙালি জাতির নবজাগরণের ইতিহাস যাঁহারা জ্ঞানিতে চাহেন, তাঁহাদিকাকে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে।’ তবে নবজাগরণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণার সঙ্গে একালে ঐতিহাসিকদের ধারণা মিলবে না, যেমন মিলবে না সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর অধিকাংশ সিদ্ধান্তবাক্য। *বিদ্রোহ ও বৈরিতা* বইটিতে সম্যাসী-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ, ওহাবী-বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ এবং শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারত, হিন্দুসমাজ ও খ্রিস্টান পাদ্রি, সিভিল সার্বিসে বর্ণ-বিচার, ভারত ছাড়—প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রের প্রয়োজনে লেখা, তাই এগুলিকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ বলা যায় না। অন্যদিকে *বৈরিতার* প্রসঙ্গে সাময়িক উত্তেজনা পরিহার করা সম্ভব হয়নি—‘তখন অশুভ ভারতবর্ষ ও অন্তর্বিপ্লব এবং ঋণ্ডিত ভারতবর্ষ ও স্বাধীনতা এই দুইটির মধ্যে একটি বাছাই করিতে গিয়া উভয় সমাজের নেতৃবৃন্দ শোষণটিকেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মুসলমান নেতৃবৃন্দ কিন্তু ভারতবর্ষকে ঋণ্ডিত করিয়া এক অংশে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায়ই প্ররোচিত হইয়াছিলেন।’ ‘আধুনিক মুসলমান সমাজের রাজনীতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর সৃষ্টি, আর তাহাদেরই সহায়তায় ইহার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। তাই দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে ১৯৪২ সনে যখন কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আগন্ত-বিপ্লব বা ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করে তখন মুসলমান সমাজের নেতৃবর্গ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে আরও এই আন্দোলনকে তাহাদেরও বিরোধী সংগ্রাম বলিয়া উদ্ভিষ্ট করিতে ছাড়েন নাই। ভারতবর্ষে পাকিস্থান নামে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ভাবিত তাহারা এই সময় হইতে বিশেষ ভাবে করিতে থাকেন। তখনই বুঝা গেল, ব্রিটিশের ভেদনীতি কিরূপ বিষময় ফল প্রসব করিতে চলিয়াছে।’ এসব মন্তব্য সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে খাপ খায়, কিন্তু ঐতিহাসিকের দূর-দৃষ্টির পরিচয় দেয় না।

অবশ্য ঐতিহাসিক যত নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, তিনিও বিশেষ দেশকালের সৃষ্টি। ফলে মতামত নিয়ে কখনও সংশয়, এমনকি বিরোধিতা সম্ভব, কিন্তু যোগেশচন্দ্রের রচনা যে তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ সে কথা মানতেই হবে। জীবনীগ্রন্থে তো বটেই, সংস্থা-সংগঠনের ইতিহাসে এত তথ্য তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, যা না পেলে উনিশ ও বিশ শতকের ইতিহাস লেখা সম্ভব হত না। *বেথুন সোসাইটি* বা হিন্দু মেলা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, শিল্পবিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা সম্বন্ধে জানতে হলে যোগেশচন্দ্রের লেখা পড়তেই হবে। মনে হয় তাঁর বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাস লেখার, যে জন্য পরিকল্পিতভাবে তিনি লেখেন *বাংলার জনশিক্ষা* (১৮০০-১৮৫৬), (১৯৪৯), *বাংলার স্ত্রী শিক্ষা* (১৯৫০), *বাংলার উচ্চশিক্ষা* (১৯৫৪), *Beginning of Modern Education in Bengal* (1944), *Women's Education in Eastern India : the first phase* (1956)। বরণীয় বইটি পড়লে বোঝা যায় যোগেশচন্দ্র শিক্ষাকে কেন এত গুরুত্ব দিয়েছেন। সেখানেও সেই জাতি-গঠনের আকাঙ্ক্ষা—‘বিদ্যালয়ের শিক্ষা, পন্ডীর পরিবেশ, চরিত্রবান সমাজনেতা ও সাধারণ মানুষকে কিশোর-কিশোরীরা সম্মুখে পাইলে তাহাদেরও জীবন গঠনের আদর্শকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনিতে পারে। আদর্শ শিক্ষাব্রতী, আদর্শ নেতা, আদর্শ সাধারণ মানুষের প্রাচুর্য না হউক

অন্ততঃ অপ্রতুলতা না ঘটায় বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলা দেশে ভাবে ও কর্মে যুগান্তর আনয়ন সম্ভবপর হইয়াছে।’

আমরা যারা উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে সামান্য কিছু লেখালেখি করে থাকি, তাদের কাছে ব্রজেন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্রের রচনাবলী নিত্যব্যবহার্য আকরগ্রন্থ। জীবনীকার মন্থননাথ ঘোষ আমার মাতামহ। তিনি মুখ্যতঃ *সাহিত্য*, *মানসী* ও *মর্মবাণী*, *যমুনা*, *ভারতবর্ষ* ও *সচিত্র শিশির* এসব পত্রিকায় লিখতেন। *প্রবাসী*তে কখনও লেখেননি কেন, জানি না। তবে জীবনের একেবারে প্রান্তভাগে পৌঁছে বিস্ফোরক একটি ছোটো প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য *প্রবাসী*তে পাঠালেন—‘নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদক কে?’ (মাঘ ১৩৬৩)। প্রবন্ধটি বিতর্কের সৃষ্টি করে। প্রতিবাদীর বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে তাঁকে আবার লিখতে হয় ‘নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ’ (বৈশাখ ১৩৬৪) নামে একটি ক্ষুদ্র রচনা। মনে আছে এই প্রবন্ধগুলি *প্রবাসী*-অফিসে পৌঁছে দিতে গিয়ে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। আমি নিজে যখন এর বছর চারেক পরে *প্রবাসী*তে *সোজা* প্রবন্ধ লিখি, তখন বোধহয় তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তারপর তাঁর সঙ্গে ভালোমতো পরিচয় ঘটলো ১৯৬২-৬৩ সালে। সেই সময়ে তাঁর লেখা অধিকাংশ চিঠি অবহেলায় হারিয়েছি। প্রথম চিঠিটি সম্প্রতি খুঁজে পাওয়ায় ভারি আনন্দ হল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ঋষি বঙ্কিম রোড

নববারাকপুর। পোঃ আহারামপুর

জিঃ ২৪ পরগণা

২৫-৬-৬২

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার পূজ্যপাদ মাতামহের নিকট খুব স্নেহপ্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার পিতামহদেবের [পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ] উল্লেখ কর নাই। তিনিও যে, আমাকে কত স্নেহ করিতেন বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তোমাদের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় হইলে বিশেষ আনন্দ পাইব। তোমার মধ্যম ভাতা মনে হয় কয়েকবার *প্রবাসী* আপিসে গিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল।

আমি *প্রবাসী* হইতে অবসর লইয়াছি। বর্তমানে উপরের ঠিকানায় নিজ আবাসে থাকি। দৃষ্টিশক্তি বড়ই ক্ষীণ। তবুও তুমি আসিলে আনন্দ পাইব।

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি বিস্তারিত জীবনী লেখায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইহা আমাদের পিতৃকৃত্য। তুমি আসিলে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। শিয়ালদহ হইতে বনগাঁ লাইন। স্টেশনের নাম ‘নববারাকপুর’। কোন দিন কোন সময়ে আসিবে আমাকে আগে পত্র দ্বারা জানাইবে।

ইতি আশীর্বদক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

যোগেশচন্দ্র বাগলের জন্মশতবর্ষে যেভাবে তাঁকে স্মরণ করা উচিত ছিল, সেভাবে তা করা হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল (১৯২৩-৭১)। কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য, গ্রন্থশালাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক এবং সহসভাপতি

হিসেবে তিনি পরিষদের নানা দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত এগারোটি জীবনী ও *বেথুন সোসাইটি* বইটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করে। কিন্তু *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* তাঁর খুব বেশি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত ‘বেথুন সোসাইটি ও রচনাপঞ্জি বাদ দিলে প্রবন্ধের সংখ্যা মাত্র সাতটি (একটি প্রতিবাদ/উত্তর গণনা করলে আটটি)। আসলে প্রচারবিমুখ যোগেশচন্দ্র জীবিতকালে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে চাননি। ফলে মৃত্যুর অনতিপরে তিনি বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। তাঁর লেখা অধিকাংশ বই দীর্ঘদিন অমুদ্রিত, ফলে অধুনা দুস্প্রাপ্য। তাঁর গ্রন্থাকারে অসংকলিত প্রবন্ধের সংখ্যা বিপুল, কিন্তু সেগুলি সংকলন ও প্রকাশনের কোনও চেষ্টা হয়নি। যোগেশচন্দ্র বাগলের জন্মশতবর্ষে তাঁর রচনাবলির পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হলে, তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তাঁর রচনার সঙ্গে একালের পাঠকের পরিচয় হওয়া দরকার,—‘ইহা আমাদের পিতৃকৃত্য।’

যোগেশচন্দ্র বাগল : পাঠক ও পঠিত

সুমন ভট্টাচার্য

সমাজ-ইতিহাসের গবেষক যোগেশচন্দ্র, নিজস্ব পাঠদৃষ্টি ও পাঠ-পরিসরকে আবিষ্কার করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত এবং সাহচর্যে। নিজস্ব গবেষণা ও অপরাপর লেখালিখির সমান্তরে তাঁর সনিষ্ঠ পাঠক-পরিচয়কে দেখা যায় *প্রবাসী*-র “পুস্তক-পরিচয়” বিভাগের পৃষ্ঠায়। এই সমালোচনা হয়তো *প্রবাসী* আর *মডার্ন রিভিউ*-এর সম্পাদনাকর্মী, পরে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত যোগেশচন্দ্রের জীবিকার অঙ্গই ছিল—কিন্তু এই জীবিকাও তাঁর স্বধর্মেরই সম্ভার। আর এই সূত্রেই দেখা যায়, পাঠক যোগেশচন্দ্রের পরিচয়। অবশ্য কেবলমাত্র পাঠক নন—পঠিত যোগেশচন্দ্রও একই সঙ্গে দৃষ্ট হন। আর এই পাঠযাত্রা হয়ে ওঠে সেই সময়েরই পাঠকমনের একটি অভিজ্ঞান এবং যোগেশচন্দ্রকে পাঠেরও একটি যাত্রাসূত্র।

এখানে স্মর্তব্য—যোগেশচন্দ্রের ব্যাপ্ত উৎসাহ-পরিসরের একটি অংশে উনিশ শতক, অন্য অংশে জীবনকথা। ১৯৩৫-এ *প্রবাসী*-র থেকে তিনি সংযুক্ত হন দেশ পত্রিকায়, গৌতম নিয়োগী লিখেছেন :

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্র ... ‘দেশ’ সাপ্তাহিক পত্রে কর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঐ কাগজে নিয়মিত ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্ক’ বিষয়ে লিখিতেন।

: যোগেশচন্দ্র বাগল/সাহিত্য-সাধক চরিতমালা/পৃ. ১১

একটি অংশ এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠান আর সভা-সমিতির ইতিবৃত্ত। অপর অংশ শিশু-কিশোর সাহিত্যের পাঠরুচি। *প্রবাসী*-র “পুস্তক পরিচয়” বিভাগে তাঁর এই পাঠরুচির প্রকাশ এবং তাঁর গবেষক-সম্ভার প্রস্তুতিপর্বটিকেও দেখা যায়। যোগেশচন্দ্র *প্রবাসী*-তে সংযুক্ত হয়েছিলেন ১৯২৯-এ। তাঁর প্রথম স্বাক্ষরিত গ্রন্থ-সমালোচনা ১৩৩৮-এর ফাল্গুন অর্ধাৎ ১৯৩২-এ—বিভূতিভূষণ শূপ্তের *কাঠবেড়ালী ভাই* (পৃ. ৬৯৪) এবং তার পরের সংখ্যায় কার্তিকচন্দ্র দাশশূপ্তের *ময়ূরপঙ্খী* (চৈত্র / ১৩৩৮, পৃ. ৮৩৪)। তাঁর মুখ্য অনুরাগ ও প্রবণতাবৃত্তীয় বই-এর প্রথম আলোচনা করেন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯-এ দেশের কথা (পৃ. ২৪২) :

দেশের কথা—মন্মথনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশক—স্বদেশী শিল্প প্রচার সমিতি। ১, মানিকতলা পেন, কলিকাতা।

প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সকল জিনিষের জন্যই পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া এতকাল যেন আমরা মোহাবিষ্টের মত আলোয়ার পিছনে ছুটিয়াছি। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখীন হইয়াছে। আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে তৎপর হওয়ায় ইদানীং নানা কলকারখানার উদ্ভব হইতেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে প্রধানতঃ বঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দেশী কারখানায় প্রস্তুত নীত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রকাশে একটা বিশেষ অভাব দূরীভূত হইল। গ্রন্থখানির ৩৬

পৃষ্ঠায় একটি ভুল নজরে পড়িল। কলিকাতা হর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ঠিকানা—১৮বি আনন্দ পালিত রোড। দেশী ব্যাঙ্ক, ধীমাকোম্পানী প্রভৃতিরও তালিকা দিয়া ইহাকে সর্বাস্বসুন্দর করিবার অবকাশ আছে। গ্রন্থখানির আয় স্বদেশী দ্রব্য প্রচারে ব্যয়িত হইবে। প্রত্যেক নরনারীর কাছে গাইড বহি হিসাবে ইহার এক একখানি থাকা উচিত। প্রবাসী / জ্যৈষ্ঠ/১৩৩৯ ॥ পৃ. ২৪২।

খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে অনেক বিচিত্র বিষয়ের বই-এর রিভিউ করতে হয়েছে। বহু বিষয়ে উৎসাহ থাকলেও, সব বিষয়ে সম-উৎসুক্য না থাকাও স্বাভাবিক। যেমন সুবলচাঁদ চন্দ্রের *সরল যুয়ৎসু শিক্ষা* (আষাঢ়, ১৩৩৯/ পৃ. ৩৮৩) সর্বত্রই তিনি প্রদর্শিত রীতিই অনুসরণ করেছেন—গ্রন্থের সাধারণ পরিচয়, তথ্যগত ভ্রান্তি সংশোধন এবং উপযোগ। উপযোগ বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। দেখা যেতে পারে তাঁর আলোচনা রীতি-র ধারা বা ধারাবাহিকতা। প্রবাসী, ১৩৪৭-এর বৈশাখ সংখ্যায়—

ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ—শ্রীকমলা দেবী এম-এ। শ্রীশঙ্করেন্দ্রনাথ মিত্রের ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৮৫। দামের উল্লেখ নাই।

লেখিকা বঙ্গজননীর দুই জন সুসন্তানের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা-ভঙ্গীও সুন্দর। লেখিকা স্বল্প পরিচয়ের মধ্যেও কেবল উচ্ছ্বাসের প্রশয় দেন নাই, বস্তু লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। তবে এ ক্ষেত্রে দু-একটি ভ্রম নজরে পড়িল। লেখিকা বঙ্কিম প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, খ্রীঃ ১৮৫৭ সালে তিনি ঝাঙ্গী কলেজ হইতে সীনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন।” বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬, এপ্রিল মাসে সীনিয়ার পরীক্ষা পাশ করেন ও দুই বৎসরের জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন, ইহা শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঙ্গী কলেজের নথিপত্র হইতে দেখাইয়াছেন। এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকখানি পাঠক সমাজে আদরলাভ করিবে।

যোগেশচন্দ্র বাগল (পৃ. ২৩০)

এক অনুচ্ছেদের সমালোচনা। কিন্তু তার মধ্যেই তথ্যগত ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করেছেন, সাম্প্রতিক পাঠিত আকরগ্রন্থের পাঠসূত্রে। এখানে যোগেশচন্দ্রের আলোচনারীতির প্রত্যয়ী বহুমানতাকে বোঝা যায়—সংক্ষিপ্ত, উচ্ছ্বাস-বর্জিত, তথ্য-নিরীক্ষ এবং উৎসাহপ্রদ। তবে এই বইটির বিষয়ে জানানো যেতে পারে যে, বইটি “পাঠক-সমাজে আদরলাভ” করেনি—আর কোনো সংস্করণও হয়নি। সেই ভ্রান্ততথ্য বহন করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে “সুরক্ষিত” হয়ে আছে। অবশ্য এই চিত্রও এই দেশের অনুপম “বই-চিত্র”। সেখানে পাঠক এবং আলোচক যোগেশচন্দ্রের কিছু করবার নেই। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করবার যে এই সমালোচনা যখন প্রকাশ পায়, তখন যোগেশচন্দ্র প্রবাসী-র সম্পাদনাকর্মী নন। ফলত, প্রবাসী-তে তাঁর সমালোচনাকে জীবিকা-নিরপেক্ষভাবেই দেখা যেতে পারে।

চারের দশকে বিশ্বযুদ্ধের সংকটপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর *জগৎ কেন পথে* (১৯৪০) আর প্রবাসী-র পৃষ্ঠাতেও সেই জিজ্ঞাসার পাঠ-প্রতিফলন দেখা যায় :

যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র—দিগন্তচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ। পৃ. ১৭৬, মূল্য ১।।০

বর্তমান মহাযুদ্ধ এখন আর নতুন নহে। ইহাতে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং অত্যাধুনিক রণকৌশলের কথা আমরা অহরহ শুনিতে পাই, কিন্তু এ সব সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান খুবই অল্প। যে-সব পুস্তক পাঠে এ সকল জ্ঞানিয়া লওয়া সম্ভব তাহার মধ্যে আলোচ্য পুস্তক একখানি বলিয়া মনে করি।...লেখক প্রতিটি বিষয় অধিকন্তর পরিস্ফুট করিয়া বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।...বহু চিত্র দেওয়ায় জটিল বিষয়গুলিও সহজে বোধগম্য হইবে। (আষাঢ়, ১৩৫০ ॥ পৃ. ২৪৯)

এরপরেই শ্রাবণ, ১৩৫০ সংখ্যায় ও ভাদ্র, ১৩৫০ সংখ্যায় তাঁর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—

‘বর্তমান মহাসমর ও ব্রিটেনের বয়স্কাউট দল’ (পৃ. ৩২৯) ও ‘সমররত ব্রিটেনে অভিনব চিকিৎসা ব্যবস্থা’ (পৃ. ৪০৪)। এরপর, পৌষ-১৩৫০-এ—

ইউরোপ ভ্রমণ (প্রথম খণ্ড)—ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থকার ১৯৩৩ সালে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন। এই পুস্তকখানিতে তিনি মাত্র ইটালী ও ফ্রান্সের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই দুইটি দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি যে-সব আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞাতব্য কথা বহু আছে। বর্তমান মহাসমরে এই দুই দেশের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। এজন্যও ইহাদের কথা পাঠকপাঠিকাদের অধিকতর উপভোগ্য হইবে।

অথবা তার আগে, ১৩৪৯-এও এই মনস্কতা দেখা গেছে :

১. বোমা ও ব্যরিকেড—ধীরেন্দ্রলাল ধর। শ্রীশুর লাইব্রেরী, পাঁচ সিঁকা।

জগতের কোন না কোন স্থানে গত কয়েক বৎসর যাবৎই যুদ্ধ চলিয়াছে। গ্রন্থকার আবিসিনিয়া ও চীন যুদ্ধ (এখনও শেষ হয় নাই) সম্বন্ধে গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি এই সেদিনকার স্পেন-বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া লেখা। স্পেনের সমাজতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের সমর্থক বহু বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক ও সাংবাদিক ঐ সময় স্পেনে যায় ও নানাভাবে স্পেনকে সাহায্য করে। এমন কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও সাংবাদিক লেখকের এই যুদ্ধ-উপন্যাসে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতীয় সূত্রত, কশ আতিয়ানা, স্পেনিশ পোর্সিয়া প্রভৃতির চরিত্র বেশ পরিম্পূর্ণ। সূত্রত ও পোর্সিয়া প্রীতিবন্ধনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল ও একখানে আশ্রিতবাহী জাহাজে উভয়ে স্পেন ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু যে নৌকায় চড়িয়া জাহাজে উঠিতে হয় সেই নৌকা হইতে পোর্সিয়া স্বদেশীয়দের দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ করিয়া তাহা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সূত্রত হতভম্বের মত তাকাইয়া রহিল। পোর্সিয়ার স্বদেশপ্রেম প্রশংসার বটে কিন্তু কাহিনীর এইরূপ নাটকীয় পরিসমাপ্তিতে যেন ইহার অনেকখানি হানি ঘটিয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ ঝরঝরে। (পৃ. ৩২৩)

২. বর্তমান জাপান—দিগিম্ভচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

...পুস্তকখানির নাম বর্তমান জাপান হইলেও জাপানের পুরাতন ইতিবৃত্তের কথাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। জাপানের সম্রাটপরিবার ও তাঁহাদের কার্যকলাপ, ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে চীনের নিকট জাপানের ঋণ, খ্রীষ্টপ্রচারকদের প্রতি সন্দেহদৃষ্টি, ... পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রতি জাপানীদের আগ্রহ, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া জাপানের পররাজ্যগ্রহণের লোভ, চীনের উপর জাপানীদের আক্রোশ প্রভৃতি নানা বিষয় লেখক সম্বন্ধে ইহাতে বিবৃতকরিয়াছেন। ... জাপানের সাম্রাজ্যক্ষুধা ও বর্তমান যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্বন্ধে জাপানীদের লেখা পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া তিনি পাঠকের বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন।— (আশ্বিন/পৃ. ৬৩২)

যোগেশচন্দ্র তেমন কোনো বিস্তৃত আলোচনায় যাননি—বলা যায়, “পুস্তক-পরিচয়”—এই সীমিত থেকেছেন। কিন্তু তারও মধ্যে তিনি যেন একটু বেশি মনোযোগী বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থ, বার্ষিকী এবং ছোটোদের বই বিষয়ে। বস্তুত এখান থেকেই যোগেশচন্দ্র বাগলকে তাঁর পাঠক আর গবেষক-পরিচয়ের যুথযাত্রায় চেনা যায়। তিনি মানতেন, নথিপত্র-দলিল-পুস্তিকা-প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণির ঐতিহাসিক মূল্য। আরো বেশিরকম জানতেন বাংলার সমাজচিত্রে গ্রন্থ সংগ্রহ আর গ্রন্থ-সংরক্ষণের উদাসীনতার তথ্য। তাই তিনি বারংবার আলোচনা করেন, হয়তো, সমালোচনার জন্য নির্বাচনও করে নেন—*কেলিস ডিরেক্টরী-১৯৩৫*, *বর্ষদীপিতা-১৩৫৭*, বা শিশিরকুমার আচার্যচৌধুরীর *বাংলা বর্ষলিপির* মতো বই অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বার্ষিকী *সুপর্ণা* :

১. সুপর্ণা-চতুর্থ সংখ্যা ১৩৪৮-৪৯। সম্পাদিকা শ্রীশান্তি বসু

‘সুপর্ণা’ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বার্ষিকী। ১৩৪৮-৪৯ সালের অন্যতম প্রধান ঘটনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমন। পাঁচটি কাব্যে [য.] রবীন্দ্রকাব্য ও জীবনের বিভিন্ন দিক চারিজন লেখিকা ও একজন লেখক আলোচনা করিয়াছেন। ‘রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের রাজনীতি’, ‘রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা’, ‘শিশুমন ও রবীন্দ্র বর্ষাকাব্য’, ‘পুরস্কার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ’, ‘পঞ্চভূতের সভায় রবীন্দ্রনাথ’—কবিবরের জীবন ও কাব্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করে। ইহা ছাড়া বহু ছাত্রী ও খ্যাতনামা লেখকের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। (ভাদ্র, ১৩৪৯/পৃ. ৫৩০)

২. বার্ষিক শিশুসাধী—ডক্টর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরি এনং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। এক টাকা বার আনা।

বঙ্গদেশের প্রখ্যাতনামা লেখকদের রচনাসম্ভারে ইহা পূর্ণ। শিশুমনের উপযোগী গল্প, প্রবন্ধ, নক্সা, প্রহসন, কবিতা প্রভৃতি ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে।—ইদানীং শিশু-সাহিত্যের কতকটা মোড় ফিরিয়াছে। আজগুবি গল্প, ভূয়ো-আডভেঞ্চার প্রভৃতিতে কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের এখন আর তেমন মন বসিতেছে না। তাহাদের বিবিধ বিষয় জানিবার ইচ্ছা বর্ধিত হইয়াছে। এই জ্ঞানসম্পূর্ণ চরিতার্থ করিবার জন্য লেখক গোষ্ঠীও যে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছেন তাহা বড়ই আশার কথা। আলোচ্য বার্ষিকীখানির প্রবন্ধের বৈচিত্র্য পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, শিল্পতত্ত্ব, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাগৈতিহ্য, জীবনী, খাদ্যতত্ত্ব, যুদ্ধবিদ্যা, ম্যাজিক প্রভৃতি বহু এবং বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ বার্ষিকীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (কার্তিক, ১৩৪৮/পৃ. ১৩৪)

এখানে সমকালীন পাঠক তাঁর প্রয়োজনের তথ্য পেলোও, ভবিষ্যতের পাঠক কিন্তু পান না। সুপর্ণা বার্ষিকী প্রকাশিত হয়েছিল, এইটুকুই জানা গেল, কিন্তু তখনকার সেই লেখিকাদের নাম জানা গেল না, অজ্ঞাতই থাকল কোন কোন খ্যাতনামা লেখকের লেখা নেওয়া হয়েছিল। অথবা বার্ষিক শিশুসাধীর সে-বছরে কারা তার লেখক ছিলেন! তবু বার্ষিক শিশুসাধীর ক্ষেত্রে তাঁর শিশুসাহিত্যের পাঠকমনটি বোঝা যায়— তিনি উপযোগতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং গল্প-উপন্যাসের তুলনায় এক্ষেত্রেও, যাতে জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রগঠন হয়, সেরকম বই-এর প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল অধিকতর। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি দিয়ে এরকম প্রবণতার প্রতি পণ্ডিতের “শঙ্কং কাষ্ঠং” দৃষ্টির স্বাভাবিকতা বলে থেমে যাওয়া যায় না। কারণ—সময়টি প্রথমত, পরাধীন ভারত; দ্বিতীয়ত, বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়। কাজেই যদি অভিভাবকত্বের প্রবণতা একটু মাত্রা ছাড়ায়, তা কঠোর বোধ হতে পারে, কিন্তু তার সহৃদয়তাকেও পাঠ করা সম্ভব।

পাঠক যোগেশচন্দ্রের সমান্তরালে এই পর্বে পঠিত যোগেশচন্দ্রকেও দেখা যেতে পারে।
জ্যৈষ্ঠ/১৩৫০-এ :

বীরত্বের রাজটিকা—যোগেশচন্দ্র বাগল।। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স. ১২ নং নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা। পৃ. ৮ + ২১০। দেড় টাকা

ইতিপূর্বে যোগেশবাবু বাংলার কিশোর-কিশোরীদের ‘সাহসীর জয়যাত্রা’র গল্প গুনিয়েছেন এবং ‘জগৎ কোন পথে’ চলেছে দেখিয়ে দিয়েছেন। এবার শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন পুণ্যপ্রসঙ্গ বীর নারীগণকে, যুদ্ধক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে যারা বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

দশজন মহিমময়ী নারীর কথা এ বইয়ে সুন্দর করে বলা হয়েছে। প্রথম গল্প ‘চরম সহিষ্ণুতা’—রাবেয়ার পবিত্র জীবনকথা। তারপর ‘নৈরাশ্যে আশা’—জোয়ান অব আর্কের বীরত্ব কাহিনী। অতঃপর অঙ্কিত হয়েছে রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, রাণী অহল্যাবাই, রাণী ভবানী এবং রাণী লক্ষ্মীবাই...। এ যুগের নারী গৌরবের দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখক বর্ণনা করেছেন মাদাম চিয়াং কাইশেক, কম্বরবাই গান্ধী ও সরোজিনী নাইডুর জীবন...।

জাতীয় জাগরণের দিনে এই রকমের আদর্শ দেশের তরুণ মনে মুদ্রিত করে দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যোগেশবাবু এ কার্যে উৎসাহী ও নিপুণ। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে গল্প বলার সহজ মনোরম ভঙ্গী মিলিত হয়ে তাঁর রচনাকে করে তুলেছে একাধারে শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক।

সমালোচক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রবাসী-র পৃষ্ঠায় পাঠক যোগেশচন্দ্রের তুলনায় পাঠিত যোগেশচন্দ্র কি বেশি মনোযোগ সমৃদ্ধ? তা-কি তৎকালীন সম্পাদনাকর্মী যোগেশচন্দ্রের প্রতি লেখকের আনুগত্য? শনিবারের চিঠি-র শ্লিষ্ট কৌতুকরীতি-কে মান্য করলে সে সন্দেহ থাকে। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের নিশ্চয়ই তেমন দায় নেই— তিনি যোগেশচন্দ্রের বিদ্রোহ ও বৈরিতা (১৩৫৬)-র সবিস্তার আলোচনা করেছেন ১৩৫৬-র অগ্রহায়ণ, প্রবাসীতে :

প্যাকস-ব্রিটানিকা অর্থাৎ শান্তির যুগ আনয়নই ইংরেজ রাজত্বের বিশেষত্ব কেবলমাত্র সিপাহী বিদ্রোহই ইহার ব্যতিক্রম—সাধারণের মধ্যে এই ধারণাই প্রচলিত। কিন্তু ইহা যে পুরাপুরি সত্য নহে গ্রহকার তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীরা “যুগে যুগে শাসক ও শোষক ইংরেজের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে।”...

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ সম্রাসীবিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষিত বাঙালী মাঝেই এই ঘটনার সহিত পরিচিত। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বহুল পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার বর্ণিত বিদ্রোহ প্রকৃত বিদ্রোহ হইতে সম্পূর্ণ [য] বিভিন্ন। ... গ্রহকারের মতে ব্রিটিশ কর্মচারী দ্বারা উৎপীড়িত হইবার ফলেই সাধারণ লোকেরা সম্রাসীদলের কার্যকলাপের মধ্যে মুক্তির আশা পোষণ করিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে।...

গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে সুবিদিত আলোচনা নিম্নয়োজন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহিঃস্থায়িত হইয়া কিরূপে দাবানলে পরিণত হইল গ্রহকার তাহার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়াছেন।... ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যিক।

মোটের উপর গ্রন্থস্থানিতে ব্রিটিশ-যুগের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। দু-একটি ভ্রমের প্রতি গ্রহকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ২৯ পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তিতে ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিবর্তে মার্কুইস অব হেস্টিংস হইবে। ১১৯ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তিতে ১৮৫৬-৭ এর পরিবর্তে ১৮৫৫-৬ হইবে। (পৃ. ১৮৭-৯)

রমেশচন্দ্রের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ। একই সঙ্গে বাংলায় জনশিক্ষার আলোচনা প্রকাশ পায় মাঘ ১৩৫৬-য় :

এই ছোট বইখানি বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থরাজির অন্যতম। ইহাতে বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রধানতঃ বেসরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার মূল তথ্যগুলি সমসাময়িক প্রমাণাদির সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় আলোচনায় গ্রহকার ইহার বার্ষিক কার্যবিবরণসমূহের অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি বিশেষ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে স্বল্প-পরিসরে এরূপ বিশদ আলোচনা সম্ভবতঃ এই প্রথম করা হইয়াছে, এবং ইহা শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।... তৎকালীন বাংলা গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্ট জনশিক্ষার প্রসারে অবহিত ছিলেন না।...

এইরূপ অনেক পুরাতন তথ্য যোগেশবাবুর বইখানিতে আছে। ইহা পড়িয়া দেখিলে অনেকেই শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। (পৃ. ৩৭৮)

আলোচনা করেছেন জিতেন্দ্রমোহন সেন। প্রবাসীর বাইরেও দেখা যেতে পারে যোগেশচন্দ্রের পাঠিত পরিচয়। বিশ্বভারতী পত্রিকা-র শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২ সংখ্যায়, তাঁর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, বাংলার নবজাগরণের কথা ও সম্পাদিত বই প্যারীচাঁদ মিত্রের রামকমল সেন বিষয়ে

আলোচনা করেন দেবীপদ ভট্টাচার্য। তিনিও এখানে যোগেশচন্দ্রের রীতিকে সাধুবাদ জানালেও তাঁর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেননি :

- ১ তথ্যনিষ্ঠ অর্থাৎ Factual বা informative চরিত্রপ্রবন্ধ রচনা যত বেশি হয় আমাদের সাহিত্যের ততই মঙ্গল। কেন না, আমাদের সাহিত্যে তার অভাব এখনো রয়েছে। ... যোগেশবাবু এই ধরনের Objective চরিত্রচিত্র রচনার বিশেষ পক্ষপাতী।
- ২ তবে তিনি renaissance কে স্বীকার করেছেন কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে যে revivalistic tendency বা 'পুনরুত্থানবাদী প্রবণতা' দেখা দিয়েছিল তাকে অস্বীকার করেছেন। ... এ কথাও বলা দরকার যে ভিকটোরীয় যুগসুলভ সমাজসংস্কার আর রেনেসাঁস সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার।
- ৩ লেখক বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে নবজাগরণের আলোক কেন বিচ্ছুরিত হয় নি তার ঐতিহাসিক আলোচনা সংক্ষেপে করেছেন

। সে-আলোচনা আরো তথ্যমণ্ডিত এবং বিচারনিষ্ঠ হলে ভালো হত। (পৃ. ৬৬-৯)

এখানেও সমালোচনা, তার অভিপ্রায়কে ধারণ করে আছে। যোগেশচন্দ্র যে মনোযোগে পাঠ করেছেন, পঠিতও হয়েছেন সমরূপ মনস্কতায়। তাঁর তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যস্থাপনা বিষয়ে পাঠকের অনুযোগ ও প্রত্যাশার ব্যাপ্তিই তাঁর নিষ্ঠাকে চেনায়—রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর মৃত্যুর পরে যে কথা লেখেন—

তিনি...যুক্তি সহকারে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করিতেন এবং ভাবাবেশে গতানুগতিক পথের অনুসরণ করিতেন না...। যোগেশচন্দ্রের ভুল ভ্রান্তি হয় নাই এমন কথা বলি না—এরূপ ভুল-ভ্রান্তি হয় নাই, এমন কোন ঐতিহাসিকের সংবাদও জানি না।

যোগেশচন্দ্র বাগল / সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা ॥ পৃ. ২

তা যথার্থ। তিনি যে-ভাবে তথ্যসন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, উত্তরকালের পাঠক-গবেষক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, যোগেশচন্দ্র তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে কোনোরকম ছুঁমার্গ রাখেন নি—১৩৫৭-র প্রবাসী-তে তিনি বেধুন বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থের জন্য পাঠকের কাছেই তথ্য আহ্বান করেছেন (পৃ. ১৯২)। আবার সহযাত্রী সুহৃৎ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছেও লিখেছেন :

গোপাল দা

বিশেষ প্রয়োজনে আপনার শরণ লইতেছি। এক এক করিয়া লিখি :—

- ১। আপনি এবং আর কোন কোন গবেষকের গবেষণা বিদেশে বিজ্ঞান-সম্পৃক্ত পত্রিকায় বা জর্নালে ছাপা হইয়াছে? প্রধানদের নাম দিলেই চলিবে।
- ২। প্রধান প্রধান বিদেশী জর্নালগুলির নাম দিয়া বাংলায় লিখিয়া দি [কেন।] (যদি সম্ভব হয়)।
- ৩। কাহার কাহার গবেষণা কোন কোন দেশীবিদেশী বিজ্ঞান-সোসাইটিতে সমাদৃত হইয়াছে তাহাদের নাম।
- ৪। আমি বসু-বিজ্ঞান-মন্দির সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বাসনা করি। এইজন্য...সত্বর উত্তরপ্রার্থী।
- ৫। আপনার দর্শন প্রার্থী।

ইতি

বশব্দ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রবাসী কার্যালয়

১২০১২, আপার সার্কুলার রোড.

কলিকাতা—৯

তারিখ:

স্মারক :—বড়বাজার ৩২৮১

22-6-০২

সেখানে-২৪,

জি.এ. প্রিন্টার্স অফিসে
 ১২/৬, ১২৬ নম্বর রাস্তা:—

১। প্রথম ১০ নম্বর (১২/৬) ১২৬ নম্বর
 ২। প্রথম ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ৩। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ৪। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর

৫। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ৬। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ৭। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ৮। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর

৯। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ১০। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ১১। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর
 ১২। ১২/৬ ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর ১২৬ নম্বর

১৩-
 ১৪-
 ১৫-
 ১৬-
 ১৭-
 ১৮-
 ১৯-
 ২০-
 ২১-
 ২২-
 ২৩-
 ২৪-
 ২৫-
 ২৬-
 ২৭-
 ২৮-
 ২৯-
 ৩০-
 ৩১-
 ৩২-
 ৩৩-
 ৩৪-
 ৩৫-
 ৩৬-
 ৩৭-
 ৩৮-
 ৩৯-
 ৪০-
 ৪১-
 ৪২-
 ৪৩-
 ৪৪-
 ৪৫-
 ৪৬-
 ৪৭-
 ৪৮-
 ৪৯-
 ৫০-
 ৫১-
 ৫২-
 ৫৩-
 ৫৪-
 ৫৫-
 ৫৬-
 ৫৭-
 ৫৮-
 ৫৯-
 ৬০-
 ৬১-
 ৬২-
 ৬৩-
 ৬৪-
 ৬৫-
 ৬৬-
 ৬৭-
 ৬৮-
 ৬৯-
 ৭০-
 ৭১-
 ৭২-
 ৭৩-
 ৭৪-
 ৭৫-
 ৭৬-
 ৭৭-
 ৭৮-
 ৭৯-
 ৮০-
 ৮১-
 ৮২-
 ৮৩-
 ৮৪-
 ৮৫-
 ৮৬-
 ৮৭-
 ৮৮-
 ৮৯-
 ৯০-
 ৯১-
 ৯২-
 ৯৩-
 ৯৪-
 ৯৫-
 ৯৬-
 ৯৭-
 ৯৮-
 ৯৯-
 ১০০-

এই চিঠি ১৯৫২ সালের। ১৯৫৯-এ প্রকাশিত তাঁর *কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র*-র শেষপ্রবন্ধ ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’। আর ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থসম দীর্ঘ ভূমিকা-নিবন্ধ ‘History of the Bethune School and College (1849-1949)’ (পৃ. ১-১২৫)-সমৃদ্ধ *Bethune College and School (1849-1949) Centenary Volume* নামক গ্রন্থ। আর পঠিত যোগেশচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া, দেখা যায় জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা*-র ২য় বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যায়, ডেভিড কফ-এর “ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিজম অ্যাণ্ড দি বেঙ্গল রেনাসেন্স : দি ডাইনামিকস অব ইণ্ডিয়ান মডার্নাইজেশন ১৭৭৩-১৮৩৫”-এর একটি সমালোচনা-নিবন্ধ লেখেন সুবীর রায়চৌধুরী (‘আমদানি করা অভিনব জাগরণ’/পৃ. ৩৩-৪৮ ও ৬৭-৭৭)—তার পরে যোগেশচন্দ্র একটি চিঠি লেখেন *কলকাতা* পত্রিকার ২য় বর্ষ, ১০-১১ সংখ্যা, ৩০ মার্চ, ১৯৭১ (পৃ. ৯৬)।

রাধাকান্ত প্রমুখের প্রতি সুবিচার

কল্যাণীয়েষু, সুবীর

আজ তোমাকে একটি বিশেষ কারণে এই পত্র লিখি। ‘কলকাতা’ পত্রে তোমার সমালোচনাটি শুনলাম [য.]। শুনিয়া বড়োই মুগ্ধ হইয়াছি। ...মার্কিনিদের লিখিবার ধরন-ধারণ ভূমি বুঝিয়া লইয়াছো। প্রথমে কিছু ঠিক করা পরে তাহার প্রমাণাদি উত্থাপন করা—এই-ই নাকি মার্কিনি নীতি। আমি সাধারণভাবে লিখেতেছি [য], ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। বন্ধ-নিষিদ্ধ এবং বিস্তার-অবজ্ঞাত রাধাকান্ত দেব এবং রাধাকমল সেন সম্বন্ধে কিছু খাঁটি কথা পাইলাম। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম লেখকগণ এবং তাঁহাদের অনুকায়ীরা তো ইহাদিকো প্রায় নস্যং করিয়াই দিয়াছেন। তোমার ‘ম্যাক্স’ পড়াইয়া নেই [য.]। আমার ভুলটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভালোই করিয়াছো।...

ইতি শুভার্থী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নব ব্যারাকপুর

ঋষি বঙ্কিম রোড

২৪ পরগণা

১৯৭২-এই প্রয়াত হয়েছেন যোগেশচন্দ্র। দৃষ্টিলোপের কারণে তাঁর পড়াশোনা, আক্ষরিকভাবেই দ্বিতীয়াংশ আশ্রিত, চিঠিটিও স্পষ্টতই নিজের হাতে লেখা নয়, তখনও তাঁর পাঠবৃত্তি প্রখর এবং স-তর্ক। অনুজ গবেষকের কাছেও ভ্রান্তিনির্দেশের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থান থেকেই যোগেশচন্দ্রের যাবতীয় রচনা বারংবার পাঠের পরম্পরা দাবি করে।

কেবলমাত্র *প্রবাসী* নয়, অপরাপর সমকালীন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়, যে পাঠক যোগেশচন্দ্র এবং পঠিত যোগেশচন্দ্র এবং পঠিত যোগেশচন্দ্রের পাঠক যোগেশচন্দ্র, পঠিত হওয়ার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান তার সানুপস্থ ও সবিল্লেশ পাঠ ও পুনঃপাঠ একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র যোগেশচন্দ্রের পাঠের জন্য নয়—সময় ও সমকালকেও ইতিহাস আর ভবিষ্যতের যুগতায় পাঠের জন্য।

কৃতজ্ঞতা : ব্যক্তিগত বই দিয়ে সহায়তা করেছেন শ্রীঅরুণ দে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লেখা যোগেশচন্দ্র বাগলের পত্র শ্রীসুবীর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শতবর্ষে বাংলা ছোটোগল্পের দুই শিল্পী

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ছোটোগল্পই হলো আধুনিকতার বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ। বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প লেখা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার আগে ছোটো উপন্যাস ছিল, কিন্তু ছোটোগল্প ছিল না। কাকে যথার্থ ছোটোগল্প বলে এ নিয়ে দেশি-বিদেশি অনেক সমালোচক ও অনেক ছোটোগল্পকার অনেক ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়েছেন, আজকে সেসবের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

আজকে আমরা বাংলা ছোটোগল্পের কয়েকটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নিয়ে দু-চার কথা বলব। কথায় বলে, আগুন নিয়ে শত শত ভাষণ দেওয়ার বদলে একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিলে আগুন কাকে বলে তা বেশি ভালো বোঝানো হয়। তেমনইভাবে ছোটোগল্প সম্বন্ধে অনেক কথা বলার চেয়ে বাংলা ছোটোগল্পের দুই প্রধান শিল্পীর ছোটোগল্প নিয়ে কিছু বললেই বোধহয় বাংলা ছোটোগল্পের মান ও মূল্য বেশি বোঝা যাবে বলে আমার ধারণা। এই দুই ছোটোগল্পের শিল্পী হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আমার বিচারে এঁরা দুজনেই ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পের শিল্পী। শিল্পী কথটির উপর জোর দিতে চাই।

দুজনেই একই শিক্ষাসত্র সাউথ সুবার্বন স্কুলের ছাত্র এবং একই শিক্ষকের উৎসাহে উদ্দীপ্ত। দুজনে একই বছরে অঙ্কে ও বাংলায় লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। দুজনেরই সাহিত্য সাধনা শুরু হয় কবিতা লিখে। দুজনেরই খ্যাতির সূচনা হয় *প্রবাসী* মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখে। প্রেমেন্দ্রের গল্পটির নাম ‘শুধু কেরাণি’ আর অচিন্ত্যকুমারের গল্পটির নাম ‘দুইবার রাজা’। দুটি গল্পেরই নায়ক বয়সে নবীন, একই কালভূমির একই যুগলক্ষণে অঙ্কিত। ‘শুধু কেরাণি’ শুরুই হয়েছে বেনামা নায়কের বিয়ের ঘটনা থেকে এবং শেষ হয়েছে তার জীবনের কেন্দ্রীয় চরিত্র, তার প্রেমের আশ্রয়-স্বরূপ চরিত্রটির মৃত্যুতে। গল্পটি শুরু হয়েছে পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়ে আর শেষ হয়েছে পাখিদের নীড়-ভাঙার উল্লেখে। পক্ষান্তরে ‘দুইবার রাজা’তে প্রথমেই বলা হয়েছে উঠোনে বাজে পোড়া ঠুটো তালগাছটার কথা এবং সব শেষে আজকের সূর্যের অস্ত যাওয়ার কথা। নাম যার অমর, যে গোড়া থেকেই মৃত্যুপথযাত্রী, সে-ও তার ব্যর্থ জীবনে দুবার রাজার মতো সবার মনোযোগের বিষয় হল। একবার বিয়ের বর হয়ে, আর একবার পথ-দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে। দুটি গল্পই প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির ফ্রেমে নিবদ্ধ এবং শুই দৃশ্যগুলি শুধু গল্পের অলঙ্কার নয়, গল্পের ব্যঞ্জনও বটে। দুটি গল্পেরই নায়ক আর্থিক সংকটে জর্জরিত বিংশ শতাব্দীর বিশেষ দশকের দ্বিতীয়ার্ধের দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত যৌবনের প্রতীক। সেই যুগের যন্ত্রণা যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পুন্মাম’, ‘ভবিষ্যতের ভার’ প্রভৃতি গল্পে প্রকাশ পেয়েছে তেমনই অচিন্ত্যকুমারের ‘গুমোট’ ‘অরণ্য’ প্রভৃতি গল্পেও অনবদ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

‘পুন্মাম’ গল্পে এক প্রকারের আশা পূরণ হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ন্যায়বোধের বিসর্জন

এবং ঔচিত্যের উর্ধ্বে বাস্তবের পরাক্রম জন্ম দেয় এক বিপন্ন বিস্ময়ের। আপন কালভূমি সম্বন্ধে এই উপলব্ধি থেকে প্রেমেন্দ্র ‘একটি রাত্রি’ গল্পটির শুরু করেন এইভাবে, ‘বিংশ শতাব্দীর এই অবিশ্বাস, সংশয় ও হতাশার যুগে একটি পতিত অভিশপ্ত আত্মার উদ্ধারের কাহিনী বলতে যাচ্ছি শুনলে অনেকের নাসা কুঞ্চিত, অনেকের চোখ সকৌতুক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে জানি। কিন্তু সত্যই সূত্রের জীবনে এমনি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এ যুগে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।’ উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু বিগত শতকের বিশ-ত্রিশ দশকের সঙ্ক্ষিপ্ত প্রেমেন্দ্র যেভাবে বাঙালি নাগরিক মধ্যবিস্তার অস্তিত্বের স্বরূপ অনুভব করেছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য এই স্বল্পপঠিত গল্পটির প্রস্তাবনা আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। এসব গল্পের পাশাপাশি যদি অচিন্ত্যকুমারের ‘গুমোট’ কিংবা ‘অরণ্যের’ মতো গল্প পড়ি তাহলে দেখব সেখানেও নাগরিক নিম্নমধ্যবিস্তার জীবনের অভাব-অনটনের থেকে উদ্ভূত ভুল বোঝাবুঝির গুমোট অথবা আপন আপন স্বার্থের অরণ্যে উদ্ভ্রান্ত সমাজের ছবি যেখানে অরণ্যের পরিবেশ শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় দুর্ঘটনায় সবার প্রিয় বালকের মৃত্যুতে। এই পর্যায়ের আর-একটি গল্প ‘ইতি’ যেখানে নিষিদ্ধপন্থির সরলা শহরে আসা থিয়েটার পার্টিতে নায়িকা হবার সম্ভাবনায় এক নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তবে যা ঘটবে বলে আশা করেছিল তা নেশাগ্রস্ত অটলবাবুর লাথি-জুতার চোটে ভেঙে যায়, তবু ঘুমের মধ্যে ভোরের স্বপ্নে তার কাছে আসে তার থিয়েটারের নায়ক রাজপুত্র বেশে।

দুই

বলা যেতে পারে, এখান থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্পের ধারা আর অচিন্ত্যকুমারের ছোটোগল্পের ধারা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাভাবিক প্রবাহিত হতে থাকে। প্রেমেন্দ্রের ছোটোগল্প নিয়ে একাধিক স্থানে আলোচনা করেছি। সেগুলি থেকে অন্যভাবে বলি, ব্যস্তির আপন প্রত্যক্ষ চরিত্রের ভেতরেই তার নিজের না-জানা না-চেনা যে চরিত্র থাকে অথবা আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের গভীরে যে-ঘটনা আত্মগোপন করে থাকে সেই চরিত্র এবং সেই ঘটনাকেই প্রেমেন্দ্র অন্বেষণ করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে। পক্ষান্তরে অচিন্ত্যকুমার চাকরির সুবাদে বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরের ও মহকুমা শহরের অভিজ্ঞতা অর্জন করে বেড়ান এবং এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন শ্রেণি, বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে তাঁর সরাসরি পরিচয় হয়। প্রেমেন্দ্রের অভিনিবেশ ব্যস্তির গভীরে নিহিত রহস্যের উন্মোচনে আর অচিন্ত্যকুমারের আগ্রহ সমষ্টির বিচিত্র বিস্তারকে বিশ্লেষণ করার দিকে।

উদাহরণ দিলে বক্তব্যটা বোঝা সহজ হবে। প্রেমেন্দ্রের বিখ্যাত গল্প ‘সাগর সঙ্গমে’র কেন্দ্রীয় চরিত্র দাক্ষায়ণীকে গল্পের প্রথমাংশে একজন আচারনিষ্ঠ সংস্কারাচ্ছন্ন রুক্ষ স্বভাবের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু গল্পের প্রথমাংশ জুড়ে তাঁর যে পরিচয়কে একটু একটু করে লেখক আমাদের চোখের সামনে গড়ে তোলেন তা নৌকাডুবির পরের ঘটনাবলির ভেতর দিয়ে রূপান্তরিত হতে থাকে। তারপর গল্পের শেষে এসে দেখি, দাক্ষায়ণীর সম্পূর্ণ অন্য রূপ। দাক্ষায়ণীর এই নতুন রূপটার প্রকাশ কি আকস্মিক? গল্পটা যদি আবার পড়ি তাহলে দেখব কীভাবে আস্তে আস্তে, সহজে চোখে পড়ে না এমনভাবে, অবিশ্বাস্য এক পরিণতির জন্য লেখক প্রস্তুতি নির্মাণ করেছেন। সকলের চেনা দাক্ষায়ণী চরিত্রের গহনে যে এক অচেনা দাক্ষায়ণীর, এমন কী তাঁর

নিজেরও অচেনা এক দাঙ্কায়গীর অস্তিত্ব ছিল এই সত্যটাকে লেখক অমোঘভাবে প্রকাশ করেছেন। নানাবিধ কারণে মানুষ তার প্রকৃত পরিচয়ের ওপরে কঠোরতা কি গাভীর্য কি দূরত্বের আবরণ টেনে রাখে। তেমনই ‘ভূমিকম্প’ গল্পে শশাঙ্ক যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে মালতীকে প্রথম স্ত্রীর ছবি দেখিয়ে বলেছিল, এঁর সম্মান যেন বরাবর এ বাড়িতে অক্ষুণ্ণ থাকে—তখনই মালতী দূরে চলে গেছিল শশাঙ্কের কাছ থেকে। ওই কথাটা বলার তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। এরপর দুজনের প্রেমপূর্ণ আচরণ বা দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতা শশাঙ্কের মৃত্যু পত্নীর প্রতি অসম্মানকর হত নাকি? কিন্তু ভূমিকম্পের ভয়ঙ্কর মুহূর্তে মালতী ক্ষণিকের জন্য শশাঙ্ককে জড়িয়ে ধরে। ভূমিকম্প সেই কয়েকটা মুহূর্তের জন্য মালতীর গাভীর্য ও দূরত্বের আবরণটাকে টেনে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু ভূমিকম্পটা ধেমে যাওয়ার পরেই মালতী আবার তার আবরণটা টেনে নিয়েছিল নিজের ওপরে, বোধকরি, আত্মসচেতন হয়েই। এখানে মালতী সচেতনভাবেই, নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল একটা কৃত্রিম পরিচয় দিয়ে।

এবার তাঁর বহুপঠিত গল্প ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ আবার পড়া যাক। মন দিয়ে পড়লে পরিষ্কার হয় যে এই গল্পের যিনি লেখক তিনিই গল্পটির নায়ক, কিন্তু এমন সুকৌশলে এখানে আমি-পক্ষকে ব্যবহার করা হয়েছে যে লেখককে ভালো করে নায়ক বলে চেনা যায় না, এবং খুব গভীরভাবে গল্পটি পড়লে মনে হবে লেখক এখানে শুধু নায়ক নন, লেখকই এ-গল্পের পাঠক অর্থাৎ একই ব্যক্তির মধ্যে লেখক, নায়ক ও পাঠক এই তিনটে পরিচয় মিশে আছে। এবার দেখা যাক এই তিনটে পরিচয়ের সমন্বিত চরিত্র এই গল্পে কী করছে। একটা বিচিত্র পরিস্থিতিতে মানবিক আবেগে আত্মতৃপ্ত হয়ে সে নিজের ওপরে আরও একটা পরিচয় আরোপ করে। তার মানবিক অসাধারণত্বে আমরাও অভিভূত হই। কিন্তু গল্প শেষ করে আমরা বুঝতে পারি, যেমন ‘একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে’, তেমনই এ গল্পের লেখক-নায়ক-পাঠক চরিত্রটি ক্ষণিকের জন্য অসাধারণত্বে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আবার মিলিয়ে যাবে সাধারণত্বে।

উল্লিখিত তিনটে গল্পেই এক চরিত্রের ভূমিতল থেকে আর এক চরিত্রের উত্থান হয়েছে—‘সাগর সঙ্গমে’ দাঙ্কায়গীর সাধারণত্ব থেকে অসাধারণত্ব, ‘ভূমিকম্প’ মালতীর অসাধারণত্বে চিড় ধরেছে ভূমিকম্পের আঘাতে, সেই ফাটল দিয়ে সাধারণত্বে মগ্নিত মালতী বেরিয়ে এসেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য, কিন্তু ভূমিকম্প ধেমে যেতেই মালতীর সাধারণত্ব ফিরে গেছে ফাটল পথে, শশাঙ্কের জীবনকে আবার গ্রাস করেছে মালতীর অসাধারণত্ব এবং ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’-এ গভীর অবক্ষয় থেকে ক্ষণিকের জন্য অসাধারণত্ব সদ্যজাত জ্যোতিষ্কের মতো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আবার ডুবে গেছে সাধারণত্বের অতল অন্ধকারে।

আবার ‘হয়ত’, ‘কুয়াশায়’ অথবা ‘সংসার সীমান্তে’ প্রভৃতি গল্পে দেখি, শুরুতেই লেখক গল্পের পরিণামটা সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দিচ্ছেন এবং আমরা গল্প পড়া শেষ করে কী পাব তা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। শুরুতেই শেষ সম্বন্ধে একটা ধারণা দিয়ে লেখক গল্পের উৎসমুখ থেকে যাত্রা শুরু করে ঘটনার পর ঘটনায় দুলতে দুলতে পরিণতির অভিমুখে এগিয়ে চলে। যতই এগিয়ে চলে ততই আমরা দেখি, গল্পের বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন ঘটনা অপেক্ষা করে আছে। কেমন করে ঘটনার পর ঘটনার পর্দা সরিয়ে সরিয়ে আমরা অস্তিত্বের শোচনীয় সত্যে গিয়ে পৌঁছই তা নিয়েই গল্পের বিস্ময়কর শিল্পিত বিন্যাস। প্রকৃতপক্ষে চরিত্র বা ঘটনার এই শিল্পিত বিন্যাসটাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বিষয়বস্তু।

তিন

এবার অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে কিছু সন্ধান-কর্ম করা যাক। ১৯৩০ পর্যন্ত অনিশ্চিত জীবিকার জন্য তাঁর সাহিত্যবোধে এক প্রকার নৈরাশ্যের প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৩১ সালে অস্থায়ী মুনসেফের চাকরি নিয়ে বহরমপুরে যান এবং কিছুদিন মুর্শিদাবাদের গঙ্গার তীরে বাস করেন। তাঁর এই গঙ্গাতীরে বাসের অভিজ্ঞতা থেকে লেখেন ‘রুদ্রের আবির্ভাব’ গল্পটি, যেখানে প্রকৃতির প্রচণ্ড দাপটে মানুষের বিরাট কীর্তিও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিচ্ছেদ ঘটে গেল অচিন্ত্যকুমারের বেকার জীবনের সঙ্গে চাকরি জীবনের। এই দুই জীবনের সন্ধিক্ষণের দোটানা নিয়েও তাঁর অনবদ্য গল্প আছে ‘ন যযৌ ন তস্হৌ’ যেখানে চাকরি পেয়ে শচীন অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠেছে নিজের শরীরের ভালোমন্দ সম্বন্ধে আর মায়ের মনে বেশি উদ্বেগ জেগেছে ছেলের চাকরি সম্বন্ধে, চাকরির নিয়মকানুনগুলো ছেলে ঠিকমতো মেনে চাকরিটা বজায় রাখতে পারবে কিনা এই চিন্তাই মায়ের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে। চাকরি জীবনের এক অভিনব রূপ প্রকাশ পেয়েছে ‘ছুরি’ গল্পে। গল্পের পটভূমি এক অজ্ঞ মফস্বল শহর, নায়িকা গৌরীয়া জন্মসূত্রে বিহারী হলেও মিশে গেছে এই শহরের সঙ্গে, কিন্তু অনেকের চোখে লালসার দৃষ্টি দেখে সঙ্গে একটা ছুরি রাখে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। ওই ছুরি দিয়ে সে বড়ো সাহেবকেও প্রতিহত করে, আবার বড়ো সাহেবের অবস্থাটাও সে বোঝে। শেষে বদলির হুকুম এলে বড়ো সাহেব যখন গৌরীয়ার কাছ থেকে বিদায় নেন যথেষ্ট দূরত্ব রেখে তখন গৌরীয়ার দৃষ্টি দেখে তাঁর মনে হয় এত দিনে তিনি সত্যিই বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ অসম দুই শ্রেণির অন্তর্গত দুটি চরিত্রের মধ্যে এক নামহীন সম্পর্কের আশ্চর্য গল্প ‘ছুরি’। সেই ত্রিশ-চল্লিশের দশকে মফস্বলের চাকরিজীবী বলতে মুখ্যত সরকারি কর্মচারীদের বোঝাত। ‘অকারণ’ অথবা ‘ইনি আর উনি’ প্রভৃতি গল্পে এই শ্রেণির চরিত্রচিত্রণে সরকারি কর্মচারীদের প্রতি হার্দ্য পক্ষপাতের চাইতে বিদ্বেষের ও শ্রোষের দৃষ্টিই দেখিয়েছেন বেশি, তবু তাদের পদাধিকারের আশ্বালনের মধ্যে অবিরাম কর্মজ্বল বদলের নোঙরহীন জীবনের গূঢ়তর অসহায়তাকেও প্রকাশ করেছেন সাহিত্যিক নৈপুণ্যে।

মহকুমা-মফস্বল জীবনের চাকরিজীবীদের বাস্তবতাকে ছাপিয়ে অচিন্ত্যকুমার অধিকতর বিস্তারে গেছেন ‘হরেন্দ্র’, ‘সাক্ষী’, ‘মাটি’ প্রভৃতি গল্পে। এইসব গল্পে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস্তবতা থেকে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের বাস্তবতা অনুসন্ধানে অচিন্ত্যকুমারের আগ্রহ ও উন্মুখতাকে ব্যক্ত হতে দেখি। ‘হরেন্দ্র’র যন্ত্রণা আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত, কিন্তু গল্পের মধ্যে গ্রামীণ ভূমিভিত্তিক জীবনের ফাঁস যে কত কঠিন তা নির্ভুলভাবে লেখক দেখিয়েছেন—বেগুনির বাবা সমাজকে মানে বলে বিনাপণে হরেন্দ্রের হাতে বেগুনিকে তুলে দিতে অপারগ, কিন্তু যেই গুণ্ডারা বেগুনিকে সমাজের বাইরে টেনে নিয়ে ফেলল অমনই ছবি একেবারে পালটে গেল, কারণ শহুরে জীবনের স্বাধীনতা ভূমিনির্ভর গ্রামীণ জীবনে নেই, এখানে সবাইকে নিজস্ব ইচ্ছা-সাধ বাদ দিয়ে জমিতে বাঁধা সমাজের আদেশ-বিধান মেনে চলতে হয়।

যে-জীবনে জমির গুরুত্ব এত বেশি সে-জীবনে মামলা-মোকদ্দমাও বেশি এবং মামলা-মোকদ্দমায় সাক্ষী-সাবুদেরও মূল্য খুবই। ‘সাক্ষী’ গল্পে কীভাবে এক-একজন সাক্ষী এক-এক পক্ষকে শোষণ করে তারই কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। ‘মাটি’ গল্পের তাৎপর্য আরও গভীর। একেবারে বেহুদ চাষা আমানত ছেলেকে নামমাত্র শিক্ষিত করতেই ছেলে আজিজ চাষের কাজকে ঘৃণা করতে শিখেছে, অবশেষে জমিজমা বেচে আজিজ আদালতে

আমলার কাজ জোগাড় করেছে, উপরি উপায়ের ঘাঁতখোঁত তার নখদর্পণে, আর জমি-হারা আমানত এখন শহরের বাজারে দর্জির কাজ করে। তারপর অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, ‘কিন্তু যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম করে, আমানতের পা-কল কেমন আপনা থেকেই থেমে যায়, বৃষ্টিটা মনে হয় যেন কামার শব্দ, আর সেই শব্দে ভেসে আসে তার মাটির ডাক। তার মাটি তাকে ডাকে—ডাকে—অনেক দূর পর্যন্ত ডাকে। বলে, আমানত, চলে আয়।’ মাটির সঙ্গে কৃষিভিত্তিক সমাজের গভীর সম্পর্ককে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অচিন্ত্যকুমার বিচিত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একই সঙ্গে তাঁর গল্পে বাংলার মুসলমান কৃষক সমাজ লাভ করেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কারণ ধর্মীয় বিচারে বাংলার কৃষকদের মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্তত অখণ্ড বাংলায়। একদিকে যেমন ক্ষমতাবান মানুষ এই কৃষককে তার জমি থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে তেমনি অন্যদিকে ক্ষমতাহীন মানুষ তার জমি আঁকড়ে লড়াই করে যাচ্ছে—জমি নিয়ে এই লড়াই বারবার অচিন্ত্যকুমারের গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

‘বেদখল’ গল্পটিতে ইমানদির চাইতে তার প্রতিপক্ষ অনেক বেশি ধূর্ত, জনবলে ও আইনবলে অনেক বেশি প্রবল, পক্ষান্তরে ইমানদির একমাত্র সম্বল হল পূর্বপুরুষদের ভদ্রাসন-রক্ষা করার জন্য অটল প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস্যকর ব্যক্তিগত বীরত্ব এবং শেষ পর্যন্ত বহুগুণে পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের কাছে তার অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরাভবও তাকে ট্রাজিক নায়কের গৌরবে মহিমাম্বিত করে তুলেছে। ‘বিড়ি’র কেন্দ্রীয় চরিত্র দলিলদিই জমির আসল মালিক, কিন্তু কোনও দলিল পেশ করে আইনের কাছে তার স্বত্ব প্রমাণ করতে পারেনি। সে চায় ‘জমির কাছে ফিরে যেতে। তার নিজের মায়ের কোলে।’ তাই আইনের পথ ছেড়ে পাঁচ-ছ বছরের নাতি আলিকে নিয়ে তার সাবেক জমির ধন কাটতে নেমে পড়ে। ‘রাজার আদালতে হারতে পারি, কিন্তু খোদার আদালতে হারব না’ এই বিশ্বাস নিয়ে তার লড়াই। দখলদার নয়ন খাঁর দলবল একটা ল্যাজা বিধিয়ে দিল দলিলদির বুক। হাসপাতালে ল্যাজা বের করা হল, তবু প্রাণের আশা নেই। ওদিকে নাতি আলির ফাটা কপাল সেলাই করতে ডাক্তার উদ্যত, ভয় পেয়ে সে কেঁদে ফেলল। মরণাপন্ন অবস্থাতেও দলিলদি ট্যাক থেকে শেষ বিড়িটা পাঠিয়ে দিল নাতিকে। ‘আলি চোখ ডাগর করে দেখল, একটা গোটা আস্ত বিড়ি। এক খোঁট কালি নয়, একটা প্রকাশ ইতিহাস। এক শিব ধান নয়, একটা প্রকাশ ধানক্ষেত।’ একটা বিড়ির মধ্যেই অচিন্ত্যকুমার ধরে নিয়েছেন মৃত্যুপথযাত্রী এক কৃষকের বিরাট উত্তরাধিকার। জমির প্রতি চাষীর এই মনোভাবের ভিত্তিতে অচিন্ত্যকুমারের অনেকগুলি অনবদ্য ছোটোগল্পই রচিত।

‘দাঙ্গা’, ‘জমি’, ‘নুরবানু’ প্রভৃতি ছোটোগল্পগুলিতে দেখা যায় জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত জটিলভাবেই না উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা তুলিয়ে দেখলে অচিন্ত্যকুমারের শিল্পীমনের প্রখরতায় ও প্রসারতায় বিস্মিত হতে হয়। অখণ্ড বাংলার চাকরিজীবী থেকে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের জীবনকথা, তাদের বাস্তবতা ও বাসনা-বেদনার সঙ্গে অখণ্ড বাংলার প্রকৃতি ও নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে অচিন্ত্যকুমার এমন এক বহুমাত্রিক সাহিত্যলোক নির্মাণ করেছেন যার তুলনা বাংলাসাহিত্যে অচিন্ত্যকুমার নিজেই।

২ আগস্ট শনিবার ২০০৪ সন্ধ্যায় বাংলা আকাদেমি সভাঘরে প্রেমেন্দ্র মিত্র উদ্যাপন সমিতি, অচিন্ত্যকুমার শতবর্ষ উদ্যাপন সমিতি আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যৌথভাবে প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য জন্মশতবর্ষ সন্ধ্যা পালন-অনুষ্ঠানে পঠিত।

পত্রগুচ্ছ ১
(শিশিরকুমার দাশকে লেখা)

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : এক

॥শ্রী॥

২২৩-ই কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
২৯ মার্চ ১৯৭৭

স্নেহাস্পদেষু

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত^২ একদিন বলছিলেন তিনি যত ছাত্র পড়িয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী শিশির। সেইদিনই তোমার নাম প্রথম শুনি কি আগেই শুনেছি মনে নেই। তোমার সম্পর্কে আমার পুত্র শঙ্কর^৩ খুব উচ্চ ধারণা, তবে তুমি যে নিত্যাগ্রিয়রও^৪ সহপাঠী তা আমার জানা ছিল না। তোমার সঙ্গে কোথায় কবে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তা-ও মনে নেই। শঙ্কর মা বলছিলেন তুমি নাকি অনেক দিন আমাদের বাসায় এসেছ। আমার স্মৃতিশক্তি কোনকালেই প্রখর নয়, mental alertness সামান্য যেটুকু ছিল, বয়সের ভারে তা-ও চলে গেছে। বয়স ৭৯ অতিক্রম করে ৮০ চলেছে।

তোমার চিঠি পেয়ে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করেছি। আক্ষরিক অর্থ স্মরণ করে ‘যৎপরোনাস্তি’ কথাটা আমি সচরাচর ব্যবহার করি না। আজ করছি কারণ অন্যভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে পারছি না। আশ্চর্য হচ্ছি ভাষার উপর তোমার দখল দেখে। মতবিরোধ হলেও যে সংযত সত্ত্বমপূর্ণ সমালোচনা সম্ভব তোমার এই চিঠি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমার লেখাটার^৫ প্রথম অংশ তুমি পড়নি। পড়লে এই চিঠি দিতে কিনা সন্দেহ। তোমার অনেক প্রশ্নের উত্তর সেখানে আলোচিত হয়েছে। আমার আশঙ্কা সেগুলি হয়তো তোমার মনঃপূত হবে না।

নিত্যাগ্রিয়র বাসায়^৬ কিছুকাল ছিলাম। তার বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসতেন। তাঁদেরই পীড়াপীড়িতে আমার কলম ধরতে হয়েছে, বহুকাল চর্চা করি না। alertness একেবারেই নেই। এ অবস্থায় লিখতে গেল ভুলত্রাস্তি অনিবার্য কিন্তু ঐ অধ্যাপকেরা কিছুতেই ছাড়লেন না। বাইরে চলাফেরার সামর্থ্য নেই, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, মানসিক ধৈর্যের অভাব এইরূপ অবস্থায় আবার তাড়াহুড়া করে লেখা—ফলে যা হবার হয়েছে, লেখাটা ছাপা হওয়ার পর ওর চেহারা দেখে লজ্জিত হচ্ছি। অসংখ্য ছাপার ভুল যা কোন কালেই বরদাস্ত

করতে পারিনা—তদুপরি আমার নিজের ভাষাই অত্যন্ত শিথিল, ভ্রমপ্রমাদস্ত ঘটেছে। অসংলগ্নভাবে এক কথা বার বার বলা হয়েছে, যেসমস্ত কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল, বক্তব্য সংক্ষেপ করতে গিয়ে সেসব শুছিয়ে বলা হয় নি—বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে গেছে।

লেখাটা একসঙ্গেই প্রেসে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটা নূতন টাইপ তৈরি করা হবে, প্রুফ আমাকে দেখানো হবে, এক সংখ্যায়ই সমগ্র লেখাটা ছাপা হবে—এই প্রতিশ্রুতি আমাকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কোন কথাই রাখেন নি।^৭

আগে বৌ-প্রসঙ্গটা সারা যাক। আগে বলতে চাই—শব্দটা আদিত 'বউ' ছিল, পরে dipthangal 'বৌ' হয়েছে। আদিতে শব্দটা disyllabic ছিল, এখন মার্জিত উচ্চারণ monosyllabic, কিন্তু গ্রামে গাঁয়ে 'বো-উ' ধ্বনি এখনও লুপ্ত হয় নি—স্পষ্ট প্রলম্বিত উ। আমারই এক আত্মীয়া একদিন বলছিলেন “‘বো-উ’ যদি আনতে হয় এরকম ‘বৌ’ই দরকার।” তবে আমার লেখাটায় ত্রুটি ঘটেছে।

এবার তোমার চিঠি বাঁয়ে রেখে এক এক করে উত্তর দিচ্ছি। তোমার বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে, কারণ চিঠির কপি তোমার কাছে নেই। যে-জায়গাটা স্পষ্ট হবে না, সেটা লিখে জানালে খুশী হব।

‘কলসী কলসি কলশী কলশি’ চার বানানই বাংলা ভাষায় চলুক এরকম কোন প্রস্তাব দিই নি। “রবীন্দ্রনাথ তৎসম ‘কলসী’কে ‘কলসি’ লেখেন, এটা তাঁর একটা স্বলন” এইরূপ একটা মন্তব্য করেছিলাম। লেখাটা ছাপা হয়ে এলে অভিধান খুলে দেখি নিজের অন্ততায় একটা অমার্জনীয় অপরাধ করে বসেছি। তৎক্ষণাৎ ত্রুটি স্বীকার করে অবশিষ্ট অংশে শুরুতেই সংশোধনটা জুড়ে দিতে প্রেসকে অনুরোধ করলাম। আমার লেখাটা যদি ভাল করে পড়, দেখবে একাধিকবার বলেছি বিকল্প-বানান যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। উপসংহারের শেষ বাক্যেও বিকল্প কমানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।^৮

রবীন্দ্রনাথ এবং বানান-সংস্কার সমিতি^৯ তৎসম শব্দের বানান অবিকৃত রাখতে চেয়েছেন, তবে কার্যতঃ এ প্রস্তাব সাহিত্যিকেরা লঙ্ঘন করেই চলেছেন, অথবা রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজের বক্তব্য কিছু আলগা ভাবেই প্রকাশ করেছেন। আমি তৎসম শব্দে সংস্কৃত বানান jealously guard করতে চাই। আমার প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিবাবু^{১০} এবং বানান-সংস্কার-সমিতির inconsistency তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

তত্ত্ব শব্দের বানান-সংস্কারে পণ্ডিতবর্গের অসঙ্গতি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। হয়তো আমারই অজ্ঞতা—কিন্তু আমার ভুল কোথায় ধরতে পারছি না। লেখাটা ছাপা হয়েছে, এইবার ভুলগুলি ধরা পড়বে। বিশেষ করে ‘জ-য’ অংশের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তৎসম ও তত্ত্ব শব্দের ‘জাতিভেদ’ আমি পছন্দ করি না, তোমার কাছে আমার মতের সমর্থন পেয়ে আমার নিজের উপরই একটু আস্থা জন্মাচ্ছে কিন্তু জোরগলায় একথা প্রবন্ধে ঘোষণা করতে সাহস করি নি—যাঁরা between the lines পড়বেন তাঁরা বুঝবেন তত্ত্ব শব্দ আমার কাছে গোত্রহীন অন্ত্যজ নয়। তবে বৈদেশিক শব্দে আমিও জাতবিচার করি।

ধ্বনি ও রূপের পরিবর্তনে সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ‘তৎসম’ থাকছে না একথা আমার প্রবন্ধেও পাবে, তবে ভিন্ন context-এ (পৃ. ৩৫৮)। সংস্কৃতের স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি ছেড়েই দিলাম, ‘ফলম্ গজঃ মুনিঃ’-কেও আপাততঃ না-ই বিচার করলাম, ‘ফল গজ মুনি’-কেই যদি

‘তৎসম’ বলি এবং উচ্চারণানুগ বানান করি, তাতেও বাংলা ভাষায় হাজার করা একটা তৎসম শব্দ থাকে না। নামটা ছেড়ে দাও, ভাষার প্রকৃতি কী হবে তাই চিন্তা করো।

রবীন্দ্রনাথ ঋন্যাত্মক বানান চান, এ যুগের বহু পণ্ডিত সাহিত্যিক উচ্চারণনুযায়ী বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী। তুমিও লিখেছ “আদর্শ বানানের লক্ষ্য উচ্চারণকে প্রতিফলিত করা”। আর আমি বলছি “শব্দের বানানে কেবল ঋনিগত শুদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, বানানের প্রধান কাজ হচ্ছে শব্দের অর্থ প্রকাশ করা” (পৃ. ৩৭১)। ভাষা তো মনোভাব প্রকাশ করার জন্য। মনোভাব প্রকাশ করি শব্দের অর্থ দিয়ে,—ঋনি দিয়ে নয়। শব্দের অর্থের জন্য আবশ্যিক তার ব্যুৎপত্তি। সুতরাং যে-পথে ব্যুৎপত্তিজ্ঞান সহজলভ্য সেই পথেই চলতে হবে। এইজন্যই মূলানুগ বানান চাই।

তুমিই বলছ, ৫০।৬০।১০০ বছরে উচ্চারণ পাল্টে যায় এবং বানান ঋন্যাত্মক হলে তা-ও যুগে যুগে পাল্টাবে। এটা কি অভিপ্রেত? ‘শতবর্ষপরেই কি ‘বিচিত্র প্রবন্ধ, গোরা, জীবনস্মৃতি’ পড়তে বুঝতে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ভ্রমকে^{১১} ডাকতে হবে? কালের গতিতে যা হবার হবে, কিন্তু ইচ্ছা করে ঋন্যাসের পথ কেন সৃষ্টি করব? শতবর্ষই বা বলি কেন,—এই যুগেই কি চাটগাঁ, ঢাকা, বরিশাল, বর্ধমান, মেদিনীপুরের ঋনিকে স্বীকার করছ? বলবে, ঐসব dialect সাহিত্যিক ভাষায় গৃহীত হয় নি (ঋন্যাত্মক বানান-ব্যবস্থায় সেটাও শুধু arbitrary নয়, সমগ্র বাংলার প্রতি অবিচার)। কলকাতার ভাষা তো গ্রহণ করা হয়েছে? বাগবাজার কালীঘাটের উচ্চারণ এক? শান্তিনিকেতনের উচ্চারণ গ্রহণযোগ্য? গ্রামোফোন রেকর্ডে কণিকার^{১২} গানে শুনি ‘দাঁড়াবো তোমারি সোম্মুখে’। শান্তিদেবের^{১৩} মুখে ‘বিরহ’ হয়েছে ‘বেরহ’। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণে ভক্তদেরই অভিযোগ আছে। দানিাবু^{১৪}, তারাসুন্দরী^{১৫}, তিনকড়ি চক্রবর্তী^{১৬}, শিশির ভাদুড়ী^{১৭} উচ্চারণ একরকম ছিল না। শিশিরবাবুকে যদি বাঙালও বল, অন্য তিনজন ছিলেন কলিকাতাবাসী। ‘ছিল’-কে তোমার বন্ধুরা ‘ছিলো’ লিখছেন, ‘ছেলো’ লিখছেন না কেন? দানিাবুর মতো লোকের মুখেই ‘ছ্যালো’ শুনেছি—অবশ্য অভিনয়ে নয়, ঘরোয়া কথাবার্তায়। একই সময়ে একই পরিবারে উচ্চারণে বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বানান অত অস্থির নয়। বানান ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তিত হয় না।

ইংরেজীতে fish বানান^{*} ghoti করা যায়, তৎসম্ভবেও ইংরেজী জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। তা হলে তোমরা বাংলা ভাষায় phonetic spelling-এর জন্য উঠে পড়ে লেগেছ কেন? Phonetics-এর কথাই যদি বল, সংস্কৃত ভাষা তুলনাহীন—‘মীন’-কে ‘মিন’ বা ‘মীণ’ করার সাধ্য কারও নেই। বাংলায় ‘ভীষ্ম’-কে যদি ‘ভিশ্মৌ’ কর, লাভ কিছু হবে না। কিন্তু শব্দটি পরিচয়হীন হয়ে যাবে।

Script পরিবর্তন করার কথা যখন বল, তার একটা অর্থ বুঝি। এ বিষয়ে ইংরেজীকে আদর্শ বলতে বাধা নেই, এই অক্ষরগুলির গতি সর্বদাই ডান দিকে—a b c d e f একবারও হাত না তুলে বহু বর্ণের সমাবেশ করা যায়। তবে আমি Roman script গ্রহণের সুপারিশ করছি না।

অ্যা, z, v- এই তিনটি ঋনির জন্য তিনটি নূতন বর্ণ চেয়েছি কিন্তু সেজন্য যণ প্রভৃতিকে অনাবশ্যক মনে করছি না। য না থাকলে তোমরা গদ্য পদ্য কাব্য রচনা করবে কী করে? বাক্য খাদ্য বাদ্য-র কী দশা হবে? ‘গোন্দো পোন্দো কাবো বাকো খান্দো বান্দো উচ্চারণ-পঙ্খীরা-স্বীকার করে নেকেন কি? আচার্য না আচার্য নিয়েও তো উচ্চারণপঙ্খীদের মধ্যে কলহ।

ঋ ৯ ঙ শিশুপাঠ্য পুস্তকে প্রয়োজন নেই কিন্তু ‘আকীর্ণ, কল্প’ প্রভৃতি শব্দের জন্য বয়স্কদের দরকার হয়। নিজ ভাষার বর্ণ যদি বাঁচিয়ে না রাখ, লিপিচিহ্নের জন্য বৈয়াকরণদের অন্য ভাষার দ্বারস্থ হতে হবে। শ য় স প্রভৃতি বর্ণবর্জনে আমার আপত্তির কারণ নূতন বাংলা ভাষা সৃষ্টি না করে আমরা বর্ণ বর্জন করতে পারি না। যে-বাংলা ভাষায় আমি লালিত পালিত, সে-বাংলাকে বিসর্জন দিতে আমার মন চায় না।

সংস্কৃতের নির্দেশ বাংলায় কতটা মানা হবে প্রশ্ন করেছে। আমার প্রবন্ধেও এ প্রশ্ন আছে (পৃ. ৩৭০)। তবে যদি আমার কাছেই উত্তর চাও, আলোচনায় বসতে হয়।

“আপাতত বাংলা ব্যাকরণের সমস্যা নিয়ে” বলছ না। এ প্রসঙ্গে বলছ না ; কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে seriously ভাবছ কি? দেড়শ বছর আগে রামমোহন রায়^{১৮} কিছু ভেবেছিলেন, একটা ছক কেটেও দিয়েছিলেন। তারপরে কোথা থেকে কী হল—সম্প্রদান অপাদান প্রথমা দ্বিতীয়া এসে বাংলা ব্যাকরণে ভীড় করে দাঁড়াল। হরপ্রসাদ^{১৯} রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর^{২০} বৈয়াকরণদের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু বৈয়াকরণ কোথায়? শেষ পর্যন্ত এলেন সুনীতিকুমার। তিনি কিছু phonetics আমদানি করলেন, কাঠামো বদলানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন না। একদিকে বেশী নজর দিলে অন্য দিক নজর এড়িয়ে যায়। ‘হিসাব + আদি = হিসাবাদি, হাত + ধরা = হাঙ্করা, পাঁচ + সিকে = পাঁশসিকে’ এইগুলিকে তিনি বললেন ‘বাংলা সন্ধি’ (প্রথমটির কারণ ‘হিসাব’ বৈদেশিক শব্দ)। আমি তো দেখি এগুলি সংস্কৃত সূত্রনিষ্পন্ন সন্ধি (অন্ততঃ প্রথম দুটি)। তার পরেও প্রশ্ন থাকে—হাঙ্করা, পাঁশসিকে কি সাহিত্যিক বাংলা? ‘সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ’ যখন লিখলেন, বললাম ‘প্রথমা দ্বিতীয়া’কে বাদ দিন। উত্তর দিলেন “বাড়িখানা করেছে, কিছু ধার হয়েছে”। ধার শোধ হল বোধ হয় ১৯৬৫ সালে। প্রথমা দ্বিতীয়া বাদ পড়ল। কিন্তু ভূতটা গেল না। তৎপুরুষ সমাসে দ্বিতীয়তৎ তৃতীয়াতৎ নাম নেই বটে, কিন্তু দৃষ্টান্ত সাজানো হয়েছে—কে, দ্বারা দিয়া, কে, হইতে অপেক্ষা, র, এ, দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। চটে গেলেন। হয়তো বক্তব্য—ওগুলি দ্বিতীয়া তৃতীয়া নয়, ওগুলি বিশুদ্ধ ‘কারকচিহ্ন’। এ ছাড়া তো বলবার কিছু দেখি না। কিন্তু ‘কারকচিহ্ন’ বললেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। ‘র’ কারকচিহ্ন নয়, ওটা সম্বন্ধপদের চিহ্ন। সম্বন্ধপদ কারক নয়। বাংলা ব্যাকরণের সংস্কার আবশ্যিক বর্ণপ্রকাশ থেকে বাক্যপ্রকাশ পর্যন্ত। বর্ণ, সন্ধি, গত শযসত্ত্ব, বিশেষ্য-বিশেষণ অব্যয়, লিঙ্গ, বচন, কারক-বিভক্তি, সমাস, প্রত্যয় ক্রিয়ার বাচ্য সর্বত্র ঝাড়-পৌছ দরকার। এ না হলে বানান-সংস্কার হবে না। বানান-সংস্কার না হলে অভিধান-রচনা সম্ভব নয়। সুনীতিবাবুকে বলে বলে যখন পারলাম না, ধরলাম চিন্তাহরণ বাবুকে।^{২১} তিনি বললেন “আমি যে-কাজ করছি, এ কি কাজ নয়?” এখন অনুরোধ করছি তোমাদের। তোমরাও হয়তো ঐ উত্তরই দেবে।

বিসর্গ-বর্জন সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছ। শেষ পর্যন্ত বলেছ “অন্ত্য অ-ক্ষনি যদি লুপ্ত হয়, আমরা তার জন্য বিব্রত হব কেন?” এটা রুচির প্রশ্ন। তুমি বিব্রত হও না, আমি হই। ‘মাতঃ পিতঃ ভ্রাতঃ’ ‘মাং পিৎ ভ্রাৎ’ হলে কেবল চোখে কানে নয়, প্রাণেও লাগে। আর বলেছ “আজকের আদর্শ বানান-বিধি কাল আদর্শ নাও থাকতে পারে।” প্রতিবাদ করার কিছু নেই। শুধু বলি, আমি আজকের জন্যই বানান-বিধি রচনা করছি। কাল যদি থাকে, ভাল, না থাকলে আমার করণীয় কিছু নেই। তবে কালকেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে-পথে, সে-পথ যাতে প্রশস্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আমার কর্তব্য।

সংস্কৃতের ধ্বনি তো বাংলা ভাষায় কোথাও নেই। বানান-বিচারে সেইজন্য ধ্বনির প্রশ্ন খুব কমই তুলেছি, কেবল গোত্র পরিচয়ের জন্য যাকে বলি ‘তৎসম’ শব্দ তার বানানটা রক্ষা করতে চাই, এবং (তোমারও সম্মতি অনুযায়ী) ‘তদ্ভব’ শব্দে একই প্রশংসী অবলম্বন করলে ভাল হয় এই কথা বলছি, অবশ্য ভয়ে ভয়ে।

তুমি বানানে ধ্বনির প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ হিন্দীর ‘কংটক, কুংভ’-র দৃষ্টান্ত দিচ্ছ, এটা কি পরস্পর-বিরোধী নয়?

‘অতি > ওতি, অরুণ > ওরুণ’ সম্বন্ধে যে নিয়মের কথা বলেছ, তা আজকালকার সব ব্যাকরণেই দেওয়া আছে। আমার কোন্ ব্যাকরণ^{২২} তুমি দেখেছ জানিনা। আমার নিজের নামে যে সমস্ত বই ছাপা হয়েছে তা তো সবই নীচের ক্লাসের, সেসব বইয়ে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচিত হয় নি।

ও-কারের উপর তোমার ঝোঁক নেই দেখে আশ্চর্য হলাম। বানানে দীর্ঘকাল আমি রবীন্দ্র-প্রয়োগেই অভ্যস্ত। তাই রবীন্দ্র-প্রয়োগের বিরোধিতা করতে গিয়েও আমার লেখায় রবীন্দ্র-প্রয়োগই এসে পড়ে। ‘কৃষ্ণবর্ণ’—অর্থে আমি সচরাচর ‘কালো’-ই লিখে থাকি। আমার প্রবন্ধে আমি এ শব্দটাকে ‘ভাল’-গোষ্ঠীতেই ফেলেছি, ওটা ঠিক হয় নি। ‘সময়’-অর্থে ‘কাল’ আমি কখনও লিখব না, কারণ তখন এটা তৎসম শব্দ।

‘বল’ শব্দে আমার বানান arbitrary, কোন যুক্তি খাড়া করতে পারছি না। আমি বর্তমানে ‘বল’ লিখি, অনুজ্জায় ‘বলো’ লিখি। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন বলে মনে হয়।

অ্যা, z, v, s, f, zh ধ্বনির প্রতীক বাংলা বর্ণমালায় নেই। zh বাংলায় খুব দরকার হয় না। S-এর জন্য স আছে। f-এর জন্য ফ চলছে—ফুট, ফেল, ফসল লিখতে কেউ অস্বস্তি বোধ করেন না। Z-এর জন্য জ চলতে পারে। V-এর জন্য ভ চালাবার প্রস্তাব দিয়েছি। অ্যা-ধ্বনির জন্য নূতন চিহ্ন আবশ্যিক। এরও সুন্দর সমাধান করেছিলেন রাজশেখর বসু। অ্যা = য়া = পুরাতন চিহ্নেরই প্রকারভেদ। একটি ঞকটা, খেলি খেলা।

এ ৪

জু ভ যেমন নূতন বলে মনে হয় না, এ ৪ চিহ্ন দুটিও পুরাতনের কাছাকাছিই মনে হবে, নূতন বলে অস্বস্তির কারণ হবে না। তোমরা যদি এ বিষয়ে চিন্তা কর এবং পথ দেখাও, ভাষার ইতিহাসে তোমাদের নাম থাকবে।

পরিশেষে তোমাকে ছোট্ট একটু ঘরোয়া উপদেশ দেব। চিঠি খামে পূরে আঠা লাগাবার সময়ে সাবধান হবে। খুব ভাল হয়, আঠা যে স্থানে লেগে যাবার সম্ভাবনা, সেস্থানে যদি এক টুকরা আলাদা কাগজ রাখ।

তোমার সুন্দর চিঠিখানার জন্য আন্তরিক স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা জানাই। আমার এই চিঠির প্রাপ্তি-সংবাদ দিও। তোমার ১৪ মার্চের চিঠি ২১ মার্চ আমার হাতে পৌঁছেছে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পুঃ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজেই উচ্চারণে বৈলক্ষণ্য আছে এমন কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি, এদের ধ্বনিমূলক বানান কী হবে?—প্রতি, প্রশাম, প্রকাশ, প্রতাপ, শ্রদ্ধা, শাখা, শ্রীল, প্রশ্ন, সংসার,

বলবার, মহারাজ, মম্বন্তর, অন্বেষণ, ধন্বন্তরি, পণ, ধন, দ্রোণ, মাথা, কথা, আম, লেবু, এসেছ, যাচ্ছ, কিচ্ছু, যাচ্ছেতাই, ঘোড়া, কুড়ে, লেজ, সেনমশায়, একজটা দেবী।

পত্র : দুই

॥ শ্রী ॥

২২৩-ই কাঈজার স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

১লা বৈশাখ ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু

নববর্ষে স্নেহাশীর্বাদ জনাই—যশ মান স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি লাভ হোক। তোমার ৪ এপ্রিলের চিঠি ৬ এপ্রিল পেয়েছি।

তোমার চিঠি সৌজন্যে ভরা, কিন্তু এত সঙ্কোচ কেন? চিঠিতে একটাও কঠিন শব্দ প্রয়োগ কর নি যাতে আঘাত পেতে পারি, আমি অবিশিষ্ট আনন্দই পাচ্ছি।

একটা কথা মনে রাখা উচিত—‘তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী’ সবই পারিভাষিক, যোগরূঢ় শব্দ। সুতরাং যৌগিক শব্দের মতো এসব শব্দের অর্থ দেওয়া চলে না। পরে আর একটা শব্দ সৃষ্ট হয়েছিল ‘ভগ্নতৎসম’, এ শব্দটা এখন ‘অর্ধতৎসম’ নামে চলছে।

‘মাথা’ শব্দকে যৌগিক অর্থে ‘দেশজ’ বা ‘দেশী’ বলা যায়, কিন্তু এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ‘তদ্ভব’। ‘কার্তুজ’ শব্দকে ‘তদ্ভব’ বলতে কেউ কেউ আগ্রহী, কিন্তু পরিভাষা মানতে হলে একে ‘বৈদেশিক’ আখ্যা দিতে হবে।

‘লক্ষ্মী’ শব্দকে ‘তৎসম’ বলতে হবে। ধ্বনিবিকৃতি, কিংবা বিসর্গলোপে রূপবিকৃতি হলেও পরিভাষায় একে ‘তৎসম’ বলা হয়েছে।

‘গিন্নী’-কে ‘তদ্ভব’ বললে দোষ হত না, কিন্তু একটুখানি স্বাতন্ত্র্যের জন্য একে ‘অর্ধতৎসম’ বলা হচ্ছে।

‘সহনুভূতি, অন্তরীণ, শিরোনাম’ তৎসম শব্দ নয়। প্রথমটি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি খবরের কাগজের সৃষ্টি (interned), তৃতীয়টি লৌকিক সৃষ্টি (ফার্সী ‘সব্‌নামহ’)। ‘অভিমান’ তৎসম কিনা পরে আলোচনা করব।

সংস্কৃত শব্দকে আমি বৈদেশিক মনে করি না। ধ্বনি, ব্যাকরণ, অম্বয়রীতি আলাদা হলেও, যতটা আলাদা হলে ‘বিজাতীয়’ বলা যায়, ততটা আলাদা নয়। সুনীতিবাবু বলেন বাংলা ভাষার শত-করা ৪৪।৪৫টি শব্দ সংস্কৃত। সংস্কৃত থেকে আগত তদ্ভব শব্দের সংখ্যাও অনুরূপ হবে। বাংলা ভাষার শত-করা ৯০ ভাগ শব্দের সঙ্গে যে-ভাষার সম্পর্ক, যে-ভাষার বর্ণমালা অদ্যাবধি আমার বর্ণমালা, সে-ভাষাকে বৈদেশিক বলব কোন মুখে? সংস্কৃত শব্দকে আমি ‘ঋণ’ বলছি না, বলছি ‘উত্তরাধিকার’। কেবল ‘ধারাবাহিকতা’ বললে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক পূর্ণদৃষ্টিতে দেখা হয় না। আমি বলছি সংস্কৃত বাংলার ‘মেদ মাংস অস্থি চর্ম’। প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলার যা যোগ তার চেয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে যোগ বেশী। উচ্চারণের প্রশ্নে তোমরা যতটা গুরুত্ব দিচ্ছ আমি ততটা

দিতে পারছি না। ‘ল্যাম্প’ শব্দে উচ্চারণ-বিকৃতি নেই, অর্থেও পার্থক্য নেই, তথাপি এ বিদেশী শব্দ। ‘ল্যাম্প’ শ্রেণীর শব্দকে আমি মনে করি ভাষার জামা, ছেড়ে দিলে একটু শীতে কষ্ট পেতে পারি কিন্তু অট্টহাসি হবে না। ‘লক্ষ্মী’ শ্রেণীর শব্দকে মনে করি ভাষার অঙ্গ। এদের ছেড়ে দিলে দেহই ক্ষতবিক্ষত হবে। বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমি যদি পরিভাষা রচনা করতাম, আমি করতাম প্রধান দুই ভাগ—‘দেশী’ এবং ‘বিদেশী’। ‘গৃহিনী, ঘরগী, গিন্নী, পেট, চিংড়ি’ দেশী শব্দ ; ‘চেয়ার, টেবিল, কাগজ, দোয়াত, আলকাতরা’ বিদেশী শব্দ। পরে নানা উপবিভাগ করা যেতে পারত। ধ্বনিগত পার্থক্য—যার উপরে তোমরা সর্বাধিক জোর দিচ্ছ, আমি তাকেও দুভাগ করি। ইংরেজী ফরাসী আরবী ফার্সীর সঙ্গে বাংলার পার্থক্য উচ্চারণগত নয়, ধ্বনিগত। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার পার্থক্য ধ্বনিগত নয়, উচ্চারণগত। একথার যদি প্রতিবাদ কর, আশা করি ব্যতিক্রমগুলিকে তুলে ধরে দৃষ্টান্ত দেবে না।

তৎসম শব্দের বানান অক্ষত রাখতে চাই, এজন্য আমি নূতন কোন যুক্তির অবতারণা করব না। প্রতিবাদ করতে গিয়েও আমার বক্তব্য আমার চেয়ে অনেক জোরালো ভাষায় তুমি ব্যক্ত করেছ। ‘উচ্চারণের প্রশ্ন’ তুলেও তুমি বানানের নির্দিষ্টতা, শৃঙ্খলা, নিয়মের শাসন’-কে অগ্রাহ্য করছ না। যে-কথা আমি ভাল করে বোঝাতে পারি নি, সে-কথা চমৎকার ভাবে তুমি বুঝিয়েছ—‘স্থিতিস্থাপকতার সুবিধে হল যে দুই বা দুই-য়ের বেশী উচ্চারণ একটি বানানের আশ্রয়ে বসবাস করতে পারে’। কথাটা তুমি অন্য প্রসঙ্গে বলেছ, কিন্তু তৎসম শব্দের বানান-প্রসঙ্গেও ঐটিই আমার প্রধান কিংবা একমাত্র বক্তব্য। উচ্চারণানুগ বানানের জটিলতা-প্রসঙ্গে আমি চাটগাঁ মেদিনীপুরের কথা তুলেছিলাম। চীনা ভাষার কথা আমি জানতাম না, সে-ভাষার কথা তুমিই বলে আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ।

‘বানানের প্রধান কাজ শব্দের অর্থ প্রকাশ করা’—এটাই আমার প্রবন্ধের major premise। বলেছ “শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্পর্কটা.....নিতান্তই আপাতিক”। কে অস্বীকার করছে? কিন্তু যে-পদার্থটাকে ‘জল’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে-পদার্থকে বোঝাতে ‘জল’ শব্দই ব্যবহার করতে হবে। ‘শ্রু’ ধাতুকে এক অর্থ, ‘স্রু’ ধাতুকে অন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে এইসব অর্থ সম্পূর্ণ arbitrary। কিন্তু যখন ‘স্রবণ’ শব্দের অর্থ কী জানতে চাই, তখন ধ্বনি উচ্চারণ আমাকে সাহায্য করে না, তখন ‘স্রু’ ধাতুই আমাকে অর্থের সন্ধান দেবে। শব্দের ব্যুৎপত্তিই অর্থবোধের প্রধান অবলম্বন, তবে একমাত্র অবলম্বন নয়, কারণ রূঢ় ও যোগরূঢ় শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি সাহায্যে পাওয়া যায় না। উচ্চারণানুগ বানানে ‘স্বত্ব সত্ত্ব’ দুই শব্দই ‘শস্তো’, অন্তঃস্থ-য বর্ণমালা থেকে বিতাড়িত হলে ‘সত্য’ শব্দও ‘শোস্তো’ না হয়ে ‘শস্তো’ হবে—এ বানানে জটিলতা কমে না বাড়ে?

আর যদি বল বাংলা ভাষায় ঐ উ প্রভৃতি স্বরবর্ণ এবং য ণ ষ স প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ অনাবশ্যক, তবে তো বানান-সংস্কারের প্রশ্নই আসে না, বর্ণসংস্কার করলেই সব গোল মিটে যায়। উত্তরে আমি বলব, phonetic লিপির সাহায্য না নিলে তখনও উচ্চারণানুগ বানান সম্ভব হবে না ; আর, বর্তমান বাংলা সাহিত্য কালের গতিতে নয়, সংস্কারকের হাতাড়িতেই fossil-এ পরিণত হবে।

সংস্কৃত ‘অভিমান’ শব্দ যদি বাংলায় এসে তার অর্থ হারিয়ে ফেলে, তা হলে ‘ওভিমান’ বানানেও আমি আপত্তি করব না, যেমন আপত্তি করছি না তৎসম ‘দায়ী’ শব্দের ‘দায়ি’ বানান যখন শব্দটি ‘responsible’ অর্থে প্রযুক্ত হয়। তবে ‘অভিমান’ শব্দ সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত নই। বঙ্গীয় শব্দকোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, চলন্তিকা, সংসদ অভিধান দেখলাম—‘অভিমান’ শব্দের বাংলা

অর্থ সংস্কৃতেও অস্বীকৃত নয়। আমারও ধারণা ছিল বাংলা ‘অভিমান’ ও সংস্কৃত ‘অভিমান’ এক নয়, কিন্তু অভিধান এই ধারণা সমর্থন করছে না। ‘ওভিমান, দায়ি’তে যে আমি আপত্তি করছি না, তার মানে এ নয় যে আমি এই বানানের পক্ষপাতী।

বৈদেশিক শব্দে স্বতন্ত্র বিচার কেন, প্রশ্ন করেছে। বাধ্য হচ্ছি। তৎসম শব্দে আমার উত্তরাধিকার, তদ্ভব শব্দে আমার রক্তের সম্পর্ক। দুই শ্রেণীর শব্দেই বর্ণমালা আমার নিজস্ব। বিদেশী শব্দ ধার করে এনেছি—যেসব ভাষা থেকে এসেছি তাদের বর্ণমালা সম্পূর্ণ আলাদা। সেইসব শব্দের ক্ষনি আমার বর্ণমালায় ফোটাতে হবে। প্রশ্ন করতে পারো—ক্ষনিটি কার? আমার না মূলের? এ প্রশ্ন অবশ্যই বিচার্য। বুদ্ধদেব বসু^২ বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান পছন্দ করেন। সংস্কার সমিতি তথা সুনীতিবাবু মূলের ক্ষনিটিকে অর্থবহ মনে করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার এখানে ধনুভঙ্গ পণ কিছুই নেই, তবে মূলের ক্ষনি গ্রহণ করলে শব্দের পরিচয়-লাভ সহজ হয় মনে করি। দেশের শব্দে মূলের বানান, বিদেশের শব্দে মূলের ক্ষনি। মোটের উপর আমি মূল-পন্থী। সমস্যা দাঁড়ায়—বিদেশী শব্দ, বর্ণ আমাদের কাছে অপরিচিত, সুতরাং প্রতিটি বানানের জন্য অভিধান খুলতে হয়। বিদ্যা অন্ধ হলেও তৎসম তদ্ভব শব্দের জন্য সর্বদাই অভিধান আবশ্যিক হয় না, বৈদেশিক শব্দের মূল ক্ষনির জন্য পরমুখাপেক্ষী হতেই হবে। তথাপি বানান-বিচারে ‘দুটো রীতি’ অবলম্বন করলে সঙ্গতভাবেই আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু উপায় কী?

ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে চলে গেছে। তথাপি ‘বসু’-কে বাসু, ‘সেন’-কে সেন, ‘মিত্র’-কে মিটার বলতে আমরা লজ্জিত হই না, বরং গৌরব বোধ করে থাকি। সেই কবে দ্বারকানাথ Tagore^৩ হয়ে গিয়েছিলেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ^৪ পর্যন্ত Tagore-ই থাকলেন, ও-বংশের কেউ আর Thakur হতে পারলেন না। কিন্তু তৎসম (তথা তদ্ভব?) শব্দের বানান-রীতি অনুসরণ করে Cornwallis-কে যদি কর্ণওয়ালিস করি, তুমি মুখ টিপে হাসবে; কিন্তু Shakespeare-কে যখন শেক্সপিয়ার করব, তখন তোমার মুখে চাপা-হাসি থাকবে না, ডাঙা নিয়ে তাড়া করবে। ঠাকুর Tagore হয়েছেন বলে Shakespeare শেক্সপিয়ার হবেন! এত আশ্পর্শ!

‘বাদশাহ্ শাহজাহাঁ’ সম্পর্কে মনঃস্থির করি নি। ‘বাদশাহ্’ লিখছি, আবার ‘শাহজাহান’-ও লিখছি। ‘খুশি হিসাব’ সম্পর্কে একটা নিয়ম মেনে চলি। এ ব্যাপারে যদি ধমক দেও, মত পাশ্টাতে বিলম্ব হবে না। বিশেষ্যে ‘খুশি’, বিশেষণে ‘খুশী’ লিখছি। আরবী মূলে s-ক্ষনি আছে বলে আমার বানান ‘হিসাব’। ‘হিসেব’ কখনও লিখি না, কারণ ‘চলিত ভাষা’-কে আমি ‘কথ্য ভাষা’ মনে করি না। ‘তাড়াছড়ো, ছুটোছুটি’ আমি লৈখিক ভাষায় যথাসম্ভব পরিহার করে চলি। ‘ভেতর, ওপর, পেছন’ মেরে ফেললেও লিখব না। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছেন, বুদ্ধদেব বসু ‘শাদা’ লিখতেন, আমার মত কী। আমি বলছি—‘শ্বেত’ থেকে ‘শাদা’, ‘সিত’ থেকে ‘সাদা’ হতে পারে, কিন্তু ‘সরল’ অর্থে ফার্সী ‘সাদাহ’ থেকে ‘সাদা’ এসেছে। সবটা জড়িয়ে আমি ‘সাদা’-ই লিখি। অবশ্য বুদ্ধদেব এসব বিচার করেন নি। তিনি মনে করতেন বাংলা ক্ষনি ‘শ’, অতএব ‘শাদা’।

বিদেশী শব্দের final cluster-এ হস্-চিহ্ন সমর্থন করেছে দেখে খুশী হয়েছি। কিন্তু তৎসম শব্দে হস্-চিহ্ন কি তুমি সমর্থন করছ না?

আধুনিক বাংলা ভাষার গঠন সম্পর্কে লিখেছি, সুযোগ পেলে দেখব, যদিও চোখের অবস্থা শোচনীয়। বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ-রচনায় যদি হাত দিতে, কাজের মতো কাজ হত। এসব অবশ্য বড় কাজ। একটা ছোট কাজের জন্য আগের চিঠিতেও অনুরোধ করেছিলাম, এ

চিঠিতেও আবার বলছি। অ্যা-স্মনির জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনে তার যোজ্য চিহ্ন উদ্ভাবন করো, কিংবা যদি অপছন্দ না হয় রাজশেখর বাবুর উদ্ভাবন চালু করো। তুমি ও তোমার বন্ধুরা ইচ্ছা করলে একাজ সম্পন্ন করতে পার বলে বিশ্বাস করি। পারতেন রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর^৫ সুনীতিকুমারও—কিন্তু তাঁরা অগ্রসর হলেন না কেন, ঠিক জানি না।

সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে চিঠি শেষ করি। ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : তিন

॥ শ্রী ॥

২২৩-ই কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২৯ অগস্ট ১৯৭৭

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে মাঝে মাঝেই স্মরণ করি। তুমিও যে স্মরণ কর তা শঙ্ক-প্রতিমার^৬ কাছে জানতে পাই। ছেলেদের দৌলতে মরণকালে বন্ধুলাভ—এ-ও ভাগ্যবিধাতার অপরিসীম করুণা। তুমি আমার একটা ভুল ভেঙে দিয়েছ। আমার ধারণা ছিল পণ্ডিতমাত্রেই অহঙ্কারী—দেখছি তুমি এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

তুমি আমার সঙ্গে পত্র-ব্যবহার শুরু করেছিল—দৈবদুর্বিপাকে অকস্মাৎ তার ছেদ পড়ল। শেষ চিঠিতে লিখেছিলে ঐ চিঠি আমার চিঠির উত্তর নয়। অর্থাৎ তোমার আরও কিছু বলবার ছিল। ঘটনাচক্রে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

আজ তুমি যে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছ এ সম্পর্কে পূর্বে কখনও ভাবিনি। চিঠি পড়ে যে উত্তর মনে আসছে তাই লিখছি। গভীর ভাবে ভাববার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

ত্রিয়ার কাল-রূপ সর্বত্র একই অর্থ-দ্যোতক হবে এটা বোধ হয় বাংলা, ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি নয়—অন্যান্য ভাষার কথা জানি না।

Present Tense দিয়ে 'Past, Future' বোঝায় এবং Past Tense দিয়ে 'Present, Future, ইচ্ছা, ঔচিত্য' বোঝায় ইংরেজী ভাষায় তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। Nesfield এবং C.O.D. থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি—

- (1) He comes (= will come) in a few days time, (Nesfield)
- (2) When do you (=will you) start for Madras? (Nesfield)
- (3) Baber now leads (=then led) his men through the Kyber Pass, and enters (=entered) the plains of India (Nes.)
- (4) You might (I request you to) call at the baker's. (C. O. D.)
- (5) I wish I might (C.O.D.)
- (6) You might (ought to, yet do not) offer to help, (C.O.D.)
- (7) He might (perhaps will) lose his way, (C.O.D.)

(৪) Could = Feel inclined to. (C.O.D.)

Could you see me next morning ? এ sentence টি অবশ্য অভিধানে নেই, আমার রচনা। কিন্তু আমার রচনার প্রয়োজন কী? Should, would দিয়ে তো অহরহঃ 'Past, Present, Future, ঔচিত্য, ইচ্ছা' প্রকাশ করছ। বাংলায়ও করছ। সুনীতিবাবুর ব্যাকরণ থেকে Present Tense দিয়ে Past, Future এবং অন্য অর্থ হয় এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত (বাক্যগুলিকে কিছু সংক্ষেপ করে) তুলে দিচ্ছি—

- (১) রামচন্দ্রের অদর্শনে দশরথ প্রাণত্যাগ করেন (= করিয়াছিলেন)।
- (২) আকবর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হন (= হইয়াছিলেন)।
- (৩) তিনি একথা আমাকে বলেন নাই।
- (৪) যখন তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেন (= আসিলেন) তখন বৃষ্টি হইতেছিল।
- (৫) আশীর্বাদ করুন, এ যাত্রা যেন রক্ষা পাই (= এ যাত্রা রক্ষা পাইব, এই আশীর্বাদ করুন)।
- (৬) তবে আমরা যাই। (অনুজ্ঞার ভাব-প্রকাশ)
- (৭) চলি এবারে? (ঐ)
- (৮) কাল কী হয় তাই দেখে যাব কিনা ঠিক করব।
- (৯) কী বলেন শুনবে, তারপর দেখা যাবে।

X X X আলাদা কাগজে সংযোজনা দেখো

এবার তোমার দৃষ্টান্তে আসি।

- (১) শুধু 'আজ হল রবিবার, আজ হচ্ছে রবিবার' কেন, 'আজ হয়েছে রবিবার, আগামীকাল হয়েছে রবিবার'—ও চলে।
- (২) 'সে হল আমার বন্ধু, সে হচ্ছে আমার বন্ধু'—এদের সঙ্গে আমি যোগ করি 'সে হয়েছে আমার বন্ধু, সে হয় আমার বন্ধু'। অর্থাৎ 'সে আমার বন্ধু' সমেত পাঁচপ্রকার প্রয়োগই সাধু। 'হয়'—ত অশিষ্ট প্রয়োগ নয়। "ভুলে যাবেন না দীনেশবাবু হন আমার গুরু, আমার সামনে যা তা বলবেন না।" এই চিঠির প্রারম্ভে আমি একটি বাক্য লিখেছি 'পণ্ডিতমাত্রেই অহঙ্কারী'। লিখলে দোষ হত না 'পণ্ডিতমাত্রেই অহঙ্কারী হন' কিংবা 'পণ্ডিতমাত্রেই হন অহঙ্কারী'।

ভাষায় বিশেষ 'কালের' জন্য বিশেষ 'রূপ' নির্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু ঐ 'রূপ' ঐ বিশেষ 'কালেই' আবদ্ধ থাকে না, অন্য 'কালের' ঘটনাও দ্যোতনা করতে পারে। সংস্কৃতে 'লট্' দিয়ে 'নিকট ভবিষ্যৎ' ও 'অতীত' কালও বোঝানো হয়।

ব্যাকরণে কাল-বিভাগ arbitrary। পাণিনি-মতে 'লকার' মাত্র দশটি, আবার এর মধ্যেই তিনটি হচ্ছে 'লোট্, বিধিলিঙ্, আশীর্লিঙ্'—অর্থাৎ 'কাল' বলতে থাকল সাতটিমাত্র। বাংলায় রাজশেখর বাবুর 'কাল' দশটি, কিন্তু তার মধ্যে দুইটিই অনুজ্ঞা, অর্থাৎ 'কাল' বলতে থাকল আটটি। সুনীতিবাবু অনুজ্ঞাকে 'কালের' মধ্যে স্থান দেন নি, তথাপি তাঁর 'কাল-রূপ' চৌদ্দটি। অনুজ্ঞাকে আনলে হত ষোলটি। পঞ্চাশ বছর পূর্বে বাংলা ব্যাকরণে যে 'কাল-রূপ' ছিল তা দেখলে আজকের ছেলেদের পিলে চমকাবে।

- বর্তমান কাল : (১) নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান (শোনে)
 (২) বিশুদ্ধ বর্তমান (শুনিতেছে)
 (৩) অনুজ্ঞা বা আদেশিনী (শুনুক)
 অতীত কাল : (১) অদ্যতনী (শুনিল)
 (২) হ্যস্তনী (শুনিয়াছে)
 (৩) পরোক্ষা (শুনিয়াছিল)
 (৪) পুরানিত্যবৃত্তা (শুনিত)
 (৫) অসম্পন্ন (শুনিতেছিল)
 ভবিষ্যৎ কাল : (১) ভবিষ্যতী (শুনিবে)
 (২) অনুজ্ঞা (যেন শোনে)

সহজ সংজ্ঞা (পরিভাষা) শুলিই তুলে দিলাম, দাঁত-ভাঙ্গা সংজ্ঞাও আছে। ‘শুনিয়াছে’ পঞ্চাশ বছর আগে ছিল ‘অতীত’ কাল, তা-ও ‘হ্যস্তনী’ অর্থাৎ ‘অদ্যতনী’রও পূর্বে; আজ হয়েছে ‘বর্তমান’ কাল (পুরাণটিত),—ইংরেজী Present Perfect-এর অনুকরণে। Nesfield-এর দৃষ্টান্তটি মনোমুগ্ধ—‘The British Empire has succeeded to the Mogul’. The Present Perfect can be used in reference to a past event, provided the state of things arising out of that event is *still present*. (দৃষ্টান্তটি অবশ্য 1947-এর পূর্বকার কিন্তু ‘Baber has founded the Mogul Empire’-এটা ভুল, কারণ The state of things has entirely passed away। বেশ কথ্য। ‘আমি কাল এখানে এসেছি’—আমার এখন পর্যন্ত এখানে থাকা সত্ত্বেও ‘I have come here yesterday’ চলবে না, ‘I came’ বলতে হবে, কারণ adverb টি past time denote করছে। বাংলায় কিন্তু কালই আসি আর দশ বছর আগেই আসি past time denote করলেও আমি এখন পর্যন্ত এখানে অবস্থান করলে ‘এসেছি’-ই বলি অর্থাৎ ‘বর্তমান’ কালের চৌহদ্দিতে—অথচ ‘এইমাত্র এলাম’-ও ‘অতীত’কাল।

বাংলা ব্যাকরণে ‘হল, হলাম’-এর কাল বোঝাতে বৈয়াকরণেরা মোটামুটি চারটি সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন : নকুলেশ্বর^২ ‘অদ্যতন অতীত’, রবীন্দ্রনাথ ‘সদ্য অতীত’, রাজশেখর ‘সাধারণ অতীত’, সুনীতিকুমার ‘নিত্য অতীত’।

‘অদ্যতন অতীত’ আর ‘নিত্য অতীত’ কি এক কথা?

নীচের দৃষ্টান্তগুলি দেখো—

- ১। মধুরা হল (বা ছিল—আচ্ছ ধাতু) কৈকেয়ীর দাসী [অবস্থাবোধক]।
- ২। মধুরার জন্যই রামকে বনে যেতে হল (বা রাম বনে গেলেন) [পুরাকালে]।
- ৩। স্কুল ছুটি হল (বা ছুটি দিলাম) [এইমাত্র]।
- ৪। এক মিনিট দাঁড়াও, আমার খাওয়া হল বলে [এখনও হয় নি]।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত—সংজ্ঞা ঠিক হয় নি। ‘হ’ ধাতুর বেলাও নয়, অন্য ধাতুর বেলাও নয়। ‘রামচন্দ্র বনে গেলেন’ আর ‘ছেলেরা হেসে উঠল’ বিভিন্ন কাল-দ্যোতক। অবশ্য সংজ্ঞা রচনা করাও শক্ত—কোন সংজ্ঞাতেই ‘রূপের’ সমগ্র প্রকৃতি বোঝানো সম্ভব নয়।

ক্ষেত্রবিশেষে ‘হচ্ছে, হল’-কে ‘হয়’ ক্রিয়ার Variant বলতে বাধা নেই, তবে ‘হচ্ছে, হল’-কে Simple Present-এর রূপ বলা চলে না।

বাগ্ৰীতি হচ্ছে (বাগ্ৰীতি হল) ‘হয়’-অর্থে ‘হচ্ছে, হল’ সচরাচর বাক্যের ‘মধ্যে’ থাকে, তবে ‘অন্তে’ থাকতেও যে বাধা নেই তা পূর্বে দেখিয়েছি (তুমি convinced হয়েছ কিনা জানি না) অশ্বত্থে যে একই অর্থে প্রযোজ্য তা একটা অব্যয় যোগ করলেই প্রতীত হবে। “আজ রবিবার হচ্ছে তো (কিংবা হল তো), তা হলে চলো মঙ্গলবারই বেরিয়ে পড়া যাক।” “সে আমার বন্ধু হচ্ছে (বা হল) তো, কেন খামকা আমার অনিষ্ট চিন্তা করবে?”—ভাষাগত কোন ত্রুটি দেখি না।

ব্যাকরণে একটা পরিচ্ছেদ থাকে Transformation of Sentences। এখানে দেখানো হয় বাক্যের গঠনে পার্থক্য আছে কিন্তু অর্থে পার্থক্য নেই। অবশ্য চুল-চেরা বিচারে সূক্ষ্ম পার্থক্য আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় এই পার্থক্য লক্ষ্য হয় না।

খোকা খেয়েছে?..... খোকার খাওয়া হয়েছে?

একে সত্য বলবে না?.....একে মিথ্যা বলবে?

একে বাঞ্ছনীয় মনে কর না?.....একে অবাঞ্ছনীয় মনে কর?

ও-বই আমার পড়া।....ও-বই আমি পড়েছি।

‘হয়, হচ্ছে, হল, হয়েছে, হবে’ প্রভৃতি প্রয়োগে ‘হ’ ধাতুর বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শুদ্ধ এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ‘হ’ ধাতুকে single out করা চলে না, কারণ অন্য ধাতুরও অন্য বৈশিষ্ট্য আছে। তবে ‘হ’ ধাতুকে ‘কর্’ ধাতুর সঙ্গে ব্র্যাকিট করে আলাদা স্থান দিতে আমি রাজী। ‘ক্রিয়া’ শব্দটাই ‘কৃ’ ধাতু-নিষ্পন্ন। অতএব ধাতুর মধ্যে ‘কর্’-এর স্থানই সর্বাত্মক। কিন্তু কেবল ‘কর্’ দিয়েই যাবতীয় ক্রিয়া নয়, ‘হ’ ছাড়াও চলে না। ‘ক্রিয়া’ সম্বন্ধে বাংলা ব্যাকরণে যতগুলি সংজ্ঞার্থ দেখেছি তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞার্থই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে—“হওয়া থাকা আর করা এই তিনি অবস্থাকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে”। ‘করা হওয়া থাকা’ বললে আরও ভাল লাগত। ছেলেবেলায় পণ্ডিতমহাশয় বলতেন, “কৃ ধাতু আর ভূ ধাতু জানা থাকলে ক্রিয়ার জন্য আর চিন্তা কী।”

তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ তার সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা আমার লোপ পেয়েছে। এখানে যা লিখলাম, তা-ও হয়তো স্পষ্ট হল না, মৌখিক আলাপে স্ফুটতর হতে পারত।

তোমার চিঠি ভাল লাগে। আমার চোখের অবস্থা শোচনীয়। কপালে কত দুঃখ আছে জানি না। কলকাতা হলে, যদি সময় হয়, সাক্ষাৎ করো। নিয়ত প্রার্থনা করি, আরও বড় হও। ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

x x x

কেবল ‘বর্তমান, অতীত’ কেন, ‘ভবিষ্যৎ কাল-রূপ’ দিয়েও ‘অতীত’ প্রকাশ করা হয়। “জানেন, আপনার বন্ধু আপনাকে কীরকম গালাগাল করেছেন?” শ্রোতার উত্তর—“হবে”। এখানে ‘হবে’ অতীত-দ্যোতক। সুনীতিকুমার নাম দিয়েছেন ‘পুরাণটিত সম্ভাব্য’ বা ‘সম্ভাব্য অতীত’। পূর্বে নাম দিয়েছিলেন ‘পুরাণটিত ভবিষ্যৎ’। ক্রিয়ার রূপ ‘করে থাকবে, বলে থাকবে, শুনে থাকবে, দেখে থাকবে’।

[সংযোজনা] ‘সংযোজনী’ শব্দ আমার নয়, ‘সংযোজনা’ বলা ভাল।

পত্র : চার

॥শ্রী॥

২২৩-ঈ কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১লা নভেম্বর ৭৭ প্রাতে

কল্যাণীয়েষু

তোমার তিন চিঠিই পেয়েছি।

যখন স্কুলে পড়তাম, রুল-করা কাগজে লিখতাম। এখন চোখের শেষ অবস্থা, তাই আবার রুল-করা কাগজ ধরেছি।

‘দুর্গং পথঃ’ সম্বন্ধে তোমার অনুমানই হয়তো ঠিক। তবে অনুসন্ধান করে আরও দু-একটি প্রয়োগ বার করতে হবে, নচেৎ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংশয় থাকে।

রাজশেখর বাবুর এ^১ চিহ্ন আমার ভাল লেগেছে, ১ ভাল লাগে নি। ১ ভাল না লাগার কারণ হাতের লেখায় পার্থক্যটা সব সময়ে সুস্পষ্ট হয় না। তথাপি চিহ্ন দুটি ভাল, কারণ এ এবং ১র জাতভাই তা বোঝা যায়। যাঁরা পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরা নিশ্চয়ই হাতের লেখায় সাবধান হবেন।

তোমার চিঠিতে দেখছি, ১ চিহ্নও যে দোষ তাড়াতাড়ি লেখার সময়ে এ-তেও সেই দোষ ঘটে, তথাপি আমার বক্তব্য, সচেতন লেখকেরা সাবধানেই লিখবেন।

এ-র মাথায় মাত্রা দিয়ে ‘ত্ + র’ করা হয়েছে, ও-র মাত্রা বসিয়ে তুমি অ্যা করতে চাও, যুক্তির দিক্ থেকে অনবদ্য। তবে সাধারণ পাঠকের বিভ্রান্তি হবেই। ১৯৩১ সালে টাউন হলে রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রথম সভায় বাংলা দেশের গণ্যমান্য বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেজেগুজে মালা পরে বসে আছে, রাধাকৃষ্ণন্^২ সভাপতি। সেই সভায় ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য^৩ একটা লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন। ‘উদাস্ত’ কথাটাকে তিনি পাঠ করলেন ‘উদাও’—একবার নয়, কয়েকবার। আমার এত অস্বস্তি হয়েছিল যা আজও তোমার ‘ও’ দেখে মনে পড়ে গেল।

আমার বক্তব্য এ ও যা-হয় একটা করো—অ্যা-টাকে নির্বাসন দাও। যা বানানটি কেবল অশিক্ষিত লোকেরা ভুল করে তা নয়। শিক্ষিত লোকেরাও ভুল করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ‘সহজপাঠ’-এ এই ভুল করেছেন।

‘হচ্ছে হ্’ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য চিঠিতে প্রকাশ করতে পারব না। স্বরভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। তবে তা কতটা গ্রহণযোগ্য সে-বিচার তোমাদের। এ বিষয়ে আমার কোন ধনুর্ভঙ্গ পণ নেই, বিতর্ক স্থলেই কথাগুলি বলছি। তুমি যে-বাক্যগুলিকে অস্বীকার করছ, Cold print-এ কিংবা context-হীন হলে সেগুলি বাংলা নয়, স্বীকার্য। কিন্তু অঙ্গভঙ্গি স্বরভঙ্গিতে সেগুলিও ক্ষেত্রবিশেষে অর্থপূর্ণ বাক্য হয়।

তুমি একবার লিখেছিলে, আমার মাধ্যমিক ব্যাকরণ’ তোমার কাছে আছে, কোন সংস্করণ তা অবশ্য জানি না। যে-সংস্করণই হোক বইখানা থাকলে ৮০-পৃষ্ঠা খুলে দেখো। ‘র’ যে কখন কখন ‘কার’ হয় তার দৃষ্টান্ত আছে। তবে নীচু ক্লাসের বই বলে কোন আলোচনা নেই।

অ্যা বর্ষ সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। প্রবন্ধ লিখে কোন ফল হবে বলে আমি মনে করি না। যদি কোন প্রতিষ্ঠান-মারফৎ ধাক্কা মারতে পার, অর্থাৎ একটা রীতি চালু করতে পার, ব্যাপারটা সহজ হবে। অনুকরণপ্রিয় দেশ বানানটা সহজেই গ্রহণ করবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বহু কৃতি, যশস্বী পণ্ডিতকে অনুরোধ করেছি, কোন ফল হয় নি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ কিছু করতে পেরেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ’ বলেই ; যোগেশচন্দ্র,^৪ রামানন্দ,^৫ রাজশেখর, সুনীতিবাবু সফল হন নি। তুমি প্রবন্ধ লিখলে হয় তো দু-একটা পান্টা প্রস্তাব কিংবা বাহবা পাবে, কিন্তু কাজ কিছু হবে না। কিন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য অকাদেমি, এমনকি কোন নামজাদা প্রেস থেকেও দু-চারখানা বইয়ে ঐ বানান চালু কর, তখন অন্যান্য লেখক সাহস পাবে।

হালে আমার একটা বই^৬ বেরিয়েছে। বাঁধানো অবস্থায় এখন পর্যন্ত আমার হাতে আসে নি। আমার কতকগুলি পুরানো লেখা সংগ্রহ কর আমার ভাই বইখানা ছেপেছে। নাম দিয়েছি ‘সাময়িকী’। শিক্ষিত লোকের পড়বার মতো কোন বস্তু বইয়ে নেই। তথাপি ভাবছিলাম তোমাকে এক কপি পাঠাব কিনা। আমার দ্বিধার কারণ, কাহাকেও নিজের লেখা দেখানোর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার থাকে। সে-অহঙ্কার আমার নেই। আবার অন্যদিক্, বই না দিলে যাঁরা আপন জন তাঁরা দুঃখবোধ করেন। আমার যখন এই সমস্যা তখন অসীম^৭ এসে বলল ‘শিশিরকে একখানা বই দিও’। একথা সে কেন বলল বুঝতে পারছি না—হতে পারে কোন প্রবন্ধ তার ভাল লেগেছে কিংবা তোমাকে আমি স্নেহ করি, উভয়ের একটা আন্তরিক যোগ রক্ষা হোক এটা তারও ইচ্ছা। বই হাতে এলে তোমাকে পাঠাব।

‘বাংলা বানান’^৮ দুই ফর্মা ছাপা হয়েছে। তারই মধ্যে বিব্রী বিব্রী ভুল আছে। ঘরে বসে Press কে বশে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। বই কবে বেরুবে কিংবা আদৌ বেরুবে কিনা জানি না। অথচ এমন ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে আমার লজ্জা করছে। প্রকাশকের যোগ্যতার অভাব, না, আন্তরিকতার অভাব বুঝতে পারছি না—আবার নিজেরাই বলছে বইখানার জন্য বহু order এসেছে।

সত্যি চক্ষুর যন্ত্রণায় অস্থির আছি। স্নেহাশীর্বাদ জানবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : পাঁচ

।।শ্রী।।

২২৩-ই কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
৩ জানুয়ারি ১৯৭৮

কল্যাণীয়েষু

পঞ্চতন্ত্রকথামুখম-এ পড়েছিলাম, হংস অম্বু থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করে। কিন্তু অম্বুকেই ক্ষীরে পরিণত করে যে সে হংস নয়, সে শিশির। এযুগে তোমার মতো সমালোচকের জন্ম হল কেমন করে ভেবে পাই না। সমালোচকের ধর্ম হচ্ছে ত্রুটি আবিষ্কার করা, আর শিশিরের কাজ

হচ্ছে ক্রটিগুলি চেপে রেখে শুণ কিছু আছে কিনা তার সন্ধান করা; শুণ খুঁজে না পেলে ক্রটিকেই শুণে রূপান্তর করা।

তোমার উৎসাহ-ব্যঞ্জক চিঠিখানি যথাসময়ে পেয়েছি। তবে হরবল্লভের^১ মতোই আমার মনে হচ্ছে “মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কী হইবে।”

আশী বছর বয়সে আমার প্রথম বই^২ ছাপা হয়েছে এতেই বুঝতে পারছি লেখক নামে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। কালে ভদ্রে দু-একটা প্রবন্ধ লিখে সাময়িক-পত্রে দিতে হয়েছে এর তার অনুরোধে। নিজের লেখার প্রতি আমার মোহ নেই, তবে মমত্ববোধ আছে ঠিকই। কেউ ভাল বললে বেশ লাগে, উপেক্ষা করলে প্রাণে লাগে—কিন্তু রাগ করি না কারণ আমি জানি, আমার মেধা নেই এবং কোনকালেই পড়াশুনা করি নি। সারাটা জীবন কাটিয়েছি স্কুলমাস্টারি^৩ করে। মাস্টারি করেও লেখাপড়া করা চলে, কিন্তু আমি করেছি হেডমাস্টারি, অর্থাৎ তদারকি, এবং এই কাজেই দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা, কখন কখন রাত্রি দশটা বারোটা একটা দেড়টা। ফলে না দেখেছি সংসার, না করেছি সাহিত্যচর্চা—আমার মতো একুল ওকুল দুকুল নষ্ট করেছে সংসারে এমন লোক বিরল। বাল্যযৌবনে পিতার অগ্নে প্রতিপালিত, বার্ষক্যে আছি ছেলেদের আশ্রয়ে।

ছেলেরা তেমন অযোগ্য হয় নি, এতে অবশ্য কিছু নিশ্চিত আছে। কিন্তু এই বয়সে বই ছাপতে লজ্জা আছে। লজ্জা আমার জন্য নয়। ছেলেদেরই জন্য। বই ছাপার কথা কখনও মনে আসে নি। কিন্তু অসীম কী ভেবেছে কে জানে, বোধ হয় আসলে কোন রকমে সচল রাখার ইচ্ছাতেই কিছু লেখার জন্য পুনঃপুনঃ তাড়া দেয় এবং বই ছাপানোর আগ্রহ প্রকাশ করে। এমন সময়ে একই আগ্রহে আমার ভাই কিছু কিছু লেখা সংগ্রহ করে। কিছু কিছু লেখা আমার নিজের কাছেও ছিল, তাই দিয়েই ‘গ্রন্থকার’ হয়ে বসলাম। তবে আমার ওজন আমার জানা আছে, শিশিরকে বই দেওয়া সম্ভব কিনা ভাবছিলাম। অসীম যখন বই পাঠাতে বলল, সব দ্বিধা ঘুচিয়ে দিয়ে শিশিরকে ‘সম্মানিত এবং আনন্দিত’ করলাম।

‘সাময়িকী’ নাম তোমার পছন্দ হয় নি। আমার কিন্তু ‘সাময়িকী’ নামেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় কিনা আশঙ্কা হয়েছে, তাই একটা ‘আভাষ’ লিখেছি। বইয়ের নাম হওয়া উচিত ছিল ‘প্রতিবাদ’—কারণ দু-একটা ছাড়া প্রায় সবগুলি প্রবন্ধই কোন-না-কোন ব্যাপারের প্রতিবাদ—কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন। ক্ষণেক্ষণে যে কলম ধরেছি, বহু ক্ষেত্রেই তার কারণ মনের আনন্দ নয়, মনঃক্ষোভ। আমার বর্তমান মনোভাব প্রকাশ করেছে প্রচ্ছদ-পটে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি একে একে সবগুলি পাখিই উড়ে যাচ্ছে, কোথা থেকে আসছে কোথায় যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রার্থনা করি, শান্তিময় দীর্ঘজীবন লাভ কর। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : ছয়

।।শ্রী।।

২২৩-ঈ কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৩ জুলাই ১৯৭৮

কল্যাণীয়েষু

তোমার ২৮ জুন ও ৯ জুলাইর চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। প্রথম পত্রের উত্তর দিতে দেরি হল কেন, জানাই। আমি ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে ‘বাংলা বানান’^১ তোমার হস্তগত হয়েছে। এ বই তোমার পছন্দ হওয়ার কথা নয়, অথচ তুমি যে রূপ সৌজন্যপরায়ণ তাতে আমাকে সোজাসুজি একথা লিখতেও পারবে না। ফলে আমি চিঠি লিখলে তুমি বিব্রত হবে, তাই লিখি নি।

ছাইয়ের মধ্যেও তুমি মুক্তা কুড়িয়ে পাও, একথা আমার জানা আছে। আমার বৃদ্ধ বয়সে এইটুকুই সাধনা যে তোমাদের মতো দু’একজন পণ্ডিত সজ্জনের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

আমার ‘বাংলা বানান’ সুনীতিবাবুকেই উৎসর্গ করেছি তা দেখেছ। ‘সাময়িকী’র প্রবন্ধ ‘অতি-সাধারণের কাছে’ পড়েও জেগেছ রবীন্দ্রনাথকে আমি কী চোখে দেখি। অথচ ‘বাংলা বানান’ প্রবন্ধে প্রধানতঃ এই দুই জনকেই সমালোচনা করেছি। প্রবন্ধ যখন ছাপা হয় তখন সুনীতিবাবু জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি প্রবন্ধ দেখেছেনও, কারণ ‘কুস্তিবাস’ পত্রিকা তাঁর কাছে পাঠানো হত।

তোমার Bengali Linguistic Historiography পড়ে আশ্চর্য হয়েছি। এই বয়সে এত পড়াশুনা কী করে করল ভেবে অবাক হই। মেধা হয়তো বালক-বয়স থেকেই থাকে, কিন্তু পাণ্ডিত্য অর্জন করতে তো সময়ের দরকার হয়। তোমার ক্ষেত্রেও কালিদাসের অমর পঙ্ক্তিই স্মরণে আসে—বৃদ্ধত্ব জরসা বিনা। Historiography পড়লে কোন্ সভায়?

সুনীতিবাবুকে তুমি অসম্মান অশ্রদ্ধা দেখাও নি। সুনীতিবাবু সম্বন্ধে তোমার বাংলা প্রবন্ধও পড়েছি। সুনীতিবাবুর প্রতি সুবিচারই হয়েছে। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা যথেষ্ট দেখিয়েছ—আবার তাঁর গ্রন্থের ত্রুটিও দেখিয়েছ। এ না করলে ‘বিষয়’-এর প্রতিই অবহেলা দেখানো হত। যাঁরা O. D. B. L. এর এক লাইনও হয়তো পড়েননি, তাঁদের O.D.B.L. সম্বন্ধে আহা উহু’র কোন মূল্য আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছ, তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে।

তোমার গুরু শশিভূষণ দাশগুপ্ত একদিন আমায় বলেছিলেন সুনীতিবাবু সারা জীবন বসে করলেন কি? সেই এক O.D.B.L. আর তারপর কেবল ভ্রমণ-কাহিনী।” তাঁর কথায় অবশ্য অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছিল।

O.D.B.L. সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ শুনে সুনীতিবাবু উত্তেজিত বোধ করছিলেন বলে তুমি লিখেছ। সুনীতিবাবু প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না একথা আমারও জানা আছে।

এবার ‘বাংলা বানান’ সম্বন্ধে বলি।

প্রবন্ধটা লেখা হয়েছিল ১৪/১৫ বছর আগে। আধুনিক লেখকদের কেটা বেপরোয়া ভাব দেখে এবং দু’একজন আধুনিক পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করার পর প্রবন্ধটা লিখেছিলাম।

ফলে ভাষা কিছু উগ্র হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধে আমার ব্যক্তিগত রুচিই প্রকাশ পেয়েছে বলে ওটা ছেপে সাধারণের গোচর করা সঙ্গত বিবেচনা করি নি। আধুনিক লেখকদের সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিবাবু, বানান-সংস্কার সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ সকলকেই টেনে আনতে হয়েছে। এটা যে একটা চপলতা, তা তখনই বুঝেছিলাম। কিন্তু বছর দুই আগে যখন অসীমের বাসায় ছিলাম, কয়েকজন অধ্যাপক মাঝে মাঝে বানান সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলায়, ঐ প্রবন্ধটা বাস্তব থেকে বার করে ওঁদের শুনিয়েছিলাম। ওঁদের পীড়াপীড়িতে লেখাটা ‘কৃষ্টিবাস’-এ ছাপা হল। ছাপার সময়ে নূতন কিছু কিছু সংযোজন করেছিলাম। কিন্তু আলস্যবশতঃ কিংবা দম ফুরিয়ে গেছে বলে ভাষাটাকে আর সংস্কার করা হল না—এজন্য কুণ্ঠাবোধ আছে। বই ছাপার সঙ্কল্প ছিল না। আশা প্রকাশনীর তাগিদে বোধ হয় শঙ্খ অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাই সুবীর ভট্টাচার্যের হাতে লেখাটাকে সমর্পণ করতে হল।

বই যখন ছাপা হয়েছে, যত লজ্জা থাক, বই তোমাকে দিতেই হবে। তার পরের ইতিহাস এই চিঠির ভূমিকাতেই লিখেছি। এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

পূর্ব-পাকিস্তানের তথ্য যাদবপুরের অধ্যাপক জগন্নাথ চন্দ্রবর্তীর বানান সংস্কার প্রস্তাব দেখে আমি তোমার সঙ্গে সর্বাংশে একমত যে রোম্যান লিপি গ্রহণ করলে সব ধারণার অবসান হয়।

তোমার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে তোমার চিঠির ক্রম ধরে উত্তর দিয়ে যাই। তাতে আমার শ্রম লাঘব হবে ; যদি বুঝতে না পার, লিখে আবার জ্ঞানাবে।

তুমি একেবারেই ভুল বোঝ নি। তৎসম শব্দে হস্তক্ষেপ করেই ক. বি. বানান সং-সমিতি বাংলা বানানে স্বৈরাচার এনেছেন, এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি। বানান-সং-সমিতির কথায় কথায় বিকল্প-বিধির এবং অতিরিক্ত ‘ক্ষনিপ্রিয়তা’-ও বানানে উচ্ছৃঙ্খলতা এনেছে—‘জিগগেশু, জন্মুআরি-ওআলা’ প্রভৃতি ক্ষনিসঙ্গত বানান আমার কানের ক্ষতি না করলেও চোখকে উৎপীড়িত করেছে। ‘জিগগেশু’ অবশ্য বানান-সমিতির বিধান নয়, কিন্তু একাধিক খ্যাতিমান অধ্যাপক চিঠিতে আমাকে নানা প্রশ্ন ‘জিগগেশু’ করে পাঠাচ্ছেন। ক্ষনিকে প্রাধান্য দিলে ওবানান আসবেই।

তুমি standardization-এর কথা বলেছ, একথা আমিও বলি। তবে অভিধান-রচনার সময় হয়নি। এজন্যও আমি সুনীতিবাবুকেই দায়ী করি। ব্যাকরণ-সংস্কারের যথেষ্ট সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু সে-সুযোগের সদ্যবহার তিনি করেন নি। ব্যাকরণ না হলে বানান হয় না—অভিধান রচনার উপকরণ কোথায়?

আমার লেখাটা যদি ভাল করে পড়, দেখবে আমি আমার রুচিসম্মত বানান দেশ গ্রহণ করুক এ আকাঙ্ক্ষা জানাই নি—আমি চেয়েছি অবিলম্বে একটি শক্তিশালী বানান-সংস্কার-সমিতির প্রতিষ্ঠা যার বিধান দেশ মানতে বাধ্য হয়।

নট, নঠ, ন্ড, নু, স্ট লেখা আমি অনুমোদন করি না, কারণ এসব বানান ক্ষনিসঙ্গত নয়—অনর্থক ন্ ও স্-এর উৎপীড়ন। একথা আমি সুস্পষ্টভাষায় ১৯২৮ সালে Teachers' Journal-এর এক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বলেছিলাম। কিন্তু রাজশেখর বাবুর কাছে তখনকার উদীয়মান লেখক বুদ্ধদেব বসুর বানান-প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় রাজশেখরবাবু বিধান দিলেন “ণ স্থানে ন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যুক্তাক্ষরের অংশকে ইচ্ছামত গণনা মনে করা যাইতে পারে।” (বাংলা বানান, পৃ. ৯১ দেখো) অর্থাৎ রাজশেখর বাবু নট, নঠ মেনে নিলেন। বুদ্ধদেব লিখতে

শুরু করলেন ‘স্টেশন’। শনিবারের চিঠি বিদ্রূপ করল ‘স্টেশন’। কিন্তু শনিবারের পৃষ্ঠপোষক সুনীতিবাবুও ‘ইষ্টবেঙ্গল’ সহ্য করতে পারলেন না—প্রায়ই বলতেন ‘ইষ্টো বেঙ্গল’। যতটা মনে পড়ে মুর্খ্য-ব’তেই তাঁর আপত্তি ছিল। সম্ভবতঃ তিনি চেয়েছিলেন ‘ইস্ট’। তখনও ‘স্ট’র সৃষ্টি হয় নি।

প্রসঙ্গতঃ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করি—মাগধীতে যেমন ‘ষ স’ নেই, শৌরসেনী মাহারাষ্ট্রাতেও ‘শ ব’ নেই, আর পৈশাচীতে তো সূত্রই রয়েছে ‘ষ্টস্য ষ্টঃ’। এসম্পর্কে আমার অভিমত যদি জানতে চাও বাং বানান পৃ. ৪৭, ৪৮ দেখো, বিশেষভাবে পৃ. ৪৮। সেখানে বলেছি ‘মুর্খ্য বর্ণের সহিত দন্ত্য বর্ণ যুক্ত হতে পারে না’।

সং-সমিতি ‘ষ্টীষ্ট’ বিধান দিয়েছেন, কিন্তু ‘ষ্টেশন ষ্টীমার’ সম্বন্ধে নির্বাক। সুনীতিবাবু ‘ষ্টেশন ষ্টীমার’ লিখতেন, কিন্তু চলন্তিকা লিখছেন ‘ষ্টেশন স্টীমার’। সমিতির বিধান মেনে আমিও ‘ষ্টীটি’ লিখছি। আধুনিকেরা লিখছেন ‘ষ্ট্টি’। আমার বক্তব্য fit আর feet-এর উচ্চারণ এক নয়। প্রথমটা ফিট, দ্বিতীয়টা ফীট (প্রথমটাতে ট ‘এ হস্ ইচ্ছাকৃত)। পুনরায় বানান-সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত এই রকমই চলবে। তবে তত দিন আমি জীবিত থাকব না।

‘বিকেল’ আমি যদি বা সহ্য করতে পারি, ‘ভেতর ওপর’ কিছুতেই নয়। ‘চলিত’ ভাষায় ‘পূজো’ বা ‘পূজোর’ দরকার কী? ‘পূজা’ লিখলে কী ক্ষতি? চিঠিতে, নাটকে ‘পূজো’ লেখো, প্রবন্ধে ‘পূজা’ লেখো। রবীন্দ্রনাথ তো ‘ডুবেছে মোর’ যেখানে লিখছেন, সেখানেও ‘সন্ধ্যার পূজা’ লিখতে ইতস্ততঃ করেন নি। ছন্দের প্রশ্ন তুলবে না কি জানি না। কবির ‘চলিত’ গদ্যেও অজস্র ‘জিজ্ঞাসা, সন্ধ্যা’ পাবে। অর্থাৎ ‘সন্ধ্যা’ ছাড়াও চলতে পারে।

বিশেষ্য ‘যশঃ তেজঃ’ আর সম্ভব নয়, অব্যয় সদ্যঃ-ও আর চলবে না, কিন্তু ‘সম্ভবতঃ, অন্ততঃ, ক্রমশঃ, প্রায়শঃ’ রাখতে দোষ দেখি না। ‘পুনঃপুনঃ’-তে আমার হাসি পায়।

‘লুপ্তিচিহ্ন’ সুন্দর পরিভাষা। কিন্তু সর্বত্র চলবে না। ‘বলিয়া’ স্থলে যদি/বলে//লেখ, লুপ্তিচিহ্ন বলা যেতে পারে, কিন্তু/বলে/লিখলে কি লুপ্তিচিহ্ন বলবে? অপিনিহিতির ই-লোপ বললে বোধ হয় বেশি বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন/ঙ’র প্রতি/এখানে/’/লুপ্তিচিহ্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে অনেকেই এইরূপ ব্যবহার করেন। আমি দ্বিধাগ্রস্ত। বিশেষ কোন নিয়ম নেই বলে আমি কখন লিখি/ঙ’র/, কখন লিখি/ঙ-র/‘কমা’ শব্দ ইংরেজীতেও কিন্তু সব সময়ে, নয়, প্রমাণ ‘inverted commas’, আমরা যার নাম দিয়েছি ‘উদ্ধৃতিচিহ্ন’।

‘নির্দেশক সন্ধেত’ ও ‘কর্মবাচ্য’ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য জানাবে। প্রথমটা আমার সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয়টা আমার প্রস্তাব। তোমার আপত্তি খণ্ডন করতে না পারলে নিশ্চয়ই মত পরিবর্তন করব।

‘নির্দেশক সন্ধেত’ ছাপা হয়, W.B.H.A. Bulletin December 1965-এ। সুনীতিবাবুর ‘সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’-এর 1968-সংস্করণ আমি দেখি নি। Jany-1970 সংস্করণে ‘নির্দেশক প্রত্যয়?’ পরিচ্ছেদে এক নূতন পাদটীকা দেখি : “ * ইহা বস্তুতঃ ‘পদাশ্রিত নির্দেশক’। কিন্তু পাঠক্রমে ইহাকে ‘নির্দেশক প্রত্যয়’ নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। বাঙ্গালাতে ‘পদাশ্রিত নির্দেশক’ বা ‘নির্দেশক প্রত্যয়’-রূপে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দাংশের উৎপত্তি ও রূপ বিষয়ে ODBL গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে।”

‘কর্মবাচ্য’ ছাপা হয় W.B.H.A. Bulletin-এ 1966 মার্চ মাসে। এ প্রবন্ধের কোন সমালোচনা হয়েছে কিনা জানি না।

আমার পায়ের ব্যথা সমানে চলছে। চক্ষুর অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ। কিন্তু মৃত্যু কত দূরে জানি না।

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তোমার সর্বঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। ইতি

নিয়ত-শুভানুধ্যায়ী
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : সাত

।। শ্রী।।

২২ জানুয়ারি বিকালে,
১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু

তোমার ২৩শে ডিসেম্বর ও ১০ই জানুয়ারির দুই চিঠিই যথাসময়ে পেয়েছি।

মাসাধিককাল কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি, দিন পনেরো একেবারে শয্যাগত ছিলাম, পাশ ফিরতেও পারতাম না। এখন যাকে বলে ‘শয্যাগত’ তা অবশ্য নই, তবে উঠতে বসতে দাঁড়াতে হাঁটতে জীবিত বা জড় আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়; পূর্বের ব্যাধিগুলোও সবই তাদের পরাক্রম দেখাচ্ছে, মর্ত্যের ডাক্তারদের কাছে তারা হার মানতে চায় না। আসল কথা বয়সটা অতিরিক্ত বেশী হয়ে গেছে, সুতরাং এইসব উপসর্গ স্বাভাবিক। ৮০ বৎসর পূর্তিতে রবীন্দ্রনাথকে যখন মহাত্মাজি আরও দীর্ঘায়ু কামনা জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আশী বছর বাঁচাটাই ‘বেয়াদবি’ বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অপারেশনের দেড় ঘণ্টা আগেও তিনি যে কবিতা রচনা করেছেন, তাকেও পণ্ডিতেরা উপেক্ষা করতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে অকর্মণ্য অকৃতী লোকের ৮১-পূর্তিকে ‘বেয়াদবি’ বললে খুবই কম বলা হয়। বলতে হয় অমাজনীয় অপরাধ। তোমার ২১শে ডিসেম্বরের চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সুতরাং এবার ডাকবিভাগের কোন অপরাধ নেই।

তোমার চিঠিতে তোমার মানসিক অশান্তির যে-বর্ণনা দিয়েছ তাতে আমি ততটা দুঃখিত হই নি, যতটা হওয়া স্বাভাবিক বা উচিত ছিল। কারণ আমারও ঐ যন্ত্রণা। তবে আমি শক্তিহীন, যোগ্যতাহীন বলে দুঃখবোধই করতে পারি, প্রতিকারের সামর্থ্য নেই। তোমার ক্ষেত্রে সে-কথা খাটে না। শরীরটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে বলে বিশ্রামের প্রয়োজন, কিন্তু স্বাস্থ্যটা ফিরে পেলেই বিরুদ্ধ শক্তি সঙ্গে মোকাবেলা করো। সুনীতিবাবু চিন্তাহরণবাবু প্রভৃতিকে বলে বলে হয়রান হয়েছি—এমন কি তাঁদের উত্তরে বিরক্তও হয়েছি, আমার মনে হয়েছে, তাঁদেরও সেই আন্তরিকতা ছিল না—সর্বদাই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। কিন্তু আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমার কাছ থেকেই প্রথম গুনলাম যে ভাষার অনাদরে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এইজন্যই তোমার অসুস্থতায় উদ্বিগ্নও যেমন হই, বিধাতার আশীর্বাদে শীঘ্র স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হলে আশাও তেমন হয়। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প দিনের; তোমার খ্যাতি পূর্বেই শুনেছি, এবং শুনেছি শশিভূষণের কাছ থেকেই। কিন্তু বাংলা দেশে ও বাংলা ভাষায় খ্যাতিমান পুরুষ আরও আছেন। ভাষার দুর্গতিতে মানসিক যন্ত্রণায় শরীর অসুস্থ হয়, এটা তোমার ক্ষেত্রেই প্রথম দেখলাম এবং জানলাম। তোমাকে সত্য সত্যিই

ভালবাসি বলে তোমার রোগে উদ্বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু তোমার এই অশান্তিতে যে আমি কতটা সুখী হয়েছি তা বলতে পারব না। ভাষাদরদী বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের কাছেও ভাষার শুদ্ধি উন্নতি বিষয়ে আলাপে লক্ষ্য করেছি, কিছুক্ষণের আলাপের পরই একটা নাসিকা-কুণ্ঠন ভাব। আমার ধারণা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই হেলাফেলা ভাবটা কোন দিন ছিল না। তোমার মানসিক যন্ত্রণার আমি একজন সাথী বলে তোমার এই দুঃখে আমার সুখ উপস্থিত হয়েছে। প্রার্থনা করি শীঘ্র নিরাময় হও এবং সমধিক উৎসাহে মাতৃভাষার সেবায় অগ্রসর হও। কাণ্ডারীহীন তরণীর দুর্গতি আর দেখা যায় না।

আমার আশীর্বাদ জানাবে। সুস্মিতাকে^১ আমার কথা বোলো। দুর্বলতায় লেখাগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে গেল। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : আট

।।শ্রী।।

২৭ এপ্রিল ১৯৭৯

কল্যাণীয়েষু

তোমার বর্ষশেষের চিঠি ও সুস্মিতার ২১.৪.৭৯-র চিঠি পেয়েছি।

এখনও সুস্থ হও নি জেনে খারাপ লাগছে। চিন্তা করতে বারণ করেছে। চিন্তা কেউ ইচ্ছা করে করে না—চিন্তা আপনি আসে এবং সময়ে সময়ে একের চিন্তায় অন্য লোক ক্লিষ্ট হয় বা বিরক্ত হয়। দুর্বল ব্যক্তিরই চিন্তা বেশী। কিন্তু দুর্বলতা-পরিহারও সাধনাসাপেক্ষ। আমার সে-সাধনা নেই।

অসীম ভাল হয়েছে কিন্তু দুর্বলতা যায় নি, এখনও অফিসে যেতে পারছে না। তার উপর মেয়ে পাপুরও^২ প্রবল জ্বর ও জলবসন্ত চলছে। সুমিত্রা^৩ কেমন আছে বলতে পারি না। এ বাড়িতে পূত্রবধু ছায়ার^৪ ক্যান্সার চিকিৎসা চলছে। কালিন্দী এস্টেটে কন্যা ভারতীর^৫ অ্যানিমিয়া। একমাস যাবৎ শয্যাগত। ‘বাংলা বানান’-এর মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রশস্তি অনেক পাচ্ছি। তাতে নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। আমি চেয়েছিলাম, পণ্ডিতেরা এদিকে দৃষ্টি দিন, যাতে ভাষা নিয়ে ছিনিমিনি না হয়। তবে ভাষার শুদ্ধি বা ব্যাকরণ বিষয়ে দেশের সাহিত্যিক মহল কতটা শ্রদ্ধাশীল তা চার-পাঁচ চিঠিতে তুমি আমাকে লিখেছ। কিছু করার নেই। সুনীতিবাবুর কথাই ঠিক ‘এদেশের কিছু হবে না।’

...

সম্প্রতি শান্তিনিকেতন থেকে প্রবোধচন্দ্র সেন^৬ আমাকে কয়েকখানি চিঠি দিয়েছেন। ‘রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবন’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন—‘মুগ্ধ হয়েছে, বার বার পড়েছি’—এছাড়া

যেসব কথা লিখেছেন তা তোমায় লিখতে পারব না। লিখলে তুমি আমাকেই বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করবে।

এখন তাড়াতাড়ি যাতে দেহরক্ষা করতে পারি তারই কামনায় আছি। আর বেঁচে থাকলে অনেক শোকতাপ পেতে হবে, তবে মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের মতো বন্ধু পেলাম। তাতে জীবন সার্থক মনে হয়।

প্রার্থনা করি, সত্বর আরোগ্য লাভ কর ও পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যের সেবা কর। ইতি

আশীর্বাদক
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

। প্রঃ ॥

২৭ এপ্রিল ১৯৭০

কল্যাণীন্দ্র -

তোমার বর্তমান চিঠি ও সুস্বাদু
২২.৪.৭০-এ চিঠি পেয়েছি।

ঈশ্বর সুস্থ হও যি তোমার সারস
লাগছে। চিঠি কত বাক্য করেছে। চিঠি
কত ইচ্ছা করে করে না - চিঠি আমার
আমি এত সময়ে সময়ে এত চিঠি করে
নেই কিচ্ছ হ্যাঁ বা বিচ্ছ হ্যাঁ। দুই
গুণিতক চিঠি কেন। কিন্তু দুইগুণিতক
মার্কসমাগত। আমার সে-মার্কসমাগত।

এমনি তোমার হ্যাঁ কিচ্ছ দুইগুণিতক
না যি, এমনি এমনি হ্যাঁ না হ্যাঁ না।
ও তোমার, হ্যাঁ না হ্যাঁ ও দুইগুণিতক ও চন্দ্রমাগত
চন্দ্রমাগত, সুস্বাদু হ্যাঁ হ্যাঁ চন্দ্রমাগত।
এমনি দুইগুণিতক হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চিঠি
চন্দ্রমাগত। কল্যাণীন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

‘ବୀରମାଳା’- ୧୦- ଯୁଦ୍ଧରେ ଓ ରାଜ୍ୟରାଜ୍ୟେ
 ଯୁଦ୍ଧରେ କାଳେ ମାଲେ, ଗୁଡ଼ ନିଶାପୁର
 କାହାଣୀ ମାଳା-ମାଳା ୧୨, ଯେଉଁ କାଳେ ଗୁମାସ୍ତା-
 । ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା । କାଳେ- ଗୁମାସ୍ତା, ମାଳା ଗୁମାସ୍ତା
 ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ମାଳା, ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତା ମାଳା
 ୧୨ । ଗୁମାସ୍ତା, ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା-
 ବିଶେଷ ମାଳା, ଆହୁତିରା ମାଳା କେତେକ ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା- ମାଳା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ମାଳା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା । ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ‘ଏ ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ୧୨ ।’

ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ୧୨- ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା, ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା । ୧୨
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ।

ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା

୧୨ ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା

ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା, ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା

ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା
 ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା

পত্র : নয়

।।শ্রী।।

৩-৮-৭৯ দুপুরে

কল্যাণীয়েষু

কাল অসীম এসে বলল তুমি আমার চিঠি না পেয়ে চিন্তিত আছ, কিছু দিন আগে নাকি তুমি আমাকে চিঠি দিয়েছিলে।

আমি তোমার শেষ চিঠি পেয়েছি ১৭ই এপ্রিল, সুস্মিতার শেষ চিঠি পেয়েছি ২৫শে এপ্রিল, আমি তোমাকে শেষ চিঠি দিয়েছি ২৭শে এপ্রিল। তারপরে আর তোমার খবর না পেয়ে চিন্তিত ছিলাম। অসীমকে জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর পাইনি, কারণ ওর চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস নেই বললেই হয়। শঙ্কুও ভাসাভাসা উত্তর দিয়েছে। সুস্মিতার চিঠিতে তোমার দুর্বলতার কথা ছিল। তাই মনে করেছি চিঠিপত্র লিখতে তোমার কষ্ট হয়। সুতরাং তোমাকে আর লিখি নি, কিন্তু খুবই উদ্বেগ ছিল।

তোমার স্বাস্থ্যের জন্যই তুমি শিলিগুড়ির কাজ নিচ্ছ না, একথাও শঙ্কুর কাছে শুনেছিলাম।

কাল অসীম বলল, তুমি নাকি কলকাতা আসছ এক বছরের জন্য একা—একখানা ঘর চাও। এর বেশি কিছু বলতে পারল না। ঘরের সন্ধান অসীম করবে। শঙ্কু এলে তাকেও বলব, অত্রকেও^১ বলব। আমার বড় ছেলে কল্যাণ^২ তার স্ত্রীর অসুখ নিয়ে খুবই বিব্রত। বিব্রত শঙ্কু অসীম অত্র সকলেই—ওরা প্রায় প্রতিদিনই ডাক্তার বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে। পুত্রবধূ ছায়ার cancer—এজন্য চার মাস পর্যন্ত ঘরের সকলেই উদ্বিগ্ন।

তুমি এখানে কেন আসছ, ভাল করে জানাবে।

তোমাকে কেন চিঠিতে লিখেছি কিনা মনে নেই শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত প্রবোধ সেন ‘সাময়িকী’ পড়ে খুবই উচ্ছ্বাসপূর্ণ দুইখানি চিঠি দিয়েছেন এবং শঙ্কুর কাছে শুনেছি যাদবপুরের দেবীবাবুর^৩ কাছেও নাকি ‘রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনা’ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। ‘বাংলা বানান’ তিনি দেখেছেন কিনা জানি না।

‘বাংলা বানান’^২-এর আটটা সমালোচনা পেয়েছি সাময়িকপত্রে। শঙ্কু অসীমই এগুলি সংগ্রহ করে আনে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত Indian Book Chronicle Jany. 79 সংখ্যা যাদবপুরের স্বপন মজুমদার^৪ ‘বাংলা বানান’-কে বাংলাভাষার best book of the year বলে এক দীর্ঘ প্রশংসিত রচনা করেছেন।

কিন্তু তাতে আমার যথেষ্ট আত্মপ্রসাদলাভ হলেও মূল উদ্দেশ্য সফল হয় নি। এ বই কারও নজরে আসবে আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি তবে নজরেই যদি এল, কিছু কাজ হলে ভাল হত। আমি চেয়েছিলাম সুধী জনেরা মিলিত হয়ে অর্থাৎ একটা শক্তিশালী কমিটি গঠন করে বানান ব্যাকরণের অরাজকতা দূর করুন। সেদিকে কারও যে দুশ্চিন্তা নেই সে বিষয়ে তোমার পূর্বচিঠিগুলিতে বেশ ভাল করেই লিখেছি। এই বই দুখানি পড়ে অনেক নূতন নূতন বন্ধু (সাহিত্যিক, অধ্যাপক) আমার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের সকলকেই তোমার কথা বলি। বলি যে অন্ততঃ একজন ভাষাবাদী আছেন, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা দেখে যাঁরা দৈহিক পীড়া বৃদ্ধি পায়।

আমার চোখ নিবু-নিবু আকাশে রোদ না থাকলে খুবই কষ্ট হয়—লেখাপড়ার তো কথাই আসে না। বয়সটাই এত বেশি হয়ে গেছে যে এজন্য বড়ই বিব্রত আছি। ইতি

নিয়ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

আমি ছদ্মনামে মুখী রামদাস ঝিলঙ হই।
অসংখ্য নামের স্মৃতিশালী জন্মের স্মরণ করি
একটি চাকরিতেও অস্বস্তিতে দূর করি।
সমস্ত জগৎ এ ছদ্মনামেই—স্বপ্নের
জগৎ পৃষ্ঠ-স্থিত চাকরিতে—এই জগৎ কেবল
জাগ্রত। এই এই ছদ্মনাম দূর—একটি
দূর দূর বস্তু (সাহিত্যিক, অস্বস্তিক) এখানে
জন্ম দিয়া আসে, জন্মের স্মরণেই জন্ম
কিন্তু নষ্ট। যদি এ অস্বস্তি এতজন
জন্মদাতার কাছে, এখানে জন্মের দূর—
অস্বস্তির দূর দূর দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ বস্তু
দায়।

এখানে জন্ম নিষ্ঠ-নিষ্ঠ - একজন জন্ম দায়
এখানে জন্মের জন্ম দায় - জন্মদাতার জন্মদাতা
এখানে। জন্মদাতার জন্মদাতা দায় জন্ম দায়
এখানে। জন্মদাতার জন্মদাতা দায়। ইতি

নিয়ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : দশ

।।শ্রী।।

২২৩-ঈ কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২৫শে ডিসেম্বর ৭৯, বেলা ২-৪৫

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধ্যায় তোমার ২৯-১১-৭৯-এর চিঠি পেয়েছি, আগের চিঠিও যথাসময়ে পেয়েছি। সন্ধ্যার পর চোখে দৃষ্টি থাকে না, আজ সকালে ভাল করে চিঠি পড়লাম।

উত্তর দেবার জন্য ব্যস্ত হতে বারণ করেছ, কিন্তু ব্যস্ত না হয়ে উপায় নেই, কারণ ক’দিন আর পড়া বা লেখার ক্ষমতা থাকবে জানা নেই। তাই যে-কদিন পারি তোমার হাতের লেখা দেখে নিই। সকালবেলা দেহটা বেশ পীড়িত থাকে, বারোটার পরে একটু সুস্থ থাকি, ঝাওয়া দাওয়া করতে দুটো আড়াইটে বেজে যায়, তারপর সাড়ে তিনটা চারটে পর্যন্ত লেখা পড়ার ক্ষমতা থাকে, যদি আকাশে রোদ থাকে। এ চিঠিও আজ শেষ হবে না। চিঠি যদি বড় হয়ে যায়, লিখতে দু’তিন দিন লাগবে, ছোট হলে কাল শেষ হতে পারে। ছোট করে লিখতেই চেষ্টা করব, কিন্তু এত কথা মনে আসছে যে বড় করে লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তুমি আসলে যে-চিঠি লিখে হাসপাতালে গিয়েছিলে, সে চিঠিতে অনেক প্রশ্ন ছিল যা আলোচনাযোগ্য, কিন্তু সে-চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। তুমি অসুস্থ বলে। সেসব প্রশ্ন আর নূতন করে তুলতে চাই না, কারণ আলোচনার জন্যই আলোচনা, হয়তো সেসবে এখন আর তোমার মনও নেই।

সুকুমার সেনের ‘ব্যাকরণ কেমন হওয়া উচিত’ প্রবন্ধটা পড়ার আগ্রহ আছে, ছেলেদের বলব, পত্রিকাটা কিনে আনতে।

উপসংহারে লেখা “কোথায় সে সাহসী মুষিক?”-এ ‘মুষিক’ কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারি নি। মুষিকের সাহসিকতা বা সৃষ্টিপ্রতিভা সম্বন্ধে কোন গল্প জানা নেই। শব্দটা আক্রমণাত্মক নয় তো? ২৩ শে অক্টোবর রাত সাড়ে ন’টায় আকাশবাণী কলকাতার ‘অভিজ্ঞান’ অনুষ্ঠানে ‘বাংলা বানান সমগ্র’ সম্বন্ধে একটা ভাষণ দিয়েছি, ‘বাংলা বানান’ নামে একটা বই-ও বেরিয়েছে, তারই উত্তরে ‘মুষিক’ শব্দ নয় তো?

সুকুমার সেনের^১ সঙ্গে আমার পরিচয় নেই—তবে আমার ধারণা ভদ্রলোক একটু দান্তিক। তাই যত্নতর সগর্বে ‘পরিভাষা’ রচনা করে আপন কৃতিত্ব ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ বহু পরিভাষা রচনা করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই বলেছেন পাঠককে যাচাই করে দেখতে; গ্রহণযোগ্য হলেই গ্রহণ করতে নতুবা পরিত্যাগ করতে। সুনীতিবাবুও বহু পরিভাষা রচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও অহঙ্কার প্রকাশ করেন নি।

‘টি-টা’ প্রত্যয় নয়, একথা ‘নির্দেশক সংকেত’ নামে ১৯৬৫-এর ডিসেম্বর সংখ্যা W.B.H.A. Bulletin-এ আমি বলেছি, এবং সুনীতিবাবু তাঁর ভাষাপ্রকাশ ব্যাকরণে foot note দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। তবে আমার নাম প্রকাশ করেন নি।

‘সাধারণ বচন’ সংজ্ঞাটি সুকুমার সেনমহাশয়ের “নবতম অবদান”। তবে তিনি যে বলেছেন, ‘রূপে একবচন, অর্থে বহু বচন’ একথা কোন বাংলা ব্যাকরণে উল্লিখিত হয় নি। একথাটি ঠিক

নয়। প্রায় সব ব্যাকরণগ্রন্থেই একথা আছে। অন্ততঃ আমার ‘মাধ্যমিক ব্যাকরণ’-গ্রন্থে (যদিও VII. VIII-এর ব্যাকরণ) আছে। আরও নিম্নশ্রেণীর পুস্তকেও আছে।

সংস্কৃত ভাষায় দেবঃ দেবৌ দেবাঃ থাকতে সংস্কৃত ব্যাকরণে তিনটি বচনের প্রয়োজন হয়েছে। সুনীতিবাবুর লেখায় পেয়েছি প্রাচীন গ্রীকে, প্রাচীন আরবীতে, সাঁওতালীতেও নাকি তিনটি বচন পাওয়া যায়। একথা আমার তোমাকে বলতে হবে না, তোমারই ভাল জানা আছে। তবে বাংলা বা ইংরেজীর দুটো বচন—এক বচন, বহু বচন, Singular Number, Plural Number, এখানে ‘সাধারণ বচন’ আমার মতে হাস্যকর।

‘The crow is black’ মানে ‘কাকেরা কালো’, কিন্তু ‘Crow’ singular number। ‘Crows are black’-এরও ঐ একই অর্থ—‘Crows’ plural number. ‘Many a soldier has been killed’ মানে ‘অনেক সৈন্য মারা গেছে’ কিন্তু verb ‘singular’। এর পর যদি pronoun বসাতে হয়, ‘he’ লিখতে হবে, ‘they’ নয়। একই কথা ভাষায় নানা from-এ প্রকাশ করা হয়, ব্যাকরণ বা grammar সেই form-টা কী একথাই বলে—বলা হয় singular in form plural in sense। আমার মতে বাংলা ব্যাকরণে দুইটিই বচন—একবচন আর বহুবচন।

‘টা-টি’ বসালেই বচন ‘একবচন’ হয় না—দুটি পাখী, তিনটি গোরু, পাঁচটি ছাগল, অনেকটি মানুষ—সবই বহুবচন।

বাংলা ব্যাকরণ নিশ্চয়ই নূতন করে রচনা করতে হবে—বর্ণমালা, পদ-পরিচয় থেকে শুরু করে সন্ধি, শ-ষ-স’ত্ব বিধান, লিঙ্গ, কারক, বিভক্তি, সমাস, প্রত্যয়, বাচ্য, বাংলাভাষার স্বরূপ সবই নূতন করে লিখতে হবে—এ বিষয়ে সুকুমারবাবু কী লিখেছেন জানি না—আমি অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ধরে চেষ্টাছি—সাড়া পাই না। রবীন্দ্রনাথ বলেন “আমার বয়স হয়ে গেছে”। সুনীতিবাবু বলেন : ‘বাড়িখানা করেছে, কিছু ধার হয়েছে।’ চিন্তাহরণবাবু বলেন : আমি যা করেছি তা কি কাজ নয়?’ তোমরা তো সব চোখ বুজে ধ্যান করছ। তবে কোন একটি মুষিকের কাজ নয়, বহু মুষিকের একসঙ্গে বসতে হবে।

‘প্রাকৃত বাংলা’ বলে রবীন্দ্রনাথ, ‘খাঁটি বাংলা’ বলে প্রমথ চৌধুরী,^২ আবার ‘খাঁটি বাংলাভাষা’ বলে সুকুমার সেন কী বোঝাতে চাইছেন। আমি ঠিক ধরতে পারি নি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দীনেশচন্দ্র সেন একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের ‘হিমপত্র’ থেকে কয়েকটা লাইন তুলে প্রশ্ন দিয়েছিলেন “Write in chaste Bengali”! শীঘ্র নিরাময় হও। আশীর্বাদক শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

পত্র : এগারো

॥ শ্রী ॥

কাইজার স্ট্রীট ২৯-৫-৮০

কল্যাণীয়েষু

তোমার ২৭ মে পেলাম। দাস্তে কি শুয়েই থাকে? দাঁড়াতে পারে না?

শঙ্খ অসীম শারীরিক ভাল আছে। অসীম এতদিন তার শালার বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কাল এসেছিল, আমাদের চোখ বোজা দেখে ‘বিরক্ত’ না করেই চলে গেছে। শঙ্খতো তার বন্ধুদের নিয়ে সব সময়েই ব্যস্ত থাকে।

হরিণের চিন্তায় ভরত রাজা হরিণ হয়েছিলেন। আমার চার পাঁচটি হরিণ আছে, একটি তুমি। সব সময়েই ভাবি লিখি। আবার ভাবি, কী লিখব—তাই লেখা হয় না।

আমার চক্ষু চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়^১ এক ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বলে গেলেন চোখ ভাল হবে না, তবে আর বেশী খারাপ হবে না। কিন্তু ডাক্তারের শেষের কথাটা খাটছে না। দিন রাত চোখ বুজেই থাকি। চিঠি লিখতে হলে বা কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে চোখ খুলি।

চোখ বুজে ছেলেমেয়েদের চিন্তাই বেশি করি। আর হরিণ কয়টির কথা ভাবি। তারা এলে বা তাদের চিঠি এলে ভাল লাগে। ইতি—স্নেহাসক্ত শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : বারো

॥ শ্রী ॥

২২৩-ই কাইজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৫ জুলাই ১৯৮০

কল্যাণীয়েষু

দাস্তে কেমন আছে? তোমরা আর সবাই কেমন আছ? ২৭ মে এক পত্র দিয়েছিলে তারপর আর খবর পাইনি। আমি ২৯ শে তোমাকে এক পোস্টকার্ড দিয়েছিলাম। কেমন আছ জানাবে।

‘বাংলা বানান’ বই সব বিক্রি হয়ে গেছে। আবার ছাপব নাকি ভাবছি। এ জাতীয় বই দু’বছরে সব বিক্রি হয়ে যায়, তাতে মনে হয় পাঠক সমাজ বানান-বিষয়ে ভাবে, নাসিকা-কুণ্ঠন বিদ্বৎসমাজে। তোমরা যদি একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়তো উচ্ছৃঙ্খলতা ভয়াবহ হত না। সাধারণ পাঠক ‘নির্দেশ’ চায়, কিন্তু নির্দেশ দেবে কে? সরষের মধ্যেই ভূত। তোমাকে বলতে পারি না, তুমি দিল্লীতে একা পড়ে আছ, আবার দু’বছর পর্যন্ত নানা অশান্তিতে আছ। তবে বাংলার পণ্ডিতেরা করছে কী? একটা কি শক্তিশালী সমিতি গড়া যেত না? আমার বইয়ে তো কোন নির্দেশ নেই, তা-ও অসম্পূর্ণ আলোচনা। কতদিক্ ভাববার আছে, বলবার আছে। সমস্যাগুলি যে বিদ্বৎসমাজে তুলে ধরব, সে-সম্মতও আর নেই। চোখে দেখি না, ধীরভাবে, সুশৃঙ্খল ভাবে ভাবতে পারি না। কেবল অনাচার দেখি, আর হাঙ্কতাশ করি। সবচেয়ে খারাপ লাগে—যা-কিছু ভুল, তা-ই নাকি বাংলা ভাষার প্রকৃতি। অর্থাৎ না-জানাটাই ধর্ম। ইতি আশীর্বাদক শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

পত্র : তেরো

॥ শ্রী ॥

B7/1, Kalindi Esate, Cal-89

10.1.81

কল্যাণীয়েষু

অনেক দিন তোমার সংবাদ না পেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তোমার ৩০-১২-৮০ র চিঠিতে জানলাম, ডাক-বিস্ফোভে চিঠি লোপাট হয়েছে। এটা হচ্ছে বিস্ফোভের যুগ। যে যেখানে আছে সুযোগ পেলেই বিস্ফোভ প্রকাশ করছে—এর নাম ‘গণতন্ত্র’।

আমার চোখের অবস্থা? কাল পরশু মেঘলা ছিল। খবরের কাগজ পড়া সম্ভব হয় নি। আজ একটু রোদ উঠেছে, কিন্তু ঘরে রোদ নেই। অতএব চেয়ার টেবিল বাইরে দিয়ে গেল—ঘন্টাখানেক লেখাপড়া করতে পারব—অর্থাৎ তোমার কাছে একখানি চিঠি লেখার পর যদি রোদ পাওয়া যায়। খবরের কাগজ পড়বার চেষ্টা করা যাবে। এই আমার ‘পড়াশুনা’।

অনুকম্পায় অনেকেই আমার কাছে চিঠি লিখতে চায় না। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না। আমি সময় কাটাই কী করে। আমারওতো একটা মন আছে—জড়তা এসে গেছে ঠিকই, কিন্তু স্নেহমমতা তো কমেনি। তোমাদের চিঠি পেলে ভাল লাগে। এইজন্য তোমাদের আঁকড়ে ধরে থাকি। শঙ্ক নোতুন বাড়িতে^১ গেছে। ভাল আছে। অসীমও ভাল আছে।

‘সাময়িকী’র পৃ. ১৪৪-এ দেখতে পাবে আমার এক অট্টহাস্য। “...আমরা ‘অনুগ্রহে বাধিত’ হই, ‘ভীষণ আনন্দ’ পাই এবং ‘যথেষ্ট ক্ষতি’ স্বীকার করি। তথাপি আমরা লজ্জা বোধ করি না।” অতএব তোমার ‘অবাঙালী ভদ্রলোক’-এর গল্পনা মাথা পেতেই নিতে হচ্ছে। শুধু কি ‘ভীষণ ভাল’? আমার পুরোনো লেখায় ব্যঙ্গ আছে ‘ভয়ঙ্কর, ভয়ানক ভাল’। এই ‘ভীষণ, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর’ অভিধানেও ‘অত্যন্ত’ অর্থে স্থান পেয়েছে, বলা হচ্ছে ‘কথ্য ভাষা’। ‘সাংঘাতিক’ শব্দও চলছে, তবে অভিধানে স্থান পায় নি। হালের শব্দ ‘দারুণ’। বাস্তবিক শব্দটা ‘দারুণ’। তোমরা তো ‘কথ্য ভাষার’ পূজারী। এসব দেখে ঘাবড়াও কেন? ইংরেজীতে ‘terribly, tremendous-এর অপব্যবহার আছে বটে, কিন্তু dictionary তে (Col. বা অশি)-ও সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়। কথ্য ভাষার লাগামটানা সম্ভব নয়। আধুনিক বিদ্বজ্জনদেরা কখনও ‘অবাক্ হন’ না, তাঁরা লেখেন ‘অবাক্ লাগে’। ‘পরিচয়’ Aug.-Oct. ৪০-সংখ্যায় ‘সাহিত্যের হট্টগোলে’ নামক এক প্রবন্ধে এই শ্রেণীর বহু ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। পড়লে মজা পেতে পার। বিশেষভাবে আক্রমণ করেছি ‘আন্তর্জাতিক’ ও ‘প্রাগৈতিহাসিক’ শব্দ দুটিকে। বঙ্কিমচন্দ্র ‘খপূর’ শব্দে বুঝেছেন একপ্রকার ‘অস্ত্র’ (আনন্দমঠ)। জগদীশ ভট্টাচার্য^২ আবার ‘খপূর’ (আনন্দমঠের) শব্দের মানে করেছেন ‘মৃৎপাত্র’। ‘পরিচয়’ March-৪০ তে এ নিয়েও বিরূপ মন্তব্য করেছি।

তুমি যখন ‘লক্ষ্মী’-কে ‘লোকষি’ করতে চাও তার অর্থ বুঝি, কিন্তু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের^৩ ‘অব্যেস’ (অভ্যাস), কিংবা রবীন্দ্রনাথের ‘সঙ্কে’ (য-ফলা বিহীন) বুঝি না। ‘অব্যেস’-এ য-ফলা, দন্ত্যস কেন? ‘সঙ্কে’তে ‘শো’ নয় কেন? ‘সঙ্কে’তে য-ফলা না থাকলে উচ্চারণ হয় ‘শঙ্কে’। মাঝামাঝি সংস্কার হয় না।

উচ্চারণকে standardise করা যাবে না, সুতরাং উচ্চারণানুযায়ী বানান হাজাররকম হবে এবং দিনে দিনে বদলাবে। নিত্য নোতুন বানানে ‘ভাষা’ অন্ততঃ একশ বছরও একরকম থাকবে, এমন আশা করা বাতুলতা।

কিন্তু রোদ চলে গেল। আমারও আবেল-তাবেল শেষ হল।

শান্তিপূর্ণ দীর্ঘজীবন লাভ করো। ইতি

স্নেহাসক্ত

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : চৌদ্দ

॥ শ্রী ॥

B7/1, Kalindi Esate, Cal-89

২রা বৈশাখ ১৩৮৮

কল্যাণীয়েষু

স্নেহাশীর্বাদ জানাই। তুমি আস্তিক, নাস্তিক, না অজ্ঞেয়বাদী জানি না। এ সম্বন্ধে কোনদিন আলোচনাও করি নি। আমি সৃষ্টিরহস্য কিছু বুঝি না—তাই আশীর্বাদ করি, শুভকামনা করি; এর যদি কোন মূল্য থাকে ভাল; না থাকে কারও কোন ক্ষতি নেই। প্রয়াতজনকে সর্বদা তর্পণ করি। যাঁদের তর্পণ করি, তাঁরা যদি কোথাও থাকেন এবং তৃপ্ত হন, ভাল; না থাকেন তো তর্পণ করে আমি তৃপ্তি লাভ করি। মনে হয় সাময়িক বললাভও করি। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নই অথচ জগতের আদি-অন্ত সম্পর্কে কোনপ্রকার ধারণাই করে উঠতে পারি নি। তবে চিঠিতে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, ভাল কাজ করি নি।

চোখের দুঃখ অসহনীয়, শারীরিক অবসাদও খুব। অনেক দিন ধরে তোমাকে লিখি-লিখি করেও লিখতে পারি নি। যথাসময়ে খামপোস্টকার্ড সংগ্রহ করতে না পারায় কালও তোমাকে লিখতে পারি নি আজও আকাশ অন্ধকার থাকায় সকালে লিখতে পারি নি। দুপুরে তোমার চিঠি পেলাম—অবশ্য সংক্রান্তি-দিনে লেখা বলেই আজ পাওয়া গেল—ডাকবিভাগও হঠাৎ বোধহয় কর্তব্যরত হয়েছে।

সুস্মিতা, গেটে^১ দাস্তে, শর্মিষ্ঠাকে আশীর্বাদ জানাই। তুমি কী উচ্চারণ কর Susmita না Sussita? স্মিতা যদি ssita হয়, সুস্মিতা Susmita কেন হবে? যুক্তি থাকলে জানাবে।

আমি রবীন্দ্রভক্ত। তবে ‘সহজপাঠ’ই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বর্ণ-শিক্ষার গ্রন্থ বলে মানি না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের নষ্টামিও সহ্য হয় না। নীহার রঞ্জন^২ সুকুমার সেন^৩ বেশ বাড়াবাড়ি করেছেন। ...তো মতলববাজ। এ বিষয়েও চিঠিতে সব কথা বলতে পারছি না। কেউ কেউ আমার কাছে প্রবন্ধ চেয়েছিলেন লেখার মতো ক্ষমতা ও ধৈর্য নেই, চোখই বড় প্রতিবন্ধক। ওদের ‘কিশলয়’ দেখেছি—ভুল আছে, বেশ খারাপ ভুল। ‘সহজপাঠ’-এ-ও ভুল আছে। বামফ্রন্টওয়ালাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকলে ছশিয়ার হয়ে বই লিখতে পারত।

প্রাইমারি স্তরে ইংরেজী থাকবে কিনা এনিয়ে মতভেদ হতেই পারে। তবে এ নিয়ে যে বাদানুবাদ হচ্ছে তা হাস্যকর। মন্ত্রী পার্থ বসু^৪ এবং তাঁর উপরওয়ালারা আর তাঁর প্রসাদভিক্ষুরা তারস্বরে ঘোষণা করে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ১২ বছর পর্যন্ত ইংরেজী পড়েন নি। রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ প্রবোধচন্দ্র সেন (বয়স ৮৪) বলছেন রবীন্দ্রনাথ ১৬ বৎসর পর্যন্তই ইংরেজী জানতেন না। এঁরা সকলেই ‘জীবনস্মৃতি’ পড়েছেন। তাতে বয়স দেওয়া না থাকলেও বোঝা যায় তিনি সাত আট বছরেই ইংরেজী শিখেছেন। দেবেন্দ্রনাথঠাকুরের হিসাবের খাতায়ও ইংরেজী শিক্ষকদের নামধাম, বেতন, নিয়োগের তারিখ যা পাওয়া গেছে তা ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এঁরা ইংরেজী পড়া, ইংরেজী জানা কী অর্থে ব্যবহার করছেন বুঝি না। সবাই কি চোখ বোজা কাক? ইংরেজী পড়া আর ইংরেজীর মাধ্যমে পড়া—এবিষয়েও প্রবোধ সেন যখন গুলিয়ে ফেলেন তখন বুঝি এ যুগটাতে দুষ্ট রাজনীতিরই জয়।

আমার নিজের ধারণা বাঙালীকে বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত তিনটেই ভাল করে শিখতে হবে, আর হিন্দীর যে দাপট তাতে হিন্দী না শিখলেও বাঙালীর দুর্ভোগ আছে। স্কুলস্করেই এই চারটি ভাষা শিখতে হবে। সংস্কৃতকে কংগ্রেসীরাই বর্জন করেছে, ইংরেজী সম্পর্কেও কংগ্রেসীরাই অনেক খেলা খেলেছে তারাও প্রাইমারিস্তরে একদা ইংরেজী বর্জন করেছিল—আজ কম্যুনিষ্টরা ইংরেজী বর্জন করবে এবং কংগ্রেসীরা কম্যুনিষ্টদের অনুসরণ করে ট্রাম পোড়াবে। দু-পক্ষই শয়তান। আমার দুঃখ হয় গদাহস্তে ৮৪ বছরের প্রবোধ সেন ও ৮০ বছরের সুকুমার সেনের দুর্গতি দেখে। ...যখন উন্টাপাণ্টা কথা বলে, তখন বুঝি একদল ঝুনো রাজনীতিক, আর একদলের শিং গজাচ্ছে। ইতি আশীর্বাদক শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

পত্র : পনেরো

॥ শ্রী ॥

B7/1 Kalindi Estate, Cal-8

13.2.82

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেলাম।

কে কেমন আছ লেখ নি। যাবার সময়ে তোমার শরীর বোধ হয় তেমন সুস্থ ছিল না, সুস্মিতার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না বলে শুনেছি।

ইনভাগাস্ত শব্দ সম্বন্ধে তোমাকে কী বলেছি মনে নেই। ও-সম্বন্ধে আর কারও সঙ্গে আলাপ করেছে কিনা তা-ও জানি না। দীর্ঘ ৬০ বছর চিন্তার পর সিদ্ধান্তে এসেছি ইনভাগাস্ত শব্দের বাংলা প্রাতিপদিক হ্রস্ব-ইকারান্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। নূতন সংস্করণ পৃ. ৪২-৪৩-এ আলোচনা আছে। আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ মানতে বলি নি। যাঁরা বলেন প্রাতিপদিক ই-কারান্ত না হলে সংস্কৃত নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, তাঁদের কথার প্রতিবাদ করেছি মাত্র।

সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ এক নয় একথা বহু প্রসঙ্গে বহুস্থলে বলেছি। কিন্তু অদ্যাবধি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচিত হইল না। কারও এদিকে দৃষ্টি আছে বলেও মনে হয় না। তবে একটা কথা আমি জোর দিয়েই বলতে চাই, যা-কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ তা-ই বাংলা ভাষার প্রকৃতি নয়। আজকাল তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বুলি দেখি ও শুনি ওটা অশুদ্ধ নয়, ওটা বাংলা ভাষার প্রকৃতি। এতে আমার কেবল হাসি পায় না, বেশ দুঃখ হয়। ভুল মাত্রই বাংলা ভাষার প্রকৃতি।

আমার বক্তব্য একটা discipline-এর মধ্যে থাকতে হবে। বাংলা ভাষার প্রকৃতি লক্ষ্য করে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করো। তবে ব্যাকরণ-রচনায় একটা আদর্শ গ্রহণ করতেই হবে। সে-আদর্শ ‘সংস্কৃত ব্যাকরণ’ হতে বাধ্য, কারণ সংস্কৃত *আধারেই* বাংলা ভাষা রক্ষিত। শুধু ৮০ ভাগ শব্দসম্ভারই নয়, বাংলা বর্ণমালা পূরাপূরি সংস্কৃত। ইংরেজী ফার্সী শব্দ বাদ দিয়েও আমি বাংলা লিখতে পারি, কিন্তু সংস্কৃত (তৎসম, তদ্ভব) বাদ দিয়ে এক পা-ও চলতে পারি না। যেখানে যেখানে সংস্কৃত থেকে সরে এসেছি, সেই সেই স্থলেই নূতন ব্যাকরণ রচিত হবে। যেখানে সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ণ মিল, সেখানে সরব কেন? সরলে দাঁড়াব কোথায়? কোথাও কোন আশ্রয় নেই, একমাত্র অজ্ঞতাই আমার অবলম্বন, কোন শিক্ষিত লোক এটা স্বীকার করতে পারে এটা

ভাবতে দুঃখ হয়। অথচ আজকাল তা-ই হচ্ছে। ভুল দেখিয়ে দিলেই বলা হবে, ‘ওটা বাংলা। সংস্কৃত নয়।’ অজস্র দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

মূর্খন্য-এ আলোচনায় (দুই সংস্করণেই আছে) বলেছি—“সংস্কৃত প্রভাবকে কোথায় কীভাবে কতটুকু স্বীকার করা হবে, সেটা ধীরভাবে বিচার করা দরকার।”

এবারকার বইয়ে^১ একটা নূতন অধ্যায় যোগ করেছি ‘সাহিত্যের হট্টগোলে’^২। সময় পেলে ওটা পড়ে দেখো। সংস্কৃত-বাংলা কলহে এই অধ্যায়টি দুই পক্ষেই অস্ত্র যোগাবে বলে মনে হয়। ওখান থেকেই দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। একজন বিদ্বৎ সাহিত্যিক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুদ্ধ শব্দ কী—‘অপসূয়মাণ-ন’ না ‘অপস্রিয়মাণ-ন’। তাঁকে কী উত্তর দিতে পারি? আর-একজন পণ্ডিতম্ভন্য Proof-reader জিজ্ঞাসা করেছিলেন “মুহ্যমান শুদ্ধ, না, মোহ্যমান শুদ্ধ?” কী উত্তর দেব?—এ দুই ক্ষেত্রে তোমার (শিশিরের) মতটাই আমি জানতে চাই।

বেশি লিখতে কষ্ট হয়। আমার চোখের উপযুক্ত আলোর অভাব।

সর্বাস্বীণ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করো। ইতি

নিয়তশুভানুধ্যায়ী
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্র : ষোলো

॥ শ্রী ॥

B7/1 Kalindi Estate, Cal-89

১ লা বৈশাখ ১৩৯১

কল্যাণীয়েষু

নববর্ষে আশীর্বাদ জানাই—দিনগুলি কল্যাণময় হোক, আনন্দময় হোক।

অসীম বলল, তোমার বাবা অসুস্থ, সেবা শুশ্রূষার জন্য সুস্মিতা এখানে আসছে। এসে গেছে কি? ছেলেরা, মেয়ে কি দিল্লীতেই থাকবে?

তোমার ৮ই এপ্রিলের চিঠি পেয়েছি। ১৬ই মার্চ তোমাকে পত্র দিয়েছিলাম। পেয়েছিলে?

তোমার হিন্দীভাষী বন্ধুকে বোলো—সন্ধিতে যদি ‘হরীশ’ শব্দ শুদ্ধ হয়, সমাসেও ‘হরিশ’ শব্দ শুদ্ধ। ‘হরিশ’ (হরিতে শয়ন করেন যিনি) শব্দ যদি অর্থহীন হয় ‘হরীশ’ (হরির ঈশ) শব্দও অর্থহীন। ‘হরীশ’ মানতে গেলে ‘বিষ্ণুশ’, মহাদেবশ, ব্রহ্মশ, ঈশ্বরেশ’ প্রভৃতিও মানতে হয়। তবে ‘হরি’ শব্দের বহু অর্থ আছে, তাতেও ‘হরীশ’ শুদ্ধ হলে ‘হরিশ’-এ কোন বাধা দেখিনা।

তুমি যা বলেছ আমারও সেই মত। হরিশ্চন্দ্র থেকেই হরিশ। বেনেপুকুরের এক প্রধান শিক্ষকের নাম ছিল জ্যোতিশ্চন্দ্র। বাধ্য হয়েই তাঁকে ডাকতে হত। তাঁর নামের বানান লিখতে হত ‘জ্যোতিশ বাবু’। ‘জ্যোতিশ’ ছাড়া অন্য কোন বানান এখানে চলে না।

তা ছাড়া নামের অর্থ খোঁজা বৃথা। ইংরেজদের মধ্যে Fox আছেন। বিকৃত বানানে ‘Wolfe’ ও আছেন। আমার এক বন্ধুর ডাক নাম ছিল ‘ইঁদুর’। আর এক বন্ধু ‘কুকুরিয়া’—কর্মজীবনে ইনি বিখ্যাত Headmaster ছিলেন। ‘মণীন্দ্রকুমার’ ‘শিশিরকুমার’-এর অর্থ কী? ‘কুমার’ না থাকলে বরং মানে হত। ‘রবীন্দ্রনাথ’-এর অর্থ কী? রবির ইন্দ্র তার পরে আবার নাথ। কবি যতই উৎফুল্ল থাকুন, তাঁর নামের ভাল অর্থ নেই। আর বলিহারি দেবেন্দ্রনাথকে—সোমেন্দ্রনাথ,

রবীন্দ্রনাথ, বুধেন্দ্রনাথ। আরও ছেলে হলে নাম থাকত শনীন্দ্রনাথ শুক্লেন্দ্রনাথ, মঙ্গলেন্দ্রনাথ, বৃহস্পতীন্দ্রনাথ।

স্বপন মজুমদার আমাকে ‘আজকাল’-এর এক ‘কর্তিকা’ পাঠিয়েছেন। তাতে জ্ঞানলাম, পবিত্র সরকার দুটি চিহ্ন উদ্ভাবন করেছেন এবং শান্তিনিকেতনের এক সভায় ‘সর্বসম্মতিক্রমে’ চিহ্ন দুটি গৃহীত হয়েছে। ‘সর্ব’ বলতে ‘নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, সুহাস চট্টোপাধ্যায় ও স্বপন মজুমদার।’ চিহ্ন দুটি অ্যা = প্র, য়া = হু। আমি অবাক হয়ে লিখেছি, পাঁচছয় বৎসর আগে শিশির আসল প্রায় এই চিহ্নই দিয়েছিল—‘প্রায়’ মানে সামান্য অন্য রকম তোমার চিহ্ন ছিল প্র, হু। তোমার সঙ্গে কি পবিত্র সরকারের কোন আলোচনা হয়েছে?

আমাকে আরও কেউ কেউ চিহ্ন পাঠিয়েছেন। সেসব এখন থাক। জগন্নাথ চক্রবর্তী পাঠিয়েছেন ‘অ্যা, য়া অর্থাৎ যফলা চিহ্নটা পরে। অন্য কোন চিহ্নে আমি আপত্তি করব না, কিন্তু ‘অ্যা য়া’-তে আপত্তি আছে, কারণ চিহ্নদুটির সঙ্গে আমি ‘বক্র আ’-র কোন সম্বন্ধই রাখতে চাই না। আমার মত হচ্ছে এই চিহ্ন হবে সংস্কৃত ‘এ’-র বাংলা বিকৃত ‘বিবৃত’ উচ্চারণ—একটা, একটি; খেলা, খেলি। সম্পূর্ণ বাংলা মৌলিক ধ্বনি। পণ্ডিতেরা কেউ কেউ বলেন এটা ইংরেজী থেকে এসেছে। আমি বলতে চাই—এর সঙ্গে ইংরেজীর কোন সম্বন্ধ নেই, ‘বক্র-আ’রও কোন সম্বন্ধ নেই। আমি স্বপনকে লিখেছি—যা-হয় একটা কিছু করো, কিন্তু তাড়াতাড়ি দুটি নূতন চিহ্ন চালু করো। ‘প্র হু’ আমি সমর্থন করেছিলাম, এই চিহ্ন দুটি রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এই তিন মনীষীর স্মৃতি পূত বলে। চোখে কিছুই দেখিনা। ফলে ভাবনাচিন্তা জড়িয়ে যায়, লেখা—অক্ষর বানান মায় শব্দ ব্যবহার এলোমেলো হয়। এক কথায় আর এক কথা লিখি, সব বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ লিখি, হাস্যকর বানান—সবই শিথিল হয়ে গেছে।

অতি কষ্টে লেখা শেষ করলাম। একটু কষ্ট করে পড়বে এবং বুদ্ধি খরচ করে অর্থ গ্রহণ করবে। ইতি—

শুভকাম
শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

পত্রগুচ্ছ ২
(মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা)

শিশিরকুমার দাশ

পত্র : এক

৪১ বাংলো লেন
দিল্লী ১১০০০৭
১২ এপ্রিল ১৯৮০

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনি আমাদের নববর্ষের প্রণাম গ্রহণ করবেন। আশা করি আপনি সুস্থ আছেন। অনেকদিন আপনাকে কোন চিঠি লিখতে পারিনি। গত দেড়মাস ধরে নানারকম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। মাসখানেক আগে একটি গাড়ির ধাক্কায় আমার ছোট ছেলেটি আহত হয় এবং পায়ের দুটি হাড় ভেঙে যায়। তাকে নিয়ে খুবই বিব্রত আছি।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে আর একবার অঙ্গসময়ের জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। ‘দেশ’-পত্রিকায় আপনার ‘বাংলা বানান’-এর^১ একটি সমালোচনা পড়লাম। নিশ্চয়ই আপনিও সমালোচনাটি দেখেছেন।

আপনার দৃষ্টিশক্তির কোন উন্নতি হয়েছে কি? মধ্যে মধ্যে আপনার চিঠি পেলে আমার খুবই ভাল লাগে।

পুনরায় আমাদের প্রণাম জানাই। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : দুই

৪১ বাংলো লেন
দিল্লী ১১০০০৭
২৭ মে ১৯৮০

শ্রীচরণকমলেশু,

অনেকদিন আপনার সংবাদ পাই নি। আমি নানা কাজে বিব্রত ছিলাম তাই চিঠি লিখতে পারিনি। আপনার শরীর এখন কেমন আছে? দৃষ্টিশক্তির কোন উন্নতি হয়েছে কি?

শঙ্খদা এবং অসীমের কাছ থেকে অনেক দিন কোন চিঠিপত্র পাইনি। আমি চিঠি দিয়েছিলাম। আশঙ্কা করি, সে চিঠি গুঁরা পাননি।

আমার ছেলেটির পায়ের প্লাস্টার এখনও খোলা হয়নি। আজ ৭৪ দিন হল। বোধহয়

আরো সপ্তাহখানেক পরে খোলা হবে। এখানে এখন অসহ্য গরম। তবে আমরা মোটামুটি ভাল আছি। আপনার কুশল সংবাদ জানাবেন। আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : তিন

৪১ বাংলা লেন। দিল্লী ১১০০০৭

১৭ জুলাই ১৯৮০

শ্রীচরণকমলেশু,

আজ আপনার ১৫ জুলাইর চিঠি পেলাম। ২৯ শে মে-র চিঠিও যথাসময়ে পেয়েছিলাম। দান্তে এখন সুস্থ হয়েছে এবং নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে।

“বাংলাবানান”^১ সব বিক্রি হয়ে গেছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। একটু বিস্মিতও হচ্ছি। আমি ভাবিনি যে বাংলাদেশে উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ—বিশেষ করে ভাষা সংক্রান্ত বই—এত দ্রুত বিক্রি হতে পারে। আসলে পাঠকসমাজের আগ্রহ আছে, কিন্তু প্রকাশকরা কোন বিষয়েই উৎসাহী নন, একমাত্র লাভ ছাড়া। আপনার বইটি যে এত তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়েছে তা জেনে বাঙালী পাঠকের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল।

বিদ্বৎসমাজ সম্বন্ধে আপনি যে কথা বলেছেন তা যথার্থ। তবে আমার সন্দেহ হয় সত্যিই এখন বাংলা-বিদ্যায় আগ্রহী কোন বিদ্বৎসমাজ আছে কিনা। এখন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা হয়, বহু অধ্যাপক আছেন, তা সত্ত্বেও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ অনুরাগী কোন বিদ্বৎসমাজ নেই। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন বাংলাবিদ্যা গড়ে তোলার জন্য যে চেষ্টা হয়েছিল তারসঙ্গে যখন স্বাধীনতা পরবর্তী কাক্সকর্মের তুলনা করি তখন আমি অত্যন্ত হতাশা বোধ করি। আজকের বাঙালী সাহিত্যিকরা বাংলা বিদ্যায় আগ্রহী নন। আমি তাঁদের দোষ দিইনা। আজ বাংলার শিক্ষক সম্প্রদায় একটা বিশাল আকার ধারণ করেছে। উনিশশ তিরিশ চম্বিশ সালে সে তুলনায় বাংলার শিক্ষকের সংখ্যা কত সামান্য ছিল। বাংলা পঠন পাঠনের সুযোগ এবং ব্যবস্থা ছিল কত সংকীর্ণ। কিন্তু আজ সেই বিশাল শিক্ষক সম্প্রদায় বাংলা-বিদ্যায় বেদনাদায়ক ভাবে উদাসীন। সেইজন্যই আপনি যে শক্তিশালী সমিতির কথা বলেছেন তা গড়ে উঠেচেনা। আমার কথা ছেড়ে দিন, কারণ আমি বাংলা চর্চার মূলকেন্দ্র থেকে শুধু দূরেই নই, অপাংক্তেয়ও বটে। কিন্তু বাংলাদেশের যে সব মনীষী আপনার বইটি পড়লেন তাঁরাও নিশ্চেষ্ট কেন?

তবে একেবারে নিরাশ আমি হবনা। আশা করব অদূর ভবিষ্যতে বাংলা-বিদ্যা সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষক সম্প্রদায় ভাববেন। তখন হয়ত আপনার কাজের ফল পাওয়া যাবে। তবে সে কতদিন পরে জানি না।

অগস্ট মাসের মাঝামাঝি আমার একবার কলকাতা যাবার সম্ভাবনা আছে। যদি যেতে

পারি অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করব। এখন আপনি কেমন আছেন? আমার চোখ খুব খারাপ হয়েছে। আশা করি নতুন চশমা নিলে সমস্যা মিটবে।

শঙ্কদা এবং অসীমের খবর অনেকদিন পাইনা। আশা করি ভালো আছেন। আমাদের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : চার

41 Bungalow Lane
Delhi 110007
30 December 1980

শ্রীচরণকমলেশ্ব,

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। গতমাসের ১৫।১৬ তারিখে আপনাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। এখন বুঝলাম সে চিঠি আপনি পাননি। ঐ সময়ে কলকাতায় ডাকের খুবই গোলমাল চলছিল। আমি কলকাতায় যে ক'খানি চিঠি লিখেছিলাম প্রায় সবই নিরুদ্দেশ-যাত্রী হয়েছে।

আমি এখন মোটামুটি ভালই আছি। কিন্তু আমার কর্মজীবনে অশান্তি বোধহয় চিরসঙ্গী। সেইজন্য মন সবসময়ই বিষণ্ণ থাকে। আপনি কেমন আছেন? নতুন যে অঞ্চলে^১ গেছেন সে জায়গাটি কেমন? আপনার চোখের কথা জিজ্ঞাসা করতে কষ্ট হয়, তবু জিজ্ঞাসা করছি আপনি কি রোজ কিছুক্ষণ পড়াশুনা করতে পারেন? আপনার দৃষ্টিশক্তির কথা ভেবেই বেশী চিঠি লিখতে সংকোচ হয়। ইতিমধ্যে যদি কলকাতায় যেতে পারি তখন অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করব ইচ্ছা আছে।

শঙ্কদা নতুন বাড়িতে^২ চলে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন, জানিনা চলে গেছেন কিনা। অসীমের অনেক দিন কোন খবর পাইনা। আশা করি ওরা সবাই ভাল আছে।

এখানে গত কয়েকসপ্তাহ খুবই প্রবল শীত পড়েছে। আশা করি কলকাতার আবহাওয়া এখন মনোরম। সুস্মিতা, গ্যেটে, দান্তে, লরা (অমৃতা) সবাই ভাল আছে। আমাদের সকলের প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

41 Bungalows Lane
Delhi 110 007
30 December 1980

শ্রীচন্দ্রকমলেশ্বর,

আনন্দমি পত্র আপনাকে চিঠি লেখা আরম্ভ হলো।
গত মাসের ১০/১১ তারিখে আপনাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম।
এখন বুঝলাম যে চিঠি-আলাপি পাননি। এই সময়ে কলকাতায় ভারত-
মহাশক্তি সোভিয়েত চলছিল। আমি কলকাতায় যে ক'খানি চিঠি লিখেছিলাম
সেই সবই- নিরুদ্দেশ-খালী হয়ে গেছে।

আমি এখন মোকদ্দমটি জানই আছি। কিন্তু আমার কর্মকীর্তন
অসম্পূর্ণ বোধ হয় কিংবা না। আরেকটা মন পরামর্শই বিস্তারিত। আপনাকে
কিমন আছে? নতুন যে ওয়েবসাইট পেয়েছেন সে জালালাবাদে কিমন ?
আপনার চোখের কথা জিজ্ঞাসা করতে করে হয়, তবু জিজ্ঞাসা করছি
আপনাকে কি বোঝে কিছুমাত্র গভীরতা করতে পারেন? আপনার চোখের
কথা জেনেই মৌ চিঠি-লিখতে আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে যদি কলকাতায় যে
সবই তখন আরেক প্রকার মীমাংসা করেই দেখা যায়।

মহানন্দ নতুন বাঙালি চলে যাওয়া বলে জানিয়েছিলেন, জানিনা
চলে গিয়েছিল। অসীমের আরও দিনে কোন খবর পাঠেন। আমার কাছে
ওরা সবাই ভাল আছে।

এমনিতে গভীরতা আরও খুবই সরল মনে পড়েছে। আমার
কবি কলকাতার আরও কথা এখন মনে পড়ে। সুশীল, হুগলি, মাল, বন (অবস্থা)
সবই ভাল আছে। আমার সবাই অনেক জানেন। ইতি
অনন্ত
শিগির

পত্র : পাঁচ

৪১ বাংলো লেন, দিল্লী ১১০০০৭

বিজয়াদশমী

ডাকবিভাগের ছাপ জানুয়ারী ৫.১.৮১

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনি আমাদের বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আমি অনেকদিন আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। আগস্টমাসে অল্পসময়ের জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু আমি দেখা করতে পারিনি।

আপনার চোখের অবস্থা এখন কেমন? কোন উন্নতি কি হয়েছে? এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কাজের চাপ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, তার ফলে শরীরের বেশ অবনতি ঘটেছে। হয়ত শীতের সময় কিছুটা ভাল হতে পারে।

আপনার কুশল সংবাদ জানিয়ে চিঠি দেবেন। পরে আবার বড় করে চিঠি লিখব। আমাদের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পুনশ্চ।। একটা প্রশ্ন আছে।

সম্প্রতি আমাকে একজন অবাঙালী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছেন বাঙালীরা প্রায়ই বলেন “ভীষণ ভাল”। কোন একটা বই পড়ে, কিংবা একটা সুন্দর দৃশ্য দেখে কেউ যখন “ভীষণ ভাল” বলেন তখন তাঁর কানে একটা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। কারণ ‘ভীষণ’ শব্দের সঙ্গে ভয়ের অনুষঙ্গ জড়ানো আছে।

এই “ভীষণ ভাল” expression টা কি আধুনিক? এ কি ইংরেজির “terribly good” কথার অনুবাদ? না, এ বাংলার স্বাভাবিক idiom?

পত্র : ছয়

41 Bungalow Lane

Delhi 110007

চৈত্র সংক্রান্তি/১৩৮৭

শ্রীচরণকমলেশু,

অনেকদিন আপনাকে কোন চিঠি লিখতে পারিনি। আশা করি আপনি এবং বাড়ির সকলে ভাল আছেন। শঙ্কদার খবর অনেকদিনই পাইনি। নতুন ঠিকানায় যে-চিঠি দিয়েছি খুব সম্ভব তা ওঁর হাতে পৌঁছয়নি।

এ সময় একবার আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত। বাংলাদেশে ‘সহজ-পাঠ’-কে কেন্দ্র করে অনেক হৈ-চৈ হয়ে গেল। দূরে থেকেও সামান্য কিছু কিছু খবর পাই। দেখা গেল যে বাংলার পঠন-পাঠন, অন্ততঃ প্রাথমিক বাংলা শেখানোর সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক বাঙালী পণ্ডিত, সাংবাদিক, লেখক এবং রাজনীতিবিদের একটা নিজস্ব মত আছে। আমি অবশ্য চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি মূল সমস্যাটা কি এবং কি নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক চলেছে। কলকাতায় গেলে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। এ ব্যাপারে আপনাকে লিখতে বলা আমার পক্ষে অনায়াস হবে। তবু জানতে করে এ বিষয়ে কি ভাবছেন। আপনি সম্প্রতি আর কিছু লিখেছেন—জানাবেন, আমি সংগ্রহ করে পড়ব।

আমার শরীর এখন বেশ ভাল। মোটামুটি সকলেই বেশ কিছুদিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই ভাল আছি। তাই আশঙ্কা হয়।

আপনি আমাদের সকলের নববর্ষের প্রণাম নেবেন। আপনি সুস্থ থাকুন এই কামনা করি। সুস্মিতা বিশেষভাবে আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছে। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : সাত

৪১ বাংলা লেন, দিল্লী ১১০০০৭

২৭ আগস্ট ৮১

শ্রীচরণকমলেশ্বর,

নিত্যপ্রিয়র চিঠিতে আপনার অসুস্থতার^১ সংবাদ পেয়েছিলাম। আজ আর একটি চিঠি পেয়ে জানলাম যে আপনি এখন সুস্থ হয়েছেন। অনুমান করি আপনি এখন বাড়ি ফিরেছেন। আপনাকে অনেকদিন কোন চিঠিপত্র লিখতে পারিনি। এজন্য মনে মনে বড় অপরাধ বোধ করি। আমি নানা আজে-বাজে কাজে এত বেশী বিব্রত থাকি যে আপনাকে চিঠি লেখার মত শাস্ত ও সুস্থ অবকাশ কিছুতেই পাইনা। অথচ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে একটা নিবিড় তৃপ্তি পাই।

কয়েকমাস আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “বাংলা বানানের নিয়ম” পুস্তিকার^২ নবসংস্করণের ব্যাপারে একটি চিঠি পেয়েছিলাম। ভরসা করি আপনাকে নিশ্চয়ই ওঁরা খবর দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে আপনাকে একটি চিঠি লিখব বলে ভাবছিলাম—পুস্তিকাটি থেকে অনেক বিষয় note করেছিলাম। আমার নিজের মতামত নদীর চরের মত—গ্রীষ্মে জেগে ওঠে, বর্ষায় ডুবে যায়। তাই আমার মতামত পণ্ডিতসমাজে জানাবার কথা ভাবিনি, কিন্তু পণ্ডিত সমাজ শেষ পর্যন্ত কি করলেন তা জানার কৌতুহল আছে খুবই। আশা করি অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার বইটি পড়েছেন এবং আপনার পরামর্শ নিতে আগ্রহী হয়েছেন।

আপনি এখন কেমন আছেন। কিভাবে দিনকাটাচ্ছেন সব জানতে ইচ্ছে করে। শরীরে বল পেলে আপনি লিখে জানাবেন। আপনার নিজের হাতে-লেখা চিঠি পেলে আমার খুবই ভাল

লাগবে, কিন্তু আপনি যদি কোন কষ্ট হয় আপনি এখন লিখবেন না। আমি নিত্যপ্রিয়-র কাছ থেকে আপনার খবর পাব।

আমরা ভাল আছি। সম্প্রতি দিল্লীতে একধরনের ইনফুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছে—প্রায় মহামারীর মত। তাতে আমরা পরপর সকলেই আক্রান্ত হয়েছিলাম-কিন্তু মোটামুটি অক্ষত শরীরেই সেই বিভীষিকা অতিক্রম করে এসেছি।

আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা জানিয়ে চিঠি শেষ করছি। আমাদের সকলের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : আট

৪১ বাংলা লেন

দিল্লী ১১০০০৭

বিজয়াদশমী ১৩৮৮

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনি আমাদের শুভ বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করুন। আশা করি আপনি এখন সুস্থ হয়েছেন। আমি এর আগে আপনাকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। আশা করি সেই চিঠি আপনি পেয়েছিলেন। নিত্যপ্রিয়ের কাছ থেকে^১ আপনার খবর মধ্যে মধ্যে পাই। প্রায় মাসখানেক কোন চিঠিপত্র পাইনি। No news is good news প্রবাদবাক্য অনুসারে ধরে নিয়েছি এখন ভাল আছেন।

এ চিঠির উস্তর দেবার জন্য কোন কষ্ট করবেন না। নিত্যপ্রিয়কে বলবেন যেন আমাকে দু-লাইন লিখে জানান। আপনি সুস্থ আছেন জানতে পারলেই আমার ভাল লাগবে। আপনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন। প্রণামান্তে ইতি

শিশির

পত্র : নয়

৪১ বাংলা লেন

দিল্লী ১১০০০৭

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

শ্রীচরণকমলেশু,

কলকাতা থেকে ফিরে এসেই আপনাকে চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু লেখা হয়নি। কয়েকদিন আগে আপনার “বাংলা বানান”-এর নবসংস্করণ^১ পেয়েছি। তারপরেও চিঠি লিখতে দেরী হয়ে গেল। আসলে আপনাকে চিঠি লিখতে বসলেই এখন ভয় হয়। কখন কোন বানান যে ভুল লিখে বসব!

আপনি লিখেছেন, “বানান স্থিতিশীল রাখার একমাত্র উপায় শব্দের উৎস সন্ধান। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বানান হলে শব্দের অর্থবোধ ব্যাহত হয় না।” এ ব্যাপারে বোধহয় কেউ আপত্তি করবেন না। কিন্তু বাংলাশব্দের বানান স্থির করতে গিয়ে যখন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের দ্বারস্থ হই, সেখানে এত বিকল্প প্রস্তাব দেখি যে তখন “স্থিতিশীলতা” কতখানি রাখা যাবে তাতেও সন্দেহ নয়। সম্প্রতি একটি প্রশ্নপত্রে ছাপা হয়েছিল “বশিষ্ঠ”, আমি “বশিষ্ঠ” বানানই জননতম, তাই মৃদু আপত্তি করেছিলাম। দেখা গেল সংস্কৃত অভিধান দুটি বানানকেই আশ্রয় দিয়েছেন। হিন্দীতে লেখা হয় “বিকাস”, বাংলায় লিখি “বিকাশ”। সংস্কৃত অভিধান দুই বানানকেই মানে। তখন আশঙ্কা হয় শব্দের উৎস সন্ধানও সবসময় সাহায্য করবে কিনা।

তবু মনি যে উৎস বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সংস্কৃতভাষার (ব্যাকরণের) সন্ধি সমাস ও প্রত্যয়ের নিয়ম বাংলায় কতটা প্রয়োগ করা উচিত। বাংলা সংস্কৃত থেকে শব্দ নিয়েছে প্রচুর। আরো নেবে ভবিষ্যতে। কিন্তু বাংলা ভাষা তো সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চলে না, কাজেই সেই নিয়ম মানবে কেন? এ কথা বলছি—কলকাতায় আপনার মুখে—ইন্ডোগান্ট শব্দের বানানের প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত শোনার পর।

আপনার বই পাঠকসমাজ সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় সংস্করণও, আমার বিশ্বাস, আরো সমৃদ্ধ হবে। বানান সম্বন্ধে আপনি আমাদের মত লোকের জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছেন, অনেকেই ভাবছেন, কিছু করার চেষ্টাও করেছেন। আশা করা যায়, অচিরে এই সমস্যার একটা মীমাংসা হবে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই বিভ্রান্তবোধ করছি। কাজেই আপনারা যে বিধান দেবেন তা আমি মানার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

আপনার শরীর কেমন আছে? যদি গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতা যাই তখন দেখা হবে।

আমাদের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : দশ

41 Bungalow Lane

Delhi 110007

25 August 82

শ্রীচরণকমলেশ্ব,

আজ এইমাত্র আপনার ২৩ অগাস্টের চিঠি পেলাম। আমি অসীমের মুখে শুনেছি যে আপনি আমার চিঠি পাননি। আমি ৫ অগাস্ট কলকাতা গিয়েছিলাম। ঘটনাচক্রে অসীমের সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনার কাছে যাবার ইচ্ছা ছিল খুবই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারলাম না। শঙ্খদার সঙ্গে আসার দিন দেখা হয়েছিল অল্প সময়ের জন্য।

‘আজকাল’ পত্রিকা আপনার বইটি আলোচনার করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। ওঁরা বলেছিলেন চারশ শব্দের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। আমি যে আলোচনা করেছিলাম তা ১৩ জুনের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি আপনার চোখে পড়েছে। লেখাটির একটি Cutting আমি গতকাল পেয়েছি। আমার লেখায় বোধহয় একটু cynicism প্রকাশ পেয়েছে।

কেউ কেউ বললেন একটা Serious ব্যাপার নিয়ে আমি পরিহাসের ভঙ্গীতে লিখেছি। জানিনা আপনার কি মনে হয়েছে। আমি পরিহাসের ভঙ্গীতে লিখেছি ঠিকই। তার কারণ সবাই দেখছি বানান-প্রসঙ্গ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করতে রাজী, কিন্তু সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে নীরব। কোন নিয়ম বা নিয়মাবলী যদি প্রস্তুত-ও হয়, সকলে কি তা মেনে নিতে রাজী হবেন? স্বৈচ্ছাচার বা স্বাধীনতা সহজে বিসর্জন দিতে চাইবেন কি লেখক সমাজ বা পণ্ডিতগোষ্ঠী? এইটিই আমার কাছে একটা জরুরী প্রশ্ন। বানানের নৈরাজ্যের ছবি আপনি এঁকেছেন, সমস্যাগুলি উত্থাপনও করেছেন। কিন্তু আপনি তো সেইখানেই শেষ করেননি। আপনি চাইছেন 'স্বৈচ্ছাচার শৃঙ্খলিত' করতে। সে ব্যাপারে কি কেউ অগ্রসর হয়েছেন?

যাইহোক, আমি তো বাংলাদেশ থেকে দূরে। গঙ্গাভীরের পণ্ডিতেরা যে বিধান দেবেন, আমি যমুনাতীরে বসে অবশ্যই তা মানব এটুকু বলতে পারি।

অসীমের কাছে এবং শঙ্খদার কাছে আপনার বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা শুনেছি। বিশেষতঃ আপনার চোখের কথা শুনে খুবই বিষণ্ণ বোধ করি। কেমন আছেন আপনি?

আমরা মোটামুটি ভাল আছি। গ্যেটে-দাস্তে অমৃত এবং সুস্মিতা সবাই ভাল আছে। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। নিবেদন ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : এগারো

28-10-82

বিজয়াদশমী ১৩৮৯

শ্রীচরণকমলেশ্বর,

আপনি আমাদের শুভ বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম। দিল্লীতে হঠাৎ ডেঙ্গু-জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই একএকবার করে আক্রান্ত হয়েছি। এখন মোটামুটি ধাক্কা সামলে উঠেছি। আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন শঙ্খদা এবং অসীমের কোনো চিঠি পাইনি। আশা করি বাড়িতে সবাই ভাল আছেন।

আপনি কী করছেন? নতুন কিছু লিখছেন কি? আপনার চোখের অবস্থা কেমন? সব জানাবেন। ডিসেম্বরের শেষে একবার কলকাতা যাবার সম্ভাবনা আছে, তখন আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে। শরীরের যত্ন নবেন।

সুস্মিতা আপনাকে বিজয়ার প্রণাম জানাচ্ছে। ছেলেদের কাল থেকে ইস্কুল আরম্ভ হবে। এবার পূজা উপলক্ষে দুদিন ছুটি ছিল। সমস্ত ছুটি এখন এশিয়াড-মেলায় দেওয়া হবে। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : বারো

C-19/29-31 Probyn Rd.

Delhi 110007

১লা বৈশাখ ১৩৯০

শ্রীচরণেশ্ব,

আপনি আমাদের নববর্ষের প্রণাম নেবেন। অনেকদিন আপনাকে চিঠি লিখিনি। গত পাঁচ ছ মাস ধরে নানাভাবে বিব্রত হয়ে আছি। ইতিমধ্যে বাসা বদল করেছে। নূতন ঠিকানা ওপরে দিলাম।

আপনি কেমন আছেন? কোন কিছু লিখছেন কি? এত দূরে থাকি যে কলকাতায় যে সব চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পারিনা। গরমের ছুটিতে হয়ত কলকাতা যাব। তখন আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হবে।

শঙ্খদাকে চিঠি লিখে কোন উত্তর পাইনা। আশা করি শঙ্খদা ভাল আছেন।

আপনার শরীর সুস্থ থাকুক এই কামনা করি। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : তেরো

C-19/29-31 Probyn Rd.

Delhi 110007

24.4.1983

শ্রীচরণকমলেশ্ব,

কাল আপনার চিঠি পেয়েছি। তার আগের দিন অসীমের চিঠিতে জেনেছি যে ‘প্রবীণ’-রোডের বানান সমস্যা আপনাকে কিছুটা চিন্তিত করেছে। আসলে Probyn সংস্কৃত ‘প্রবীণ’ নয়, সম্ভবতঃ কোন ভারতীয় শব্দ নয়। যতদূর মনে হয় কোন ইংরেজের নাম অথবা সেই নামের ভারতীয় (হিন্দী) বিকৃতি। কলকাতা থেকে দিল্লীতে যখন রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলেই ভাইসরয় থাকতেন। এ অঞ্চলে যে সব সাহেবসুবা থাকতেন তাঁদের নামেই রাস্তার নামকরণ হয়েছিল। প্রবীণ বোধহয় সেই প্রাচীন ইতিহাসের চিহ্নমাত্র।

আমি যে প্রখ্যাত কবি তা আমিও জানিনা। আমি কবিতা লিখি, দুচারটি ছাপাও হয়। কিন্তু নানা পত্রপত্রিকায় আমার কবিতা আপনার চোখে পড়ছে জেনে আশঙ্কিত হচ্ছি। হয়ত ওসব কবিতা আমার লেখা নয়। এযুগের কবিতা সম্বন্ধে আপনার এ্যালার্জী আছে লিখেছেন, কিন্তু দুচারটে পড়লে হয়ত এ্যালার্জী কেটেও যেতে পারে। সক্রেনটিস, যিনি নাকি কবিতার বিরোধী ছিলেন, শুনেছি তিনি কারাগারে বসে শেষ জীবনে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ তখনকার আধুনিক কবিদের রচনার প্রতি এ্যালার্জিক ছিলেন। আপনিও একবার চেষ্টা করে দেখুন না, ‘দুপ্পাচা’ নাও হতে পারে। পরপৃষ্ঠায় আপনার পাকস্থলীর শক্তি পরীক্ষার্থে একটি নমুনা পাঠালাম। প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

তবে কাকে করে আছ আড়াল ; পাহাড় ?
প্রাচীকে না প্রতীচীকে ?
এমন নিবিড় স্থবিরতা নিয়ে ?
অথচ শরীর জুড়ে ঢেউ
উঠেছিল একদিন,
হঠাৎ নিশ্চল তারা আজ।
তবে কি সৃষ্টির লগ্নে তোমার প্রেরণা
পরিত্যাগ করেছিল তোমাকে, পাহাড় ?
এখন লুকের মত চাও
মাটি, নদী, সমুদ্রের দিকে।
সেই লোভও শিলীভূত হয়,
যেন সে পরের পরিণীতা
ছেড়ে গেছে প্রথম প্রেমের প্রতিভাকে।
তবে কাকে করে আছ আড়াল, পাহাড় ?
স্মৃতিকে না আকাঙ্ক্ষাকে ?

পত্র : চৌদ্দ

C-19/29-31 Probyn Rd.
Delhi 110007
5.11.1983

শ্রীচরণেশ্বর,

আজ আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আমার বিজয়ার চিঠি পাননি জেনে খুব খারাপ লাগছে। আজ অসীম-সুমিত্রা-পাপু এসেছিল। এই পোস্টকার্ড পাপুর কাছ থেকে পাওয়া। আমার চিঠি পৌছবার আগেই আশা করি অসীমের সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। আমাদের সকলের প্রণাম নেবেন। কাল আবার অসীমের সঙ্গে দেখা হবে। আমরা সবাই ভাল আছি। কালীপূজার পট্কা-বোমা ইত্যাদির আওয়াজে আজ একটু সন্ত্রস্ত। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : পনেরো

C-19/29-31 Probyn Rd.
Delhi 110007
12 March 1984

শ্রীচরণকমলেশু,

গত মাসে কয়েকদিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। সে কথা অসীমের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি সেজন্য খুবই খারাপ লাগছে। সামনের মাসে বা গরমের ছুটিতে আবার সম্ভবত যাব। তখন দেখা হবে।

অসীম লিখেছে আপনি আমার লেখাটি^১ দেখতে চেয়েছেন। আমার কাছে একটি ‘কপি’ ছিল। সেটি “আজকাল” পত্রিকা নিয়ে নিয়েছে। ঐ পত্রিকায় লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হবে এইরকম আশ্বাস দিয়েছেন ওঁরা। ছাপা হলেই আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আপনার শরীর কেমন আছে? অসীমের কাছে মধ্যে মধ্যে খবর পাই। আপনাকে দেখতে এবং আপনার কথা শুনতে ইচ্ছে করে।

আমাদের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : ষোলো

C-19/29-31 Probyn Rd.
Delhi 110007
8 April 1984

শ্রীচরণেশু,

আজ সকালে আমার এক হিন্দীভাষী বন্ধু এসেছিলেন। তাঁর নাম “হরীশ”।^১ কথায় কথায় তিনি বললেন বাঙালীরা ‘হরিশ’ লেখে কেন? ‘হরি’ আর ‘ঈশ’ যোগ করলে “হরীশ” হওয়াই উচিত।

আমি চলন্তিকা, হরিচরণ এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেখলাম। ‘হরিশ’ শব্দটি কোথাও পেলাম না।

শব্দটি তাহলে এল কোথা থেকে? ‘হরিশ্চন্দ্র’ শব্দটির অপভ্রংশ নিশ্চয়ই। যেমন ‘সুরেন্দ্র’ থেকে ‘সুরেন’, ‘অহীন্দ্র’ থেকে ‘অহীন’ শব্দ; ‘হরিশ্চন্দ্র’ থেকে ‘হরিশ’। এবিষয়ে আপনার কি বক্তব্য জনতে চাই।

অবশ্য ‘হরিশ’ শব্দটি অন্য কোন ভাবে ব্যুৎপন্ন হয়েছে কিনা জানিনা। আপনার শরণাপন্ন হলাম।

আশা করি কুশলে আছেন। শঙ্কদা এসেছিলেন। নিত্যপ্রিয়ও হঠাৎ এসেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে আপনার কথা কিছু শুনলাম।

প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্রগুচ্ছ ২ / ১০৭

পত্র : সতেরো

C-19/29-31 Probyn Rd.
Delhi
১লা বৈশাখ ১৩৯১

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনি আমাদের নববর্ষের প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনি সুস্থ থাকুন, প্রসন্ন থাকুন দেহে মনে, এ আমাদের আন্তরিক কামনা।

আশা করি আমার গতসপ্তাহে লেখা “হরীশ”-“হরিশ” সম্পর্কিত চিঠিটি পেয়েছেন। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। নিবেদন ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : আঠারো

C-19/29-31 Probyn Rd.
Delhi 110007
21 April 1984

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনার চিঠি পেলাম। আশা করি পয়লা বৈশাখে যে পোস্টকার্ডটি লিখেছিলাম সেটি আপনি পেয়েছেন। ‘হরিশ’ সম্বন্ধে যা লিখেছেন আমি তা ‘হরীশ’কে বলেছি। বোধ করি ‘গিরিশ’ এবং ‘গিরীশ’ পদদুটি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। প্রথমটি সমাসে শুদ্ধ এবং সিদ্ধ। দ্বিতীয়টি সন্ধিতে। তবে কোনো বাংলা অভিধানেই ‘হরিশ’ পদটি নেই। ‘গিরিশ’ চলন্তিকায় আছে (গিরিতে যিনি শয়ন করেন-এই অর্থে) জ্ঞানেন্দ্রমোহন ‘গিরিশ’ গ্রহণ করেননি।

‘আজ-কাল’-এ পবিত্র সরকার উদ্ভাবিত চিহ্ন দুটি আমিও দেখেছি। আমিও অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু সংকোচে ঐ প্রসঙ্গ কারো কাছে উল্লেখ করিনি। পাঁচ-ছ বছর আগে চিঠিতে আপনাকে লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনার হয়ত মনে নেই। আপনার স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতায় মুগ্ধ হলাম।

সুস্মিতা এখনও কলকাতায় যেতে পারেনি। হয়ত মে মাসের শেষে, ছেলে মেয়েদের গরমের ছুটি আরম্ভ হলে যাবে।

আপনি কেমন আছেন? আমাদের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : উনিশ

C-19/29-31 Probyn Rd.

Delhi 110007

13 October 1984

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনি আমার বিজয়ার প্রণাম নেবেন। আমি গত দু'তারিখে অষ্টমী পূজার দিনে দুসপ্তাহের জন্য বিদেশে গিয়েছিলাম। আজ ফিরেছি। বিজয়ার প্রণাম জানাতে তাই দেবী হল।

আপনি কেমন আছেন? 'য'-ফলা সম্পর্কিত প্রবন্ধটি^১ নিত্যপ্রিয় আমাকে দিয়েছিল। আমি আপনার বক্তব্য ভাল বুঝতে পারিনি। তাই সে সম্বন্ধে নীরব ছিলাম। ইচ্ছা ছিল কলকাতায় গেলে আপনার সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি স্পষ্ট করে জানব।

আমি সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একবার কলকাতা যাব। তখন দেখা হবে। ভাল থাকবেন। সুস্বাস্থ্য ও আমাদের ছেলেমেয়েরা সবাই তাদের বিজয়ার প্রণাম জানাচ্ছে। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : কুড়ি

C-19/29-31 Probyn Rd.

Delhi 110007

9 May 1985

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি। অনেক দিন চিঠি লিখিনি। এ বছর পয়লা বৈশাখেও কোন চিঠি লিখিনি। ঐ সময় আমি উড়িষ্যা গিয়েছিলাম। সেখানে নানা হৈ চৈ-র মধ্যে আপনাকে চিঠি লিখতে পারিনি। পরে লিখতে পারতাম কিন্তু লজ্জায় লিখে উঠতে পারিনি। ইতিমধ্যে সোমেশ্বর^২ এসেছিল। তার কাছে আপনার খবর পেয়েছি। অসীম লিখেছে, বাবা তোর ওপর রেগে গেছেন। রাগ করারই কথা। আমি ক্ষমা চাইছি।

আমি রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ^৩ লিখেছি। অসীম নিশ্চয়ই আপনাকে পড়তে দেবে। যদি পড়তে পারেন আমার খুব ভাল লাগবে। রবীন্দ্রনাথ যখন চীনে যান তখন তাঁর খুব বিরোধিতা হয়েছিল। সেই ব্যাপারটি সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে।

আপনি এখন কেমন আছেন। আপনার চিঠি পেলে আবার লিখব। আপনি আমাদের প্রণাম নেবেন। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থী

শিশির

পত্র : একুশ

C-19/29-31 Probyn Rd.
Delhi 110007
24.10.85

শ্রীচরণকমলেশ্ব,

আপনারা আমাদের শুভ বিজয়ার প্রণাম নেবেন। কলকাতা থেকে ফেরার আগে আর একবার আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কাজের চাপে যেতে পারলাম না। আপনার দৃষ্টিহীনতার কথা মনে হলেই মন বিষণ্ণ হয়ে আসে, কিন্তু আপনার কাছে গেলে এত নূতন চিন্তার খোরাক মেলে যে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

আমি যে দু-সপ্তাহ যাদবপুরে পড়লাম তাতে খুব আনন্দ পেয়েছি। ওখানকার অধ্যাপকেরা খুবই পরিশ্রমী, ছাত্র-ছাত্রীরাও খুব বুদ্ধিমান। আমি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটি ছোট বই^১ লিখেছি। আশা করি মাস-দুয়েকের মধ্যে ছাপা হবে। আপনাকে নিজের হাতে দিয়ে আসার চেষ্টা করব।

আমি আবার লিখব। আপনি সুস্থ থাকুন এই কামনা করে শেষ করছি। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : বাইশ

১ বৈশাখ ১৩৯৩
দিল্লী

শ্রীচরণকমলেশ্ব,

আপনি আমাদের নববর্ষের প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনাকে প্রায়ই চিঠি লেখার কথা ভাবি, মধ্যে মধ্যে নানা সমস্যা নিয়েও বিরত করার কথা ভাবি, কিন্তু আপনার চোখের কথা ভেবে নিরস্ত হই। গত মাসে অসীম দিল্লী এসেছিল তখন আপনার খবর পেয়েছিলাম।

এই চিঠিতে আপনাকে একটি ছোট প্রশ্ন করছি। ‘মরুদ্যান’ বানান কি হবে? চলন্তিকা লিখেছেন ‘মরুদ্যান’, স্ত্রীনেত্রমোহন ‘মরুদ্যান’, হরিচরণ শব্দটি তাঁর অভিধানে রাখেননি।

আশা করি আপনারা ভালো আছেন। সুস্মিতাও ছেলেমেয়েরা সবাই আপনাদের নববর্ষের প্রণাম জানাচ্ছে। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : তেইশ

C-19/29-31 Probyn Rd.

Delhi 110007

বিজয়াদশমী/১৩ অক্টোবর ৮৬

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনি ও মাসিমা আমাদের বিজয়ার প্রণাম নেন।

অগাস্টমাসে অল্প সময়ের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন আপনাকে দেখে, আপনার দৃষ্টিহীনতার জন্য অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হচ্ছিল। আপনি অনেকদিন আগে ধর্ম বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নটিই বারবার মনে ফিরে আসছিল।

আপনি লিখেছিলেন আপনি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বা ঈশ্বর চিন্তা বুঝতে পারেন, কিন্তু গান্ধীর ধর্মচিন্তা বোঝেন না একেবারেই। আমি অবশ্য গান্ধীর ধর্মচিন্তা বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি কিনা সেটা আলাদা ব্যাপার। গান্ধীর ধর্মের মূল কথা ঈশ্বরে বিশ্বাস, মঙ্গলময় সেই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সমস্ত কাজ মানুষের বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও ইন্দ্রিয়াতীত শাস্ত্র সত্যে বিশ্বাসী, যদিও তিনি বলবেন আমাদের চেতন্যের মধ্যে যদি ঈশ্বর প্রতিভাত না হন, তাহলে তাঁর অস্তিত্ব মানুষের পক্ষে অবাস্তব। অস্তুত The Religion of Man বঙ্গভাসমালায় এই কথাটা খুব জোরের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের বঙ্গব্যাও আমি বুঝি, কিন্তু আমি তাঁর মঙ্গলময় ঈশ্বরকেও সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ একটা কোনো স্পষ্ট মঙ্গলময় বিধান এই বিশ্বে কাজ করেছে এই বোধ আমার নেই। থাকলে আপনার দৃষ্টি হারাতো না।

কোনো মঙ্গলময় বিধান নেই, নেই Moral University নেই—কিন্তু মানুষের বাঁচার জন্য, মানুষের মতো বাঁচার জন্য, মানুষকেই একটি Moral Universe গড়ে নিতে হয়। এই Moral Universe মানুষের সৃষ্টি। এই মঙ্গলময় ঈশ্বরও মানুষের প্রয়োজনে মানুষের রচনা। অবশ্য একথা রবীন্দ্রনাথ মানবেন না, কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ করবেন না, তিনি মৃদু হাসবেন হয়তো। গান্ধী অবশ্যই মানবেন না এবং তিরস্কার করবেন।

আপনি লিখেছিলেন আমি ধর্ম বিষয়ে কোনো দিন চিন্তা করেছি কিনা। আমি বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পড়েছি। অনেক শিখেছি। ধর্মের ইতিহাসের মতো চিন্তাকর্ষক সত্যি কিছু নেই। মানুষের সমস্ত মহৎ এবং সেইসঙ্গে পাশবিক ও অমানবিক চিন্তা ও কর্মের এমন অস্বাভাবিক সমাহার ধর্মের ইতিহাস ছাড়া আর কোথাও পাই না। যা আমাকে মুগ্ধ করে তা এক বিশালতার বোধ এবং নিজের দিকে ফিরে তাকানোর প্রেরণা। লোকে বলে ধর্ম মানুষকে শান্তি দেয়, আমি মনে করি ঠিক তার উল্টো। ধর্মের যে বোধ তা আমাদের প্রবল ভাবে বিপন্ন করে তোলে, অসহায় করে তোলে এই বিশ্বের সীমাহীন রহস্যের সামনে। তখন অবশ্য এক শাস্ত্রত অপরিবর্তনীয় সত্যকে স্বীকার করতে পারলে সব সমাধান হয়। কিন্তু সেই সত্যকে স্বীকার করতে হয় বিশ্বাসে। সেই বিশ্বাস আমার নেই। বেশীর ভাগ মানুষেরই নেই, তাদেরও বিশ্বাস নিজস্ব উপলব্ধিজাত নয়, সংস্কারগত, ঐতিহ্যলব্ধ। যাঁরা নিজের উপলব্ধি থেকে এই বিশ্বের সীমাহীনতার সঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতাকে মেলাতে যান, তাঁদের অবস্থা রবীন্দ্রনাথের মতো—বিশ্বাস আর সংশয়ের মধ্যে

দুলতে থাকেন। কিন্তু সংশয় থেকে কবিতা হতে পারে, ধর্ম জন্ম নিতে পারে না। সে অর্থে আমি অধার্মিক। বোধ হয় আপনিও। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : চব্বিশ

১ বৈশাখ ১৩৯৪

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনারা আমাদের সকলের নববর্ষের প্রণাম গ্রহণ করবেন। গত মাসে নিত্যপ্রিয় একবার অল্প সময়ের জন্য এসেছিল, তখন আপনার খবর পেয়েছিলাম। আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি, দেখতে ইচ্ছে করে, আপনার কথা শুনতে ইচ্ছে করে।

আমি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি ছোটো বই^১ লিখেছি। তার বিষয় হল স্পেনের এক কবিদম্পতী কীভাবে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক সময় স্পেনের সাহিত্যে কী উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। শব্দদা একসময় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন, আমার বইটি তারই সম্পূরক। আশা করি আগামী মাসে বইটির ছাপা শেষ হবে। তখন আপনাকে পাঠাব।

আপনি ভালো থাকুন এই কামনা করে চিঠি শেষ করছি। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : পঁচিশ

C-19/29-31 Probyn Road

Delhi 110007

১২ মে ৮৭

শ্রীচরণেশু,

আমি হঠাৎ কলকাতা গিয়েছিলাম। খুবই ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করি। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় কালিন্দী পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হলনা। সে জন্য আমার মনে অপরাধবোধ জন্মে আছে।

দিল্লী ফিরে এসে আপনার ৬ মে তারিখে লেখা চিঠি পেলাম। আপনি বাংলা স্বরবর্ণ সংস্কার সম্বন্ধে যা লিখেছেন সে ব্যাপারে আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব আমি তা অবশ্যই করব। আমি যেহেতু কলকাতা থেকে দূরে আছি, তাই আমার পক্ষে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি initiative নিতে চাই। বাংলা স্বরবর্ণমালা ঠিকই আছে, দরকার শুধু

‘অ্যা’-র জন্য দুটো চিহ্ন। আমি যে চিহ্ন দুটি একবার আপনাকে পাঠিয়েছিলাম তা-আপনি অপছন্দ করেননি। চিহ্ন দুটি বোধ হয় আপনার মনে আছে—ঐ(ত্-য় ত্-য়-র-ফলার কসি বিহীন রূপ) আর মধ্যের ‘অ্যা’-ক্ষনির জন্য বর্ণের বাঁ দিকে ‘ঈ’)। আমি একটি চিঠি তৈরি করে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। সেই চিঠিতে বাংলা দেশের সমস্ত শিক্ষক সম্প্রদায়, প্রকাশক ও মুদ্রকের কাছে আবেদন করব তাঁরা যেন এই সংস্কারকে (সংস্কার তো নয়, শুধু সংযোজন) সমর্থন করেন। এই চিঠিতে প্রথম স্বাক্ষর থাকার দরকার আপনার। তারপর পবিত্র ও শঙ্করদার স্বাক্ষর। আর বেশী লোকের দরকার নেই।

আমি দু একদিনের মধ্যেই এই চিঠির খসড়া পাঠাচ্ছি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি দীর্ঘ ঋ (ঋ) স্বরবর্ণ মালায় রাখতে চান। তার কি কোনো প্রয়োজন আছে ঋ-কার রাখার যৌক্তিকতা আছে কারণ ‘ঋণ’ বা ‘ঋষি’ প্রভৃতি শব্দ বাংলায় ব্যবহার হয়। কিন্তু বাংলা ভাষা লেখার জন্য তো দীর্ঘ-ঋ র কোনো প্রয়োজন নেই। দীর্ঘ ঈ-র মতোই দীর্ঘ ঋ-ও কি অনাবশ্যক নয় ?

যাইহোক, আপনি এ ব্যাপারে উত্তেজিত হবেন না। কারণ আমাদের স্বরবর্ণ বর্জনের চেয়েও নতুন একটি বর্ণের সৃষ্টি বেশী প্রয়োজন।

আমাদের সকলের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : ছাব্বিশ

১৬ মে ৮৭

শ্রীচরণেশ্বর,

আজ আপনার পঁচিশে বৈশাখে লেখা আশীর্বাদ পত্র পেলাম। আমার বাবা বেঁচে থাকলে আপনার মতোই খুশি হতেন। আপনার কণ্ঠস্বরে আমি বাবার কণ্ঠস্বরও শুনেতে পাচ্ছি।

আশা করি আমার আগের চিঠি পেয়েছেন। আমি ‘অ্যা’ ক্ষনি বিষয়ে একটি খসড়া করে স্বপনকে পাঠিয়েছি। স্বপন আপনার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করবে। আজ পবিত্রকেও লিখেছি। খসড়াটি শুনে আপনি যা করতে বলবেন তাই করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ও স্পেন আগামী মাসেই প্রকাশিত হবে।

আমাদের সকলের প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত
শিশির

পত্র : সাতাশ

বিজয়াদশমী
২ অক্টবর ১৯৮৭

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনি ও মাসিমা আমাদের বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করবেন। কাল বিকেলে আপনার ২১ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিটি পেয়েছি। নিত্যপ্রিয় যে আপনাকে “শাস্ত্র মৌচাক” বইটি দিয়ে এসেছে সে খবর আমি পেয়েছিলাম। কথা ছিল যে বইটি আপনাকে পড়েও শোনাবে। অবশ্য খুব যে শোনার মতো বস্তু এর মধ্যে আছে তা নয়।

অ্যা-ফলি নিয়ে স্বপন leaflet ছেড়েছে জানি। কথা ছিল আপনার সঙ্গে আলোচনা করে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিদ্বৎ-জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বিভিন্নজনের কাছে পাঠানো হবে। স্বপন কী করেছে ঠিক জানিনা। অন্তত আমার নাম না দিলেই পারত।

রাজশেখর বসুর চিহ্নদুটি আপনি সরলতর মনে করেন, কিন্তু হাতের লেখায়, চিহ্ন দুটি বর্তমান এ এবং -কারের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠ যে confusion ঘটাবে। চিহ্ন দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই তর্কাতীত। আপনি যে আমার চিহ্নদুটি অনুমোদন করেননি, আমি তা বুঝতে পারিনি। আশা করি অন্য কেউও অনুমোদন করবেন না, সেক্ষেত্রে সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু রাজশেখর বসুর চিহ্ন দুটিও, এতদিনেও যখন চালু হোল না, এখন চালু হতে পারে বলে মনে করেন কি?

নবনীতা দেবসেন এবং পবিত্র সরকার আপনাকে তাঁদের বই উৎসর্গ করেছেন জেনে ভালো লাগল। এঁরা এখনকার বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ লেখক এবং পণ্ডিত। এঁদের কাছে বই পেলে আমার মতো লোক নিশ্চয়ই সম্মানিত বোধ করবে। আপনাকে বই উৎসর্গ করে এঁরা নিজেদের সম্মানিত করেছেন।

আপনার দৃষ্টিবিহীনতার জন্যই চিঠি লিখতে গিয়েও মনে হয় আপনাকে পীড়িত করছি। তাই অনেক সময়ই চিঠি লেখার কথা মনে হলেও, আত্মসম্বরণ করি।

আপনার শরীর কেমন আছে? আমরা সবাই ভালো আছি। আমাদের প্রণাম নেবেন।

প্রণত

শিশির

পত্র : আঠাশ

বৈশাখ/১৩৯৫

শ্রীচরণকমলেশু,

আপনারা আমাদের নববর্ষের প্রণাম গ্রহণ করবেন। আশা করি ভালো আছেন। গত সপ্তাহে অসীমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার মুখে আপনার কথা শুনলাম।

কেতকী কুশারী ডাইসন একটি নতুন বই লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে। বইটি যদি কেউ আপনাকে পড়ে শোনায় ভালো হয়। অসীমের কাছে একখণ্ড বই আছে শুনলাম।



ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে “বাংলা বানান সংস্কার একটি ভিত্তিপত্র” পেলাম। আপনার কাছে নিশ্চয়ই পৌঁচেছে। আপনি কি মতামত জানিয়েছেন? আমার মনে হয় বানান সংস্কার আর বাংলা বর্ণমালা সংস্কারে দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার এবং এদের আলাদা রাখতে পারলেই ভালো।

আমরা সবাই ভালো আছি। আপনি যখন সুবিধে হবে চিঠি দেবেন। ইতি

প্রণত

শিশির

পত্র : উনত্রিশ

C-19/29-31 Probyn Road
Delhi 110007

২১ অক্টোবর ৮৮

শ্রীচরণেশু,

আপনি ও মাসিমা আমাদের সকলের বিজয়ার প্রণাম নেকেন। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। নিত্যপ্রিয় আমাকে চিঠিপত্র লেখেনা, পাপু এসেছিল মাস দুয়েক আগে, তার কাছে আপনার খবর পেয়েছিলাম।

এখানে গত চারদিন খুব ধুমধাম করে পূজা হল। এখন দিল্লীতে শতাধিক পূজা হয়। আতঙ্কবাদীদের আতঙ্কে এ বছর সবাই একটু অস্বস্তিতে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে।

আপনি সুস্থ থাকুন এই প্রার্থনা করে চিঠি শেষ করি। পরে আবার লিখব। ইতি

প্রণত

শিশির

মণীন্দ্রকুমার-শিশিরকুমার : পত্র-বিনিময়

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৯৮-১৯৮৯) এবং শিশিরকুমার দাশ (১৯৩৬-২০০৩) পত্রালাপ শুরু করেন ১৯৭৭ সালে। মণীন্দ্রকুমারের মৃত্যুর পরে অজয়কুমার নন্দী মণীন্দ্রকুমারের জীবনী লিখছেন যখন, তখন মণীন্দ্রকুমারকে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা চিঠি অজয়বাবুকে দেওয়া হয়। শিশিরকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাঁকে লেখা মণীন্দ্রকুমারের কিছু চিঠি অজয়বাবুকে দেওয়ার জন্য। শিশির কয়েকটি চিঠি নির্বাচন করে পাঠিয়েছিল। তার একটি অজয়বাবু তাঁর শিক্ষাচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৯৯৮) জীবনীগ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। বাকিগুলোও তাঁর জিন্মায় ছিল। শিশিরের লেখা মণীন্দ্রকুমারকে চিঠিগুলোও অজয়বাবুর সংরক্ষণে ছিল। সব চিঠি পাওয়া যায় নি, সবগুলো সংরক্ষিতও হয়নি। ফলে চিঠিগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেল না। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দুজনের পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। শেষ পাঁচ বছর মণীন্দ্রকুমারের দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি লোপ পাওয়ায়, তাঁর চিঠিপত্র অজয়বাবু লিখে দিতেন, তাঁকে লেখা চিঠিপত্র অজয়বাবু পড়ে শোনাতে। ১৯৭৭ থেকেই তাঁর দৃষ্টিক্ষীণতা শুরু হয়েছিল, যেজন্য শিশির ছোটো ছোটো চিঠি লিখত, যাতে মণীন্দ্রকুমারের পড়তে কষ্ট না হয়, বিজয়া, নববর্ষের চিঠিও শিশির লিখত কুষ্ঠাভরে, মণীন্দ্রকুমারের চোখের অবস্থার কথা ভেবে। ব্যাকরণ ও বানান, সাহিত্য, ভাষা বিষয়ে পরের দিকে সাক্ষাতেই আলোচনা করতো, দিম্বি থেকে কলকাতায় এলে, বিভিন্ন সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া উপলক্ষে। মণীন্দ্রকুমার ও শিশিরের রঙ্গকৌতুক করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল, ফলে তাঁদের আলাপ-আলোচনা ব্যাকরণ-বানান হলেও সরস হয়ে উঠত। চিঠিপত্রগুলোতে তার আভাস আছে, তবে সামান্যই। চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের এবং কিছু প্রসঙ্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে পত্র-পরিচিতিতে।

পত্র-পরিচিতি

শিশিরকুমার দাশকে লেখা মণীন্দ্রকুমার ঘোষের পত্র

পত্র : এক

- ১ মণীন্দ্রকুমার ঘোষ আলোচ্য সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যপ্রিয় ঘোষের (১৯২৪-২০০৩) সঙ্গে রেলওয়ে-কর্মী পুত্রের রেলওয়ে কোয়টার্সে থাকতেন, শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে ক্যান্টিনে।
- ২ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) বরিশালের চন্দ্রহারে মণীন্দ্রকুমারের ছাত্র ছিলেন, মণীন্দ্রকুমারের উপদেশ শুনে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়া ছেড়ে সাহিত্য বিষয়ে পড়াশুনা করেন কলেজে।
- ৩ শঙ্খ চিস্তপ্রিয় ঘোষের (১৯৩২) বাড়ির ডাক নাম।
- ৪ নিত্যপ্রিয় (১৯৩৪) ও শিশির (১৯৩৬) প্রেসিডেন্সি কলেজে সহাধ্যায়ী ১৯৫১-৫৫ সালে। শিশিরের আই.এস.সি পাশ করে বাংলা অনার্স বি.এ.-তে, নিত্যপ্রিয়ের আই.এ. পাশ করে ইংরেজি অনার্স

বি.এ.-তে। নিত্যপ্রিয়ের বি.এ.তে পাস পাঠ্যক্রমে অলটারনেটিভ বাংলা থাকায় বাংলা অনার্সের ক্লাসে পড়ার সুবাদে শিশিরের সঙ্গে পরিচয়।

৫ 'বাংলা বানান'। প্রবন্ধটি কৃষ্ণিবাস পত্রিকায় ১৩৮৩-এর (১৯৭৬-৭৭) অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬ টি৬ বেলগাছিয়া ভিলা। যে সব অধ্যাপকেরা সেই সময় মণীন্দ্রকুমারের সঙ্গে গল্প করতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে বার্ষিক রায়, শ্যামাপ্রসাদ সরদার, জ্যোতি চক্রবর্তী বানান-ব্যাকরণ নিয়ে প্রশ্ন করতেন।

৭ 'বাংলা বানান' প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তখনকার কৃষ্ণিবাস পত্রিকা আদর্শ পত্রিকা না হলেও, ওই পত্রিকায় দেওয়া হয়েছিল, কেননা পরিচিত জনেরা পত্রিকা চালান। মণীন্দ্রকুমার প্রুফ নিজে দেখেন (তখনও প্রাক্কামায় দৃষ্টি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়নি), নির্ভুল ছাপা না হলে উত্তেজিত হন, তাছাড়া একটা নতুন 'বর্ণ' ফাউন্ড্রি থেকে তৈরি করাতে হবে,—ছাপা ব্যাপারটা দেখাশুনা করা যাবে, এই ভরসায় প্রবন্ধটি কৃষ্ণিবাস পত্রিকায় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রুফে ভুল হতে থাকে, বানান বিষয়ে প্রবন্ধে ছাপার ভুল অনর্থ করবে, তৃতীয়বার প্রুফ চাওয়া হলে, পত্রিকার কর্মকর্তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪) নিত্যপ্রিয়কে একটি রুপ পত্র লেখেন, মাসিক পত্রিকা চালানো কীরকম কষ্টকর, বারবার প্রুফ দেখানো সম্ভব নয়, লেখকের যা সংশোধন একবারে করলে ভালো হয়। তাছাড়া নতুন বর্ণটি পত্রিকাটির পক্ষে বানানো সম্ভব নয়। নিত্যপ্রিয় প্রেসে গিয়ে সুনীলকে না পেয়ে যিনি তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে পাতুলিপি ফেরত নিয়ে জানায়, প্রবন্ধটি ছাপার দরকাব নেই, প্রুফের সংশোধন না করেই প্রেস যদি প্রুফ পাঠায়, তাহলে দোষটা লেখকের নয়, প্রেসের; তাছাড়া নতুন বর্ণটি তৈরি না করতে পারলে প্রবন্ধটি ছাপতে হবে না। শীতল চৌধুরী (১৯৩৪), যিনি বরুণ চৌধুরী নামে লেখেন, 'খেড়ে খোকাদের বোঝাড়া কাণ্ড' বলে নিত্যপ্রিয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রেসে আবার জমা দেন। শেষ পর্যন্ত মণীন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রকুমার (১৯১২-২০০২) সরস্বতী প্রেসের ফাউন্ড্রি থেকে 'অ্যা'র নতুন বর্ণটি তৈরি করে পত্রিকাটির প্রেসে গিয়ে দিয়ে আসেন। ছাপা পত্রিকায় খুব বেশি না হলেও ভুল থেকেই গিয়েছিল, প্রুফের সংশোধন মান্য করা হয়নি। প্রেসের তরফে অবশ্য যুক্তি ছিল, প্রতি প্রুফেই বর্জন সংযোজন চলছিল, মাসিক পত্রিকার পক্ষে সেসব মান্য করাও কঠিন ছিল। বলা বাহুল্য, মণীন্দ্রকুমার এই নেপথ্য কলহকাহিনি জানতেন না, জানলে ছাপাতে রাজি হতেন না। পত্রিকা প্রকাশের পরে কৃষ্ণিবাস কর্তৃপক্ষ মণীন্দ্রকুমারের প্রবন্ধের জন্য ১০০ টাকা পাঠান, সেটা পেয়ে লেখক খুসিও হয়েছিলেন, অবাঞ্চ্য হয়েছিলেন।

ছাপার ভুল সম্পর্কে একটি কাহিনি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দর্পণ পত্রিকায় মণীন্দ্রকুমারের একটি গ্রন্থের আলোচনা করে সমালোচক লিখেছিলেন, ছাপায় ভুল আছে, সংশোধন বাঞ্ছনীয়। অত্যন্ত বিচলিত লেখক নিত্যপ্রিয়কে আদেশ করেন, দর্পণ পত্রিকায় সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করে সমালোচকের কাছ থেকে জেনে আসতে হবে, কী কী ভুল আছে। এই বিষয়ে সম্পাদক হীরেন বসু উচ্চহাস্য করে মন্তব্য করেন, 'আরে ধুর মশায়, আমার সমালোচক বইটা ঠিক মতো পড়েছে কি না সন্দেহ, আর পড়লেও কতটা বুঝেছে। আর ছাপার ভুল? বাংলা বইতে ছাপার ভুল থাকেই, তাই লিখতে হয়, ও লিখে দিয়েছে, সমালোচনায় ওটা না পড়েও লেখা যায়। আপনিও যেমন।'—মন্তব্য শুনে মণীন্দ্রকুমার নিশ্চিন্ত হন।

৮ প্রুফে কীরকম গ্রহণ-বর্জন চলত, এটি তার একটি উদাহরণ।

৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতি। সমিতির প্রথম পুস্তিকা ১৯৩৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়।

১০ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)

১১ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্রমভ (১৮৬৫-১৯৫২)

১২ কপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৪-২০০০)

১৩ শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯)

- ১৪ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিাবাবু) (১৮৬৮-১৯৩২)
- ১৫ তারাসুন্দরী (১৮৭৮-১৯৪৮)
- ১৬ তিনকড়ি চক্রবর্তী (১৮৭৭-১৯৫৪)
- ১৭ শিশিরকুমার ভাদুড়ি (১৮৮৯-১৯৫৯)
- ১৮ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)
- ১৯ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)
- ২০ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)
- ২১ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৯০০-১৯৭২)
- ২২ মণীন্দ্রকুমার ঘোষের ব্যাকরণ ও বানান বিষয়ে গ্রন্থ : সরল বাংলা ব্যাকরণ (১৯৫৪), মাধ্যমিক ব্যাকরণ ও রচনা (১৯৬৬), ব্যাকরণকলি ও রচনাকাকলি (১৯৬৮), ব্যাকরণের অআকথ (১৯৭৩), বাংলা বানান (আশা, ১৯৭৮), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ এবং সরল ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের সম্পাদনা।

পত্র : দুই

- ১ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮)
- ২ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)
- ৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)
- ৪ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪)
- ৫ রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

পত্র : তিন

- ১ প্রতিমা ঘোষ (১৯৩২), শঙ্কর স্ত্রী
- ২ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (১৮৪০?-১৯৪০); ভাষাবোধ বাঙলা ব্যাকরণ (১৮৯৮) তাঁর অন্যতম ব্যাকরণ-গ্রন্থ।

পত্র : চার

- ১ 'অ্যা'-র জন্য নতুন বর্ণের প্রয়োজন—এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য লেখকের বাংলা বানান (দে'জ চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৯)-এর প্রথম প্রবন্ধ।
- ২ সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণ (১৮৮৮-১৯৭৫)
- ৩ বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য
- ৪ যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬)
- ৫ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)
- ৬ সাময়িকী (অধ্যয়ন, ১৩৮৪, কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রকাশন সংস্থা)
- ৭ নিত্যপ্রিয় ঘোষের বাড়ির ডাক নাম
- ৮ বাংলা বানান (আশা, ১৩৮৫)

পত্র : পাঁচ

- ১ হরবল্লভ : বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের হরবল্লভের কথা স্মরণ করে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে স্রীকান্তের উক্তি।
- ২ আগেকার বইগুলো বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক, সেই অর্থে বাংলা বানান ও সাময়িকী 'আশী বছর বয়সে আমার প্রথম বই'।
- ৩ ১৯২৬ সালে 'স্কুলমাস্টারি' শুরু : (কলকাতা) আদর্শ বিদ্যালয়, কলকাতার কাছে মহেশতলা হাইস্কুল, (বরিশাল জেলায়) চন্দ্রহার কে আর শিক্ষায়তন, (কলকাতা) ব্রাহ্ম বয়েজ, (পাকশি) চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ, (কলকাতা) বেনেপুকুর বিদ্যাপীঠ, (খড়গপুর) কৃষ্ণলাল শিক্ষানিকেতন। আদর্শ বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম বয়েজ ছাড়া অন্যত্র হেড মাস্টার।

১১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

পত্র : ছয়

- ১ বাংলা বানান-এর আশা সংস্করণ (১৯১৭)
- ২ বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা (১) ও (২), শিক্ষা ও সাহিত্য, জুলাই-আগস্ট ১৯২৮ ও অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২৯
- ৩ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *Origin and Development of Bengali Language*

পত্র : সাত

- ১ সুস্মিতা (১৯৪২), শিশিরের স্ত্রী

পত্র : আট

- ১ পাপু, সাহনা (১৯৬৪) নিত্যপ্রিয়ের কন্যা
- ২ সুমিত্রা (১৯৪২), নিত্যপ্রিয়ের স্ত্রী
- ৩ ছায়া (১৯২৯-১৯৭৯), সত্যপ্রিয়ের স্ত্রী
- ৪ ভারতী (১৯৪২), মণীন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠা কন্যা
- ৫ প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬)

পত্র : নয়

- ১ অত্র, কৃত্যপ্রিয় (১৯৪৪) মণীন্দ্রকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র
- ২ কল্যাণ, সত্যপ্রিয়ের বাড়ির ডাক নাম
- ৩ দেবীপদ ভট্টাচার্য (১৯২৩-১৯৮৯)
- ৪ স্বপন মজুমদার (১৯৪৬)

পত্র : দশ

- ১ সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২)
- ২ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

পত্র : এগারো

- ১ দাস্তে, দেবর্ষি, শিশিরের দ্বিতীয় পুত্র (১৯৭২)

পত্র : বারো

- ১ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)

পত্র : তেরো

- ১ ইন্দিরচন্দ্র নিবাস, বাগমারী রোড
- ২ জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯১২)
- ৩ শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫)

পত্র : চৌদ্দ

- ১ গেটে, রাজর্ষি শিশিরের প্রথম পুত্র (১৯৬৩); শিশিরের কন্যা, নাম অমৃতা, বাড়ির নাম শরা (১৯৭৪)
মণীন্দ্রকুমার ভুলে লিখেছেন শর্মিষ্ঠা
- ২ নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১)
- ৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে

পত্র : পনেরো

- ১ বাংলা বানান-এর প্রথম দে'জ সংস্করণ, ২০ পৌষ ১৩৮৮ (৫ জানুয়ারি ১৯৮২)
- ২ প্রবন্ধটি প্রথমে *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে লেখা শিশিরকুমার দাশের চিঠি

পত্র : এক

১ বাংলা বনান (আশা, ১৩৮৫)

পত্র : তিন

১ বাংলা বনান-এর আশা সংস্করণ

পত্র : চার

১ কালিন্দী এস্টেট, লেক টাউনের কাছাকাছি

২ উন্টোডাঙ্গা-মানিকতলা, সিআইটি রোডের কাছে, ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস

পত্র : সাত

১ প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের অপারেশন

২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত 'বানান সংস্কার সমিতি' (১৯৭৯), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। এই সমিতির বিশেষজ্ঞ কমিটিতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য ও দেবীপদ ভট্টাচার্যের নাম ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ৩১.৭.৮১ তে বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল সমিতির কাজ বন্ধ করে দেয়। মণীন্দ্রকুমার 'বানান সংস্কারের চিন্তা অবাস্তব না' প্রবন্ধে, *আনন্দবাজার পত্রিকায়*, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮-তে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন।

পত্র : আট

১ কর্মসূত্রে নিত্যপ্রিয় প্রায়ই কলকাতা থেকে দিল্লি যেত, শিশিরের সঙ্গে দেখা করত

পত্র : নয়

১ বাংলা বনান-এর দ্বৈত সংস্করণ (১৩৮৮)

পত্র : পনেরো

১ গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব

পত্র : ষোলো

১ হরীশ ত্রিবেদী, *An Alien Homage* নামে EP Thomson-এর গ্রন্থের সম্পাদক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক

পত্র : উনিশ

১ বিভাব পত্রিকায় শরৎ ১৩৯১-এ প্রকাশিত সংসদ বাংলা অভিধান-এর আলোচনা।

পত্র : কুড়ি

১ সোমেশ্বর ভৌমিক, শব্দের বড়ো মেয়ে শ্রাবস্তীর স্বামী

২ প্রথমে প্রবন্ধ, পরে গ্রন্থ বিতর্কিত অতিথি।

পত্র : একুশ

১ ভাবাজিজ্ঞাসা

পত্র : চব্বিশ

১ শাস্ত্র মৌচাক

পত্র : পঁচিশ

১ পবিত্র সরকার (১৯৩৮)

পত্র
(শ্রীহরিগায় চক্রবর্তীকে লেখা)

সৈয়দ মুজতবা আলী

নিচুপট্টি, বোলপুর,
২৩।২।৬৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

এই তো প্রকৃত মিত্রের সংকর্ম (সৎকার বললুম না, পাছে আপনি শব্দটি রূঢ়ার্থে নিয়ে আমার সামান্যার্থে অপপ্রয়োগে অসন্তুষ্ট হন)। যে ভুলটি আপনি দেখিয়েছেন—I wish it were my only & the biggest mistake—হায়! এর চেয়ে কত না বৃহত্তর ভ্রম ত্রুটি বিচ্যুতি আমার হয়েছে, এবং কেউ দেখিয়ে দেয় নি, ভগবদ কৃপায় নিজেই কয়েকটি আবিষ্কার করেছি, কটি পারিনি ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ভাবুন তো, প্রত্যেকটি ভ্রম সম্বন্ধনগণ দয়া পরবশ হয়ে যদি দেখিয়ে দিতেন, তবে কত না নিশ্চিন্ত মনে আপন বক্তব্য নিবেদন করে যেতে পারতুম। অবশ্য এ স্থলে কেউ ২ বলবেন, ‘এতই যদি ভুল করো, তবে লেখবার কি প্রয়োজন!’ কিন্তু আমার মনে হল আপনি সে-দলে নন। আপনার বক্তব্য, ‘লেখো, ভদ্র, কিন্তু সাবধানে!’ এই দেখুন, ‘ভদ্র’ বলতে মনে এল, আমি আমার এক বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে একখানা বই উপহার দিয়ে লিখি ‘চতুর্ভদ্র চরণে’* এবং পাই এক ভট্টাচার্যের কাছ থেকে (ভ্রমচায় বোধ হয় চক্কাবর্তীর মত সহিষ্ণু নন!) নিদারুণ কটুবাক্য। চতুর্ভদ্র = ধর্মঅর্থকাম মোক্ষ—তা আমি পঁাতি পেড়ে, সর্ব যোগরূঢ়ার্থে ব্যবহৃত সর্বসমাসার্থ জানবো কি করে? অবশ্য স্বাধিকারপ্রমত্তঃ মেঘদূতে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে জেনেও প্রগল্ভতা বশতঃ শব্দার্থে, সামান্যার্থে—অধি না হয়েও আর্থ প্রয়োগ করি। To sell মানে কোনো বস্তু বিক্রয় করা—মার্কিনরা sell ideas also. আশ্মো চেষ্টা করছিলুম, নতুন কিছু sell করতে। আপনি ভেজাল ধরে ফেললেন!

আপনার কাছে নিবেদন, ভবিষ্যতেও যেন আমার সর্বপ্রকারের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেন—বিশেষ করে তৎসম শব্দ সমাসের অপপ্রয়োগে। আমার সংস্কৃত যৎসামান্য। আমাকে পড়াতে গিয়ে গুরু হার্টফেল করে মারা যান। আমার উচিত গলায় দড়ি বেঁধে—গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে ইত্যাদি।

নমস্কারান্তে—ব্রাহ্মণ—প্রণামান্তে

(সৈয়দ) মুজতবা আলী

* ইচ্ছে ছিল ‘চতুস্পদে’—বা মোলায়েমতর ‘চরণ চতুষ্টয়ে’ লেখার।

প্রসঙ্গ : সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি পত্র

হিরণ্ময় চক্রবর্তী

সাপ্তাহিক দেশ-পত্রিকায় (৩৩ বর্ষ ৫ম সংখ্যা শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬৫) ‘পঞ্চতন্ত্র’-শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় ‘চোখের জলের লেখক’-এই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী ৪৪০ পৃষ্ঠার তৃতীয় ভূক্তে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পংক্তিতে ‘স্বাধিকার প্রমত্ত’-শব্দটি নিম্নলিখিতভাবে প্রয়োগ করেন : ‘ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টাধম ফরাসী মিলিটারি স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাক্ষী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিদ্বার শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে।’

এই রচনাটির বক্তব্য মোটামুটি এইরকম: মোটাদাগের সরলীকরণের আশ্রয় নিয়ে লেখকদের ‘চোখের জলের লেখক’ কিংবা ‘হাসাবার লেখক’—এই জাতীয় বর্ণীকরণের যে অগভীর প্রবণতা কারুর কারুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সেই প্রসঙ্গে আলীসাহেব নানা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কোনো বড়ো মাপের লেখককে শুধু যে ওই রকম একটি বাঁধাগতের ছাপ মেরে দেওয়া যায় না তাই নয়, হাসি ও কান্না এই দুই স্বাভাবিক মানবিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও এক বিচিত্র যোগ রয়েছে এবং প্রতিভাধর লেখক তাঁর কাক্ষিত অভিঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উভয়েরই দক্ষ প্রয়োগ করে থাকেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি তৃতীয় শ্রেণির ‘চোখের জলের লেখক’ এই মর্মে প্রকাশ্য সভাস্থলে জনৈক অধ্যাপকের উচ্চারিত রায়ের কথা শুনে আলীসাহেব এতই ধাক্কা খান যে তিনি শুধু একজন চরমতম ‘গ্যাগা’ (Gaga) বা জড়বুদ্ধিসূলভ লোকের মতো অর্থহীন কতকগুলি ক্ষনিই বের করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি এই লেখায় দেখাতে থাকেন যে ধারণাটি কতটা ভ্রান্ত ও অগভীর। চিন্তাশীল প্রবন্ধ ছাড়াও শরৎচন্দ্র ‘ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপবাণে আমাদের জঙ্ঘরিত’ করেছেন, ‘সামাজিক নিষ্ঠুরতার কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে’ গেছেন। এরপর আলীসাহেব ঘরোয়া উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে ‘হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।’ মন্তব্য করেছেন যে, ‘সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের ভিতরে যারা সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সে-সব অনাচারের বিরুদ্ধে নাক্সা তলোয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়, তখন আমাদেরই মত জড়ভরতদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।’

আলীসাহেব এরপরেই ড্রাইফুসের প্রতি ফরাসি মিলিটারির অবিচার প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ব্যর্থ আবেদনের কথায় আসেন। ড্রাইফুস শত্রুর কাছে গোপনে সামরিক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যাদি পাচার করে দেশদ্রোহিতা করেছেন এই অভিযোগে কারাবন্দি হয়ে অত্যাচারিত হন। পরে অভিযোগ

টেকে নি। যাই হোক তাঁর হতভাগিনী স্ত্রী উপায়ান্তর না দেখে শেষে সাহিত্যিক এমিল জোঁলার শরণাপন্ন হন। বৃদ্ধ জোঁলা মাফ চাইলেও বেচারি তাঁর কাগজপত্র জোঁলার টেবিলে ফেলে রেখে চলে যান। ভাগ্যক্রমে সে রাত্রে জোঁলার কোনো কিছু করার ছিল না। এটাওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়ায় প্রথমে অলসভাবে পড়তে শুরু করে বৃদ্ধ হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন ও তারপর গেলেন ক্ষেপে! এর পর তাঁর হাত দিয়ে বেরল বিখ্যাত গ্রন্থ *জাকুজ্জ (J'accuse)* ‘আই একুজ্জ’। ‘ফরাসী সরকারকে আমি একুজ্জ করি’, অভিযুক্ত করি। এইভাবে তথাকথিত ‘কাঁদানোর লেখক’ ‘জোঁলার কৃপায় ডাইফুসের প্রতি সুবিচার হল।’

মুজতবার সিদ্ধান্ত : ‘শেষ কথা : বহু বছ প্রকৃত লেখক, ‘চোখের জলের লেখক’ নন কিংবা শুধু ‘হাসাবার’ লেখক নন। দুইই। তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন।’ শরৎচন্দ্রের ‘অরক্ষণীয়া’ নামক কাহিনিতে পাত্রপক্ষের সামনে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পাত্রীর অত্যধিক সাজসজ্জা দেখে ছোটো একটি ভাইবির হাসি পেলেও অনুচা বয়স্কা কন্যার দিক থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপটটির কারুণ্য অনুভব করতে পেরে লেখক যোলো বছর বয়সেই কেঁদে ফেলেছিলেন।

এইভাবে আলীসাহেব বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহৎ লেখকের অন্তরে মানুষের, বিশেষত বঞ্চিত বা হতভাগ্য মানুষদের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে পাঠকদের মর্মে সঞ্চারিত হয় সেটাই তাঁদের প্রকৃত প্রেরণার উৎস এবং নিছক কাঁদাবার লেখক বলে তাঁদের আখ্যা দিলে তাঁদের শিল্পের প্রকৃতি অথবা শিল্পের কৌশল কোনোটার প্রতিই সুবিচার করা হয় না। তাঁর মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে আমার মনে হয়েছিল যে, ‘স্বাধিকারপ্রমত্ত’ শব্দটি উনি যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন তা হল ‘ক্ষমতামদমত্ত’ বা ওই জাতীয় কিছু, এবং এই প্রয়োগটি সম্ভবত যথার্থ নয়। তার কারণ, বহুযুগ পূর্বে সংস্কৃতসাহিত্যে শব্দটির প্রসিদ্ধ প্রয়োগ ঘটেছিল কালিদাসের *মেঘদূতম্* কাব্যগ্রন্থে যে বিশিষ্ট অর্থে তা হল ‘নিজকর্তব্যে অবহেলাকারী।’ ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তদনুসারী বলেই মনে হয়।

চলন্তিকা অনুসারে ‘অধিকার’ শব্দটির অন্যতম অর্থ ‘নিজ কর্তব্যের অন্তর্গত বিষয়’, যদিও এর অপর অর্থ হল ‘আধিপত্য’, ‘কর্তৃত্ব’ ইত্যাদি। আর ‘প্রমত্ত’ শব্দের অর্থ সেখানে দেওয়া আছে ‘অনবহিত’, ‘ব্রাস্ত’, ‘প্রমাদযুক্ত’ ইত্যাদি, যদিও এর অন্যান্য অর্থ হল ‘অতিশয় মত্ত’ এবং ‘অত্যাসক্ত’। আর ‘প্রমাদ’ শব্দের অর্থ দেওয়া আছে ‘অনবধানতা’ (অর্থাৎ মনোযোগ, সাবধানতা ইত্যাদি বিষয়ের অভাব), ‘বিমূঢ়তা’, ‘ব্রাস্তি’, ‘বিস্মৃতি’ ইত্যাদি। অবশ্য ‘প্রমত্ততা’-ও একটি বিহিত অর্থ।

যাই হোক, আমার বিবেচনায় আলী সাহেবের ওই প্রয়োগটি ছিল আপাতদৃষ্টে দুষ্ট কিংবা অন্ততপক্ষে বিভ্রান্তিকর হওয়ার আশঙ্কায়ুক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ওঁকে একটি পত্র লিখি। ওঁর ঠিকানা জানা ছিল না, তাই ‘দেশ’ পত্রিকার ঠিকানাতেই চিঠিটি পাঠাই। উত্তরের প্রত্যাশা খুব একটা ছিল না, তবু নিজের ঠিকানাটি দিয়ে রেখেছিলাম। যখন ওঁর তরফ থেকে বর্তমান চিঠিটি এসে পৌঁছল তখন দেখলাম যে, উনি ভ্রমস্বীকারের ছলে কী অপূর্ব সরস, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে আমার বালখিল্যোচিত অত্যাচারের সপ্রতিভ ও সুযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। প্রসঙ্গ বাদ দিলেও পত্রটি নিজগুণেই উপভোগ্য এক সাহিত্যানিদর্শন, যার মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে বৈদ্যের সঙ্গে উজ্জ্বল রসবোধের, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে গুণপনায়ুক্ত ছাবলামির।

দুর্গাপ্রতিমা : যুক্তিবাদীর বিনির্মাণে

জহর সরকার

প্রতি বছরের প্রায় উপাংশে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্গা প্রতিমার আরাধনা করেন। দুর্গা তখন সপরিবারে সবাহন এবং সশস্ত্র মর্তে আবির্ভূত হন। এই উপলক্ষে যে মৃত্তিকারূপিণীকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন জাগতেই পারে। যেমন দুর্গা যখন মহিষাসুরের সঙ্গে এক জীবনমরণ যুদ্ধে রত তখন তাঁর যুবক পুত্র কার্তিক কী করে এমন উদাসীন বা ভাবলেশহীন প্রতিক্রিয়ায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন? কী করেই বা তাঁর অতি গুণী ও সুযোগ্য দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী তখন এতটা নিরুদ্বিগ্ন এবং মঙ্গলময়ী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকেন যখন তাঁদের মা রোষান্বিতা হয়ে শত্রুর বুকের উপর পা রাখেন? আর দেবীর স্থূলোদর হস্তীমুখ সদা সরল পুত্র গণেশের ভূমিকাটিই বা কি এই প্রেক্ষাপটে মানায়?

এসব সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার বাইরে দাঁড়ালে আরও অনেক প্রশ্নই মনের মধ্যে আসবে। যেমন দেবী দুর্গার এই সময়ের ঘনকুণ্ডিত উজ্জ্বল পরিধেয় ও এবং ঝলমলে আভরণ কি কোনও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মানায়? কিংবা যেভাবে তিনি একটি পায়ের ভারসাম্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তাতে একটাবার যদি তাঁর ভয়ঙ্কর হিংস্র বাহনটি চঞ্চল হয়ে ওঠে, পড়ে যাবেন না তো? সবচেয়ে বড় কথা, বছরের মধ্যে মাত্র একবার যিনি কটি দিনের জন্য বাপের বাড়িতে আসবার সুযোগ পান তাঁর কি খুব দরকার ছিল একজন রক্তাক্ত মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে এতটা পথ টেনে হিঁচড়ে আনবার?

শুধু কি তাই? তিনি যে একই সঙ্গে দুই বিপরীত রূপিণী। শাস্ত্রমতে যিনি সমরপ্রিয়া অসুরদলনী, বাপের বাড়ি আসা মাত্র তিনিই হয়ে গেলেন বাঙালি ঘরের আদরের মেয়েটি। অবশ্য তাঁর এই দ্বৈতরূপের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে ভারতীয় পুরাণাদি ও মূর্তিশিল্পের বহুকালবাহিত সমঝোতার কৌতূহলজনক ইতিহাস। তবে ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিকেরা দুর্গাপূজার ইতিহাসকে যত প্রাচীন তত্কা (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও মহাভারতের দুটি বিতর্কিত অংশসূত্রে) পরিয়ে দিতে চান না কেন, বর্তমানে দুর্গাপ্রতিমাকে আমরা যে-রূপে প্রত্যক্ষ করি তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে আজ থেকে মাত্র শতাব্দীর আগে অর্থাৎ আধুনিক যুগের শুরুতে। তবে বাঙালিদের মনে এই মূর্তির বাস্তবতা সংক্রান্ত বিশ্বাসবোধে দ্বিধা না থাকার কারণ দুটি। এক, দীর্ঘকাল ধরে ধর্মীয় ভীষণতায় নত হয়ে থাকার দরুন সমাজের প্রভাবশালীরা যে সময় যা চাপিয়ে দিয়েছে তারই প্রতি মান্যতা। দুই, দেবীর ঘরোয়া পারিবারিক পরিচয়ে তাঁর শাস্ত্রীয় সংজ্ঞার অপরিচয়ের দুরত্ব মোচন হয়েছে।

আর এখানেই আমাদের সমস্যার শুরু। বস্তুত ভারতীয় হিন্দু মনসিকতায় একই দেবতার বহু বিচিত্র পরিচয় এমন কী পরস্পরবিরোধী পরিচয় ও গুণের অস্তিত্ব মেনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। কিন্তু এ নিয়ে সমস্যা কণ্টকিত হন গবেষকেরা। একটি দেবতার সঙ্গে জড়িত নানান কিংবদন্তি, পৌরাণিক কাহিনি, ধর্মসাহিত্য ও পরিবর্তিত মূর্তির এমন বিপুল এবং জটিল সহাবস্থানের উত্তর বোধহয় আর কোনও দেশের গবেষকদের খুঁজে বেড়াতে হয় না। ফলে অনেকসময়ই তাঁদের ইতিহাসবোধের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনির বা ধর্মসাহিত্য উদ্ভূত কাহিনির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি-কল্পনার বিরোধ বেঁধে যায়। এতে যুক্তির ক্রম নাগাড়ে ভেঙে যাওয়ায় তাঁরা কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন। আবার এরই মধ্যে দেবদেবীর পৌরাণিক নাম ও গুণের সঙ্গে লৌকিক নাম ও গুণের বিরোধও এক এক সময় তুঙ্গে উঠে। যেমন দুর্গার ক্ষেত্রেই ধরা যাক। যখন তিনি হিমাঙ্কুর কন্যা তখন তিনি তুষারধবলা হৈমবতী, তখনই তিনি গৌরবর্ণা বলে গৌরীও। কিন্তু তিনিই যখন আঁধাররূপা কৃষ্ণবর্ণা হয়ে কালীরূপে পরিচিতা হন তখন তাঁর রূপগত ও গুণগত সূত্রে বিভ্রান্তি ঘটেই। এভাবে শুধু উদ্ভবগত ও গুণগত নামই যথেষ্ট নয়, কর্মগত নামেও দেখি যখন তিনি শাকমাত্র গ্রহণ করেন তখন তিনি শাকন্তরী। হিন্দু পরিবারে লক্ষ করা গেছে যে পুত্র কন্যার নাম অনেক সময়ই দেবদেবীর নামানুসারে রাখা হয়। তখন অবশ্য পরিবারের ধর্মবিশ্বাসের ভিন্নতা (অর্থাৎ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত) অনুযায়ী নাম রাখা হয়, তা সে যতই স্ববিরোধী হোক।

একই দেব বা দেবীর একাধিক নামের দুটি স্তবমালা ‘অষ্টোত্তরশতনাম’ এবং ‘সহস্রনাম’-এর অবদানও কম নয়। এরই ফলে অসংখ্য লৌকিক ও আঞ্চলিক দেবদেবীর নাম মূল পৌরাণিক দেবদেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। অধিকাংশ সময় এইসব নামকরণ আবার উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাতৃকাশজিপূজার একান্নপীঠগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। গবেষণা করে জানা গেছে একাধিক পুরাণকাহিনির মধ্যে বিষ্ণুর দশ অবতার কাহিনি, তামিল স্থল-পুরাণ, শিবসম্পর্কিত লিঙ্গ-পুরাণ ও দক্ষযজ্ঞ কাহিনি এইসব দেবীর নামকরণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। পুরাণাদির এই জটিলতম মিশ্রণে সেকালের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা দেবীর শাস্ত্রীয় পরম্পরার সঙ্গে প্রাক-হিন্দু ও অ-হিন্দু ধর্মচারণকে যুক্ত করে দিয়ে এটিকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বভারতীয় রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরই ফলে এই মিশ্রণে কখনও কখনও মারাত্মক বৈপরীত্য ঘটে গেছে। যেমন আমাদের পূর্বোল্লিখিত কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্রিক কালী ও হিমালয়কন্যা গৌরবর্ণা রূপবতী পার্বতী এবং লোলচর্মা কৃশোদরী চামুণ্ডা একই সঙ্গে কী করে রণরঙ্গিনী দেবী দুর্গার প্রতিক্রম হতে পারেন তার অর্থ উদ্ধার করা দুষ্কর।

পীঠস্থানগুলির এমনি বিচিত্র সমস্যা ছাড়াও কেবলমাত্র একালে পূজিতা শারদীয় দুর্গামূর্তিটিকে যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখা যাবে অন্তত দুটি বিশিষ্ট ধারা এর মধ্যে মিশে আছে। যার প্রথমটি একটু বিস্তারিত আলোচনাসাপেক্ষ। এই ধারাটি মূল ঐতিহ্যবাহী। এর মধ্যে রয়েছেন ইন্দো-য়ুরোপীয় সিংহবাহিনী। রয়েছেন মদ্য ও মাংসপ্রিয়া বিক্ষ্যবাসিনী। রয়েছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের মহিষাসুরমর্দিনী। দেবীর এই রূপগুলি পৃথক পৃথক ভাবে সেই সপ্তম-অষ্টম শতক থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। তবে অষ্ট্য-মধ্যযুগ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে এই সমস্ত মূর্তির মিশ্রণে প্রস্তুত বর্তমানে দেশা দুর্গামূর্তিটির জন্য। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে ষোড়শ শতকের রামায়ণ অনুবাদক কবি কৃষ্ণিবাসের প্রভাবও ছিল অপরিণীম। বস্তুত কৃষ্ণিবাস তাঁর

অনুবাদ গ্রন্থটিতে শক্তির আধার দুর্গার সিংহ ও মহিষজয়ী যে-রূপছবি একেছিলেন, দুটি ভিন্ন ধারার মিশ্রণ হলেও সেকালের বাঙালি সমাজে তা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। স্বভাবতই এর প্রভাব পড়েছিল মূর্তিশিল্পেও।

এখন যে সময় আমরা দুর্গাপূজা করি সেটি রামচন্দ্রের অকাল-বোধন পূজার সময়। এই সময়টিও বাংলা দেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে যখন এই পূজার সময়টিকে মেনে নেওয়া হয়েছিল তখন শরৎকালের প্রকৃতির গুরুত্বও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। দেখা গেছে ওই সময় নতুন এক কৃষক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। কেন এবং কীভাবে তাদের এই সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল তা নৃতাত্ত্বিকদের আলোচনার বিষয়। আমরা অত বিস্তারে না গিয়ে যেটুকু বলতে পারি, সেটুকু হল ওই সময় কৃষকদের ঘরে বিপুল পরিমাণে আউস ধান উঠত। ওই সময়ই নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষান্তে এক ভয়ানক ঝাঁড়াঝাড়ি বান আসত। কখনও কখনও ধান ঝাঁচিয়ে কৃষক সেই বিপর্যয়ও সামলে উঠতে পারতেন। ফলে ভরভরন্ত ফসলসুখে কৃষকের সুখের দিন সমাগত হওয়ায় ওই সময়ের পূজা মেনে নিয়ে সেকালের পুরোহিত সম্প্রদায়ও তাঁদের সমাজজ্ঞানের পরিচয় রেখেছিলেন। অবশ্য আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছাও তাঁদের এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

দেখা গেছে যে, একটি দেশের সংস্কৃতি প্রায়শই সে দেশের ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অনেক সময় শাস্ত্র বা তত্ত্ব সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য না হলে গান, কথকতা বা অভিনয়ের মাধ্যমে সেগুলি অনায়াসে সাধারণের কাছে পৌঁছে যেত। আর শিল্প যেহেতু নিয়তই জীবনসংপৃক্ত তাই ধর্মীয় কঠোরতায় জীবনের স্পর্শ লেগে তা যেন সহজেই হৃদয়ের ধন হয়ে উঠত। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দূরকালের নয়, একালের একটি উদাহরণ সহযোগে কথাটি পরিষ্কার করি নেওয়া যেতে পারে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর অবিস্মরণীয় চণ্ডী পাঠের কথা স্মরণে আনা যাক। এটি থেকেই কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে যে, এর সুরঝঙ্কার পাঠ ও মন্ত্রের শিহরণ জাগানো কাব্যময় উচ্চারণ মানুষের মনকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে। দেবতার প্রতি ভীতি ও আনন্দের এই তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তি এমন শিল্পমাধ্যম ছাড়া গড়া সম্ভব নয়। মনে করি শুধু শেষ পর্যায়টিকে। দেবী ও অসুরের স্বর্গমর্ত্যপাতালব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধবর্ণনার সময় আবৃত্তিকারের আবেগমখিত কণ্ঠের নাটকীয় আবেদন সরাসরি যেন শ্রোতার হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছয়। বর্ণনা তারপর ক্রমশই অত্যুজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতিভার স্পর্শে। তারপর যখন মৃতপ্রায় অসুরের উপর দেবীর ত্রিশূল সর্বশেষ আঘাত হানে তখন শিল্পীর কণ্ঠস্বর ক্রাইম্যাক্সে পৌঁছে গিয়ে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, অসুরদলনীর জগজ্জয়ী রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য যেন শ্রোতার মনে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকে না। আর এভাবেই ধর্মাচরণের পরিবর্তন সাধিত হয় চিরটাকাল।

এর অন্য আর একটি দিকও উল্লেখযোগ্য। সেটি ঠিক এর বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে একবার এই সমগ্র ছবিটিকে দেখে নেওয়া যায়। এ বিষয়ে একালের কয়েকজন গবেষক ভাবছেন, পুরুষানুক্রমে তথাকথিত আর্যরা যাদের কালো কুরূপ প্রাচীন অধিবাসী বসে অসুর, দানব, রাক্ষস বা পিশাচ আখ্যা দিয়ে এসেছে, একটি মাত্র 'জিন টেস্ট' দ্বারা প্রমাণিত করা যাবে যে, সেই অভিযুক্তরা মূলত আমাদেরই পূর্বপুরুষ। এক্ষেত্রে অবশ্য উপাদান সংগ্রহ করা যাবে আর্য-অনার্য সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে। আর তা যদি সত্য হয় তাহলে আর্যরাজ্যের (যদিও রূপকার্থে) যে-গুরুত্বের কথা এই যুদ্ধের কাহিনি দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা

করা হয়েছে, তা এসেছে আমাদেরই পূর্বপুরুষদের শরীরঝরা রক্ত থেকে।

এই কাহিনিতে মহিষের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ভারতীয় ধর্মীয় কাহিনিতে অনেক সময় সেই মহিষকে দানব বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক ইতিহাস আছে। এই বাংলা দেশেই মধ্যযুগে একদল প্রাচীন অধিবাসী ভয়ঙ্কর শক্তিশ্বর মহিষদের পালে পালে বধ করতে করতে বাসভূমির সন্ধানে যাত্রা করেছিল। কখনও নদী-উপত্যকা, কখনও সরীসৃপ কণ্টকিত জলাভূমি পেরিয়ে অবশেষে যেখানে গিয়ে তারা উপস্থিত হল, সেখানে স্থল আর জলের সীমারেখা মুহূর্তে মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। শুষ্ক হল তাদের বেঁচে থাকবার কঠিনতম লড়াই। কখনও স্থলজন্তু, কখনও উভচর জন্তুর সঙ্গে মৃত্যুর পাঞ্জা খেলা। তারপর একসময় তারা সত্যি ভূমি খুঁজে পায় এবং সেটিকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। মধ্যযুগের এই মানুষেরাই হলেন নব্য-কৃষিজীবী। প্রায় অনুরূপ উদাহরণ মেলে আমেরিকার এক কৃষকের জীবনীতেও। সেও নাকি পশ্চিমাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ উষরভূমিতে নির্মমভাবে বাইসন ও রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করে সেটিকে চাষাবাদের যোগ্য করে তুলেছিল। এও তো এক ‘অশুভ’ শক্তির উপর শুভের জয়। কিন্তু জানা নেই বাংলাদেশের সেই নতুন কৃষিজীবীদের জীবনে সেকালে দুর্গাপূজার সংস্কৃত রূপটিরও কতটা প্রভাব পড়েছিল। তবে নগরকেন্দ্রিক জনজীবনে দুর্গাসম্পর্কিত কাহিনিগুলি যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত দুর্গা সম্পর্কিত শাস্ত্রাদি ও মূর্তিশিল্পের বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা গেছে যে দুর্গার যুদ্ধরতা ভঙ্গিটিও পৃথক পৃথক পরিচয়সমৃদ্ধ। যেমন কোথাও তিনি শুধুই সিংহবাহিনী, কোথাও একাধারে তিনি সিংহবাহিনী ও অসুরদলনী। তিনি কখনও চতুর্ভুজা, কখনও অষ্টভুজা ও কখনও দশভুজা। সপ্তম-অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল ধরে দুর্গার ‘সিংহবাহিনী’ ও ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ মূর্তিদুটি পৃথকভাবেও পাওয়া গেছে। আবার এই দেবীকেই বাংলা দেশে একটি সময় বিশালাকার গোধিকা-আসীনা রূপেও দেখা গেছে। মূর্তি বিশেষজ্ঞদের মতে পরবর্তীকালে এই গোধিকা-আসীনাই সিংহবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তবে একথা মানতেই হবে যে, নগরায়ণের পাশাপাশি মূর্তিশিল্পেও আভিজাত্যের স্পর্শ লেগেছিল। এবং লৌকিক গোধিকা-আসীনার চেয়ে নিঃসন্দেহে সিংহবাহিনী অনেক বেশি অভিজাত মূর্তি। অবশ্য এর সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের যোগ রয়েছে।

আমাদের আলোচ্য দুর্গার অধুনাকালের মূর্তিটি বিষয়ে দ্বিতীয় ধারাটিও কম চিন্তাকর্ষক নয়। এই ধারাটির অন্তরালে রয়ে গেছে এক সুনিপুণ মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ। ব্যাখ্যায় আসা যাক। প্রথমেই মনে রাখা দরকার শরৎকালে, যে-দুর্গা সপরিবারে বাংলার মাঠে ঘাটে এসে উপস্থিত হন তিনি যেন বাঙালি ঘরের বিবাহিতা কন্যা (সেকালের গৌরীদান প্রথাটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য)। এই কন্যার প্রতি অসীম মমত্ব নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকা তথা বাঙালির পিতৃহৃদয় ও মাতৃহৃদয়। এক্ষেত্রেও এক বিশেষ কালের সাহিত্য এই কাহিনি ধারণ করে আছে। বস্তুত আটের শতক জুড়ে শাস্ত্র পদকর্তা ও গীতিকাররা তাঁদের কবিতায় এই ঘরের মেয়ের ঘরে আসার আনন্দ ও মাত্র তিনটি দিন পরে চোখের জলে বিদায় দেওয়ার ছবিটি ঐকে রেখেছেন। আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, বিদায়ব্যথাই চিরস্থায়ী। তাই কে কত কল্পণ করে এই ব্যথা বর্ণনা করতে পারেন তারও যেন এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা সে সময় কবিদের মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল। সমাজ মনস্তত্ত্বে এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। শুধু বাঙালি হৃদয়েই দুর্গাপূজাকে

কেন্দ্র করে এই বেদনাঘন আবেগ সঞ্চারিত হয়নি। সেসময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সীতার পতিগৃহে যাত্রা ও রামের বনবাস যাত্রার মতো পরিবার থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির অভাবজনিত বিদায়ব্যথাও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু সে সবকে ছাপিয়ে গেছে প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বাঙালি হৃদয়ের আত্মীয়বিচ্ছেদ বেদনার তীব্রতা। ভক্তের চোখের জলের সঙ্গে যেন সে সময় বিদায়ী মেয়ের (বা মার) চোখের জল একাকার হয়ে যায়। যদিও দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করা হয় প্রতিমার মুখে গর্জন তেলের প্রলেপ দ্বারা। আর এখানেই গোপন করে রাখা আছে এক সুক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কারসাজি। আপাতভাবে আমরা এখানে লক্ষ্য করি, যে ভীষণরূপিণীর ভয়ে দেবতা ও অসুর উভয়েই থরহরিকম্পমান, সেই শক্তিই কী ভাবে বাঙালি ঘরের মিষ্টি আদরনীয় কন্যাতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এবং লক্ষ্য করার বিষয় যে সব অস্ত্রাদির সাহায্যে দুর্গা অসুরজয়ী হয়েছেন সে সব অস্ত্র পুরুষ দেবতারই দান। প্রাণ জাগে তাহলে সেইসব পুরুষরাই কেন অস্ত্রধারণ করলেন না?

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে দেবীর যুদ্ধংদেহী রূপ, শারদীয় দুর্গাপূজায় সম্পূর্ণ পান্টে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন মূর্তিশিল্পে ততটা হয়নি, যতটা হয়েছে বাঙালির হৃদয়-সংবেদী কাব্যকবিতায়। এও এক বিরোধাভাস। অর্থাৎ মূর্তিতে যাকে দেখছি আর মনে যাকে ভাবছি তাঁরা এক নন। কিন্তু কবিরা চমৎকার শিল্পকৌশলে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন। তাই দাশরথি রায়ের মেনকা স্বামী হিমালয়কে বলেছেন, “কে হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী/সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী?” রসিকচন্দ্র রায়ের মেনকার মনোভাবও অনুরূপ। তিনি বলেছেন, “গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে?/এ তো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে/...মুখে য়দু হাসি; সুধারাশি হে, আমার উমাশশীর;/এ যে মেদিনী কাঁপায় হুঙ্কারে হুঙ্কারে/হায় এ হেন রণবেশে এল এলোকেশে, এ নারীকে কে চিনিতে পারে?” ব্রজমোহন রায়ের মেনকা তো কিছুতেই মনতে চান না। বলেন, “কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনতে না পারি।/...কি সুরী অসুরী হবে, দানবী মানবী কিবে—/যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী?” কেবল মানসকল্পনায় নয়, সেকালে মূর্তিশিল্পেরও নানা পরিবর্তিত রূপ কবিতায় বিধৃত হয়েছে। রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের মেনকা তাই বলছে, “গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলে ঘরে কার মেয়ে?/এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার!/উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হইল?”

আসলে এই সমস্ত উদাহরণ থেকে আমাদের মনে যে-প্রশ্নটি বেশি মাত্রায় নাড়া দেয় তা হল কেন সেকালের কবিরা দেবীর শাস্ত্রানুসারী পরিচয়কে সরিয়ে রেখে তাঁকে বাঙালি ঘরের মেয়ের রূপ দিতে বেশি উৎসাহ বোধ করেছিলেন? শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন এর অন্তরালে রয়েছে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব। কিন্তু এখানেও সংকট কাটে না। কারণ শাস্ত্রাঙ্গীতিতে সমরপ্রিয়ার রূপান্তর ঘটেছে প্রতিবাৎসল্যময়ী ঘরের কন্যাটিতে। আর বৈষ্ণব ধর্মের মূল নারীশক্তি শ্রীরাধিকা প্রেমময়ী, হ্রাদিনী সন্তার ধারক। যদিও একটিবার মাত্র একজন ভক্ত কবি কালীকে সম্বোধন করে বলেছেন, “একবার হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা। শ্রীরাধারে বামে লয়ে”—কিন্তু সেখানেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ পরিগ্রহ করার কথা উঠেছে—শ্রীরাধার নয়। আমাদের আলোচ্য দুর্গা কেবলমাত্র মাতৃপরিচয় প্রধান হয়ে উঠছেন এবং মেয়ের পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছেন। কী ভাবে এবং কেন তাঁর এই রূপান্তর ঘটেছে?

দেখা গেছে একটা সময় থেকে অসুরদলনী আর একা নন, মর্ত্যে প্রতিমারূপে আসছেন

সপুত্রকন্যা। যে-মুহূর্তে ভয়ঙ্করীকে কেবলমাত্র ‘মাতৃরূপে সংস্থিত’ করা হল সেই মুহূর্তেই তাঁকে বাঙালি পরিবারভূক্ত স্নেহময়ী ‘মা’তে রূপান্তরিত করা হল। কারণ হিন্দু পরিবারে পিতৃতান্ত্রিক নির্দেশে নারীর মূল পরিচয় কর্তব্যরত মাতৃরূপে। কবিরায় মেনে নিলেন এই মহাদেশ। তাই রাম বসুর মেনকা গিরিরাজকে বলেছেন, “গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী/...এনো কার্তিক, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগবতী/এনো মন্তকে কোরে।” মূর্তিশিল্পের ইতিহাসেও লক্ষ করা গেছে প্রথমে দুই পুত্র অর্থাৎ কার্তিক ও গণেশ দেবী দুর্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এই ধরনের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে অধুনা বাংলা দেশের কুমিল্লা জেলার দক্ষিণ মহম্মদপুরে। কিন্তু এই দেবতাদ্বয় প্রধান দেবতারূপে গণ্য হলেন না। তাঁরা কেবলমাত্র দেবীর মহাজাগতিক সৃষ্টিরহস্যের একধারে যেন দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার দেবীকে সঙ্গে রাখতে হল হিন্দু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত্রয়ীকেও। দেবীর চালচিত্রে যুক্ত হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বরিশাল জেলার মাধবপাশা, কুমিল্লার চন্দিনা ও দিনাজপুরের বেতনাতে দেবীর সঙ্গে এই ত্রয়ীর মূর্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সংযুক্তি সম্পর্কে কোনো শাস্ত্রাদির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমাদের প্রশ্ন জাগে, এই সংযুক্তি দ্বারা সেকালের পিতৃতান্ত্রিক পুরোহিতবর্গ কি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, দেখো কেমন হাসিমুখে দেবী তিন তিনজন পুরুষদেবতার অধীনতা মেনে নিচ্ছেন।

এরই কিছুকাল পরে সেই প্রভূত ক্ষমতাশালী পিতৃতান্ত্রিকতার ক্ষজাধারী পুরোহিতবর্গ অনায়াসে অতি সুকৌশলে ওই তিন দেবতাকে দেবীর চালচিত্রে থেকে বর্জন করে কেবলমাত্র দুই পুত্রের অবস্থানকেই গুরুত্ব দিলেন এই মর্মে যে ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যাই নারীর একমাত্র কর্ম পরিচয় এবং এটুকুতেই যুদ্ধরতা নারীকে কমণীয় মাতৃরূপ দেওয়া যায়। এর ফলে দেবী তাঁর সর্বোচ্চ স্থান থেকে নেমে ঠিক এক বিপরীত ভূমিকায় স্থাপিত হলেন। এরই জন্য ওই সময়ে সমস্ত বাংলা জুড়েই দেবীর ‘ললিতা’ মূর্তি ব্যাপক প্রচলন লাভ করেছিল। বস্তুত পুরোহিতবর্গের সুচতুর ও অলঙ্ঘনীয় চাপের ফলে মূর্তিবিন্যাসে যে-বিক্ষিপ্ততা ও অসমীচীনতা দেখা দিচ্ছিল তা নিয়ে কোন সমস্যা সেকালে দেখা দেয়নি। কারণ ততদিনে জনসাধারণও দেবীর যুদ্ধরতা মূর্তি থেকে কোমল-স্বভাব মাতৃমূর্তিকেই বেশি পছন্দ করতে শুরু করেছিল।

অবশ্য তারপর মায়ের মূর্তির সঙ্গে যখন কন্যাদের সংযুক্তি ঘটানো হল তখন সেটি খুব সহজে হয়নি। এর কারণ নারীজনিত মূল্যবোধের আবেগ। তাঁরা শাস্ত্রমতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার স্ত্রী। মর্যাদায় তাঁরাও তো কম নন। সম্ভবত এই সংযোজন ঘটেছে তাই অনেক পরে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরসীকুমার সরস্বতী ও এনামুল হকের মতো মূর্তি বিশেষজ্ঞরা সপুত্রকন্যা কোনো প্রাচীন দুর্গামূর্তি খুঁজে পাননি। বস্তুত বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরে মন্দিরে সপরিবার দুর্গার ব্যাপক প্রচার ঘটে আঠারো-উনিশ শতকে। শুধু মন্দিরে নয়, ওই সময়কাল থেকেই বাঙালির অন্তরে ইস্টদেবী রূপে দুর্গার এই মূর্তিই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। যদিও এ সম্পর্কেও কোনো শাস্ত্রাদির প্রমাণ মেলেনি। উল্লেখযোগ্য, দুর্গার এমন সপরিবার আবির্ভাব ভারতের আর অন্য কোনো রাজ্যে ঘটেনি। এ একেবারে বাঙালীর নিজস্ব ধন। আবার এই বাংলাদেশেই তাঁর পুত্রকন্যাদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক পূজার দিনও আছে।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় কী অপরিসীম চাতুর্যের সঙ্গেই না সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দিনী ও যৈড়েশ্বরময়ী দশভুজাকে বাৎসল্যময়ী মাতৃরূপ দান করা হয়েছিল। শাস্ত্র সমর্থন করুক আর নাই করুক বাংলা দেশের পিতৃতান্ত্রিকতার ক্ষজাধারীরা এটিকে সারা বাংলাতেই ব্যাপকভাবে

ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য তাঁদের এই প্রচেষ্টা আরও দৃঢ়ভূমি পেয়েছে সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কারণেও। বস্তুত অষ্টাদশযুগ থেকেই ভারতে মুসলমান শাসকদের ক্ষমতা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত তাঁদের দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল এবং ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ ঘটতে চলেছিল, তখন বাংলার ভূস্বামী তথা হিন্দু জমিদারেরা নিজস্ব হিন্দুত্বে বলীয়ান হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন তাহেরপুরের কংসনারায়ণ ও নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ। সেই সময় হিন্দু-সমাজ ও ধর্মের উপর অসংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির কোনো প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ছিল না। তাই অপসূরমান সেই মুসলমান কর্তৃত্বের দুর্বলতায় সেকালের ব্রাহ্মণ্যবাদ নতুন করে মাথা তুলবার অবকাশ পেয়ে পিতৃতান্ত্রিকতার দাপট দেখাতে শুরু করেছিল। এরই ফলে আঠারো শতকেই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও অন্যান্য ভক্তকবিদের সৃষ্টিসূত্রে ভয়ঙ্করী দুর্গা প্রতিবাৎসল্যময়ীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিংবা বাঙালি ঘরের মাতৃরূপা জগজ্জননীতে পরিণত হয়েছিলেন।

কিন্তু এহো বাহ্য। বস্তুত তিল তিল করে গড়ে তোলা এক বীর্যবতী নারীকে কেবলমাত্র সামাজিক প্রয়োজনে এতটা দুর্বল ও হীনবীর্য করে উপস্থাপনা করার মূলে যে উদ্দেশ্যমূলকতা কাজ করেছিল তার সামান্য অংশের সত্যও যদি একালের নৃতাত্ত্বিক, লিঙ্গ নির্মাণতাত্ত্বিক, চিহ্নবিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়, তাহলে তাঁরা স্তম্ভিত হবেন। এর জন্য অনবরত দেবীর প্রতীক পরিবর্তনেও সেকাল কোনো দ্বিধা বোধ করেনি। এর প্রভাব পড়েছিল সেকালের সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, মূর্তিশিল্পে ও পটচিত্রেও। একমাত্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিরোমণিদের অপ্রতিরোধ্য চাপে যে শাস্ত্রীয় দেবীর চরিত্র আমূল পাল্টে যেতে পারে এবং প্রকৃত সত্য বিস্মৃত হয়ে মনগড়া সত্যে নারীর হীনবীর্য রূপটিকেই শিরোধার্য করে ভক্তি-আবেগে আত্মতৃপ্ত পূজার প্রচলন এত ব্যাপক মাত্রায় জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। তবে সেই ট্র্যাডিশন তো আজও চলেছে।

তথ্যসূত্র :

- ১ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, ১৯৫৬; *ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনগ্রাফি*, কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
- ২ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, ১৯৯৩; *দি এপ্রোপ্রিয়েশন অফ আ ফোক হিরোইন* : রাধা, সিমলা, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এ্যাডভান্সড স্টাডিজ।
- ৩ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, ১৯৩৩ : *ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মিডিয়াভাল স্কালচার*, দিল্লি।
- ৪ ভাতারকর, রামকৃষ্ণ গোপাল, ১৯১৩, *বৈষ্ণবীক্সম, শৈবীক্সম এ্যান্ড মাইনর রিলিজিয়াস সিসটেমস্*, পুনর্মুদ্রণ, বারাণসী, ১৯৮২।
- ৫ ভট্টাচার্য, আশুতোষ, ১৯৩৯, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ ১৯৯৮, এ. মুখার্জী এন্ড কোং।
- ৬ চৌধুরী, বিজয়লক্ষ্মী, ১৯৮৭, *দি ডেভেলপমেন্ট অফ মাদার গডেস্ ওয়ারশিপ*, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী।
- ৭ কোবার্ন, টমাস, ১৯৮৪ : *দেবী মাহাত্মা, দি ক্রিস্টালাইজেশন অফ দি গডেস ট্র্যাডিশন*, দিল্লি; মতিলাল বানারসীদাস।

- ৮ দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, ১৯৪৬, *অবস্থায়ের রিলিজিয়াস কান্টস*, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম।
- ৯ হক, এনামুল, ১৯৯২, *বেঙ্গল স্কালচারস্ : হিন্দু আইকনোগ্রাফি আপটু ১২৫০* এ. ডি., ঢাকা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম।
- ১০ হাজরা, রাজেন্দ্রচন্দ্র, ১৯৪০, *স্ট্যাডিজ ইন দি পুরানিক রেকর্ডস্ অন হিন্দু রাইটস্ এ্যান্ড কাস্টমস্*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ১১ কিন্সলে, ডেভিড : ১৯৪৭, *হিন্দু গডেস : ভিশন অফ দি ফেমিনিন ইন হিন্দু রিলিজিয়াস ট্র্যাডিশন*, দিল্লি, মতিলাল বানারসীদাস।
- ১২ নাপার্ট ১৯৯২, *ইন্ডিয়ান মিথলজি, এন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মিথ এন্ড লিজেন্ড*, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লি, ইনডাস/হারপার কলিঙ্গ পাবলিকেশনস্।
- ১৩ মহাপাত্র, পীযুষকান্তি, ১৯৭২, *দি ফোক কান্ট অফ বেঙ্গল*, কলকাতা।
- ১৪ রাও, গোপীনাথ, ১৯১৪, *এলিমেন্টস অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফী*, ত্রিবাঙ্কুর, ১৯৭১ পুনর্মুদ্রণ। বারাণসী, ইন্ডোলজিকাল।
- ১৫ সরস্বতী, সরসীকুমার, ১৯৬২, *আর্লি স্কালচারস অফ বেঙ্গল*, কলকাতা।
- ১৬ সরকার (আদিত্য) শিখা, ২০০১, *মাদার গডেস ইন প্রি-মেডিভ্যাল বেঙ্গল*, কলকাতা, ফার্মা কে. এল. এম।
- ১৭ সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৯৮৬, *দি হিস্টরি অফ বেঙ্গলি ল্যান্ডস্কেপ এ্যান্ড লিটারেচার*, দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ, গেইল।
- ১৮ সেন, সুকুমার, ১৯৮২, *দি গ্রেট গডেস ইন ইনডিক ট্র্যাডিশন*, কলকাতা, প্যাপিরাস।
- ১৯ সরকার, দীনেশচন্দ্র ১৯৭১, *স্ট্যাডিজ ইন দি রিলিজিয়াস লাইফ অফ এনসিয়েন্ট এ্যান্ড মিডিয়াভেল ইন্ডিয়া*, দিল্লি, মতিলাল বানারসীদাস।
- ২০ শ্রীবাস্তব, বলরাম, ১৯৭৮, *দি আইকনোগ্রাফি অফ শক্তি*, দিল্লি।
- ২১ সোটন মারলিঙ্গ, ১৯৭০, *হোয়েন গড ওয়াজ এ ওম্যান*, নিউ ইয়র্ক, ভারাক্স।
- ২২ ওয়াকার, বারবারা, ১৯৬৩, *দি ওম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া অফ মিস্ট্রি এন্ড সিক্রেটস্*, সান ফ্রান্সিসকো, হারপার কলিঙ্গ।
- ২৩ অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাওন্পদাবলী*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

‘নৌকাপূজা’—শ্রীহট্ট-কাছাড়ে এক বিশেষ ধরনের মনসাপূজা

অজিতকুমার চক্রবর্তী

সুরমা-বরাক উপত্যকায়, অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড় জেলায় জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ এক ধরনের মনসাপূজা হয়, যার নাম ‘নৌকাপূজা’। এই পূজার আয়োজক বা উদ্যোক্তাগণ সাধারণ চাষী ও হীবর সম্প্রদায়ের লোকেরা। প্রথাগতভাবে মাঘী বা ফাল্গুনী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য পদ্মাপুরাণে (মনসামঙ্গল) দেখা যায় চান্দ সদাগর এই ফাল্গুন মাসের পূণ্যতিথিতেই চৌদ্দ-ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করেছিলেন—

বাইল উত্তরে বাত ফাল্গুন যে মাসে।

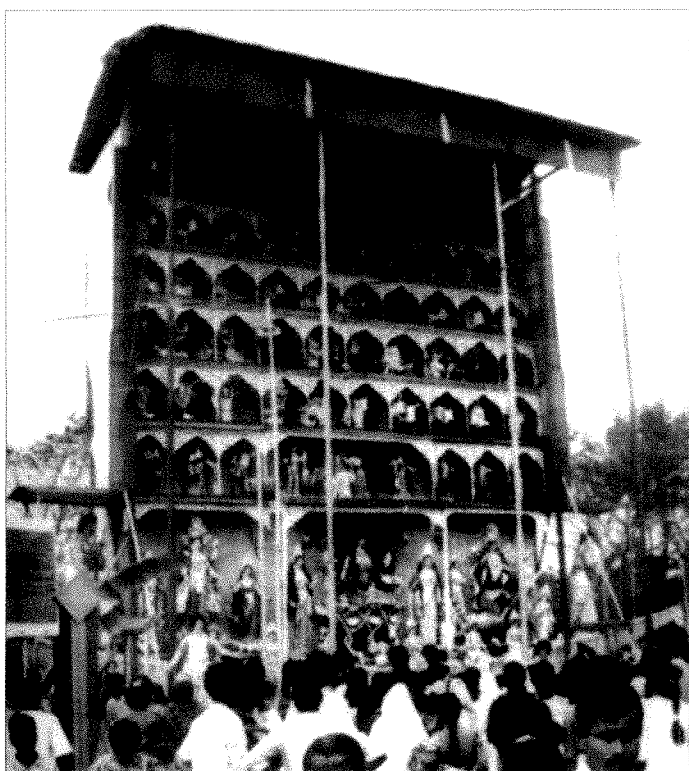
চান্দে ডিঙ্গা চালাইল লঙ্কার উদ্দেশ্যে ॥ (যষ্টিবর দস্ত)

অবশ্য অন্য কোনো শুক্লাপঞ্চমীতেও এই পূজা নিষিদ্ধ নয়। বস্তুত শ্রীহট্টের নিম্নাঞ্চলে কোথাও কোথাও বৈশাখী শুক্লাপঞ্চমীতেও এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসবের মতো এ পূজাও পাঁচদিনব্যাপী চলে। কখনও বা চলে আটদিনব্যাপী।

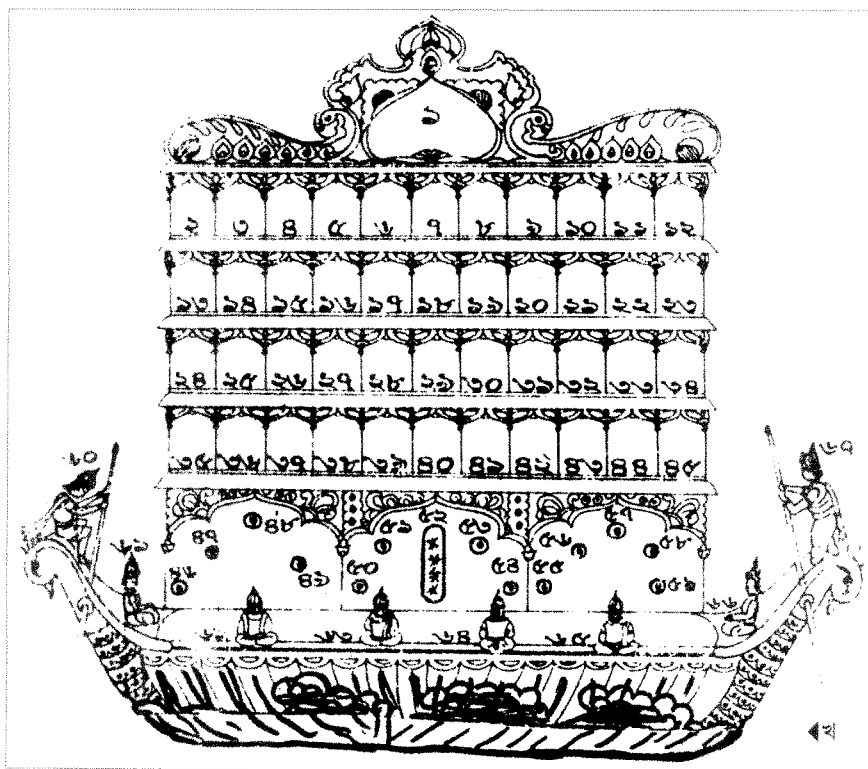
‘নৌকাপূজা’ নামে হলেও আসলে এ সর্পদেবী মনসারই পূজা। অবশ্য মনসার সঙ্গে পূজা হয় বহু দেবতার। যদিও মধ্যমণি থাকেন বিষহরি বা মনসা। এই নৌকা মূলত মনসার পূজামণ্ডপ বা মনসার আশ্রয়স্থল। অর্থাৎ নামে ‘নৌকাপূজা’ হলেও নৌকাকৃতি মণ্ডপে স্থাপিত মনসা ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাই মুখ্য।

বাঁশ, কাপড়, মাটি প্রভৃতিতে প্রস্তুত এই নৌকা উদ্যোক্তাদের সাধ্যানুসারে ২০ হাত থেকে ১০০ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। উচ্চতায় ১৪ হাত থেকে ২০ হাত। তবে ১৪ হাতের কম হবে না। এই নৌকা হবে তিনতলা থেকে সাততলা পর্যন্ত। প্রতি তলে আলাদা আলাদা কোঠায় রাখা হয় নানা দেবদেবীর মূর্তি, যার মধ্যে বিষহরি বা মনসার মূর্তিটিই হবে প্রধান। এই নৌকাপূজার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় অ্যালেন সাহেবের (B.C. Allen) একটি রচনায়। তিনি ১৯০৫ সালে তাঁর রিপোর্টে বলেছেন—“A shed is built, at the end of which is a boat painted and guilt, from which rise tier upon tier, the images of various gods, among whom Bishahari is generally the most prominent. For several days sacrifices are offered to the deities, and Brahmans, who are well paid and feasted for their services, offer up their prayers.”

নৌকাস্থিত দেবদেবীর মধ্যে থাকবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং আরও নানা দেবদেবীর মূর্তি—যাঁরা দেবসভায় ভূতনাথের সামনে বেঙ্গলার নৃত্যের দর্শক হিসাবে উপস্থিত



८



ছিলেন। এঁদেরও পূজা করতে হয় আলাদা আলাদাভাবে। এই সভাতেই মনসার দাবি অনুসারে বেছলা প্রতিষ্ঠা করেন যে শ্বশুর চান্দ সদাগরকে দিয়ে পদ্মার পূজা করাবেন। মনসাও মৃত লক্ষীন্দরকে প্রাণদান করেন।

পদ্মা বোলে মোর দুঃখ কেহ নাহি বুঝে।
না জিয়াব বালকে যাবত নাহি পূজে॥
সভার সাক্ষাতে বাঙ্গী করুক অঙ্গীকার।
শ্বশুরের হস্তে পূজা করাবে আমার।.....
অঙ্গীকার করি বালী বোলে দেবতারে।
দেয়াইব ফুল জল শ্বশুরের করে ॥’^{১০}

(জগজ্জীবন বোষাল ১৯৬০/৩০৯)।

নৌকার পাটাতনে থাকবে চান্দ সদাগর, সনকা, বেছলা, লক্ষীন্দর, নৌকা, মাঝিমাধ্ব প্রভৃতি পদ্মাপুরাণ তথা মনসামঙ্গলে বর্ণিত মর্ত্যমানুষদের মূর্তি। নৌকাস্থিত মূর্তির সংখ্যা অনেকটাই নির্ভর করে পূজার আয়োজকের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর। তবে ন্যূনতম পঞ্চাশটি মূর্তি থাকতেই হবে। প্রতিদিন বেশ কিছু ছাগল-পাঠা দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদানও পূজার আবশ্যিক অঙ্গ।

এই সকল দেবদেবীর মধ্যে মুখ্য বা প্রধান হলেন পদ্মাবতী অর্থাৎ মনসা, তাই তাঁকে স্থাপন করা হয় একেবারে সামনে। নৌকাস্থিত অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির তুলনায় মনসার মূর্তিটি হয় বৃহত্তর। উপবিষ্ট অবস্থায় তার উচ্চতা হবে সাত থেকে আট ফিট। পার্শ্ববর্তী মূর্তিগুলির দাঁড়ানো অবস্থায় উচ্চতা দুই থেকে তিন ফিট। মনসার এই বিরাট মূর্তির পাশে তাদের মনে হয় যেন সব ‘লিলিপুট’। পার্থক্য শুধু আকারেই নয়, পূজাতেও প্রকাশ পায়। এই সকল পার্শ্বস্থ দেবতাদের পূজা হয় সংক্ষিপ্ত বা নামমাত্র। আর প্রধানা দেবী মনসাকে তুষ্ট করতে তাঁর পূজা হয় অনুপুষ্ট বিধি-নিয়ম মেনে। পূজা করেন সাধারণত ব্রাহ্মণেরাই। পাঁচদিন বা আটদিনব্যাপী পূজা চলাকালীন ‘মনসামঙ্গল’ (যাকে এই অঞ্চলে বলা হয় ‘পদ্মাপুরাণ’), তার পাঠ ও গান চলে দিনরাত্রিব্যাপী। প্রথাগতভাবে এই গানের মুখ্য গায়ক হয় নারীবৈশাখারী নপুংসক বা হিজড়েরা (Unush), স্থানীয় ভাষায় এদের বলা হয় ‘গুরমা বা গুরমি’ (gurma/gurmi)। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড. সুজিত চৌধুরী বলেছেন : “Each of five days a professional singer (along with his colleagues) would recite Manasa Mangal popularly known as ‘Padma Purana’. This singers were originally a class of eunuchs called ‘gurmi’ or ‘gurma’ by the natives.”^{১১}

মনসাপূজার কদিনব্যাপী মনসামঙ্গলের যে গানের অনুষ্ঠান চলে—কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার মুখ্য ভূমিকা ছিল এই ‘গুরমাদেবরই একচেটিয়া। তাদের নর্তকীর বেশ, হাতে চামর। এই সূত্রে ‘গুরমিরা’ সর্পাঘাতের চিকিৎসক, তাই এই অনুষ্ঠানে তাদের অভিধা হয়েছে ‘ওঝা’, এবং এই সংগীতানুষ্ঠানের নামও হয়েছে ‘ওঝা-গান’। তবে বর্তমানে এদের দ্রুত অবলুপ্তির ফলে অন্য নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই গানের গায়করূপে আসছে। এদেরও বলা হয় ‘ওঝা’। একটি কৌতুকজনক ব্যাপার — ওঝাগান বা পদ্মাপুরাণের গায়কদের গুরমাদের মতোই নারীবৈশাখ ধারণ করতে হয় এবং হাতেও রাখতে হয় ‘চামর’।

এই ‘গুরমা’ শব্দটি এই বাংলায় পরিচিত নয়। ‘বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে’ শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে ‘নপুংসক, খোজা বা হিজড়ে’। কিন্তু শব্দটির কোনো উৎস বা ব্যুৎপত্তি

নির্দেশ করা হয়নি। কোনো কোনো পণ্ডিতজনের মতে তিব্বতী তন্ত্রাচারে নর্তকীদের বলা হয় 'গরু-মা' (Gar-Ma) এবং নাচের সময় তাদের হাতেও থাকে চামর। আমরা জানি এই চামরও আসে তিব্বত থেকে। এই তিব্বতী-ভূটানীদের সঙ্গে আসাম ও উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ সুদীর্ঘ অতীতকাল থেকে। সুতরাং যদি তিব্বতী নর্তকী 'গরু-মা'র সাংস্কৃতিক উত্তরসূরি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এই 'গুরুমা'দের তবে নিশ্চয়ই মান্যতা পেতে বাধা হবে না। সুতরাং শ্রীহট্ট-কাছাড়ের এই গুরুমা-গুরুমি শব্দটির উৎসমূলও যে এখানে এ বিষয়ে সম্মত হইবে অবকাশ থাকে না।

আবার নৌকাপূজা অর্থাৎ মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই নৌকাপূজাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে যায় নৌকার চারিদিক ঘিরে। চলে মাসাবধি, যতদিন না পূজামণ্ডপ ভেঙে ফেলা হয় ও নৌকার কাঠামো খুলে দেওয়া হয়।

নৌকাপূজা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। ১৯০৫ সালে নৌকাপূজা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যয় সম্পর্কে অ্যালেন সাহেব লিখছেন : "A special form of religious ceremony is known as the Nouka or boatpuja, and is performed by a wealthy man in satisfaction of a vow, who generally spends from 300/- to Rs. 500/- on the ceremony"^{৪৪} এই প্রসঙ্গেই পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ (ভট্টাচার্য) ১৯৩১ সনে বলেছেন— "এই পূজায় দুই হাজার টাকার মত ব্যয় হয়।" তিনি আরও বলেছেন, "বিশ্বশালীরা এই পূজায় কখনও পঞ্চাশ হাজার টাকাও খরচ করে থাকেন।"^{৪৫} আজকের দিনে খুব সাধারণভাবেও এই পূজায় কমপক্ষে পনেরো হাজার (১৫,০০০) টাকা ব্যয় হয়। সমগ্র বাংলা ও আসামের কোথাও এমন ব্যয়বহুল মনসাপূজা দেখা যায় না।

সমগ্র পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে মনসা খুবই জনপ্রিয় দেবী। তাই মনসা পূজার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ সম্পর্কে শ্রীহট্ট সন্তান বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, — "মনসাকে আমাদের স্থানীয় ভাষায় বিষহরি বলে। এত সাপের ভয় সে অঞ্চলে ছিল বলিয়াই, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় ঘরে ঘরে মনসাপূজা ছিল।.....বিষহরি বা মা মনসাপূজা সেকালে আমাদের অঞ্চলে একটি প্রধান পর্বই ছিল। দুর্গোৎসব সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাধারণ লোকেরা নিজেদের বাড়িতে এই চারদিনব্যাপী পূজার আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু বিষহরি বা মনসাপূজা প্রায় ঘরে ঘরেই হইত।.....পূজায় ছাগাদি বলির বিধান ছিল। শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসাপূজা হইবে। ভাসানের দিন দেশময় নৌকার 'বাচ'-খেলা হইত। আমাদের প্রান্তিক ভাষায় বাচখেলা শব্দটি প্রচলিত ছিল না। আমরা ইহাকে নাও-দৌড়ান বা নৌকাদৌড় কহিতাম।.....এই বাচখেলায় কোনো সাম্প্রদায়িক ভাব বা ভেদ ছিল না। হিন্দুর নৌকাতে মুসলমান এবং মুসলমানের নৌকাতে হিন্দু উঠিয়া বৈঠা ধরিতেন। তখনকার দিনে ধর্মের পার্থক্য থাকিলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিকতার অভাব ছিল না। একে অন্যকে নিজের আত্মীয় কুটুম্বের মতন দেখিতেন।.....এ সকল হইতেই বুঝা যায় এই মনসাপূজা, মনসার ভাসান ও নৌকা-দৌড়ান এ সকলের ভিতর দিয়া সেকালে আমাদের গ্রাম্যজীবনে কতটা আনন্দ-উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠিত।"^{৪৬}

এই সকল মনসাপূজা, নৌকা-দৌড়ান ছেড়েও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের 'নৌকাপূজা' নামীয় বিষহরি পূজা সমস্ত বেশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্ররূপে আজও তার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। নৌকাকে বিষহরি তথা মনসার মণ্ডপ বা আশ্রয় করে ব্যবহার অন্যত্র দেখা যায় না। বেশ কিছু 'মনসামঙ্গল'

কাব্যের কবিরা মনসাপূজক দুই জেলে (মৎস্যজীবী) জালু ও মালুর কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এর থেকে অনেকে মনে করেন সর্পদেবী মনসার পূজা প্রথম প্রচলিত হয় রাখাল ও কৃষকদের মধ্যে। পরে মৎস্যজীবীদের মধ্যে। এ সম্পর্কে প্রদ্যোৎকুমার মাইতি বলেন— “the cult of Manasa first spread among the people whose work was rendered dangerous by the snakes.”^১ নৌকাপূজা সম্পর্কে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও শ্রীমাইতি মনে করেন— “মৎস্যজীবীদের এটি একটি উৎসব হিসেবেই প্রচলিত হয়েছে।”

ধীবররা যে মনসাপূজা আড়ম্বর সহকারে করত — তার দৃষ্টান্ত আমরা পদ্মাপুরাণেও লক্ষ্য করি। চন্দ্রধর তাঁর বাণিজ্যতরী ‘মধুকর’ নিয়ে ‘কনক পাটন’ বা বন্দরে পৌঁছিয়ে দেখলেন :

মধুকর কাণ্ডার টানিয়া তখন।/অনন্দে মিলিয়া গিয়া কনকপাটন।।
নদীর কুলেতে এক দেখিয়া বাসর।/জিজ্ঞাসা করিল তারে চান্দসদাগর।।
দীপে ধূপে পুজ্জে লোকে হরসিতে নাচে।/নৌকা লইয়া গেল সাধু মাণ্ডপের কাছে।।
সমুদ্রের পারে চাঁদে দেখিয়া ধীবর।/জিজ্ঞাসা করিল তারে চান্দ সদাগর।।
এই মাণ্ডপের মধ্যে কেমন দেবতা।/পূজিলে কেমন ফল কি তার ব্যবস্থা।।
ধীবরে বোলয়ে শুন সাধু অমিকারী।/এই মণ্ডপেতে গিয়া পূজ্জ বিষহরি।।L....
জ্ঞেই বর মাগ তুমি সেই বর পাইবা।/পদ্যাতে ভকতি করি সপুত্রে বাড়িবা।।^২

(যষ্ঠিবর, পৃ. ১৩-১৪)

এ থেকেই অনুমান করা যায়, মৎস্যজীবী শ্রেণির মধ্যে বিষহরি বা ‘মনসাপূজার’ প্রচলন ছিল, কিন্তু উচ্চবর্গের মধ্যে এই দেবী বিশেষ পরিচিত ছিল না। তবে ‘নৌকাপূজা’ নামটির সঙ্গে মনসার কোথাও যোগ দেখা যায় না— এমনকি নৌকা-র সঙ্গে কোন সম্পর্কও দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় একমাত্র বহুপ্রচলিত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে উদ্ধৃত বণিক চন্দ্রধরকে শান্তি দিতে ক্রুদ্ধা দেবী কর্তৃক একে একে তার পণ্যপূর্ণ চৌদ্দখানি ডিগ্গা ডুবিয়ে দেওয়া এবং বেহুলার প্রচেষ্টায় সেই চৌদ্দ ডিগ্গা উদ্ধার কাহিনিতে।

দেবী মনসার আসন বা আলয় হিসেবে “নৌকা” প্রস্তুত করতে অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। নিশ্চিতভাবে কেউ বলতেও পারে না— এ অঞ্চলেই বা কবে ঘটেছিল এই নৌকাশ্রয়ে পদ্মাবতীর পূজা। তবে একথা ঠিক যে মৎস্যজীবীদের কাছে নৌকার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবং এর ব্যবহারিক গুরুত্বের জন্যই মনসাপূজার সঙ্গে নৌকা যুক্ত করার পূর্বেরই—তারা শুরু করে নৌকাপূজা যা তাদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। নৌকাপূজার সঙ্গে মনসাপূজা যুক্ত হয়—যখন তাদের জীবনে ভয়ঙ্করভাবে দেখা দেয় সর্পাতঙ্ক। সর্পদেবী পদ্মাবতী তথা মনসার পূজার প্রবর্তন হলেও মৎস্যজীবীগণ তাদের পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যানুসারে নৌকাপূজা বাদ দেয়নি। বরং ঐতিহ্যবাহী নৌকাপূজার সঙ্গে নবাগত মনসাপূজা একত্র করে এক সময় প্রচলিত হল নবরূপে ‘নৌকাপূজা’ বা নৌকান্বিত মনসাপূজা। এই নৌকাপূজার উৎস হিসেবে এমন ভাবনা বোধহয় খুব অসঙ্গত নয়।

দুই

এখানে লক্ষণীয় যে নৌকাপূজা শুরু হয় মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে, যা মনসাপূজার জন্য নির্ধারিত নয়। বরাক উপত্যকা, শ্রীহট্ট তথা পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই মনসাপূজা হয়ে থাকে শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে।

আর শ্রীপঞ্চমীতে জ্ঞানবিদ্যার অধীশ্বরী দেবী সরস্বতীর আরাধনা হয় সমগ্র বাংলা ও আসামে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পণ্ডিতেরা মনসার সঙ্গে সরস্বতীর একটা সম্পর্ক বহুস্থলে লক্ষ্য করেছেন।^{১০} ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য অথর্ববেদেও লক্ষ্য করেছেন এই সম্পর্ক^{১১}। এই সম্পর্ক তিনি লক্ষ্য করেছেন বৌদ্ধদেবী জাম্বুলী বা বিষহরির সঙ্গেও। ধ্যানমগ্নেও মনসা ও সরস্বতীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।^{১২} মনসা ও সরস্বতীর এই সম্পর্ক থেকেই হয়তো শ্রীপঞ্চমী তিথিতে নৌকাপূজার উপযোগী তিথি নির্দিষ্ট হয়েছে — এমন মনে করা যায়।

তবে মনসা ও সরস্বতীর এই সকল সম্পর্ক থেকেই যে শ্রীপঞ্চমী তিথি নৌকাপূজার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে সকলের কাছে একথা মান্যতা নাও পেতে পারে। কারণ সরস্বতী পূজার সাধারণত সমাজের উচ্চবর্গের মধ্যেই প্রচলিত। সুতরাং এর উৎস খুঁজতে হবে অন্যত্র। একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে নিম্নবর্গের যে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে নৌকার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে তারাই একসময় প্রচলন করেছিল এই নৌকাপূজার। এখনও এ অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নৌকাপূজার মুখ্য উদ্যোগী হলেন—মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোক। এ অঞ্চলে কিছুকাল আগেও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তুসমূহের পূজার প্রচলন ছিল এই পঞ্চমী তিথিতে। এর সাক্ষ্য আমরা পাই পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের একটি লেখায়। তিনি বলেছেন : ‘On the Sripanchami day husbandmen worship their corn sieves, ploughshares, winnowing baskets; Carpenters worship their saws, files, chisels; Weavers their looms and shuttles geed so on’^{১৩}। নৌকা যেহেতু ধীবরদের জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই এই শ্রীপঞ্চমীর দিনই তারা নৌকাপূজা শুরু করে। মনে হয় কোনো এক সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ অঞ্চলের ধীবর শ্রেনির মধ্যে নৌকাপূজার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে যখন মনসার পূজা গৃহীত হল সেই সমাজে (মনসামঙ্গলের জালু-মাণ্ডু দুই ধীবরের কাহিনি তারই দ্যোতক) তখন তাদের নৌকার উপরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে এই পূজার প্রচলন হয়।

ফসল কাটা ও গোলাজাত করার কাল বা সময়ের সঙ্গে এই নৌকাপূজার একটা সম্বন্ধ দেখা যায়। নৌকাপূজার জন্য প্রয়োজন বিস্তীর্ণ স্থান। তাই এ সময় অর্থাৎ ফসল কাটার পর ফাঁকা মাঠ পাওয়া যায়, যেখানে পূজার আয়োজন, মেলার স্থান সহজেই মেলে। মাঘ-ফাল্গুনেই অর্থাৎ ফসল কাটার পরই, নৌকাপূজা হয়। অবশ্য কোথাও আবার বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতেও এই পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে ব্যাটীভক্তি তরঙ্গিনীর^{১৪} কথা (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে)। নৌকাপূজা সম্পর্কিত একমাত্র সংস্কৃতগ্রন্থ, যেখানে নৌকাপূজার বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে বৈশাখ মাসকেই নৌকাপূজার উপযুক্ত সময় বলে নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে — ‘বৈশাখাদিষু মাসে পূজয়েৎ সর্বশাস্তিদাং’। সম্ভবত এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল মৈমনসিং-হবিগঞ্জ সীমান্তের কোনো ‘নিম্ন বিলুয়া’ অঞ্চলে, যেখানে মাঘ-ফাল্গুনেও মাঠ যথেষ্ট জনশূন্য হয় না। তাই সেখানে বৈশাখ মাসকেই নৌকাপূজার তথা মনসাপূজার উপযুক্ত কাল বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু বরাক উপত্যকা শ্রীহট্টের অনেকটা উঁচু অঞ্চলে অবস্থিত। তাই এ অঞ্চলে মাঘ-ফাল্গুনকেই উপযুক্ত সময় বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য ফসল তোলার সময়ের উপরই নির্ভর করে, কারণ এ সময়টাতে ফসলতোলা হয়ে গেছে এবং ‘অটেল অবসর’। বিস্তৃত ফাঁকা মাঠে নৌকাপূজার স্থানও দেদার। শ্রীহট্ট ও বরাক উপত্যকার অধিকাংশ

অংশেই শালি শস্য অগ্রহায়ণে পাকে, পৌষেই ফসল কাটা এবং গোলাজাত প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাই এ অঞ্চলে মাঘ-ফাল্গুন মাসকেই নৌকাপূজার উপযুক্ত কাল বলে গণ্য করা হয়। অপরদিকে সিলেটের সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ (বর্তমান বাংলাদেশ) অঞ্চলে শালি মুখ্য ফসল নয়। সেখানে বোরো ফসল বোনা হয় শীতে এবং শীতান্তে চৈত্রে তোলা হয়। ফলে বৈশাখ মাসই সেই অঞ্চলে নৌকাপূজার উপযুক্ত সময় বলে গণ্য করা হত।

তিন

নৌকায় স্থাপিত সকল দেবদেবীর মূর্তি অপেক্ষা, এমনকি দশভুজা, মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গামূর্তি অপেক্ষাও মনসার মূর্তি অনেক বড়ো করে গড়া হয়। এর মূলে বোধ হয় সকল দেবতার মধ্যে মনসার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো বা প্রমাণ করার মনোভাব কাজ করে। মনসামঙ্গলের মুখ্য চরিত্র চান্দ সদাগরের কাহিনিতে দেখা যায় যে সমাজের উচ্চবর্গের লোকেরা মনসাকে গ্রহণ করতে চায়নি। পরন্তু তারা মনসাকে ‘ধামনা ভাতারি’, ‘চ্যাঙ্কুড়ি’, ‘কানি’ প্রভৃতি বলে তাকিছিল্য ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। উচ্চবর্গের কাছে মনসাকে পূজা পেতে বহু কটকৌশল লেগেছে, লেগেছে দীর্ঘ সময়। মনসামঙ্গলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্তা মনসা বলছে—

কি বুদ্ধি করিবে বোলো মন্ত্রী নেতাই।

কেমতে চান্দোর হস্তে ফুল জল পাই॥

ছয় পুত্র মারিলু ধনজন করিলু হানি।

তথাপি না পূজি চান্দো সদাই বোলে কানি॥^{১৫}

(জগজ্জীবন ঘোষাল, পৃ. ১৪৯-৫০)

চাষি, ধীবর, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতির সমাজে মনসা পূজিতা হলেও উচ্চবর্গের ঘরে মনসার স্থান সহজে হয়নি। চান্দ সদাগর চৌদ্দভিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যযাত্রায় যখন কালীদেহে পৌঁছাল তখন—

জানিয়া পদ্মার মায়া বলে কর্ণধার।

“বুঝাই নৃপতি, না কর অহংকার॥

অই কালীদেহেতে মনসার অধিকার।

ঝড়বৃষ্টি নহে শুন নাগ অ(ব)তার॥

অই ‘ত’ দেউল-ক্ষজ্ঞা দেখহে, রাজন।

নাগের প্রতাপে রক্ষা নাহিক জীবন॥

মনসাপূজা তুমি কর একাসনে।

তবে ধনপ্রাণ লৈয়া বা যাই পাটনে॥^{১৬} (বিপ্রদাস)

নৌকার মাঝি-মাল্লারা মনসার ভক্ত, তারা চান্দকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মনসাকে পূজা করতে বলে। কিন্তু চান্দেদর জেদ—

প্রাণ গেলেও না লইব কাণীর স্মরণ।

যদি দৃষ্টে হয় তবে বধিবে জীবন॥

শেষ পর্যন্ত মনসার পূজামণ্ডপ ভেঙে ‘মন্দিরের যত ধনে ভিক্ষা কৈল ভরা।’ এর প্রতিফল হিসাবে মনসা তার সমস্ত ভিক্ষা ডুবিয়ে দিল, শেষ পর্যন্ত লখাই-এরও মৃত্যু ঘটাল। তবু চান্দ অনড় — ইতরলোকের দেবী মনসার পূজা কিছুতেই করবে না। চান্দ শিব-দুর্গার ভক্ত, তাদের

পূজা করে হঠমনে, বণিক গজেশ্বরীর পূজা করে, কিন্তু মনসা 'নৈব, নৈব চ।' উচ্চবর্গের আরাধ্য শিব-দুর্গা প্রভৃতির পূজাক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয়রা চির-অপাঙ্কস্তেয়।

এসব কারণেই নৌকাপূজার সঙ্গে মনসার পূজাকে মিলিত করে এই চাষি, মাঝি, মাদ্রা প্রভৃতি শ্রেণির লোকেরা যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে নৌকাপূজা করে—যেন দুর্গাপূজার ঔজ্জ্বল্যকে লান্ন করে দিতে। আর এই মানসিকতা থেকেই নৌকায় স্থাপিত সমস্ত দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে মনসার মূর্তিটি এত বড়ো করে দেখানো হয়।

বর্তমানে সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নিশ্চয়ই হ্রাস পেয়েছে অনেক পরিমাণে। তথাপি পরস্পরের প্রতি বিরূপতার একটা সূক্ষ্মভাব উভয় শ্রেণির মানসিকতায় অনেকটাই জিম্মাশীল রয়েছে। এ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয়রা ঐতিহ্যানুযায়ী দেবী দুর্গাকে এবং অন্য সকল দেবতাকেই শ্রদ্ধা করে — কিন্তু মনসাকে উচ্চতর স্থানে দেখে। শ্রীহট্ট-বরাক উপত্যকার লোক-সমাজে একটা কথা চালু আছে—“ডালের মধ্যে মসুরী, দেবতার মধ্যে বিষরি।” অর্থাৎ কলাই, মুগ প্রভৃতি সকল ডালের মধ্যে সেরা ডাল হল মসুরী ডাল, আর সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন বিষহরি অর্থাৎ মনসাদেবী। কারও হাতে কিছু টাকাকড়ি সঞ্চিত হলে সে তা ব্যয় করে নৌকাপূজার জন্য। অনেক কম খরচে দুর্গাপূজা সম্ভব হলেও সে দুর্গাপূজার কথা কখনই ভাববে না। তাই মনে হয়, এই নৌকাপূজা, যা কিনা মনসাপূজারই নামান্তর তা নিশ্চয়ই সমাজের উচ্চবর্গের জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপূজা বা ‘দুর্গোৎসব’কে টেকা দেবার মানসিকতা থেকেই একদিন সৃষ্ট হয়েছে এবং আজও চলছে।

উৎস নির্দেশিকা

- ১ Assam District Gazetteers, Vol. I, Cachar : B.C. Allen, Shillong, 1905।
- ২ কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল : ড. আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।
- ৩ Prof. Dr. Sujit Choudhury, *Folklore and History : A study of the Hindu Folk cults of the Barak Valley*, New Delhi।
- ৩ক ড. সুজিত চৌধুরী, *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার*, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৭৪।
- ৪ Assam District Gazetteers, Vol. II, Sylhet, B.C. Allen, Shillong, 1905।
- ৫ P.N. Bhattacharya; *Man in India Vol-X 'Folk-Culture and Folklore in the Sylhet district in India, 1931, p. 255।*
- ৬ বিপিনচন্দ্র পাল : “সন্তর বৎসর”। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৫, ২৭ ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ ১৬-২৬।
- ৭ P.K. Maity, *Historical Studies in the cult of goddess Manasa*; p. 174
- ৮ তদেব, p. 309।
- ৯ কবি ষষ্ঠিবর দত্ত বিরচিত : *পদ্মাপুরাণ - পুথি*।
- ১০ কানাইলাল ভট্টাচার্য, *সরস্বতী, ভাবকল্পনা ও প্রতিমার বিবর্তন*, ২০০২, পৃ ৮৬।
- ১১ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* ৮ম সংস্করণ; কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ ২৬৫।
- ১২ P. K. Maity : *ibid*, p. 215।
- ১৩ P. N. Bhattacharya : *ibid*, p. 259।
- ১৪ “ব্যাড়ীভক্তি ভরসিণী” প্র. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পৃ ২৯৭-২৯৮।
- ১৫ কবি জগজ্জীবন — প্র. পা.টী.-২।
- ১৬ বিপ্রদাস পিপলাই, *মনসাবিজয়*, সুকুমার সেন সম্পাদিত ও এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত।

সঙ্গতিসূত্র এবং মেদিনীপুরের উপভাষাবৈচিত্র্য

প্রকাশকুমার মাইতি

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তার বাস। তাই তাকে বেশ কিছু সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। তার ব্যবহৃত ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। তা নিয়ন্ত্রিত হয় বেশ কিছু সামাজিক নিয়মের দ্বারা। এমনই তিনটি সমাজভাষিক সূত্রের কথা বলেছেন ভাষাবিজ্ঞানী সূজান আরভিন-ট্রিপ (S. Ervin-Tripp) তাঁর ‘Sociolinguistics’ প্রবন্ধে (১৯৭১)। সূত্রগুলি হল—

ক. বিকল্প সূত্র (Alternation Rules)

খ. পারস্পর্য সূত্র (Sequencing Rules)

গ. সঙ্গতি সূত্র (Co-Occurrence Rules)

ভাষা ব্যবহারের সময় বক্তার সামনে কিছু বিকল্প থাকে। সেই বিকল্প থেকে সে বেছে নেয় একটি। যেমন, সম্বোধনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় ‘তুই’, ‘তুমি’ এবং ‘আপনি’ এই তিনটি বিকল্প রয়েছে। কতকগুলি নিয়ামক (factor) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যথা—বয়স, লিঙ্গ, শ্রেণিজীবিকা প্রভৃতি। আবার সামাজিক স্তরে সম্বোধন হয় এক প্রকার। আত্মীয়তা স্তরে বদলে যায় তার ধরন। বিকল্পসূত্রে ভাষা ব্যবহারে বক্তা-শ্রোতার এই পারস্পরিক অবস্থান এবং তার ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।

সমাজে ভাব বিনিময়ের সময় বক্তা যে-ভাষা ব্যবহার করে তার মধ্যে পারস্পর্যের নিয়মরীতি রয়েছে। সাধারণ কথোপকথন অগোছালো হলেও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এই পারস্পর্য-সূত্র বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়। তবে প্রাত্যহিক জীবনে বক্তা-শ্রোতা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সময় সমাজভাষিক পারস্পর্য সব সময় রক্ষা করা না হলেও সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্বোধন-পরিচয়-কুশলবিনিময়-আলাপচারিতা-বিদায়গ্রহণ এই পারস্পর্যক্রমে গ্রথিত থাকে যে-কোনো কথোপকথন। পারস্পরিক আলাপচারিতার অন্তরঙ্গ (informal) এবং পোশাকি (formal)—দুটি পর্যায়েই বিষয়টি স্পষ্ট লক্ষ করা যায়।

কোনো ব্যক্তি কথা বলবার সময় যে-সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করে তা সঙ্গতিসূত্রে গ্রথিত। একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দ বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, বাংলা ভাষায় ‘শবপোড়া’ বা ‘মড়াপোড়া’ এমন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার হয় না। বরং তা আমরা ব্যবহার করি এইভাবে—‘মড়াপোড়া’ বা ‘শবদাহ’। সঙ্গতিসূত্রের এই বোধ থাকে বক্তার মস্তিষ্কে এবং তার শব্দ নির্বাচনও এই সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান প্রবন্ধে মেদিনীপুরের উপভাষায় বক্তা-শ্রোতা পারস্পরিক কথোপকথনে সঙ্গতিসূত্রের প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা হবে।

আরভিন-ট্রিপ সঙ্গতিসূত্রকে দেখিয়েছেন দু’ভাবে। যথা—

১ বাক্যগঠনে পাশাপাশি শব্দ নির্বাচন (Horrizontal)

২ আলম্ব শব্দ নির্বাচন (Vertical) বা আন্বয়িক সংবর্তন।

১.০০. বাক্য গঠনে পাশাপাশি শব্দনির্বাচন :

সঙ্গতিসূত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাক্য গঠনে পাশাপাশি শব্দ নির্বাচন। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বাক্যগুলির বিশ্লেষণের সময় দেখা যায় বাক্যে প্রযুক্ত শব্দগুলির পাশাপাশি অবস্থানে রয়েছে এই সূত্রের অনুসরণ। সমস্ত উপাদানের সঙ্গে উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে না। আলোচনার জন্য কতকগুলি বাক্য নেওয়া হল—

- (i) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা।
- (ii) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা কি?
- (iii) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা মন হয়।
- (iv) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা জাগি।
- (v) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা কে কোইল?
- (vi) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা জাগি নি ত।
- (vii) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা অ্যাখণ আসি।
- (viii) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা দাঁড়াবোনি।
- (ix) মত্ৰা ঘর্যা আজ অন্যাক কাজ আছ্যা কাল বুস্ব।

(তথ্য সংগ্রহ : তমলুক মহকুমা)

[মত্ৰা = ম্ + অ + ত্ + র্ + অ্যা

ঘর্যা = ঘ্ + অ + র্ + অ্যা

অন্যাক = অ + ন্ + অ্যা + ক্

আছ্যা = আ + ছ্ + অ্যা

কোইল = ক্ + ও + ই + ল + অ

বুস্ব = ব্ + উ + স্ + ব্ + আ

মন = ম্ + অ + ন্ + অ]

প্রদত্ত বাক্যগুলিতে পাশাপাশি শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ওই পর্যন্ত বাক্যটি সম্পূর্ণ এবং অর্থ প্রকাশে কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় বাক্যে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে প্রশ্নবোধক সর্বনাম 'কি'। তৃতীয় বাক্যে অনিশ্চয়তা সূচক 'মন হয়' যুক্ত হয়েছে। নিশ্চয়তাবোধক ক্রিয়াপদ 'জাগি' ব্যবহৃত হয়েছে চতুর্থ বাক্যে। পঞ্চম বাক্যে প্রশ্নবোধক বাক্যাংশ 'কে কোইল', ষষ্ঠ বাক্যে ক্রিয়াসহ নগুর্ধক অব্যয় 'জাগি নি ত' যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যগুলিতে বিভিন্ন প্রকার বাক্যখণ্ড বা বাক্যাংশ যুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রদত্ত নটি বাক্যে দেখা যাচ্ছে স্বর ও ব্যঞ্জনসহ প্রথম ছটি পদ অবিকৃত রূপেই প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই উপাদানগুলি পারস্পরিক সঙ্গতিসূত্রে গ্রথিত। এদের অবস্থান নিয়ে বিরোধ নেই। এ ধরনের আরও বাক্য আমরা পেতে পারি :

- (i) তু মোর ঘোরকু চল।

- (ii) তু মোর ঘোরকু চল্ এখুণ।
 - (iii) তু মোর ঘোরকু চল্ মোর সাঁত্ৰ।
 - (iv) তু মোর ঘোরকু চল্ সাঁঝবালা। (ল > ল্)
 - (v) তু মোর ঘোরকু চল্ না।
 - (vi) তু মোর ঘোরকু চল্ সাইকেল চড়িকি।
- (ল = মুর্ধ্য ল, মুর্ধ্য থেকে উচ্চারিত)

অতিরিক্ত একটি শব্দ ‘আজ’ পূর্বোক্ত প্রথম বাক্যে ব্যবহার করতে চাইলে বাক্যটির শব্দগুলির বিন্যাস হতে পারে নিম্নরূপ—

- (i) আজ তু মোর ঘোরকু চল্।
- (ii) তু আজ মোর ঘোরকু চল্।
- (iii) তু মোর ঘোরকু আজ চল্।
- (iv) তু মোর ঘোরকু চল্ আজ।

(তথ্য সংগ্রহ : কাঁথি মহকুমা)

১.১. বাক্যে ‘SOV’ প্যাটার্ন-এর মধ্যে শব্দ ব্যবহার :

বাংলা বাক্যের ‘SOV’ এই ক্রমটিই মেদিনীপুর অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। কর্মবাচক শব্দের ক্ষেত্রে সাধারণত ‘কাল-ব্যক্তি-স্থান’ এই ক্রম অনুসৃত হয়। যেমন—তান্যা দুফোর বালা কোচা কোচিকে লিয়া রথ্যার মেলায় গেছে। এখানে কর্তাবাচক শব্দ—তান্যা (ত্ + আ + ন্ + অ্যা, অর্থ—তারা), ক্রিয়া—গেছে (গ্ + এ + ছ + এ), কালবাচক object—দুফোর বালা, ব্যক্তিব্যবচক object—কোচা কোচিকে এবং স্থানবাচক object—মেলায়। বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা, হেঁসা খেলা দিন কেটে যাহুয়া। এখানে তিনটি অসমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে।

১.২. অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার সংযুক্তি :

অসমাপিকা এবং সমাপিকা ক্রিয়া কখনো কখনো সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

- (i) হাঁসপাতালে যেয়া দেখাস্। (< দেখে এসেছি)
- (ii) তমার পাটা ফুলেইছে। (< ফুলে গেছে)
- (iii) তোর তরে কী লিয়াস্। (< নিয়ে আসব)
- (iv) রবিকে কোয়াইলি। (< বলে এলাম)

১.৩. নঙর্থক বাক্যের গঠন :

নঙর্থক বাক্যের অস্তে সাধারণত না সূচক অব্যয় ‘না’, ‘নি’, ‘নাই’ প্রভৃতি যুক্ত হয়। যেমন, ‘সে ঘর যাবে নি’, ‘কাজটা পারবো নি’, ‘গরম জলে হাত দিতে নাই’ প্রভৃতি। এগুলি কখনো কখনো বাক্যের মাঝেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘জলটুক নাই দিলি’।

১.৪. প্রশ্নবোধক বাক্যের গঠন :

যে সমস্ত প্রশ্নবোধক বাক্যের উত্তর ‘হ্যাঁ’ কিংবা ‘না’ তাদের গঠন নিম্নরূপ—

- (i) বিলু কি ঘর যাউছু ?
- (ii) তমার কি সময় হিচে ?

সমাপিকার পরেও ‘কি’ বসতে পারে। যেমন—

- (i) বিলু ঘর যাউছু কি ?
- (ii) তমার সময় হিচে কি ?

আবার প্রশ্নবোধক সর্বনাম ছাড়াই প্রশ্নবাক্য তৈরি হতে পারে। যথা—

- (i) বিলু ঘর যাউছু ?
- (ii) তমার সময় হিচে ?

এক্ষেত্রে স্বাসাঘাত পড়েছে ক্রিয়ার উপরে।

যে সমস্ত প্রশ্নবোধক বাক্যের বস্তুগত উত্তর পাওয়া যায় তাদের ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক সর্বনাম সাধারণ সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন—

- (i) তুমি কী করছ ?
- (ii) তুমি কখন আস্ ?
- (iii) কভে রাম আইসেছে ?
- (iv) তোম্মে কাই যাবি ?

তবে সমাপিকা ক্রিয়ার পরেও প্রশ্নবোধক সর্বনাম বসতে পারে।

২.০০ আলম্ব শব্দ নির্বাচন বা আন্বয়িক সংবর্তন :

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত বাক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিলোপন, আগম, রূপান্তর এবং বিপর্যাস প্রভৃতি নানা প্রকার সংবর্তন ঘটেছে।

২.১. বিলোপন :

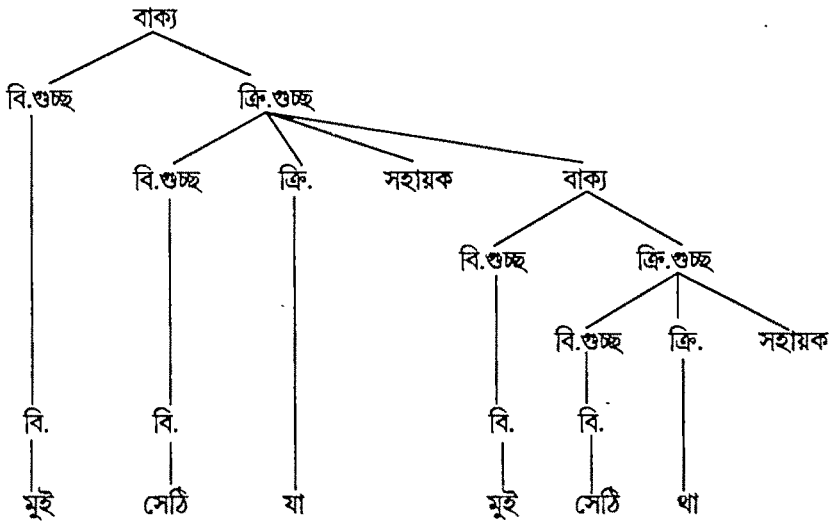
বিলোপন নানা ধরনের হতে পারে। যথা—সমধর্মী কর্তা বিলোপন, সমধর্মী কর্ম বিলোপন, সমধর্মী ক্রিয়া বিলোপন, স্থিতিক্রিয়া বিলোপন, সহায়ক বিলোপন, অনালোকিত উপাদানের বিলোপন প্রভৃতি।

২.১.১. সমধর্মী কর্তা বিলোপন :

দুটি বাক্যের সংবর্তনের সময় যদি বাক্যদুটিতে সমধর্মী কর্তা থাকে তবে অধিগঠনে দেখা যায় একটি কর্তা বিলোপিত হয়েছে। যেমন—

- (i) মোকে তাত্হ্যা টাকা দিছ্যা
মোকে তাত্হ্যা মুড়ি দিছ্যা > মোকে তাত্হ্যা টাকা
দিছ্যা, মুড়ি দিছ্যা।
- (ii) মুই সেঠি যাব
মুই সেঠি থাব > মুই সেঠি যাব আর সেঠি থাব।

বৃক্ষরেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে এইভাবে—



সংযোজন—আর

সমধর্মী কর্তা বিলোপন

অধিগঠন—মুই সেঠি যাব আর সেঠি থাব।

২.১.২. সমধর্মী কর্ম বিলোপন :

দুটি বাক্যের সংবর্তনের সময় অধোগঠনে একই প্রকার কর্ম থাকলে সংবর্তিত হওয়ার পর অধিগঠনে প্রাপ্ত বাক্যে একটি কর্ম বিলোপিত হয়। যেমন—

- (i) হামি অথা যাব
হামি অথা থাইক্ব > হামি অথা যাব এবং থাইক্ব।
- (ii) বিলু সেঠি গ্যাছল
বিলু সেঠি থাছল > বিলু সেঠি গ্যাছল আর থাছল।

২.১.৩. সমর্থনী ক্রিয়া বিলোপন :

অধোগঠনে দুটি বাক্যে একই প্রকার ক্রিয়া থাকলে সংবর্তনের পর সাধারণত একটি ক্রিয়া লুপ্ত হয়। যেমন—

- (i) মুই ভাত খাচি
মুই রুটি খাচি $>$ মুই ভাত আর রুটি খাচি।
- (ii) রাম আইসেছে
হরি আইসেছে $>$ রাম আর হরি আইসেছে।

২.১.৪. স্থিতিক্রিয়া বিলোপন :

বাংলা বাক্যের স্থিতিক্রিয়া বিলোপনের মতোই মেদিনীপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত বাক্যে স্থিতিক্রিয়া বিলোপিত হতে দেখা যায়। যেমন—সামনে গত $<$ তমার সামনে গত আছে।

- (i) তুমার খুব পৈসা।
(ii) তার অনেক টাকা।

২.১.৫. সহায়ক বিলোপন :

এই জাতীয় বিলোপনে সাধারণত ‘হয়’ ক্রিয়ার বিলোপন ঘটে। যেমন—

- (i) রাধি ভাল মেয়্যা $<$ রাধি হয় ভালো মেয়ে।
(ii) হামি পাঁচু।
(iii) তু রাজার ঝিঅ।

২.১.৬. অনালোকিত উপাদানের বিলোপন :

বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত অনালোকিত অংশ অনেক সময় বিলোপিত হয়। সাধারণত কথোপকথনের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সংবর্তন হতে দেখা যায়। বস্তু হচ্ছে করেই বাক্যের কিছুটা অংশ অনালোকিত (defocussed) রাখে। যেটুকু বললে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেটুকুই সে বলে। যেমন—

- (i) বইটা কাকে দুব?
রবিকে।
(ii) তুমি এঠি কী কত্বে আসস?
কাজ। (= মুই এঠি কাজ কত্বে আসসি)

২.২. বিশেষ্যীভবন :

বিশেষ্যীভবন বাক্যের গঠনগত দিকটি তুলে ধরে। এখানে অর্থগত দিকটি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সংবর্তনে পরিবর্তন ঘটে ক্রিয়ার। তারপর পরিবর্তিত হয় কর্তা বা কর্তা বিশেষ্যগুচ্ছ। ক্রিয়া সংবর্তন ঘটে এইভাবে—

ক্রিয়া—ক্রিয়াবিশেষ্য (-আ, -আনো/-আনা) ক্রিয়া থেকে সংবর্তিত ক্রিয়াবিশেষ্য সব সময় একবচন হয়। যেমন—

(i) অর সব লোক দ্যাখাণা।

(ii) দিঘা মোর বহুবার যাবা।

বিশেষ্যীভবনের ফলে ক্রিয়ার কালগত বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। আদিত্তে ক্রিয়াটি যে কালেই থাকুক না কেন বিশেষ্যীভবনের পর কোনো কালের ইঙ্গিত দেয় না। যেমন—

মুই তমার কাছে আস্‌সিলি

মুই তমার কাছে আসিঠি/আসিহি > মোর তমার কাছে আসা

মুই তমার কাছে আসব

অনেক সময় ক্রিয়াকে ক্রিয়াবিশেষ্যে পরিণত করবার পর ‘-র’ বিভক্তি যোগে সম্বন্ধবাচক বিশেষ্যে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর ‘কথা’ এই ক্রিয়াবিশেষ্যটি বসে। যেমন—

(i) রামের খাবার কথা।

(ii) তমানকার আসার কথা।

বিশেষ্যীভূত বাক্য যে বাক্যে বিগর্ভিত সেই বাক্য অনুসারে তার কাল নির্দিষ্ট হয়। যেমন—

(i) তানকার এঠি আসা পছন্দ হয় নি।

(ii) তমানকার এঠি থাবা ঠিক হবে নি।

বিশেষ্যীভূত বাক্যের ক্রিয়াবিশেষ্যের সঙ্গে যেমন ‘-র’ বিভক্তি যোগ হয়, তেমনই নির্দেশক প্রত্যয় ‘-টা’ যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন—

(i) তমানকার যাবাটা ঠিক হবে নি।

(ii) তমার হাঁসাটা কি ভাল দ্যাখাইল।

২.৩. বাক্য বিগর্ভন :

বিশেষ্যগুচ্ছের মধ্যে এক বা একাধিক বাক্য সংযোজিত হতে পারে। একে বলা হয় বাক্য বিগর্ভন। সাধারণ বাক্য যেমন বিগর্ভিত হতে পারে তেমন নিষ্ঠান্ত বাক্যও বিগর্ভিত হয়।

২.৩.১. নিষ্ঠান্ত বাক্য বিগর্ভন :

নিষ্ঠান্ত বাক্য বিগর্ভন সাধারণত হয়ে থাকে এইভাবে—

বিশেষ্য গুচ্ছ—নিষ্ঠান্ত বাক্য + বিশেষ্য।

নিষ্ঠান্তবাক্য = এক্‌বারে পচে যাবা

বাক্য = মুই আমগুলা ফেলি দিছি

বিগর্ভনের পরে প্রাপ্ত বাক্য =

এক্‌বারে পচে যাবা আমগুলা ফেলি দিছি।

অনুরূপভাবে একাধিক নিষ্ঠান্ত বাক্যও বিগর্ভিত হতে পারে।

২.৩.২. সাধারণ বাক্য বিগর্ভন :

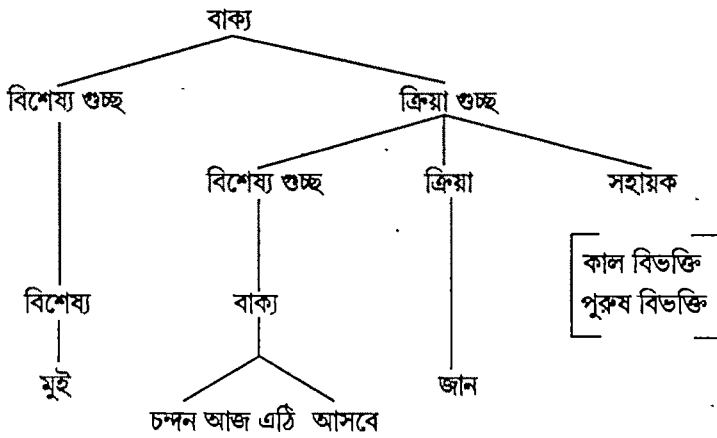
নিষ্ঠান্ত বাক্যের মতো সাধারণ বাক্যও বিগর্ভিত হতে পারে। যেমন—

বাক্য-১ = মুই একথা জাগতি।

বাক্য-২ = চন্দন আজ এঠি আসবে।

বিগর্ভনের পরে প্রাপ্ত বাক্য = চন্দন আজ এঠি আসবে মুই জাগতি।

বৃক্ষরেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে দেখানো যেতে পারে এইভাবে—



২.৪. বাচ্য সংবর্তন :

বাচ্য শব্দের অর্থ কথা বা কথা বলার ভঙ্গি। বাচ্য শব্দটিকে তাই বলা যায় কথা বলার ভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাক্যের ক্রিয়াটি কর্তা বা কর্মের অনুগামী অথবা স্বয়ং প্রধান হলে ক্রিয়ার রূপভেদ দ্বারা তা নির্ণীত হয়। এইভাবে আমরা ক্রিয়ার চার প্রকার রূপবৈচিত্র্য পেতে পারি। যা আসলে চার প্রকার বাচ্য।

২.৪.১. কর্তৃবাচ্য (active voice) :

কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া কর্তার অনুগামী। ক্রিয়া একটি ব্যক্তিকে অনুসরণ করে বলে একে ব্যক্তিক বাচ্য বলে (personal voice)। যেমন—

- রাম বণে গ্যাছল।
- তুম্‌হি মুঢ়ি খাইয়েছ?
- সে ঘাটে দাঁড়ি ছিল।

২.৪.২. কর্মবাচ্য (passive voice) :

কর্তার প্রাধান্য কমে যায় কর্মবাচ্যে। এক্ষেত্রে ক্রিয়া অনুগামী হয় কর্মের। একমাত্র সাকর্মক ক্রিয়াই

কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন—

- (i) তমার দ্বারা একাজ হবার নয়।
- (ii) এঠিনু কথা শুণা যায়।
- (iii) ঐখান থাইকে নদী দ্যাখা যাবেক।
- (iv) ভুখা পেটে চা খাইতে নাই।

২.৪.৩. ভাববাচ্য (neuter voice) :

ভাব শব্দের পারিভাষিক অর্থ হল ক্রিয়া। এখানে কর্তা বা কর্মের পরিবর্তে ক্রিয়াই প্রাধান্য লাভ করে। যেমন—

- (i) তানকে ঘর যেতে হবে।
- (ii) হামার আইজ্ঞ যাবা হবেক নাই।
- (iii) তমার গান শুণা হয় নি।
- (iv) বইটি হামার পঢ়া হইয়ে গেছে।

২.৪.৪. কর্মকর্তৃবাচ্য (quasi-passive voice) :

কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মই কর্তার মতো কাজ করে। এখানে ক্রিয়ার কর্তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। অধিগঠনে কর্তৃবাচ্যের যে রূপ তার সঙ্গে এর বিশেষ কোনো গঠনগত পার্থক্য নেই। ‘হওয়া’ জাতীয় সমাপিকা ক্রিয়াও যুক্ত হয় না। যেমন—

- (i) জোরে জোরে শাঁক বাজেহুয়া।
- (ii) চাঁইড় চাঁইড় বাজ পইড়ছে।
- (iii) কাল বেশ গরম পড়ুছল।
- (iv) আমাহর শাঁক ভালো বাজুচি।

২.৪.৫. সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য এবং সংবর্তন :

সরল, জটিল এবং যৌগিক তিন শ্রেণির বাক্যের সংবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন বাক্য সঞ্জন করা যেতে পারে।

২.৫.১. সরল বাক্য :

এই শ্রেণির বাক্য একটি সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত। যেমন—

- (i) যদু ভাত খাচে।
- (ii) মুই ঘর গেছলি।
- (iii) তানে এটি আস্‌সে।

২.৫.১.১. ক্রিয়াহীন সরল বাক্য :

এই শ্রেণির সরল বাক্যে ক্রিয়া অনুশ্লিষিত। তাই এদের ক্রিয়াহীন সরল বাক্য বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। যেমন—

- (i) মুই পাঁচু = মুই ϕ পাঁচু
- (ii) এউটা মনকার ক্যালাপ = এউটা ϕ মনকার ক্যালাপ।

২.৫.১.২. ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য :

ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন, ‘তু করুঠু’, ‘সে খায়ঠে’। এখানে কর্মপদের উল্লেখ নেই। আবার মুখ্যকর্ম এবং গৌণকর্মযুক্ত সরল বাক্য পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

- (i) বিলু জুলিকে বিস্কুট দিচ্ছে।
- (ii) তানে মোকে টাকা দিবে কইছে।

২.৫.২. জটিল বাক্য :

একটি প্রধান বাক্যখণ্ড ও এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্যখণ্ড নিয়ে জটিল বাক্য তৈরি হয়। বাক্যখণ্ডগুলি পারস্পরিক আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও অধীনতার সম্পর্ক স্বীকার করে যুক্ত হয়।

২.৫.২.১. সাপেক্ষ পদযুক্ত জটিল বাক্য :

এই জাতীয় জটিল বাক্য ‘যদি....তবু/তাহলে/তবে’ যোগে গঠিত হয়।

- (i) তুই যদি অংকটা জাণু তাহলে কোসা দ্যাখা না।
- (ii) তনে যদি যাবি নি ত দাঁড়ি আছু কেন?

২.৫.২.২. প্রতিনির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য :

এই শ্রেণির জটিল বাক্য ‘যখন...তখন’/‘যার...তার’ প্রভৃতি প্রতিনির্দেশক যোগে গঠিত হয়। যেমন—

- (i) যখন টেসনে আইলি তখন টেন চোলেইছে।
- (ii) তুমি যেঠি লে যাব সেঠি যাব।
- (iii) যার তরে দাঁড়ি আছি তাকু তনে লেইছু।

২.৫.৩. যৌগিক বাক্য :

এই প্রকার বাক্যগুলিতে সাধারণত একাধিক সরল বাক্য পারস্পরিক স্বাধীন অর্থপ্রাধান্য বজায় রেখে সংযোজকের দ্বারা যুক্ত হয়। ‘কিন্তু’ ‘এবং’ প্রভৃতি সংযোজক মূলত ব্যবহৃত হয়। যেমন—

- (i) ছুটবিটিট কাজের কিন্তু পঢ়াশুনায় নাই।
- (ii) মোর ক্ষতি হয় হউ তবু তমার কথা শুনব নি।

২.৫.৪. সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য

- (i) সরল বাক্য—গরীব হলেও উ অসৎ লহে।
জটিল বাক্য—যদিও উ গরীব তবু উ অসৎ লহে।
যৌগিক বাক্য—উ গরীব কিন্তু উ অসৎ লহে।
- (ii) সরল বাক্য—তমার জিতার কথা শুণছি।
জটিল বাক্য—তুমি যে জিতুছ শুণছি।
যৌগিক বাক্য—তুমি জিতুছ, তমার জিতার কথা শুণছি।

নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা :

ক. বাংলা

- চন্দ্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, *বাংলা বাক্যের পদশৃঙ্খলের সংগঠন*, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা।
১৯৯৮, *বাংলা সংবর্ডনী ব্যাকরণ*, শ্রীঅরবিন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা।
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৪২, *ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৫০, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
দাশ, নির্মল, ১৯৮৪, *উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে*, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা।
নাথ, মুগাল, ১৯৮৯, *সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা*, বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা।
১৯৯৯, *ভাষা ও সমাজ*, নয়া প্রকাশ, কলকাতা।
বসু, আনন্দমোহন, ১৯৭৬, *বাংলা ভাষার ইতিহাস*, পারমিতা প্রকাশন, বোলপুর, বীরভূম।
ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র, ২০০০, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, কলকাতা।
মজুমদার, পরেশচন্দ্র, ১৯৭১, *বাংলা ভাষা পরিক্রমা*, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা।
শ, রামেশ্বর, ১৯৮৮, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
সেন, সুকুমার, ১৯৭৫, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা।

খ. ইংরেজি

- Bach, E, 1974, *Syntactic Theory*, Holt Rinehart and Winston, NY.
Bloomfield, L, 1993, *Language*, Allen & Unwin, London.
Bright, W, 1966, *Sociolinguistics*, Mouton, The Hague.
Chatterjee, S.K, 1975, *The Origin and Development of the Bengali Language*,
In 3 Parts, Rupa & Co, Calcutta.
Chomsky, N, 1965, *Aspects of the Theory of Syntax*, MIT Press, Cambridge, Mass.
Ditmer, N, 1978, *Sociolinguistics*, Edward Arnold, London.
Ervin-Tripp, S, 1971, *Sociolinguistics*. (In Fishman, 1971).
Fishman, J.A, 1971, *Advances in the Sociology of Language.....I* (Ed), Mouton, The Hague.
Labov, W, 1972, *Sociolinguistic Patterns*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Trudgill, P, 1974, *Sociolinguistics*, Penguin, Harmondsworth.

আর্যাবর্ত।

মাসিক পত্র ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত ।

প্রথম বর্ষ ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

(কার্তিক হইতে চৈত্র ।)

১৩১৭ ।

প্রকাশক—শ্রীচুর্গনাথ বসু ।

১০৬২ স্ক্রামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

আর্য্যাবর্ত পত্রিকার ইতিহাস ও কালানুক্রমিক সূচি

অশোককুমার রায়

কোনো মাসিক পত্রিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই একটি ভূমিকা, পূর্বাভাস বা সূচনায় পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা শুধু আমাদের দেশেই নয় বিদেশি সাময়িক পত্রেরও একটি চিরন্তন পদ্ধতি। এটিকে সূতিকা সংস্কারও বলা যায়। এ'ছাড়া আরো একটি বিষয় হ'লো 'সম্পাদকীয়' অর্থাৎ সম্পাদকের কলমে সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ ও সে বিষয় মন্তব্য আমাদের আলোচ্য সেকালের লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২) প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত আর্য্যাবর্ত মাসিক পত্রে সর্বাংশে অনুপস্থিত। তাই এই পত্রিকা সম্পর্কে লিখিত ভাবে পত্রিকার উদ্দেশ্য, আদর্শ তথা পরিচালন ইতিহাস ইত্যাদির কথা সে ভাবে আজ আর জনবার উপায় নেই।

তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আবির্ভূত আর্য্যাবর্ত মাসিক পত্রটি (১৩১৭-১৩২১ বঙ্গাব্দ) স্বল্পায়ু হলেও বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে নিঃসন্দেহে রচনা নির্বাচন তথা সম্পাদনা-নৈপুণ্যে। মোট সাড়ে চার বছরে ৫৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

বৈশাখ, ১৩১৭ (এপ্রিল, ১৯১০) প্রথম প্রকাশ ও অন্তিম সংখ্যা প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩২১ (অক্টোবর, ১৯১৪)। প্রকাশক ছিলেন দুর্গানাথ বসু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। দুর্গানাথ সম্ভবত ছাপাখানার মানুষ হবেন, অনেক অনুসন্ধান করেও তাঁর পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি। লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৪/১ ও ৬৪/২, সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত হয় আর্য্যাবর্ত।

আর্য্যাবর্ত-এর পাতা ওলটাতে গিয়ে যে কথাটি সর্ব প্রথম মনে আসে তা'হল সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যেন এক সেতু, সাহিত্যের নানা ধারাকে আপন করে বেঁধে উনিশ শতকের প্রাণধারা নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ান বিশ শতকের দরজায়—লেখকদের উদ্বুদ্ধ করেন উনিশ-বিশ দুই শতকের বাণীর সম্মেলন ঘটাতে আর্য্যাবর্ত-এর পৃষ্ঠায়। দুই ধারা নিয়ে রচিত হয় এক আশ্চর্য সুন্দর 'সিম্ফনি'। মাসিক আর্য্যাবর্ত-এর ঘরানা বঙ্কিমী হলেও ঝঙ্কারে রাবীন্দ্রিক; দলিল সামন্তরাজের কিন্তু ছাড়পত্র তার জাতীয়তাবাদে আর শান্তির মিছিলে। এই পত্রিকা মননে বাঙালি, চলনে বাঙালি, রুচিতে বাঙালি অথচ চরিত্রে ভারতীয়। তাই আর্য্যাবর্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন বাসরে ভারতীয় প্রাণ সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে বিশ্ব সাহিত্য ও সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গনে।

কবি-ঔপন্যাসিক-প্রবন্ধকার-ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রপ্রসাদের সব পরিচয় আজ অনেকটাই বিস্মৃতির অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেলেও সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ প্রবাদে পরিণত এক নাম। আর্য্যাবর্ত-ই তাঁর প্রথম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা। আর্য্যাবর্ত-এর পঞ্চমবর্ষে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ সর্বস্বর্ণের কর্মী তথা সম্পাদক রূপে দৈনিক

বসুমতী পত্রিকায় যোগ দেন। এরপর স্বাভাবিকভাবেই একক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত *আর্য্যাবর্ত*-এর বিলুপ্তি ঘটে বলে অনুমান করা যায়।

মানুষের মনোরঞ্জন সাময়িক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও পরোক্ষ উদ্দেশ্য চিন্তা বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো হেমেন্দ্রপ্রসাদও বিশ্বাস করতেন, সাহিত্যকে লোকশিক্ষার অন্যতম প্রধান বাহন করা উচিত বলে। কেউ বা অবকাশ কাটাবার জন্যে কেউ বা বিশিষ্ট আদর্শ বা শিক্ষালাভের জন্যে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা পড়তে ভালোবাসেন। যারা এমনই সংসাহিত্যের রচয়িতা তাঁরা এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে প্রতিষ্ঠিত *আর্য্যাবর্ত* মাসিক পত্রিকায়।

পরাদীন ভারতে বাঙালিকে তখন এমন বহু অভূতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যাতে বাঙালির গল্প, উপন্যাস বা কথাসাহিত্যও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তারই পাথুরে প্রমাণ বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসের স্বল্পস্থায়ী হলেও *আর্য্যাবর্ত* ও তার সহযোগী *যমুনা* (১৩১৬), *মুম্বায়ী* (১৩১৬), *মানসী* (১৩১৫), *কুশদহ* (১৩১৫), *সুপ্রভাত* (১৩১৪), *আর্যভূমি* (১৩১৫) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি। ১৯০০ থেকে ১৯১৫ সাল বিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভিকাল, বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্য স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় নানা আলোচনা জাতীয়তাবাদী লেখক-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদের *আর্য্যাবর্ত* পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে তৎকালীন ব্রিটিশসরকারের দমননীতির মধ্যেও। এসব কারণে *আর্য্যাবর্ত*-এর ১ম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষের সংখ্যাগুলি বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস রচনায় মূল্যবান উপাদান বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এত সব গুণ সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে *আর্য্যাবর্ত* সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রবিরোধী এক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। ঠিক কী কারণে এই বিরোধ তা আজ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও 'আর্য্যাবর্তগোষ্ঠী'র কারোর স্মৃতি কথায় স্পষ্ট কোন উল্লেখ না পাওয়ায় এখানে এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসতেই পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দেড় দশক পর্যন্ত সংস্কারপন্থী হিন্দুধর্ম, পৌত্তলিকতা-বিরোধী ব্রাহ্মধর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের কু-প্রথা ও কুসংস্কার বর্জিত হিন্দুধর্ম ও সর্বধর্ম সমন্বয়, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিরসে আশ্রিত বৈষ্ণব ধর্ম—এ সমস্তই সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে এক বিবর্তনের ধারা সূচিত করেছিল। তাই এই সময়কার উপরিউল্লিখিত পত্র-পত্রিকায় নানাবিধ প্রবন্ধ, আলোচনা, সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সমকালীন ধর্মীয় ইতিহাসের ধারা অবলম্বন করেছিল। অন্যদিকে এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের রথ যে দুই মনীষী টেনে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের প্রতি সমর্থন, পৌত্তলিকতার প্রতি আনুগত্য ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি কটাক্ষ বিংশশতাব্দীর শুরু থেকেই সাহিত্য জগতে রবীন্দ্র-বিরোধী এক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ স্বাধীন চিন্তা, মননের উদ্যম, গতানুগতিকতার উল্লেখন করে যে বিদ্রোহ—তা বাংলায় এনেছিল এক যুগান্তকারী আলোড়ন। সাহিত্যিক সমাজে তখন একদিকে বঙ্কিমযেঁষা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে রবীন্দ্রানুসারী সমাজের বৈদিক দীক্ষা ও উপনিষদের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির ভাবধারায় পুষ্ট সাহিত্যিক চিন্তাধারার যে বিরোধ—বিংশশতাব্দীর শুরুতে তা' তীব্র আকার ধারণ করে ছিল। এই তথাকথিত পিছিয়ে পড়তে চাওয়া হিন্দু সমাজ ও এগিয়ে চলতে চাওয়া ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ

ঘটিত দ্বন্দ্বই সম্ভবত আর্য্যাবর্ত-এ রবীন্দ্রনাথ সহ রবীন্দ্রগোষ্ঠীর কারোরই রচনা না প্রকাশিত হওয়ার কারণ।

কালক্রমে দুই মনীষীর দ্বন্দ্ব মিটে যায়। কিন্তু তার অনেক আগে আর্য্যাবর্ত পত্রিকা (আশ্বিন, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) বন্ধ হয়ে যায়।

আজীবন রবীন্দ্র প্রতিভার অনুরাগী হলেও ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় ‘প্রণয়ের পরিণাম’ নামে হেমেন্দ্রপ্রসাদের একটি গল্প প্রকাশিত হলে এই গল্পটি নিয়ে সাহিত্যিক সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের যে সব সাহিত্যিক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন, তথা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় কলম ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে রমণীমোহন ঘোষ (১৮৬৪-১৯৩৬), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮) ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রমণীমোহন আষাঢ়, ১৩০৬ প্রদীপ পত্রিকায় ‘চৈতালী সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখলে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় লিখেছিলেন—“এই প্রবন্ধ রচয়িতার প্রতি ভারতী পত্রিকা সম্পাদক যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তবে প্রার্থনা করি পাঠকগণ সেই অহমিকা ক্ষমা করিবেন।” কিন্তু এই প্রবন্ধে বিরুদ্ধ মত এমন মিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে তাতে কারো কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। শ্রীশচন্দ্রমজুমদারও ভাদ্র, ১৩০৬ প্রদীপ পত্রিকায় “প্রতিভা” নামে যে কবিতা লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রশংসাদিক্য থাকলেও হেমেন্দ্রপ্রসাদের প্রতি অতিরিক্ত আক্রমণ ছিল না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রদীপ-এ একটি কবিতা লেখেন। তারনাম ‘একটি কুকুরের প্রতি’, প্রদীপ-এ এই কবিতা মুদ্রিত হবার পর তার উপর একটি কাগজ আঁঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে কৌতুহলী পাঠক সেই কাগজের আবরণ সরিয়ে পায় এক দীর্ঘ কবিতা, যার প্রথম স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করলাম মাত্র, অন্যান্য স্তবকগুলিও এমনিই নিন্দাবাদ পূর্ণ। বাংলা গল্পসাহিত্যের অন্যতম রূপকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনে নিঃসন্দেহে এ’এক কলঙ্কের ইতিহাস হয়ে রইলো।

চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রবাদ
কুকুর চিৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি
আজি এ’কলির শেষে অপরূপ একি
কুকুরের মতি ভ্রম বিষম প্রমাদ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের উল্লেখ করেই এই দুর্ভাগ্য জনক তথা অপ্ৰীতিকর প্রসঙ্গের শেষ করলাম। কারণ দু’পক্ষেরই “অনুরাগীর দল” সাহিত্যের এই বাদানুবাদের মুদ্রিত আকারে যা’ প্রকাশ করেন তার পরিমাণ যেমন বিশাল, তেমনি লজ্জাজনক মনে হয়।

তবে এ’বিবাদ পরে আর থাকেনি, যেমন হেমেন্দ্রপ্রসাদ কবির লোকোত্তর প্রতিভার অনুরাগী হন তেমনি কবিও হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাহিত্যসৃষ্টি, সম্পাদনা-নৈপুণ্য, সাংবাদিক প্রতিভা ও দেশপ্ৰীতির পরিচয় লাভ করে মুগ্ধ হন। তিস্তার তেইশ বছর পরে হলেও হৃদয়তা এতটাই হয়েছিল যে মাসিক বসুমতী-র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিয়মিত লেখক। ১৩৩২, ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বার্ষিক কুন্ডলীর সংখ্যাগুলিও উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র রচনায় সমৃদ্ধ। বলা বাহুল্য, এই-সংখ্যাগুলির সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ।

আর্য্যাবর্ত প্রথম সংখ্যা থেকেই অলঙ্করণ, সাজসজ্জায় প্রচুর রঙিন ও সাবাকালো চিত্রে

সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার মুখোমুখি থাকতো আর্টপেপারে মুদ্রিত বিখ্যাত দেশি-বিদেশি চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্র। লেখায়-রেখায় সবমিলিয়ে সম্পাদনায় সুরুচির প্রকাশ সর্বত্র।

সাহিত্য প্রধান বিবিধ বিষয়ক এই পত্রিকায় যারা লিখেছিলেন সেকালের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউঙ্কার, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, রামপ্রাণ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু, আনন্দনাথ রায়, কেদারনাথ মজুমদার, কালিদাস রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিপিনবিহারী গুপ্ত, অঘোরনাথ বসু, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, রমণীমোহন ঘোষ, বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, শরচ্চন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রনাথ সোম, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরবালা ঘোষ, অক্ষয়কুমার সরকার, অক্ষয়কুমার বড়াল, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, অনুরূপা দেবী, হরিদাস পালিত, রাধাগোবিন্দ কর, অতুলচন্দ্র ঘোষ, সরোজবাসিনী গুপ্তা, রাসবিহারী ঘোষ, মোহম্মদ আসাদ আলী, ননীগোপাল মজুমদার, বিমলাচরণ লাহা, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, নবকৃষ্ণ ঘোষ, জগদীশ গুপ্ত, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মিত্র, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সরোজনাথ ঘোষ, জলধর সেন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, নিরুপমা দেবী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উল্লেখযোগ্য।

আর্য্যাবর্ত পত্রিকা, কালানুক্রমিক সূচি

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৭

- চিত্রকর (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১-৯।
শিখধর্ম (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০-১৯।
নববর্ষ (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৯-২০।
বাজীরাও ও মন্তাসী (বাজী রাওয়ের কলঙ্ক মোচন) (প্রবন্ধ)—সখারাম গণেশ দেউস্কর।
পৃষ্ঠা ২১-৩৩।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৪-৪৩।
চিতোর (ভ্রমণ)—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৪-৪৯।
বঙ্গীয় নদ নদীর জীবন-সংগ্রাম (প্রবন্ধ)—কালীকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ৪৯-৫৩।
সংগ্রহ [সাহিত্য] : গুণ-থৈয়াম/[ভ্রমণবৃত্তান্ত] : রাজপুত্র রাজ্যে/[বিবিধ] : ভারতীয়
অবস্থা ও ব্যবস্থা। পৃষ্ঠা ৫৪-৬১।
সমালোচনা [রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত]। পৃষ্ঠা ৬২-৭০।
প্রভাতে (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭১-৭২।

২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

- নিরুদ্দেশ যাত্রা (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৩-৮৩।
মিলন (কবিতা)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪।
সোনা বিবি (ঐতিহাসিক চিত্র)—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৮৫-৮৯।
পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯০-১০০।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১০১-১১৫।
উষা (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ১১৬।
সমালোচনা [ম্যালেব্রিয়া-শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত] পৃষ্ঠা ১১৭-১২৫।—শশিভূষণ
মুখোপাধ্যায়।
বুদ্ধাঙ্কি [প্রত্নতাত্ত্বিক সংবাদ]—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১২৬-১২৮।
সংগ্রহ : ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য। পৃষ্ঠা ১২৯-১৩১।—লেখকের নাম নেই।
বিবিধ : সিপাহি সীতারাম। পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৭।—লেখকের নাম নেই।
আমেরিকায় হিন্দুধর্ম। পৃষ্ঠা ১৩৮-১৪০।—লেখকের নাম নেই।
খশুগিরি। পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৪।—লেখকের নাম নেই।

৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৭

- বিদূষী (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৪৫-১৫৪।
পাষণের কন্যা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৫৫-১৬৩।
বর্ষা (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৬৩।
সমর বেগম (প্রবন্ধ)—দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৬৪-১৭৫।
কীটনৃত্ত্ব (ইতিহাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৮।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮৭।
প্রজ্ঞা পারমিতা (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ১৮৮-১৯১।
সিদ্ধু-জলে [হায়েন] (অনুবাদ কবিতা)—সম্পাদক [হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ] পৃষ্ঠা ১৯১।
সমালোচনা [রাণী ভবানী—দুর্গাদাস লাহিড়ী]—লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৮।
ব্রজাঙ্গনা (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০।
ভারতীয় অরণ্যানী (প্রবন্ধ)—কালীকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ২০১-২০৪।
সংগ্রহ : ভারতীয় ললিতকলা শিল্প (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা ২০৫-২১১।
বিবিধ : হেষ্টিংসের বন্ধু—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১১-২১৩।
ভারতী (কবিতা)—লালগোপাল মল্লিক। পৃষ্ঠা ২১৩-২১৪।
আসামে আহোম—দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১৪-২১৬।

৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৭

- আর্যাবর্ত [খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী] (প্রবন্ধ)—রামপ্রাণশস্ত্রী। পৃষ্ঠা ২১৭-২২৫।
বিশুদ্ধ জলের অভাব (প্রবন্ধ)—নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ২২৬-২৩১।
সিদ্ধিদাতা গণেশের বয়স (প্রবন্ধ)—সখারাম গণেশ দেউস্কর। পৃষ্ঠা ২৩২-২৪১।
আত্মপ্রকাশ (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ২৪১।
কীটনৃত্ত্ব (ইতিহাস)—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ২৪২-২৪৫।
যেও একবার (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৪৫।
রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বীর (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৮।
উত্তরাধিকারী (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৮।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৬০-২৬৪।
সমালোচনা [ফরিদপুরের ইতিহাস—আনন্দনাথ রায়] পৃষ্ঠা ২৬৫-২৭০।
সংগ্রহ : অন্ধকূপে ইংরাজ রমণী (ইতিহাস)—লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা ২৭১-২৭৬।
বারাণসী (ভ্রমণবৃত্তান্ত)—লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৮।
আত্মা (দর্শন)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৭৮-২৮১।
বিরহে (কবিতা)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৮১-২৮২।
প্রজ্ঞাপারমিতা কি?—বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ। পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৭।
প্রতীক্ষা (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৮৭-২৮৮।

৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১৭

- পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৮৯-২৯৬।
সার্থকতা (কবিতা)—দেবীরানী ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৯৬।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৯৭-৩০৬।
সুখ-শয্যা (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩০৬।
আজমীর (প্রবন্ধ)—শরচ্চন্দ্র মিত্র। পৃষ্ঠা ৩০৭-৩১০।
জিজ্ঞাসা (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১।
আশার সমাধি (গল্প)—ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৩১২-৩২৪।
ঢাকা (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩২৫-৩৩০।
কীটানু-তত্ত্ব (ইতিহাস)—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩৩।
গঙ্গাবক্ষে (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৩৩৩।
বিদায়-চূড়ন (গল্প)—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৮।
সমালোচনা [প্রেম ও প্রকৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম] পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪৪।
সংগ্রহ : কাশ্মীর-এর হ্রদ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৪৬।
বঙ্গে সমাজ সংস্কার (সমাজ তত্ত্ব)—লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা ৩৪৭-৩৫০।
ভারতের ভাবী বিপদ (বিবিধ)—লেখকের নাম নেই। পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫২।
নদীয়া জেলার সিদ্ধযোগী বলরামচন্দ্র (জীবনী)—দীনেন্দ্রকুমার রায়। পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৯।
প্রয়াণ (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৬০।

৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৭

- পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অনুষ্ঠানে পঠিত)—ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬৮।
জ্ঞানালোক (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৬৮।
কুমার রাজার গড় (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭৯।
যমুনা-বক্ষে মধুরায় (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৩৭৯।
বঙ্গলক্ষ্মী (প্রবন্ধ)—যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৮০-৩৮৬।
রামায়ণী সভ্যতা (প্রবন্ধ)—কেদারনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩৮৬-৩৮৯।
নদীয়া জেলার সিদ্ধযোগী বলরাম চন্দ্র (জীবনী)—দীনেন্দ্রকুমার রায়। পৃষ্ঠা ৩৯০-৩৯৫।
নিরবচ্ছিন্নতা (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৩৯৫।
পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৯৬-৪০৪।
শরৎ (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪০৪-৪০৫।
সমালোচনা : ভক্তের জয়—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত। পৃষ্ঠা ৪০৬-৪০৯।
সংগ্রহ [সাহিত্য] : মীরাবাই। পৃষ্ঠা ৪১০-৪১২।
বাণিজ্য : বাণিজ্য শিক্ষা। পৃষ্ঠা ৪১৩-৪১৫। বিবিধ : তাম্বুল। পৃষ্ঠা ৪১৬-৪১৭।
রজনীকান্ত সেন (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪১৭।

গ্রন্থ পরিচয় : নবীনা—দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ৪১৮-৪২১।
 কাশ্মীরে বাঙ্গালী যুবক—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। পৃষ্ঠা ৪২১-৪২২।
 রামদাস গ্রন্থাবলী [১ম ও ২য় খণ্ড]—রামদাস সেন। পৃষ্ঠা ৪২২-৪২৩।
 সৃষ্টি রহস্য—ফুলকুমারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪২৩-৪২৪।
 নূতন (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪২৫-৪২৬।
 মৃত্যু মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪২৭-৪৩২।
 বিচ্ছেদ (কবিতা)—দেবীরাণী ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৩২।

৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩১৭

বেদ কি? (প্রবন্ধ)—চন্দ্রধর কাব্য সাংখ্যতীর্থ। পৃষ্ঠা ৪৩৩-৪৩৯।
 শোভন (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৪৩৯।
 পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৪৪০-৪৫০। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে
 পঠিত অভিভাষণ-শেষাংশ)
 প্রণয় (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৫১।
 বৈজ্ঞানিকের পরিচয় (প্রবন্ধ)—সম্পাদক [হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ]। পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৫।
 অকারণে (কবিতা)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৫৫।
 ইচ্ছামৃত্যু (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৫৬-৪৬৪।
 কবি রজনীকান্ত (প্রবন্ধ)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৭৫।
 প্রবাহ (কবিতা)—বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪৭৫।
 মৃত্যুমিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৭৬-৪৮৫।
 সমালোচনা : শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা-বিনয় সরকার প্রণীত। পৃষ্ঠা ৪৮৬-৪৯১।
 সংগ্রহ [সাহিত্য] বার্ষিক। পৃষ্ঠা ৪৯২-৪৯৪। শিল্প বিদ্যালয়। পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০৪।
 বিবিধ : খাইবার পাস-এ পাঠান। পৃষ্ঠা ৪৯৭-৪৯৯। মশক। পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০৪।

৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭

বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা (প্রবন্ধ)—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পৃষ্ঠা ৫০৫-৫২৫।
 নর্তকীর কুপ (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫২৬-৫২৮।
 রামায়ণী সভ্যতা (প্রবন্ধ)—কেদারনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৫২৯-৫৩৪।
 তুমি (কবিতা)—উপেন্দ্রনাথ দত্ত। পৃষ্ঠা ৫৩৪।
 পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৩৫-৫৪২।
 মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৪৩-৫৫২।
 সমালোচনা : বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধংসোন্মুখ?। পৃষ্ঠা ৫৫৩-৫৫৬।
 রূপ (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৫৬।
 সংগ্রহ [সাহিত্য] কুমারী ঔপন্যাসিক। পৃষ্ঠা ৫৫৭-৫৫৮।
 [ইতিহাস] চার্লকের হিন্দু পত্নী। পৃষ্ঠা ৫৫৯-৫৬০।

[বিবিধ] আমাদের সীমান্ত প্রদেশ। পৃষ্ঠা ৫৬০-৫৬২।
 নারী-হৃদয় (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৫৬২।
 পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫৬৩-৫৭০।
 গ্রন্থ পরিচয় : রাজা রামকৃষ্ণ—দুর্গাদাস লাগিড়ী প্রণীত। পৃষ্ঠা ৫৭১-৫৭৩।
 মূর্তি পূজা—হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ৫৭৩
 ঢাকার বিবরণ—কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। পৃষ্ঠা ৫৭৪।
 স্মৃতি-সাথী—দীননাথ দত্ত প্রণীত। পৃষ্ঠা ৫৭৫।
 কবিতা ও কবিপ্রিয়া (কবিতা)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৭৫-৫৭৬।

৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৭

পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫৭৭-৫৮৩।
 জন্ম ও মৃত্যু (কবিতা)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৫৮৩।
 অধ্যাপক রবার্ট ক (জীবনী)—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৫৮৪-৫৯০।
 হরিদ্বার (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৫৯০।
 মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৯১-৬০০।
 যুঅন-চুয়ং বা হিউয়েন-সিয়ং (প্রবন্ধ)—অজরচন্দ্র সরকার। পৃষ্ঠা ৬০১-৬১২।
 আক্ষেপ (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৬১২।
 মক্ষিকা (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬১৩-৬১৭।
 কৃতজ্ঞতার বিনিময় (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬১৮-৬২৫।
 বেদ কি? (প্রবন্ধ)—চন্দ্রধর ভট্টাচার্য, কাব্য সাংখ্যতীর্থ। পৃষ্ঠা ৬২৬-৬৩৩।
 পূর্বস্মৃতি (কবিতা)—অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৬৩৩।
 সমালোচনা : খাদ্য—ডাঃ চুনিলাল বসু। পৃষ্ঠা ৬৩৪-৬৩৭।
 সংগ্রহ [সাহিত্য] ফরাসী উপন্যাস। পৃষ্ঠা ৬৩৮-৬৪২।
 [ইতিহাস] বারীচ। পৃষ্ঠা ৬৪২-৬৪৩।
 আশীর্বাদ (কবিতা)—বিনয়কুমারী ধর। পৃষ্ঠা ৬৪৩।
 বরকুমার ব্রত (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৬৪৪-৬৪৬।
 অবহেলন (কবিতা)—হরিপদ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৬৪৬।
 গ্রন্থপরিচয় : সারস্বত কুঞ্জ—কেদারনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৬৪৭।
 : মরণ-রহস্য—নিখিলনাথ রায়। পৃষ্ঠা ৬৪৭-৬৪৮।

১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩১৭

প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে পুনরালোচনা (প্রবন্ধ)—নগেন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৬৪৯-৬৫৯।
 পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৬৬০-৬৬৪।
 বিচিত্র পিতৃকুলানুরাগ (প্রবন্ধ)—অঘোরনাথ বসু, কবিশেখর। পৃষ্ঠা ৬৬৫-৬৬৮।
 বিকাশ (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৬৮।

হীরক (প্রবন্ধ)—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৬৯-৬৭৭।
অভিলাষার্থ-চিন্তামণি (প্রবন্ধ)—সখারাম গনেশ দেউকর। পৃষ্ঠা ৬৭৮-৬৮২।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৮৩-৬৯২।
পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৯৩-৭০১।
অস্তিমে (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭০১।
বর্তমান বঙ্গসাহিত্য (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭০২-৭০৮।
সমালোচনা [সাহিত্য] : ছড়া ও গল্প—ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭০৯-৭১২।
সন্ধ্যা (কবিতা)—লাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ৭১২।
সংগ্রহ [সাহিত্য] : উপন্যাসের ভবিষ্যৎ। পৃষ্ঠা ৭১৩-৭১৪
বিবিধ : সংক্রামক কলেরা। পৃষ্ঠা ৭১৫-৭১৮।
পুরাতন (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭১৯-৭২০।

১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১৭

পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৭২১-৭২৯।
কৃষিতত্ত্বের আলোচনা (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৩০-৭৩৭।
ওমরের পথে (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৩৭।
মুহূর্তের ভুল (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৪৪।
ব্যর্থ প্রভাত (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৪৪।
বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য (প্রবন্ধ)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৪৫-৭৪৯।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৫০-৭৬০
আগ্রার পথে (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৭৬০।
ভাষা-বৈচিত্র্য (প্রবন্ধ)—বিনয়কুমার সরকার। পৃষ্ঠা ৭৬১-৭৬৮।
গয়া (ভ্রমণ)—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৬৯-৭৭৪।
অনন্ত সত্য (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৭৪।
সমালোচনা : শঙ্খ (কাব্যগ্রন্থ)—অক্ষয়কুমার বড়াল। পৃষ্ঠা ৭৭৫-৭৭৮।
সংগ্রহ [সাহিত্য] : নাটকের নীতিশিক্ষা। পৃষ্ঠা ৭৭৯-৭৮০।
[বিজ্ঞান] : হিন্দু রসায়ন। পৃষ্ঠা ৭৮০-৭৮৩। মুষিক ও প্লেগ। পৃষ্ঠা ৭৮৩-৭৮৫।
পুরাতনী : ডাক (জীবনী)—দেবনারায়ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৮৬-৭৮৮।
সংযোজন : ডাকের কথা—দীনেশচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ৭৮৮।
কুনালের পিতৃভক্তি [ঐতিহাসিক কাহিনী]—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৭৮৯-৭৯২।
পুরাতন প্রসঙ্গের কথা (আলোচনা)—অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৯২।

১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৭

পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৭৯৩-৭৯৮।
কৃষিতত্ত্বের আলোচনা—অজরচন্দ্র সরকার। পৃষ্ঠা ৭৯৯-৮০৭।

- ব্যর্থ সন্ধ্যা (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮০৭।
পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮০৮-৮১৭।
আলোকে আঁধারে (কবিতা)—হরিপদ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৮১৭।
মৃত্যু মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮১৮-৮২৭।
মাঘ মণ্ডল (ব্রত-পার্বণ)—নরেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৮২৭-৮৩২।
করমেতি বাই (জীবনী)—অঘোরনাথ বসু, কবিশেখর। পৃষ্ঠা ৮৩২-৮৩৯।
সহনুভূতি (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৮৩৯।
পূর্বস্মৃতি (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৪০-৮৪৪।
প্রতিধ্বনি (কবিতা)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮৪৪।
মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ প্রথা (প্রবন্ধ)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৪৫-৮৪৮।
সমালোচনা : বাজে কথা—সুশীলাসুন্দরী দাসী। পৃষ্ঠা ৮৪৯-৮৫২।
সংগ্রহ : পৃষ্ঠা ৮৫৩-৮৫৪

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৮

- বৈশাখ (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১।
পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ২-১০।
হৃদয়ের ব্যবহার (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ১০।
প্রাচীন ভারতের কথা (প্রবন্ধ)—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। পৃষ্ঠা ১১-১৮।
গতি (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৮।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৯-২৮।
ক্ষুদ্র (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৮।
প্রাচীন ভারতে আর্য ও অনার্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল : অযোধ্যা-কিষ্কিন্ধ্যা-লঙ্কা—কেদারনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ২৯-৩৬।
হাসি ও অশ্রু (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩৬।
ময়মনসিংহ সন্মিলনী (ইতিহাস)—বিনোদবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৭-৪৮।
অশোক-চরিত [মহাবংশ ও দীপবংশ অবলম্বনে] (প্রবন্ধ)—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পৃষ্ঠা ৪৯-৫৭।
কোথায়? (জার্মান কবি হায়েনের কবিতা অবলম্বনে)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা-৫৭।
কাচের চুড়ি (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৮-৬৯।
বর্ষ বিদায় (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৯।
সমালোচনা : সনাতনী—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৭০-৭৩।
সংগ্রহ [ইতিহাস] ফরাসী চিত্রে মীরকাশিম। পৃষ্ঠা ৭৩-৭৭।
বিবিধ : পৃথিবীর উদ্দেশ্য ... মানব জাতি—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৭৮-৮০।

২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

- পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৮১-৯২।
ওমরের পথে (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯২।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯৩-১০২।
য়ুরোপ ভ্রমণ (ভ্রমণ)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ১০৩-১০৯।
সন্ধ্যা ও কুসুম (কবিতা)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ১০৯।
সমুদ্র বক্ষে (গী. দে. মোর্গাসার গল্পের অনুবাদ)—গুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ১১০-১১৭।
কায়া ও ছায়া (প্রবন্ধ)—যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১৮-১২৩।
প্রাচীন ভারতে আর্য ও অনার্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল (প্রবন্ধ)—কেদারনাথ মজুমদার।
পৃষ্ঠা ১২৪-১২৮।
তদাত (কবিতা)—ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী। পৃষ্ঠা ১২৮।
অশোকের রাজকার্য ও শাসন পদ্ধতি (প্রবন্ধ)—অজরচন্দ্র সরকার। পৃষ্ঠা ১২৯-১৩৫।
মিলনের মৃত্যু (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩৬-১৪২।
মৃত্যু (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৪২।
গ্রন্থ সমালোচনা [বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার]। পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৮।
কাতরা (সংস্কৃত হইতে অনুবাদ কবিতা)—সুরবালা ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৪৮।
সংগ্রহ [সাহিত্য] ডিকেশের স্ত্রী চরিত্র (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১৪৯-
১৫০।

সমাজসংস্কারক ডিকেশ (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১৫১।
স্বপ্ন (জার্মান হইতে) (অনুগল্প)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১৫২।

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৮

- পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৫৩-১৬৪।
বিরহিণী (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৬৪।
টলেমি (প্রবন্ধ)—রামপ্রাণ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৬৫-১৭৩।
বিহুলা (সংস্কৃত হইতে কবিতায় অনুবাদ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১৭৩।
মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৭৪-১৮৩।
কায়া ও ছায়া (প্রবন্ধ)—যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৮৪-১৯০।
গুণের পরাজয় (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৯০।
পিতৃভক্তির পুরস্কার (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৬।
সত্যপ্রকাশ (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৯৬।
ধর্ম ও বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৯৭-২০৩।
নাকে খৎ (নাটক)—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২০৪-২২০।
সংগ্রহ (বিজ্ঞান) অসবর্ণ বিবাহে স্পেসার (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ২২১-২২৪।
মানবের ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ২২৪-২২৬।

বর্ষা-গীতি (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ২২৭।

গ্রন্থসমালোচনা : সাধুচরিত (রামভনু লাহিড়ীর জীবনী)—অতুলচন্দ্র ঘটক।

পৃষ্ঠা ২২৮-২৩২।

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩১৮

দুঃখ (প্রবন্ধ)—ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ২৩৩-২৪৮।

মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫৮।

বিভাগ (সংস্কৃত হইতে)—সুরবালা ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৫৮।

অশোকের রাজকার্য্য ও শাসন-পদ্ধতি (প্রবন্ধ)—অজরচন্দ্র সরকার। পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬৫।

প্রশ্ন (মূরের অনুকরণে) (কবিতা)—মানিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পৃষ্ঠা ২৬৫।

য়ুরোপ-ভ্রমণ (ভ্রমণকাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ২৬৬-২৭১।

কবি (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—সুরবালা ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৭১।

এই কি চিকিৎসা (গল্প)—অমর। পৃষ্ঠা ২৭২-২৮১।

বঙ্কিমপ্রসঙ্গ (বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী হইতে)—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৩।

ত্রীক্ষেত্র (ইতিহাস)—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৮৪-২৯২।

গ্রন্থ সমালোচনা : ব্যবহারিক কৃষি দর্পণ—হেমচন্দ্র দেব। পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৮।

ঋতু বর্ণন (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০১।

সংগ্রহ (শিল্প) : ইয়োরোপে ও ভারতে শিল্পকলা (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা ৩০১-৩০৪।

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩১৮

দ্রবময়ী চণ্ডালিনী (প্রবন্ধ)—অক্ষয়কুমার সরকার। পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৭।

পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩০৮-৩১৬।

মৃত্যু-মিলন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩১৭-৩২৬।

পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩২৭-৩৩৩।

য়ুরোপ ভ্রমণ : প্যারিস—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৯।

ভ্রান্ত (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৩৯।

ভণ্ড (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৫১।

রামায়ণ ও মহাভারত (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৫২-৩৬৩।

রাজা মটুক রায় (ইতিহাস)—জগৎ প্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৬৮।

গ্রন্থ সমালোচনা : যুধিকা (কাব্য)—আমোদিনী ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০।

সংগ্রহ (সাহিত্য) : থ্যাকারে (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৩৭১-৩৭২।

(ইতিহাস) : ডাইস সম্বার (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৫।

সুন্দরী (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৭৬।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩১৮

- পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৮৭।
কবি কঙ্কণের যুগের সমাজ (প্রবন্ধ)—যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৮৮-৩৯৭।
সংশয় (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৯৭।
মৃন্ময় (যশোহর মহম্মদপুর অঞ্চলের ইতিহাস)— যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।
পৃষ্ঠা ৩৯৮-৪০৪।
সমুদ্রবক্ষে (গী দে মোপঁসা) (গল্প)—অনুবাদ গুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ৪০৫-৪১০।
বিপ্লবীক (কবিতা)—অক্ষয়কুমার বড়াল। পৃষ্ঠা ৪১১।
সরযুবালা (গল্প)—সুশীলা সুন্দরী দাসী। পৃষ্ঠা ৪১২-৪২৪।
সন্ধ্যায় (কবিতা)—যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪২৪।
স্মৃতি-বিভ্রম (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪২৫-৪২৭।
সরস্বতী (কবিতা)—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৪২৭।
বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বকোষ (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪২৮-৪৩৬।
মৃত্যু-জয় (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৩৭-৪৩৮।
চিত্র-পরিচয় [সরস্বতী-শিল্পী ভবাণীচরণ লাহা]-সম্পাদক। পৃষ্ঠা ৪৩৮।
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ)—অরুণেন্দ্রপ্রকাশ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪৪০।
গৌফের মূল্য (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৪৭।
শারদীয়া জ্যোৎস্না (কবিতা)—নরেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৪৪৭।
যুরোপ ভ্রমণ (ভ্রমণকাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৫৩।
সৌন্দর্য্য (স্কট) (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৫৩।
গৃহাগত (গল্প)—দীনেন্দ্রকুমার রায়। পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৬৪।
দেবদূতের প্রতি অরিস্টনেমি (যোগবান্ধিষ্ট রামায়ণ অবলম্বনে)—অনুরূপা দেবী।
পৃষ্ঠা ৪৬৪।
যাক্সের নিরুত্তর (প্রবন্ধ)—জম্বীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৭৮।
সংগ্রহ (সমাজতত্ত্ব) : সামাজিক সমৃদ্ধি (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৪৭৯-৪৮২।

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩১৮

- মালদহে পাল নগরী রামাবতী (ইতিহাস)—হরিদাস পালিত। পৃষ্ঠা ৪৯৪।
মদনভস্মের ফল (রাজশেখর) (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৪৯৪।
অচলায়তন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমালোচনা)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ৪৯৫-৪৯৯।
রামায়ণ ও মহাভারত (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫০০-৫১১।
যুরোপ-ভ্রমণ (ইংলণ্ড)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৯।
তীর্থযাত্রা (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫২০-৫৩০।
পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫৩১-৫৪১।

- শোক (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৫৪১।
 ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ)—অরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৪২-৫৪৩।
 পাষাণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৪৪-৫৫১।
 রাধেশচন্দ্র শেঠ (সচিত্র প্রবন্ধ)—সম্পাদক। পৃষ্ঠা ৫৫১।
 সংগ্রহ (ইতিহাস) দিল্লী। পৃষ্ঠা ৫৫২।
 বিবিধ : প্রাসাদ-প্রসাধিকা (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৫৫৩-৫৫৪।

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

- মালদহের পাল নগরাদি (ইতিহাস)—হরিদাস পালিত। পৃষ্ঠা ৫৫৫-৫৬১।
 চুড়ামণিযোগ (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৬২-৫৬৯।
 বিদেহরাজ জনক (ইতিহাস)—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৫৭০-৫৭৪।
 লঙ্কাতুরা (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—সুরবালা ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৭৪।
 রাজা মটুক রায় (ইতিহাস)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৫৭৫-৫৭৯।
 ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ [সম্রাট আকবরের রত্নভাণ্ডার] (প্রবন্ধ)—কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।
 পৃষ্ঠা ৫৮০-৫৮২।
 প্রিয়স্মৃতি (শেলী হইতে) (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৫৮২।
 পুরাণকথা (প্রবন্ধ)—বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ। পৃষ্ঠা ৫৮৩-৫৮৮।
 অদৃষ্টচক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৮৯-৫৯৭।
 কাল (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৯৭।
 জাতিভেদে বিবাহের পদ্ধতিভেদ (প্রবন্ধ)—অঘোরনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৫৯৮-৬০৬।
 বুলবুলের প্রতি (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৬০৬।
 ভগিনী নিবেদিতা (প্রবন্ধ)—রাধাগোবিন্দ কর। পৃষ্ঠা ৬০৭-৬০৮।
 বিদেশী গল্প : অভিনয় (ইংরাজি হইতে)—অতুলচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬০৯-৬১৪।
 বীর ও গুণী (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬১৪।
 গ্রন্থ সমালোচনা [ফোয়ারা-ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পৃষ্ঠা ৬১৫-
 ৬২৭।
 [অচলায়তন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] অক্ষয়কুমার সরকারের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
 পৃষ্ঠা ৬২৮-৬৩২।
 গঙ্গার প্রতি হিমালয় (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৩৩-৬৩৪।
 সংগ্রহ [বিবিধ] : প্রাচীন গ্রীসের ধর্মমত (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা ৬৩৫-৬৩৮।

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩১৮

- অল্‌বেরুনীর ভারত ভ্রমণ (ইতিহাস)—গিরিজামোহন সান্যাল। পৃষ্ঠা ৬৩৯-৬৪৬।
 বাঁশী-চোর (গল্প)—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৬৪৭-৬৫৪।
 কবি (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৫৪-৬৫৫।

রামায়ণ ও মহাভারত (প্রবন্ধ)—শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৫৬-৬৬০।
প্রতিভা (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৬৬০।
অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৬১-৬৭১।
উন্মীলা (কবিতা)—সরোজবাসিনী গুপ্তা। পৃষ্ঠা ৬৭১।
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ)—অরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৭২-৬৭৫।
অজ্ঞাত (Browning এর অনুকরণে)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। (কবিতা)। পৃষ্ঠা ৬৭৫।
ম্লিনের ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)—হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৬৭৬-৬৭৯।
পাষাণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৮০-৬৮৭।
নবীন-প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—গিরিজনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৮৮-৬৯১।
নিরবচ্ছিন্নতা (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৯১।
আয়ুর্বেদের ইতিহাস (প্রবন্ধ)—ব্রজবল্লভ রায়। পৃষ্ঠা ৬৯২-৬৯৮।
য়ুরোপ ভ্রমণ : ইংলণ্ড (ভ্রমণ কাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৬৯৯-৭০৭।
পুরস্কার (হায়েন) (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭০৭।
গ্রন্থ সমালোচনা [গোধূলি (কাব্য)]—ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী—রমণীমোহন ঘোষ।
পৃষ্ঠা ৭০৮-৭১৪।
বিদায় (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭১৫-৭১৬।
সংগ্রহ (ইতিহাস) দিল্লী। পৃষ্ঠা ৭১৭-৭১৮।

২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাস, ১৩১৮

বারাণসী (ভ্রমণ কাহিনী)—দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭১৯-৭৩০।
আলোক (ইংরাজি হইতে) (কবিতা)—যতীশচন্দ্র বসু। পৃষ্ঠা ৭৩০।
মালদহের পশ্চিকথা : রামাবতী ও গৌড় (ইতিহাস)—হরিদাস পালিত।
পৃষ্ঠা ৭৩১-৭৪১।
বৃথা নহে (ইংরাজি হইতে) (কবিতা)—অতুলচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৪১।
লালফুল (গল্প)—সুশীলাসুন্দরী দাসী। পৃষ্ঠা ৭৪২-৭৫২।
দীন রাজ্যেশ্বর (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৫২।
রাজা মটুক রায় (ইতিহাস)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৭৫৩-৭৫৭।
বীণাপাণির উদ্বোধন (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৭৫৭-৭৫৮।
অদৃষ্টচক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৫৯-৭৬৮।
য়ুরোপ-ভ্রমণ : স্টিয়াট ফোর্ড-অন-এডন (ভ্রমণ কাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু।
পৃষ্ঠা ৭৬৯-৭৭৮।
আফ্রিকায় ইসলাম ধর্ম (প্রবন্ধ)—মোহাম্মদ আসাদ আলী। পৃষ্ঠা ৭৭৯-৭৮০।
গ্রন্থ সমালোচনা : প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
পৃষ্ঠা ৭৮১-৭৮৩।
দিল্লী (ইতিহাস)—শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৮৪-৭৮৮।
সংগ্রহ (বিবিধ) : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। পৃষ্ঠা ৭৮৯-৭৯০।

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩১৮

- বজ্রেশ্বর [ভ্রমণকাহিনী]—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৭৯১-৮০০।
 বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তার (প্রবন্ধ)—রাসবিহারী ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮০১-৮০৬।
 বসন্তের উপহার (কবিতা)—সরোজবাসিনী গুপ্তা। পৃষ্ঠা ৮০৬।
 চন্দ্রদ্বীপ (ইতিহাস)—হেমসুন্দর বসু। পৃষ্ঠা ৮০৭-৮১৬।
 ব্যর্থ বসন্ত (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮১৬।
 অদৃষ্ট চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮১৭-৮২৪।
 বেলভেড়িয়ার (ইতিহাস)—দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮২৫-৮২৯।
 রামায়ণী সভ্যতা (সাহিত্য) (প্রবন্ধ)—কেদারনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৮৩০-৮৩৬।
 সংযম (সংস্কৃত হইতে কবিতায় অনুবাদ)—অঘোরনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৮৩৬।
 আয়ুর্ষেদের ইতিহাস (ব্রাহ্মণ যুগ)—ব্রজবল্লভ রায়, কাব্যকণ্ঠ বিশারদ। পৃষ্ঠা ৮৩৭-৮৪০।
 'পিক্‌নিক্' (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৮৪১-৮৪৬।
 কালী পোদ্দার (জীবনী)—অশ্বিনীকুমার সেন। পৃষ্ঠা ৮৪৭-৮৪৮।
 গ্রন্থ সমালোচনা [সঙ্গীতচন্দ্রিকা—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়]—জানকীনাথ গুপ্ত
 পৃষ্ঠা ৮৪৯-৮৫৪।
 যুরোপ ভ্রমণ : ব্রসেলস্ (ভ্রমণ কাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৮৫৫-৮৬০।
 সংগ্রহ : তাজমহল (ইতিহাস)। পৃষ্ঠা ৮৬১-৮৬২।

২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩১৮

- শৈল-স্মৃতি (ভ্রমণ কাহিনী)—ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৮৬৩-৮৭০।
 কবি ও কাব্য (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৭০।
 মালদহের পল্লী-কথা (ইতিহাস)—হরিদাস পালিত। পৃষ্ঠা ৮৭১-৮৭৯।
 দারিদ্র্য (সংস্কৃত হইতে অনূদিত কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নাই। পৃষ্ঠা ৮৭৯।
 সনাতনী (প্রবন্ধ)—তারকচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ৮৮০-৮৮৮।
 ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য (প্রবন্ধ)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৮৯-৮৯৫।
 রাজামটুক রায় (জীবনী)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৮৯৬-৯০১।
 বর্ষচক্র (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯০১-৯০২।
 উন্মাদিনী (কবিতা)—হেমাসিনী ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯০৩।
 রামায়ণী সভ্যতা (সাহিত্য) (প্রবন্ধ)—কেদারনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৯০৪-৯০৯।
 যুরোপ ভ্রমণ : হাইডেলবার্গ (ভ্রমণকাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৯১০-৯১৮।
 নর ও নারী (কবিতা)—জীবানন্দ মল্লিক। পৃষ্ঠা ৯১৮।
 সংগ্রহ (বিবিধ) : পরিবর্তনশীল পৃষ্ঠা (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৯১৯-৯২৩।
 প্রত্যাবর্তন (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯২৪-৯৩৬।

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩১৯

- Positivism বা ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১-৩।
মদনের বিবাহ (স্কট কর্তৃক অনুদিত ফরাসী হইতে) (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ৩।
পাষণের কথা (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪-১১।
ধর্ম (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—অঘোরনাথ বসু, কবিশেখর। পৃষ্ঠা ১১।
য়ুরোপ ভ্রমণ : লুসার্ণ (ভ্রমণকাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ১২-১৯।
অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২০-২৯।
জীবন ও মৃত্যু (কবিতা)—লাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ২৯।
ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার (প্রবন্ধ)—নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৩০-৩৭।
পুরাণ কথা : সূর্য্যবংশে মনুর ধারাস্তরদ্বয় ও তৎসংক্রান্ত কতিপয় কাহিনী—বিনোদবিহারী
বিদ্যাবিনোদ। পৃষ্ঠা ৩৮-৪১।
ঈশার পুনরাবির্ভাব (বালজ্যাক) (গল্প)—গুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ৪২-৫১।
মির্জা নগরের ঋৎসাবশেষ (ইতিহাস)—ননীগোপাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ৫১-৫৬।
অঞ্জলি (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৭।
নবীন-প্রসঙ্গ (নবীনচন্দ্র সেনের রচনা প্রসঙ্গ) (প্রবন্ধ)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।
পৃষ্ঠা ৫৮-৬১।
ব্যর্থ প্রেম (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬।
সংগ্রহ (সমাজতত্ত্ব) নর ও নারী (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৭৬-৭৯।
(শিল্প) তাজমহলের স্থপতি (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৭৯-৮০।

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

- বৌদ্ধ উপাখ্যান (প্রবন্ধ)—চারুচন্দ্র বসু। পৃষ্ঠা ৮১-৮৫।
বিদ্যা (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—অঘোরনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৮৫।
Positivism বা ধ্রুব দর্শন প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৮৬-৮৯।
কবি ও শিল্পী (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৯।
'অচলায়তনের' আলোচনা (অচলায়তন ও জীবন স্মৃতি) (প্রবন্ধ)—মনোরঞ্জন
গুহঠাকুরতা। পৃষ্ঠা ৯০-৯২।
পরিষদের প্রতি নিবেদন (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃষ্ঠা ৯৩-১০১।
বন্ধু (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১০২-১১১।
আলোক (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১১।
প্রবাদ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—বিমলাচরণ লাহা। পৃষ্ঠা ১১২-১১৪।
রামায়ণ ও মহাভারত (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১৫-১২০।
অবসান (কবিতা)—চঞ্চলকুমারী দেবী। পৃষ্ঠা ১২০।

- মনসামঙ্গল (প্রবন্ধ)—দীনেশচন্দ্র সেন। পৃষ্ঠা ১২১-১২৫।
 ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১২৬-১৩২।
 অপরাধ (কবিতা)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৩৩।
 মরুভূমে (বালজ্যাক) (গল্প)—গুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ১৩৪-১৪০।
 অদৃষ্ট চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৫।
 সংগ্রহ (বিবিধ) চরিত্র (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১৪৫-১৫০।
 কোথা যাও হে তপন? (রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী পর্যটন-যাত্রার উপলক্ষ্যে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছে)—দেবেন্দ্রনাথ সেন। পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২।

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩১৯

- পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৫৩-১৬০।
 কামনা (কবিতা)—সরোজবাসিনী গুপ্তা। পৃষ্ঠা ১৬০।
 পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৯।
 ক্ষণিক সুখ (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৫।
 গ্রহণ ও বর্জন (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৭৫।
 জীবন বৈচিত্র (প্রবন্ধ)—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৭৬-১৮৩।
 ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার (প্রবন্ধ)—নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৮৪-১৯২।
 যুরোপ ভ্রমণ : মিলান (ভ্রমণ কাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ১৯৩-২০৩।
 সমুদ্র (কবিতা)—সুরবালা ঘোষ। পৃষ্ঠা ২০৩।
 মরুভূমে (বালজ্যাক) (গল্প)—গুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ২০৪-২১১।
 ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১২-২১৯।
 প্রণয়ে (কবিতা)—সুরবালা ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১৯।
 অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২২০-২২৪।
 গ্রন্থ সমালোচনা : অশোক—চারুচন্দ্র বসু। পৃষ্ঠা ২২৪-২২৭।
 সংগ্রহ (সাহিত্য) : সমসাময়িক চিত্র—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ২২৭-২৩২।
 সময় (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—অতুলচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৩২।

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩১৯

- ভারতীয় শিল্প (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৯।
 Positivism বা ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৪০-২৪৫।
 প্রত্যাবর্তন (গল্প)—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ২৪৬-২৬২।
 সাধুনা (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ২৬২।
 ভাষাতত্ত্ব (প্রবন্ধ)—অমূল্যচরণ ঘোষ, বিদ্যাভূষণ। পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৫।
 সুকিয়াবিবি ও সুকিয়া স্ট্রীট (ইতিহাস)—বিমলাচরণ লাহা। পৃষ্ঠা ২৬৬-২৬৮।
 ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭৩।

ঐতিহাসিক যথাক্রমে : ভারতে চীন অভিযান (ইতিহাস)—পঞ্চানন বিশ্বাস।

পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৬।

ক্রোধ (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—অঘোরনাথ বসু, কবিশেখর। পৃষ্ঠা ২৭৬।

অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৭৭-২৮০।

অনুরোধ (কবিতা)—লাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ২৮০।

মানব-প্রহেলিকা : জড় ও জীব (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৯।

যুরোপভ্রমণ : ফ্লরেন্স (ভ্রমণকাহিনী)—নরেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ২৯০-২৯৯।

রক্তা (কবিতা)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৩০০। [চিকিৎসা কূলে রক্তানগরী দর্শনে]

সংগ্রহ (বিজ্ঞান) মশক-নাশ (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৩০১-৩০৪।

গ্রন্থ সমালোচনা : অর্থনীতি—যোগীন্দ্রনাথ সমাদার। পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬।

৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩১৯

কুটদন্তের উপাখ্যান বা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের পূর্বভাস (প্রবন্ধ)—চারুচন্দ্র বসু।

পৃষ্ঠা ৩০৭-৩১৩।

গৌরী (গল্প)—সুশীলাসুন্দরী দাসী। পৃষ্ঠা ৩১৪-৩২৪।

নিকটে ও দূরে (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৩২৪।

আলিবাঈ—বেগম (প্রবন্ধ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৯।

মেঘের আর্তনাদ (কবিতা)—সুব্রত চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ৩২৯।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩৯।

বিদায় (কবিতা)—লাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ৩৩৯।

জীবন-সংগ্রামে সহায় (প্রবন্ধ)—উমাপতি বাজপেয়ী। পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪৩।

পাষণের কথা (উপন্যাস)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৫১।

মুগ্ধ (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৫১।

মানব প্রহেলিকা (বৈজ্ঞানিক রহস্য)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৫২-৩৫৮।

Positivism বা ধ্রুবদর্শন-প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৬২।

গোবসন্ত (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৬।

অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৩৬৭-৩৭২।

সমুদ্র-তাণ্ডব (কবিতা)—যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৭২।

সংগ্রহ (বিবিধ) আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৬।

বরণ (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৩৭৬।

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩১৯

মদন মহল (ইতিহাস)—কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৮২।

কবিতা (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৮৩-৩৮৪।

মহেশপুরের সূর্যরাজা (ইতিহাস)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৩৮৫-৩৮৯।

- মন্দারে মধুসূদন (ভ্রমণ)—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৯০-৩৯৫।
 কবি-হৃদয় (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৯৫।
 ঋণ পরিশোধ (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৯৬-৪১২।
 দ্বৈতপ্রীতি (কবিতা)—গিরিজাকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৪১২।
 অদৃষ্টচক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪১৩-৪২৩।
 সন্ধ্যা (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৪২৩।
 জীবনের নবজীবন লাভ (গল্প)—অঘোরনাথ বসু কবিশেখর। পৃষ্ঠা ৪২৪-৪২৯।
 বিসম্বৰ্জন (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৩০-৪৩৮।
 দস্যুর পুরস্কার (নাট্যগল্প)—কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু। পৃষ্ঠা ৪৩৯-৪৪৯।
 সংগ্রহ (বিবিধ) : কর্মফল (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫৫। ৪৫৬-Blank Page।

৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩১৯

- বুদ্ধগয়া (ইতিহাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৫৭-৪৬৪।
 সমাজনীতি : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (প্রবন্ধ)—মণীন্দ্রমোহন বসু। পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৭০।
 বিদায় (কবিতা)—লাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ৪৭০।
 কর্ণেল স্কিনার (জীবনী)—দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৭১-৪৮১।
 মধুপুর জঙ্গল ও ব্রহ্মপুত্র নদ (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রকুমার বসু। পৃষ্ঠা ৪৮২-৪৮৫।
 কাশী (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৮৫।
 অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৮৬-৪৯৪।
 নীরব কবি (কবিতা)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪৯৪।
 ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৯৫-৫০০।
 কবি (কবিতা)—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫০০।
 কৃষ্ণচন্দ্র রায় (জীবন কথা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৬।
 কবি (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫০৬।
 রাক্ষসী না দেবী? (গল্প)—দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়। পৃষ্ঠা ৫০৭-৫১৪।
 মানব-প্রহেলিকা : জড়বাদ ও আত্মবাদ (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
 পৃষ্ঠা ৫১৫-৫২৩।
 সংগ্রহ (ইতিহাস) : প্রাচীন কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৫২৪-৫২৫।
 গোবসন্ত (প্রবন্ধ)—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৫২৬-৫২৮।

৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

- পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫২৯-৫৩৬।
 বুদ্ধগয়া (ইতিহাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৩৭-৫৪৫।
 সনাতন ধর্ম (সংস্কৃত হইতে অনূদিত) (কবিতা)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৪৫।
 সখারাম গণেশ দেউস্কর (জীবনী)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৪৬-৫৫২।

- যবন হরিদাস (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩।
 অদৃষ্টচক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৫৪-৫৬৩।
 ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৬৪-৫৭০।
 ভারতের প্রথম নীলকর (প্রবন্ধ)—অশ্বিনীকুমার সেন। পৃষ্ঠা ৫৭১-৫৭২।
 চিররুদ্ধা (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৫৭২।
 গ্রন্থ সমালোচনা : এষা—অক্ষয়কুমার বড়াল। পৃষ্ঠা ৫৭৩-৫৭৮।
 মাথার খুলি (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৭৯-৫৯২।
 সংগ্রহ (বিবিধ) : হেষ্টিংস হাউস (ইতিহাস)। পৃষ্ঠা ৫৯২-৫৯৬। রাধা (কবিতা)—হোম।
 পৃষ্ঠা ৫৯৬।

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩১৯

- রাধা (কবিতা)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৯৭-৬০০।
 বুদ্ধগয়া (ইতিহাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬০০-৬০৬।
 উপাসনা (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬০৭-৬১০।
 জীবন-বৈচিত্র্য (প্রবন্ধ)—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬১১-৬১৯।
 কবিতা (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬১৯।
 রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব (জীবনী)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬২০-৬২৭।
 কামনা (কবিতা)—সরোজবাসিনী গুপ্তা। পৃষ্ঠা ৬২৭।
 মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (জীবনী)—ব্যোমকেশ মুস্তফী। পৃষ্ঠা ৬২৮-৬৩৩।
 সাহিত্যিক (গল্প)—হেমদাকান্ত চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬৩৪-৬৪০।
 বিরহে (কবিতা)—সুরবালা ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৪০।
 অদৃষ্ট চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৪১-৬৪৫।
 বিরহিনী (কবিতা)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৪৫।
 জিন্নতুন্নিসা বেগম (প্রবন্ধ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৪৬-৬৪৯।
 গ্রন্থ সমালোচনা [নীলাশ্বরী—ঋগেন্দ্রনাথ মিত্র]—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
 পৃষ্ঠা ৬৫০-৬৫৭।
 কবিতার রূপ (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৫৭।
 যৌবনাবসান (কবিতা)—গিরিজানাত মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৫৮।
 ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৫৯-৬৬৫।
 সংগ্রহ (বিবিধ) : বুদ্ধের জন্মস্থান (ইতিহাস)। পৃষ্ঠা ৬৬৬-৬৬৭।
 সে গেছে চলিয়া (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৬৮।

৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩১৯

- রামটেক (ভ্রমণ কাহিনী)—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৬৯-৬৭৬।
 আহান (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৭৬।

চন্দ্রমণ্ডল (প্রবন্ধ)—উমাপতি বাজপেয়ী। পৃষ্ঠা ৬৭৭-৬৮০।
সবজী : বেগুন (প্রবন্ধ)—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৬৮১-৬৮৭।
অদৃষ্টচক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৮৮-৬৯৭।
মানব-প্রহেলিকা (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৯৮-৭০৫।
আরতির শেষ (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৭০৬-৭২১।
চিনের ভারত আক্রমণ (প্রবন্ধ)—তারানাথ রায়। পৃষ্ঠা ৭২২-৭২৫।
চিত্র (কবিতা)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৭২৬।
সংগ্রহ : ধূমপান (প্রবন্ধ)। পৃষ্ঠা ৭২৭-৭২৯।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৩০-৭৩৯।

৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩১৯

মেঘদূতের সমস্যা-পূরণ (প্রবন্ধ)—হরিহর ভট্টচার্য। পৃষ্ঠা ৭৪১-৭৫০।
বন্দি প্রেমের স্বপ্নভঙ্গ (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৫০।
অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৫১-৭৫৯।
রামটেক (ভ্রমণ কাহিনী)—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৬০-৭৬৫।
রক্ষা-কবচ (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৭৬৬-৭৭৫।
মহেশপুরের সূর্যরাজা (প্রতিবাদ প্রবন্ধ)—সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস। পৃষ্ঠা ৭৭৫-৭৭৭।
যশোহরের পত্র (ইতিহাস)—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। পৃষ্ঠা ৭৭৭-৭৮২।
উপহার (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৮২।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৮৩-৭৮৮।
নলডাঙ্গার প্রাচীন কীর্তি (ইতিহাস)—ননীগোপাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ৭৮৮-৭৯২।
সংগ্রহ (বিবিধ) : দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি সাহিত্য সম্বন্ধীয় গল্প—শ্যামলাল গোস্বামী।
পৃষ্ঠা ৭৯৩-৭৯৬।
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (জীবনী)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৭৯৭-৮০০।
বৈদিক সমাজ (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৮০১-৮০৭।
বিজ্ঞান ও হিন্দুব্যবস্থা (প্রবন্ধ)—রমেশচন্দ্র রায়। পৃষ্ঠা ৮০৮-৮১১।

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩১৯

অলবেরশীর ভারত-বিবরণ (ইতিহাস)—গিরিজামোহন সান্যাল। পৃষ্ঠা ৮১৩-৮১৮।
চন্দ্রবংশ (বিষ্ণু পুরাণ ৪র্থার্ণব ৫-১৫ অধ্যায়)—বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।
পৃষ্ঠা ৮১৯-৮২৬।
অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮২৬-৮৩৫।
রাধারানী (গল্প)—তারাদাস চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৩৬-৮৪৩।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮৪৪-৮৪৯।
গ্রন্থ-পরিচয় : নির্বাসন-কাহিনী—মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। পৃষ্ঠা ৮৪৯-৮৫০।

- নারী ধর্ম—গিরিজাসুন্দর চক্রবর্তী। পৃষ্ঠা ৮৫১-৮৫২।
আর্য্য নারীর গৃহধর্ম—নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৫২-৮৫৩।
আফগান আমীর চরিত—আবুনাসের সহিদুল্লা। পৃষ্ঠা ৮৫৩-৮৫৪।
সংগ্রহ (ইতিহাস) : ঝাঙ্গীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ + পৃষ্ঠা ৮৫৫-৮৫৯।
মেলা (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৬০।

৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২০

- আবাহন (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ১।
সারনাথের অশোক-লিপি (প্রবন্ধ)—বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ২-৫।
কলঙ্ক-মুক্তি (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫-৯।
দুঃখের প্রতি (কবিতা)—ভৃঙ্গদ্বন্দ্বের রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৯।
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (জীবনী)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১০-১৪।
প্রার্থনা (কবিতা)—জগদীশচন্দ্র গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৪।
সমালোচনা : ঢাকার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—যতীন্দ্রমোহন রায়। পৃষ্ঠা ১৫-২২।
বেদাদি গ্রন্থে সূর্য (প্রবন্ধ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৩-৩১।
তুমি ও আমি (কবিতা)—সরোজবাসিনী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩১।
অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩২-৪১।
সংগ্রহ [প্রত্নতত্ত্ব] : পাটনার পুরাবস্তু (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই।
পৃষ্ঠা ৪২-৪৬।
ভূস্বর্গে-কয়েকটি দিন (দীর্ঘ কবিতা)—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৪৬-৫১।
পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫২-৬২।
সাহিত্য-সম্মিলন (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৩-৭৩।
দেব-প্রসাদ (প্রাচীন গল্প)—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৪-৭৭।
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ (গল্প)—দিগিন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৭৭-৮০।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

- শিব বাড়ির বুদ্ধ মূর্তি (প্রবন্ধ)—সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃষ্ঠা ৮১-৮৯।
শিববাড়ি (ইতিহাস)—সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃষ্ঠা ৯০-৯৫।
অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯৬-১০৬।
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (জীবনী)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১০৭-১১২।
তুমি ও আমি (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১১২।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (জীবন ও সাহিত্য আলোচনা)—[হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ]। পৃষ্ঠা ১১৩-
১২২।
পুরাতন প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১২৩-১২৮।
সারনাথের অশোক-লিপি (প্রবন্ধ)—বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১২৯-১৩৫।

- লছমী (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৩৫-১৪৪।
 সমালোচনা : মানবের জন্মভূমি—উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পৃষ্ঠা ১৪৪-১৫০।
 নিশীথে (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৫০।
 দান-প্রতিদান (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ সেন। পৃষ্ঠা ১৫১-১৫৭।
 মিলন (গল্প)—দিগন্তনাথ মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯।
 নিদাঘে (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬০।
 সংগ্রহ [বিবিধ]—ফেরীর আমলে ভারত (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৫ টিথোনাস্ (টেনিসনের কবিতা অবলম্বনে লিখিত)—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।
 পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৮।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২০

- পদ্মী রক্ষা (প্রবন্ধ)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭৬।
 প্রিয়দর্শনে (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৭৬।
 দিম্বর লৌহ-স্তম্ভ (প্রবন্ধ)—কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮১।
 প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ (জীবনী)—দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৯।
 কামনা (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ১৮৯।
 কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (জীবনী)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৯০-১৯৪।
 অচঞ্চল (সিলভেস্তারের কবিতা অবলম্বনে)—মাণিক ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৯৪।
 অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৯৫-২০৪।
 Positivism বা ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ২০৪-২১১।
 কৃপণ (গল্প)—সরোজনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১২-২২২।
 পূর্বসংস্কার (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২২২।
 সমালোচনা [গ্রন্থ] সাধনা-বিনয়কুমার সরকার—শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২২৩-২৩৪।
 প্রায়শ্চিত্ত [গল্প]—শৈলেশনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৩৪-২৪৪।
 অতীত (কবিতা)—লাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫।
 সবজী : ট্যাঙ্ক (কৃষিকথা)—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ২৪৫-২৪৮।
 সংগ্রহ [ইতিহাস] ২৪ পরগণায় ইংরাজাধিকার (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই।
 পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫৩।
 প্রতাপাদিত্যের গৃহ দেবতা (প্রবন্ধ)—অশ্বিনীকুমার সেন। পৃষ্ঠা ২৫৩-২৫৬।

৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২০

- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [জীবনী]—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৫৭-২৬৫।
 স্মৃতি [গল্প]—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৬৬-২৭৫।
 মুমুকু (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৭৫।

- অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৭১-২৮০।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৯।
অনিন্দ্যা (গল্প)—সম্পাদক। পৃষ্ঠা ২৯০-২৯৯।
সমালোচনা (গ্রন্থ : উত্তরাঞ্চল পরিভ্রম—শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত)। পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০৫।
জীবন-সংক্রান্তি (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩০৬।
মিলন (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩০৭-৩২২।
ডালি (কবিতা)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩২৩।
সংগ্রহ (বিবিধ) : প্রাচীন ভারতে মাংস-ভক্ষণ—চিকিৎসক। পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৮।
বুরহান শা'র দরগা (ইতিহাস)—ননীগোপাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩৩।
অধিকার (গল্প)—মণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৪৪।

৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২০

- পণ্ডিত বৃন্দ মিশ্রের উপাখ্যান (সেক শুভোদয়া অবলম্বনে)—কৃষ্ণচরণ সরকার ও হরিদাস পালিত। পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৪৮।
স্মরণ (কবিতা)—মাণিক ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৩৪৮।
বসন্তে (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৪৯-৩৫৫।
আনন্দ বিদায় (দ্বিজেন্দ্রস্মৃতি) (প্রবন্ধ)—জলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৬২।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৭০।
হাসি (ইংরাজি হইতে অনূদিত)—নরেশচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৭০।
অদৃষ্ট-চক্র (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৭১-৩৭৪।
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (জীবনী)—দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৮০।
মিত্রতা (কবিতা)—অঘোরনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৩৮০।
নবীনচন্দ্রের কাব্যে কৃষ্ণচরিত্র (প্রবন্ধ)—সরোজবাসিনী গুপ্তা। পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮৭।
প্রার্থনা (কবিতা)—সুকেশী দেবী। পৃষ্ঠা ৩৮৭।
অনিন্দ্যা (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৮৮-৩৯৮।
শিশুর প্রতি (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৩৯৯।
সমালোচনা [বাল্মীকির বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। পৃষ্ঠা ৪০০-৪০৩।
অবিচার (কবিতা)—অতুলচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪০৩।
সবজী : রাস্তা-আলু [সচিত্র]—দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। পৃষ্ঠা ৪০৪-৪০৬।
দিল্লীর লাড্ডু (গল্প)—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪০৭-৪১৩।
রাম ও সীতা : শয়ন মন্দিরে (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৪১৩।
লালা কীর্তিনারায়ণ (প্রবন্ধ)—যতীন্দ্রমোহন রায়। পৃষ্ঠা ৪১৪-৪১৭।
সংগ্রহ [বিবিধ] আকবরের শিল্পানুরাগ (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪১৮-৪২১।
নারী ও কবি (কবিতা)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৪২১।

- সে দেশ (কবিতা)—মণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪২২।
 উড়িয়া (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪২৩—৪৩০।
 কবির গান (টেনিসন)—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৩১।
 কল্পনা (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৩২।

৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২০

- শারদলক্ষ্মী (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৪৩৩—৪৩৪।
 শক্তি-সাধনা : স্বাধেদ (প্রবন্ধ)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৩৫—৪৪৩।
 মানস-প্রতিমা (সাদী) (কবিতা)—নরেশচন্দ্র ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৪৩।
 স্বাধীনতার মূল্য : আলকোল ডেডে (গল্প)—মানিক ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৪৪৪—৪৫০।
 শীলতা (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—অঘোরনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৪৫০।
 সৎমা (গল্প)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৫১—৪৬৪।
 মনস্কামনা (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৬৪।
 পুষ্পনায়িকা (টেনিসন)—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৬৫—৪৭১।
 রঘু পাগুলা (গল্প)—জলধর সেন। পৃষ্ঠা ৪৭২—৪৮১।
 প্রেমের স্বরূপ (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪৮১।
 পান্নানেপাল (ভ্রমণ)—শরৎচন্দ্র মিত্র। পৃষ্ঠা ৪৮২—৪৮৮।
 পরিণাম (গল্প)—তারাদাস চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪৮৯—৪৯৯।
 প্রেম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪৯৯।
 পটেশ্বরী (ভ্রমণ)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৫০০—৫০৭।
 অভিমান (কবিতা)—মানিকচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৫০৮—৫০৯।
 ধার করা শাল (গল্প)—গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত মূল ইংরাজি হইতে বাংলায় অনুবাদ :
 মনমথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫১০—৫১৬।
 সুবর্ণরেখা নদী (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৫১৬।
 নিমন্ত্রণ-রক্ষা (গল্প)—সরোজনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫১৭—৫২৭।
 নীলা (গল্প)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৫২৮—৫৩৭।
 মৃত্যু-মিলন (কবিতা)—লাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ৫৩৭।
 অনিন্দ্যা (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৩৮—৫৫৮।
 গ্রন্থ সমালোচনা : অনুপ্রাস—জলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৫৯—৫৬০।

৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩২০

- পল্লী রক্ষা (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৫৬১—৫৬৯।
 ভ্রম (কবিতা)—নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৬৯।
 মৃত্যু আহুন (গল্প)—হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৭০—৫৭৯।
 জ্যোৎস্না-মাধুরী (কবিতা)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ৫৭৯।

- কবি বিহারীলাল (জীবনী)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৫৮০-৫৮৭।
উর্কশীর প্রতি পুরুষবা (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৫৮৭।
নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র (প্রবন্ধ)—সরোজবাসিনী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫৮৮-৫৯৬।
সঙ্গীত মাহাত্ম্য ও সঙ্গীত আলোচনার উপকারিতা (প্রবন্ধ)—নেপালচন্দ্র রায়।
পৃষ্ঠা ৫৯৭-৬০১।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬০১-৬০৬।
শ্যাম-বিরহে (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত হয়নি। পৃষ্ঠা ৬০৬-৬০৮।
সনেট পঞ্চাশৎ : প্রমথ চৌধুরী।—সমালোচনা। পৃষ্ঠা ৬০৯-৬১১।
কোজাগর পূর্ণিমা (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬১১।
গ্রন্থ-সমালোচনা : বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ জমীদার—সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
পৃষ্ঠা ৬১২-৬১৯।
স্বাগত (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৬১৯।
হরিদ্বার হইতে লক্ষণঝোলা (ভ্রমণ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৬২০-৬২৬।
প্রজাপতির নির্বন্ধ (গল্প)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৬২৬-৬৪০।
সংগ্রহ (ইতিহাস) : রাজা সীতারাম রায়—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই।
পৃষ্ঠা ৬৪১-৬৪৫।
অনঙ্গমঞ্জরী (কবিতা) (টেনিসনের অবলম্বনে)—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৪৬-৬৪৮।

৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২০

- কর্ণের দান (কবিতা)—মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৬৪৯-৬৫১।
দ্বিজেন্দ্রলাল (জীবনী)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৫২-৬৬০।
তুমি ও আমি (ইংরাজী কবিতার ভাব অবলম্বনে) (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার।
পৃষ্ঠা ৬৬০।
কবি বিহারীলাল (জীবনী)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৬১-৬৬৪।
স্নেহের বন্ধন (গল্প)—তারাদাস চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৬৫-৬৭৫।
হরিদ্বার হইতে লক্ষণঝোলা (ভ্রমণ)—জলিতমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৭৬-৬৮১।
সুজন ও দুর্জ্ঞান (সংস্কৃত হইতে) (কবিতা)—অমরনাথ বসু। পৃষ্ঠা ৬৮১।
বিষ্ণুদাস হাজরা (জীবনী)—ননীগোপাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ৬৮২-৬৮৬।
হৃদয়ের মূল্য (গল্প)—হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৮৭-৬৯৫।
সংসর্গে (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬৯৫।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৬৯৬-৭০১।
তন্ময় (কবিতা)—জীবেন্দ্র কুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ৭০১।
কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭০২-৭০৮।
হতাশা ও আশা (কবিতা)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৭০৮।
পুরাতনের পুনরাবর্তন (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭০৯-৭২২।
সিদ্ধাশ্রম-পথে (কবিতা)—শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ। পৃষ্ঠা ৭২৩-৭২৪।

সংগ্রহ (বিবিধ) : ভারতীয় মিউজিয়মের ইতিবৃত্ত (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই।

পৃষ্ঠা ৭২৫-৭৩১।

গ্রন্থ সমালোচনা (সমসাময়িক ভারত—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার)। পৃষ্ঠা ৭৩২-৭৩৬।

৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২০

লক্ষ্মী মা (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৭৩৭।

প্রত্যাৰ্পণ (গল্প)—নিরুপমা দেবী। পৃষ্ঠা ৭৩৮-৭৫৮।

ভিতর ও বাহির (কবিতা)—সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৫৮।

বান্ধা সাহিত্যে য-ফলা (প্রবন্ধ)—ব্যোমকেশ মুস্তফী। পৃষ্ঠা ৭৫৯-৭৬৪।

প্রেম-বিকাশ (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৭৬৪।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৭৬৫-৭৬৯।

বান্ধালার বিস্তার (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৭৭০-৭৭৩।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৭৪-৭৭৮।

বাসনা (কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরাজি কবিতা হইতে) (কবিতা)—অতুলচন্দ্র ঘোষ।

পৃষ্ঠা ৭৭৮-৭৭৯।

সঙ্গত মাহাত্ম্য ও সঙ্গীত আলোচনার উপকারিতা (প্রবন্ধ)—নেপালচন্দ্র রায়।

পৃষ্ঠা ৭৮০-৭৮২।

সংগ্রহ (বিবিধ) : ইংরাজ সমাজে দৈরথ যুদ্ধ (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই।

পৃষ্ঠা ৭৮৩-৭৮৫।

স্মৃতি (কবিতা)—মাণিক ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৭৮৬।

সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্ (গল্প)—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯৩।

ক্ষুদ্র কবিতার জন্য কবির কৈফিয়ত (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৭৯৩।

কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৯৪-৮০৬।

প্রাচীন ভারতে অর্থনীতি (প্রবন্ধ)—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। পৃষ্ঠা ৮০৭-৮১৪।

আত্মা (হুইটম্যানের কবিতা অবলম্বনে) (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮১৪।

গ্রন্থ সমালোচনা (সাগর সঙ্গীত—চিন্তরঞ্জন দাশ) পৃষ্ঠা ৮১৫-৮২৩।

জন্মভূমি (কবিতা)—সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ৮২৪।

৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩২০

চিরমিলন (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৮২৫-৮২৬।

ময়নাগড় (ইতিহাস)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৮২৭-৮৩১।

চিরসাধী (কবিতা)—সাবণ্যময়ী বসু। পৃষ্ঠা ৮৩১।

প্রত্যাৰ্পণ (গল্প)—নিরুপমা দেবী। পৃষ্ঠা ৮৩২-৮৫১।

পূজা-শেষে (কবিতা)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ৮৫১।

গয়া ভ্রমণ (ভ্রমণকাহিনী)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৫২-৮৬২।

১৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

পাপ (লঙ্কফেলো হইতে) (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৬২।
ব্যাধি ও তাহার প্রতিবেশ (টাইফয়েড জ্বর ও কলেরা) (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
পৃষ্ঠা ৮৬৩—৮৭০।
কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৮৭১—৮৮০।
প্রতিদান (গল্প)—হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৮১—৮৯২।
গান শেষ (লঙ্কফেলো হইতে) (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৯২।
গ্রন্থ সমালোচনা (গৈরিক)—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৮৯৩—৮৯৭।
সংগ্রহ (বিবিধ) প্রাচীন প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা ৮৯৮—৯০৩।
মাতৃ-স্নেহ (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯০৩।
পুরাতন-প্রসঙ্গ (স্মৃতিকথা)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৯০৪—৯১০।
কালো বঁধু (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৯১১—৯১২।

৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩২০

বসন্ত (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৯১৩।
গয়া ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯১৪—৯২৪।
কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯২৫—৯৩৪।
ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৯৩৫—৯৪৬।
রাধারাণী (গল্প)—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৪৭—৯৫৪।
ব্যাধি ও তাহার প্রতিবেশ (প্লেগ বা মহামারী) (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
পৃষ্ঠা ৯৫৫—৯৬৩।
সংগ্রহ (বিবিধ) : প্রাচীন পাটলীপুত্র (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই।
পৃষ্ঠা ৯৬৪—৯৬৮।
গ্রন্থ সমালোচনা [অন্নপূর্ণার মন্দির—নিরুপমা দেবী] পৃষ্ঠা ৯৬৯—৯৭৭।
ব্রতকথা ও নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম (প্রবন্ধ)—কনকলতা গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৯৭৮—৯৮০।
ক্ষমা (গল্প)—মণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৮১—৯৮৮।
সত্য (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ৯৮৮।
বিষ্ণুপুর (ইতিহাস)—প্রমথনাথ রায়। পৃষ্ঠা ৯৮৯—৯৯৫।
বর-পণ (প্রবন্ধ)—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৯৯৫—১০০০।

৪র্থ বর্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩২০

ঋতুরাণী (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ১০০১।
গয়াভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০০২—১০১৫।
আবার বিবাহ (গল্প)—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০১৬—১০২২।
পাপ (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০২২।
বর-পণ (প্রবন্ধ)—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১০২৩—১০৩৯।

বাস্তালার বিস্তার (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১০৪০-১০৪৭।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিশোধ (যক্ষা বা ক্ষয়কাশ)—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

পৃষ্ঠা ১০৪৮-১০৫৬।

শরৎকুমার লাহিড়ী (জীবনী)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১০৫৭-১০৬৩।

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩২১

বর্ষবরণ সঙ্গীত (ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ) (গান)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ১।

একান্নবর্তী-পরিবার (প্রবন্ধ)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২-২০।

আশীর্বাদ (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ২০।

হাতসর্কস্বা (গল্প)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ২১-৩০।

অধ্বেষণ (কবিতা)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। পৃষ্ঠা ৩০।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ)—অরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

নীরব প্রেম (কবিতা)—জ্ঞানাজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩২।

নাস্তিকের ধর্মানুষ্ঠান (বালজাক থেকে) (গল্প)—গুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ৩৩-৩৮।

অশ্রু (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৯-৪৮।

বর্ষ আবর্তন (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৯।

প্রতিশোধ (গল্প)—অমলেন্দু গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৫০-৫৬।

পদচিহ্ন (কবিতা)—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৫৬।

গ্রন্থ সমালোচনা (মাল্য ও নির্মাল্য—আলো ও ছায়া প্রণেতা প্রণাত)। পৃষ্ঠা ৫৭-৬৬।

আগ্নাদূর্গ (কবিতা)—জগৎপ্রসন্ন রায়। পৃষ্ঠা ৬৬।

সংগ্রহ (বিবিধ) : ভারতকথা—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৬৭-৭৪।

কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৫-৮৬।

আবার আসিবে কবে? (কবিতা)—নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮।

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩২১

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ১৭৭।

মধুসূদন দত্ত (স্মরণ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৯।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সনেট)—নবকৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৭৯।

অশ্রু (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ১৮০-১৮৮।

সখা (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯০।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ : ডিপথিরিয়া (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৬।

মুক্তদ্বার (কবিতা)—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ১৯৬।

মুসলমান কবির বাঙ্গালা রচনা (প্রবন্ধ)—আবদুল করিম। পৃষ্ঠা ১৯৭-২০৫।

নাস্তিকের ধর্মানুষ্ঠান (বালজাক থেকে)—গুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯।

ফুলঝুরি (গল্প)—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১০-২৩০।

কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৭।
সংগ্রহ (বিবিধ) জেব-উম্মিসা (ইতিহাস)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই।

পৃষ্ঠা ২৩৮-২৪০।

সৌন্দর্য ও কবি (কবিতা)—যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৪০।
হরিদাস ঠাকুরের পাটি (প্রবন্ধ)—ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৪১-২৪৬।
প্রতিশোধ (গল্প)—অমলেন্দু গুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৪৭-২৫৭।
বঙ্গভাষা (কবিতা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৫৮।
গ্রন্থ সমালোচনা [গোপালন—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র] পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬৩।
হৃদয় দেবতা (কবিতা)—নরেন্দ্রনাথ সেন। পৃষ্ঠা ২৬৪।

৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩২১

প্যারীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৮।
নব-বরষায় (কবিতা)—কালিদাস রায়। পৃষ্ঠা-২৬৮-২৬৯।
অশ্রু (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৭০-২৭৮।
ত্যাগের জয় (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮০।
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ (প্রবন্ধ)—অরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৩।
দাশরথি রায় (জীবনী)—রমানাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৮৪-২৮৯।
কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ২৯০-২৯৭।
প্রকৃতি ও কবি (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার।
প্রতিশোধ (উপন্যাস)—অমলেন্দু গুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০৫।
কন্যা (গল্প)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৩০৬-৩১২।
নাস্তিকের ধর্মানুষ্ঠান (বালজাক হইতে)—শুরুদাস সরকার। পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৬।
বিনাশক (ইংরাজি কবিতা অবলম্বনে) (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩১৬।
গ্রন্থ সমালোচনা [পর্ণপুট—কালিদাস রায়]। মহিতোষকুমার রায়চৌধুরী।

পৃষ্ঠা ৩১৭-৩২৮।

বনসুন্দরী (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৩২৮।
বারিবিদ্যুর কথা (গল্প)—জানকীনাথ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩৯।
সংগ্রহ : রাবণের লক্ষা (প্রবন্ধ)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৪৪।
ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ : টিটেনাস্-খনুস্টকার। পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৫২।

৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩২১

মহারাত্রী (ইতিহাস)—রামপ্রাণ গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৬২।
ভিখারী (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৩।
অশ্রু (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৬৪-৩৭৩।
বৈপরীত্যে (কবিতা)—বিভূতিভূষণ মজুমদার। পৃষ্ঠা ৩৭৩।

- পাশী (প্রবন্ধ)—আশুতোষ তরফদার। পৃষ্ঠা ৩৭৪-৩৮০।
 বাণীচরণে (কবিতা)—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৮০।
 মণিহার (গল্প)—সুশীলাসুন্দরী দাসী। পৃষ্ঠা ৩৮১-৩৮৯।
 উৎকৃষ্টিতা (কবিতা)—জ্ঞানাজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৮৯।
 কিশোরীচাঁদ মিত্র (জীবনী)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৩৯০-৩৯৯।
 সনেট (কবিতা)—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃষ্ঠা ৩৯৯।
 শেষ পাঠ (ইতিহাস)—অমলেন্দু গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪০০-৪০৬।
 ব্যর্থ প্রেম (কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪০৬-৪০৭।
 গ্রন্থ সমালোচনা [উর্শ্চিকা (গীতি কবিতা)—রমণীমোহন ঘোষ] পৃষ্ঠা ৪০৮-৪১৬।—
 শরচ্চন্দ্র ঘোষাল।
 প্রতিশোধ (উপন্যাস)—অমলেন্দু গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪১৭-৪২৩।
 দাশরথি রায় (জীবনী)—রমানাথ মুখোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ৪২৪-৪৩০।
 কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ (জীবনী)—আনন্দনাথ রায়। পৃষ্ঠা ৪৩১-৪৩৭।
 পাপিয়া-স্তুতি [কীটস অবলম্বনে] (কবিতা)—বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৩৮-৪৪০।

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩২১

- আবাহন (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪৪১।
 অশ্রু (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। পৃষ্ঠা ৪৪২-৪৫০।
 জীবনারতি (গল্প)—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪৫১-৪৭৭।
 অদৃষ্টের উপহাস (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪৭৮-৪৮২।
 শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত (জীবনী)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪৮৪-৪৮৯।
 প্রতিশোধ (উপন্যাস)—অমলেন্দু গুপ্ত। পৃষ্ঠা ৪৯০-৪৯৮।
 এস (কবিতা)—লেখকের নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০০।
 গ্রন্থ-সমালোচনা [Indian Myth and Legend-by Donald Mc, London এর
 বঙ্গানুবাদ ভারতীয় গল্প কথা]। পৃষ্ঠা ৫০১।
 সংগ্রহ (শিল্পকলা) : কাশ্মীরের শিল্প। পৃষ্ঠা ৫০২-৫০৪।
 স্ত্রীর প্রকৃত পত্র [মৃণালিনী দেবী]—লেখিকার নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৫০৫-৫১৯।
 তুলনা (কবিতা)—বিশ্বপতি চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৫১৯।
 সেকালের শিক্ষা (প্রবন্ধ)—লেখক নাম মুদ্রিত নেই। পৃষ্ঠা ৫২০-৫৩১।
 ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ : হাম ও বসন্ত (প্রবন্ধ)—সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
 পৃষ্ঠা ৫৩২-৫৩৬।

সমকালে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর

সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেকালের কথা : ক) জনস্বাস্থ্য সমস্যা

উনিশ শতকের শেষভাগ। বৃটিশ শাসনাধীন বাংলার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল শোচনীয়।

বৃটিশ আসার আগে পরিস্থিতি ছিল ভিন্নরূপ। কোনো ভারী শিল্প গড়ে ওঠার ব্যাপার না থাকায় সমাজে হঠাৎ করে কোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিত না। স্বাভাবিকভাবে স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল জনগণের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সমস্যা সহজেই আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, ইউনানী এবং টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করা যেত। যদিও কখনও কখনও মহামারী বা বিভিন্ন আঞ্চলিক রোগে অনেক লোক মারা যেত। কিন্তু এমন ঘটনা খুব কমই ঘটত, ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উপর জনগণের পূর্ণ আস্থা ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় শুরু হয় ব্যাপক শিল্পায়ন। শিল্পাঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে জনবসতি বাড়তে থাকে। বহু রেল লাইন, সড়ক জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ফলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঘটে ভীষণ অবনতি। ইতিমধ্যে সরকার কেবল মিলিটারিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে কলারার প্রকোপ কমাতে সক্ষম হলেও গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বরের প্রকোপ কমাতে সক্ষম হয়নি।

জলবায়ু ও পরিবেশগত কারণে বাংলা হয়ে ওঠে কলেরা, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতির মড়ক সৃষ্টিকারী রোগের লীলাক্ষেত্র।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা *আয়ুর্বিজ্ঞান* পত্রিকা জানায় ১৮৭১-৮১ সালের মধ্যে বাংলায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। এর মধ্যে মেদিনীপুর এবং বর্ধমানে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে পঁচাশি হাজার এবং দেড় লক্ষ।

১৮১৭-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কলেরা মহামারীতে বহু ইউরোপীয় এবং ভারতীয় প্রজা (১/১০ ভাগ গোরা সৈন্য এবং ১৮ মিলিয়ন ভারতীয়) মারা যায়। ১৮৯০-১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ম্যালেরিয়া মহামারি ২০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটায়।

খ) চিকিৎসকের একান্ত অভাব, সরকারি উদাসীনতা এবং জাতীয় নবজাগরণ

এই দুঃসহ জনস্বাস্থ্য পরিবেশের পাশাপাশি ছিল চিকিৎসকের নিতান্তই অপ্রতুলতা। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত ক্যাম্পবেল ব্রাউনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়।—তখন প্রতি দুহাজার জন পিছু একজনও



মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার ছিল না।

অতএব উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার গ্রামীণ মানুষকে দেশীয় অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসকের উপরই নির্ভর করতে হত।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা *সাধারণী*-তে প্রকাশিত একটি পত্রে বলা হয়, আনাড়ি চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান আর ইচ্ছাপূর্বক মৃত্যু ঘটান এ দুই-ই সমান। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের লোকে এটা বোঝে না। আবার অনেকে বুঝিয়াও কেহ অসঙ্গতি প্রযুক্ত, কেহ বা আবশ্যকমত সূচিকিৎসক না পাওয়ায় অগত্যা সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ সেই পাপাত্মাদিগের হস্তে জীবন সর্বস্ব প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যিনিই দুইটা রঙের বড়ি পাকাইয়া চাদরের খুটে বাঁধিয়া বাহির হইলেন, তিনিই কবিরাজ। যিনিই একখানা সাইন বোর্ড ঝুলাইয়া দুটো শিশি বোতল সাজাইয়া, জমকাইয়া বসিলেন, তিনিই ডাক্তার। পূর্বে যেমন কেহ লেখাপড়া না শিখিলে এবং জীবিকা নির্বাহের অন্য উপায় না থাকিলে, পাঠশালার শুকমহাশয় হইত, আজকাল যিনি ইংরেজির দু'পাতা উন্টাইয়া, স্কুল ছাড়িয়া, কাজকর্মের সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিলেন, তিনিই ডাক্তার হইলেন। কবিরাজ দিগের মধ্যে অনেকের বিদ্যাও আবার এদের অপেক্ষাও কিছু অধিক, মা সরস্বতীর সহিত তাঁহাদিগের চিরবিবাদ, কখন দেখা সাক্ষাৎও নাই। তাঁহাদের কাহার পিতা পিতামহ, কাহার মাতা মাতামহ, কাহার শশুর সম্বন্ধী, কাহার কোন কুলের কে চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা সেই স্বহৃদে স্বহৃদবান হইয়া, সেই দোহাই দিয়া কবিরাজ হইয়া বসিয়াছেন। এইরূপ সব ডাক্তার কবিরাজ। বিশেষতঃ ডাক্তার আজকাল গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। বাংলা জুড়ে তখন চলছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের প্রভাব। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর তমসা কাটিয়ে, কুসংস্কারের মোহ নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠছে জাতি।

রেনেসাঁসের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে সর্ববিষয়ে কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা। আর একটা মানবজীবনকে সর্বপ্রকারে ভরিয়ে নেওয়া ও বিকশিত করা।

আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপের রেনেসাঁসের মতোই মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ, ইউরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত অনুবর্তন। আমাদের প্রেরণার উৎস প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে *সংবাদ* ডাক্তার জানায় মেডিক্যাল কলেজ চালু হবার পর প্রথম দিকে বাংলার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলি বিনা দ্বিধায় তাদের ছেলেদের এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাতে চাননি, তবে শীঘ্রই পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের চমৎকারিত্ব এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের যত্নের দিকটি বিবেচনা করে তাঁদের মতের পরিবর্তন ঘটে। এগিয়ে এলেন কলিকাতার বিস্তৃশালী সম্প্রদায়। মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় সকল ছাত্রদের পুরস্কৃত করে এবং যোগ্য ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে তাঁরা জাতীয় কর্তব্য পালন করলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একাই প্রতি বছর তিনজন ছাত্রের বিলেতে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করতেন।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের জন্য রানি স্বর্ণময়ী দেবী কলকাতায় একটি আবাসিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন।

ক্রমে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভীষণ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই প্রভূত জনপ্রিয়তার কারণগুলি হল :

- ১ কলকাতা তথা বাংলার পরিবেশ ও জলবায়ু।
- ২ বাংলার মড়ক সৃষ্টিকারী রোগব্যাদি।
- ৩ বিভিন্ন ধরনের মহামারী রোধে দেশীয় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যর্থতা।
- ৪ ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিশেষত সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা।
- ৫ পাশ্চাত্যপন্থী তৎপরতা ও চিকিৎসা জগতের নিত্য নতুন আবিষ্কার।
- ৬ উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রভাব।

কলকাতায় তখন একটিমাত্র মেডিক্যাল কলেজ এবং কয়েকটি মেডিক্যাল স্কুল। এদের পক্ষে তখনকার বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মিলিত রাজ্যের ৮০ মিলিয়ন জনগণের চাহিদা পূরণ ছিল নিতান্তই অসম্ভব। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার এই আগ্রহ এতটাই ছিল যে বহু যুবক মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজে ভর্তি হতে না পেরে বিভিন্ন অবৈধ প্রতিষ্ঠান থেকে জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে অবৈধভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করে দেয়।

গ) ভারতীয় চিকিৎসকদের উপর বর্ণবিদ্বেষমূলক অবিচার ও নির্যাতন

নেটিভ ডাক্তারদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বর্ণবিদ্বেষমূলক অবিচার ও নির্যাতন চালাতে অভ্যস্ত ছিল। কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজের মেডিক্যাল কলেজগুলি থেকে বেশ কিছু ভারতীয় চিকিৎসক পাশ করে বেরোতেন। যদিও এঁরা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে ইউরোপীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ইউরোপীয় চিকিৎসকদের সমান ছিলেন কিন্তু এঁদের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে নিযুক্ত করা হত। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা ছিল খুবই কম, মাসিক বেতনক্রম ছিল ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা। একই জায়গায় একজন ইউরোপীয় আই.এম.এস. ডাক্তার শুরুতেই মাসিক বেতন পেত ৪০০ টাকা। ইউরোপীয় এবং ইউরেশিয়ান অ্যাপোথেকারীরা, যারা একটিমাত্র মেডিক্যাল পরীক্ষায় পাশ করত—তারাও নেটিভ ডাক্তারদের থেকে বেশি বেতন পেত।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের ভারতীয় সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরা তাঁদের অভিযোগ জানিয়ে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন। কিন্তু সরকার এই আবেদনপত্র বাতিল করেন।

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পাটনার টেমপল স্কুল অব মেডিসিন-এর প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ সিম্পসন প্রায় একই রকমের একটি আবেদন সরকারের কাছে পাঠান।

উত্তর বাংলার সার্জন জেনারেল মন্তব্য করেন :

১ অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরা যে কাজ করেন তার তুলনায় বেশি বেতন পান।

২ তাঁদের শিক্ষার খরচ প্রধানত সরকার বহন করেন।

৩ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর রোজগার করেন।

কিন্তু ক্রমশঃ নেটিভ ডাক্তারদের মনে অতৃপ্তি বাড়তে থাকে এবং এর ফলে শুরু হয় উনিশ শতকের মেডিক্যাল রিফর্ম আন্দোলন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ কলকাতার সিটি কলেজে জনসভা হয় সম্ভ্রান্ত সাড়ে সাতটায়। ডাঃ ভুবনমোহন সরকার সভাপতিত্ব করেন। এর পরবর্তী সভা হয় ৩০ মার্চ ১৮৯৬ কোলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান হলে। এই সভায় রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জী, রাজা বিনয়কৃষ্ণ, মাননীয় শ্রীসুরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী, মাননীয় শ্রী এ.এম. বাসু, মিঃ ডবলু.সি.ব্যানার্জী, মিঃ মনমোহন ঘোষ, মিঃ

লালমোহন ঘোষ, রেভারেন্ড কালীচরণ ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন।

এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডঃ কে.এন. বাহাদুরজি এবং ডঃ এ.আর পাণ্ডুরং সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবি সনদ পেশ করেন :

১) সিভিল এবং মিলিটারি মেডিক্যাল সার্ভিস পৃথক করা হোক। একটি নূতন ভারতীয় মিলিটারি মেডিক্যাল সার্ভিস তৈরি করা হোক।

২) সিভিল মেডিক্যাল সার্ভিসের পুনর্গঠন। এই সার্ভিসে ভারত ও ইউরোপের চিকিৎসকদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে। প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা দেখে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় চিকিৎসকদের সিভিল মেডিক্যাল সার্ভিসে নিয়োগ করতে হবে।

এই দাবি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য ফোরাম থেকেও করা হয়। কিন্তু সরকার মানতে রাজী হননি। অবশেষে দুটি মাত্র পরিবর্তন সরকার মেনে নেন।

ক) কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সিভিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনদের জন্য সিনিয়র গ্রেড (মাসিক বেতন ৩০০ টাকা) চালু হল।

খ) প্রতি প্রদেশে অল্প কিছু নির্বাচিত সিভিল স্টেশনে ভারতীয় চিকিৎসকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করা চালু হল।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের জন্ম ও শিক্ষার সূচনা

১৮৫৩ সালের ২৩ আগস্ট রাধাগোবিন্দ কর জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান সাতরাগাছি। পিতা প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং শিক্ষাবিদ ডাক্তার দুর্গাদাস কর। প্রপিতামহ রামমোহন কর প্রতিপত্তিশালী এবং অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তিনি নীলকুঠির মালিক ছিলেন। পিতামহ ভৈরবচন্দ্র কর কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান গোপাললাল মিত্রের বড়ো ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র ডাক্তার দুর্গাদাস কর,—রাধাগোবিন্দ করের পিতা।

দুর্গাদাস করের বয়স যখন দুই কী তিন বৎসর তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই অবস্থায় তিনি কলকাতায় মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন। ছাত্রজীবনে তিনি প্রথমে ডাফস্কুলে এবং পরে মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৩ সালে ডাক্তারি পাশ করে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। প্রথমে বরিশাল, তারপর ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের পর ১৮৬২ সালে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগে ভেষজতত্ত্বের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি নয় বছর শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ভৈষজ্য-রত্নাবলী* প্রকাশ করেন। এই বইটির জন্য বাংলার চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে ডাক্তার দুর্গাদাস করের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাধাগোবিন্দ ডাক্তার দুর্গাদাস করের প্রথম পুত্র। তাঁর তিন ভ্রাতা ও পাঁচ ভগিনী ছিল। ভ্রাতাদের নাম রাধামাধব, রাধারমণ ও রাধাকিশোর। মাতা কলকাতার হোগলকুড়িয়া নিবাসী দুর্গাদাস ঘোষের কন্যা।

তিনি হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হন।

যৌবনের বিপথগামিতা থেকে ফিরে আসা এবং একটি আদর্শের জন্ম

এই সময় বিবিধ পারিবারিক সমস্যা এবং যৌবন সুলভ-উচ্ছলতায় তিনি সাময়িকভাবে বিপথগামী হন। এক বৎসর ডাক্তারি পড়াশুনো করে তিনি মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করেন।

এই সময় কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের উৎসাহে কলকাতায় অবৈতনিক সাধারণ নাট্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধাগোবিন্দ এবং তাঁর মধ্যম ভ্রাতা রাধামাধব এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র পালের বাড়িতে এই নাট্য সম্প্রদায় দীনবন্ধু মিত্রের *লীলাবতী* নামক নাটক অভিনয় করেন। রাধাগোবিন্দ এই নাটকে সারদাসুন্দরীর ভূমিকায় সুচারুরূপে অভিনয় করেন।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার কর পুলিশের হাতে বিনা দোষে নিগৃহীত হন।

শ্যামাপূজা উপলক্ষে রাধাগোবিন্দের ভ্রাতারা এবং অন্যান্য প্রতিবেশীগণ বড়ো রাস্তার ধারে একটি পাঁচিলের উপর তুবড়ি রেখে পোড়াচ্ছিল। বীটের কনস্টেবল তা জোর করে ফেলে দেয়। এই ঘটনায় ডাক্তার করের ভ্রাতাদের ও অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে কনস্টেবলের বচসা হয় এবং কনস্টেবল প্রহৃত হয়। ডাক্তার কর এই ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কিছুক্ষণ পরে যখন তিনি বাড়ি ফিরে আসেন তখন পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলে। দৌষীরা সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল। সেই কনস্টেবল ডাক্তার করকে একজন দাঙ্গাবাজ বলে সনাক্ত করে। নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণের জন্য তাঁর সকল চেষ্টা বিফল হল। তিনি ১৫ দিনের জন্য বিনাশ্রম কারাগারে দণ্ডিত হলেন।

এই সময় তিনি আর একটি ভয়ঙ্কর আঘাতের সম্মুখীন হন। তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। এই দুটি ভয়ঙ্কর ভাগ্য বিপর্যয় ডাক্তার করের মনে আমূল এক পরিবর্তন আনে। নিজেকে কোনোরূপ জনসেবামূলক কাজে নিয়োজিত করবার একটা প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। তাঁর পরবর্তী জীবনে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং অসাধারণ আত্মত্যাগ আমরা দেখতে পাই তার সূচনা সম্ভবত এখানেই।

শিক্ষা সমাপন এবং চিকিৎসক ও সমাজসেবকরূপে আত্মপ্রকাশ

১৮৮০/৮১ খ্রিস্টাব্দে রাধাগোবিন্দ কর পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হন। তিন বছরের শিক্ষাক্রম শেষ করে তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে যান। তাঁর সঙ্গে যান কাস্মীরের বিখ্যাত ডাক্তার আশুতোষ মিত্র। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.আর.সি.পি. ডিপ্লোমা গ্রহণ করে এক বছর বাদে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে শ্যামবাজারে নিজ বাড়িতে ডাক্তার কর চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। অল্প দিনেই পন্ডির মধ্যে তিনি চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফিজিশিয়ান ও সার্জন। তাঁর নিজের বাড়িতেই শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। অনেক দরিদ্র রোগীর কঠিন শল্য চিকিৎসা তিনি নিজের বাড়িতেই করতেন। এছাড়া বিষ চিকিৎসায় তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষপান করলে ডাক্তার করকেই লোকে ডাকত। এই চিকিৎসায় তাঁর যথেষ্ট হাতযশ ছিল।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ। কলকাতায় প্রথমবার প্লেগ রোগ দেখা দিল। সরকার নির্দেশ দিলেন

প্লেগরোগীকে হাসপাতালে বাধ্যতামূলকভাবে ভরতি করতে হবে। এই নির্দেশে শহরের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে একটা ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হল। শহর ছেড়ে দলে দলে লোকে পশ্চিমাঙ্গে বাস করতে লাগল। এই সময় স্যার জন উডবার্ন বাংলার ছোটোলাট ছিলেন, তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন—রোগীকে বাধ্যতামূলকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। গৃহস্থ বাড়ির একপ্রান্তে একটি সুপরিষ্কৃত ঘরে বা বাড়ির ছাদে অল্প খরচায় একটি ঘর নির্মাণ করে সেখানে প্লেগ রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা করা যায়।

এই সময় ডাক্তার কর পশ্চিমবাসীদের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। পশ্চিম প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে কোথায় রোগীর জন্য ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে তা আগে থেকে নির্ণয় করার ভার সরকার ডাক্তার করের উপর দিয়েছিলেন। ডাক্তার কর দিনের পর দিন ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে, এমনকী নিজ চিকিৎসা ব্যবসা অবহেলা করে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। এই একটি কাজের মধ্য থেকেই ডাক্তার করের সমাজ সচেতনা, আত্মত্যাগ ও দয়ালু হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেম

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রস্তুত ঔষধ বাজারে চালু করার ব্যাপারে এক বিশেষ বাধার সম্মুখীন হন। তিনি জ্ঞানানুযায়ী ঔষধ ব্যবসায়ীরা কেমিস্ট্রি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা শুধুই লাভ লোকসানের হিসাব বুঝতেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তুত ঔষধ দেখে তাঁরা প্রশংসা করলেও মাথা নেড়ে জানাতেন “নামী কোম্পানীর বিলাতি ঔষধের বাজারে চাহিদা আছে। আমাদের খদ্দেররা দেশী ঔষধ ব্যবহার করতে চাইবেন না।”

এ সত্ত্বেও অনেক চেষ্টার পর বেঙ্গল কেমিক্যালের দেশী ঔষধ স্থানীয় ঔষধের দোকানের শেলফের পেছনের দিকে ঠাই পেল। বিক্রীর অবস্থা সহজেই বোধগম্য।

এই অবস্থায় এগিয়ে এলেন ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু এবং ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। তাঁদের দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় এগিয়ে এলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী প্রভৃতি খ্যাতিমান চিকিৎসকবৃন্দ। তাঁদের সবার একান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বিক্রি বাড়ল বেঙ্গল কেমিক্যালের এইটকেন'স্ টনিক সিরাপ, সিরাপ অব হাইপোফসফাইট, প্রভৃতি। এছাড়া তাঁরা ছিলেন দেশীয় ঔষধের উপর যথেষ্ট আস্থাশীল। তাই কুর্চি, বাসক এবং কালমেঘের সিরাপ ও জোয়ানের আরক বাজারে চলতে থাকে।

প্রথম বেসরকারি জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও ক্রমোন্নতি

১৮ অক্টোবর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ বাংলা রেনেসাঁসের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিন কলকাতা শহরের ৯জন খ্যাতিমান চিকিৎসক ১৬১ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড ঠিকানায় মিলিত হলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করে বিদেশি সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ এবং আর্থ দেশবাসীর সামগ্রিক উপকারের জন্য একটি জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সভাবনা নিয়ে আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে জানাই স্যার চার্লস উডের নির্দেশনামা (উডস্ ডেসপ্যাচ) অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টায়

সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতা পাবার কথা।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ এম.এন.ব্যানার্জী। ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের একান্ত আগ্রহে এই সভা আহত হয়। সভায় উপস্থিত থাকেন

- ১ ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত
- ২ ডাঃ বিপিনবিহারী মৈত্র
- ৩ ডাঃ বিনোদবিহারী মিত্র
- ৪ ডাঃ কুমুদনাথ ভট্টাচার্য
- ৫ ডাঃ বি.বি. ব্যানার্জী
- ৬ ডাঃ জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী
- ৭ ডাঃ এম.এল. দে
- ৮ ডাঃ আর. জি. কর
- ৯ ডাঃ এম. এন. ব্যানার্জী

এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় জাতীয় স্বার্থে একটি বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

ডাঃ এম. এন. ব্যানার্জী — চেয়ারম্যান

ডাঃ কে.এন্. ভট্টাচার্য — সেক্রেটারি

ডাঃ আর.জি. কর (অডিটর), ডাঃ এ. কে. দত্ত (অডিটর)

ডাঃ জে.সি. লাহিড়ী—কোষাধ্যক্ষ

ডাঃ বি.বি. মৈত্র, ডাঃ বিনোদবিহারী মিত্র, ডাঃ এম.এল. দে, ডাঃ ব্রজেননাথ ব্যানার্জী, ডাঃ আর. কে. সেন, ডাঃ পি.সি. মজুমদার, ডাঃ এস.সি. বোস, ডাঃ এস.বি. দে (সদস্য)।

এই কমিটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু করা ডাঃ খান্ডগীরের স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নভেম্বর ১৮৮৬, স্কুল শুরু হয়। এখানে আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য বিভাগ ছিল। এর নাম হয় ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে স্কুলের অ্যালোপ্যাথি বিভাগ আলাদা করে নেওয়া হয়। এর নামকরণ হয় ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল।

স্কুল শুরু হয় ১৬১ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড ঠিকানায়। এরপর ঠিকানা বদল হয়ে প্রথমে হল ১৫৫ ও পরে ১১৭ বৌবাজার স্ট্রিটে। ১৮৮৯ সালে স্কুল পরিচালনার জন্য একটি সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন করা হয় (১৮৮২ সালের অ্যাক্ট VI অনুযায়ী)। প্রথম কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ ছিলেন—

প্রেসিডেন্ট—ডাঃ লালমাধব মুখার্জী

সেক্রেটারি—ডাঃ আর.জি. কর

সদস্যগণ—

- ১ মিঃ আর.ডি. মেহতা
- ২ বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু
- ৩ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
- ৪ ডাঃ আর সেন
- ৫ বাবু হরিপদ ঘোষাল
- ৬ বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান

করা হত। শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল বাংলা। এর সঙ্গে একটি বহির্বিভাগীয় হাসপাতাল ছিল। ১৮৮৯ সালে এই হাসপাতালে প্রায় চার হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হয়। স্কুলটির নিজস্ব ভালো হাসপাতাল না থাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষ মেয়ো হাসপাতাল, চাঁদনি হাসপাতাল এবং সুকিয়া স্ট্রিট ডিসপেন্সারিতে ছাত্রদের ক্লিনিক্যাল ক্লাসের ব্যবস্থা করেন।

প্রথম দিকে শব ব্যবচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮৯-৯০ সালে সরকারের অনুমতি নিয়ে শব ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়। প্রথমে শিক্ষাবর্ষ ছিল তিনবছর, পরে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাবর্ষ চার বছর করা হয়। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ এই স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষকদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ—

মেডিসিন	: ডাঃ জগবন্ধু বসু, এম.ডি. ডাঃ এস.এন. ব্যানার্জী, এম.আর.সি.এস. ডাঃ আর.জি.কর.এল.আর.সি.পি.
সার্জারী	: ডাঃ প্রাণধন বসু এম.বি. ডাঃ জে.এন. মিত্র এম.আর.সি.পি.
চক্ষু বিভাগ	: ডাঃ লালমাধব মুখার্জী, এল.এম.এস.
স্বাস্থ্য	: ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, এম.বি.
মেডিক্যাল	
জুরিসপ্রুডেন্স	: ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ দত্ত ডাঃ এস. মুখার্জী, এম.ডি, সি.পি.এস.ডি
থেরাপিউটিক্স	: ডাঃ নীরদবিহারী বাসু এম.বি.
ফার্মাকোলজি	: ডাঃ বি. বাসু
অ্যানাটমি	: ডাঃ অমূল্যচরণ বাসু, এম.বি. ডাঃ শরৎচন্দ্র বসু, এম.এ., এম.বি.
ফিজিওলজি	: ডাঃ এস.এন. দে, এম.বি.সি.এস, বি.এস.সি. ডাঃ নীলরতন সরকার, এম. এ, এম.বি
ডিমেনস্ট্রেশান	: ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সেন, এম.বি. ডাঃ শরৎচন্দ্র বসু, এম.এ, এম.বি. ডাঃ আশুতোষ নাথ
ক্লিনিক্যাল	
মেডিসিন	: ডাঃ কে.সি.দত্ত এম.বি. ডাঃ এন.আর. সরকার এম.এ, এম.বি. ডাঃ এস.বি. মুখার্জী, এম.বি ডাঃ এস.সি. সর্বাধিকারী বি.এ., এম.বি.
শব ব্যবচ্ছেদ	: ডাঃ আর.জি. কর ডাঃ অমূল্যচরণ বসু ডাঃ শরৎচন্দ্র বসু

শুরুতে মাত্র ৮জন ছাত্র ছিল। ক্রমশ ছাত্রসংখ্যা বাড়ে।

সাল	ছাত্রসংখ্যা
১৮৯০-৯১	১১৮
১৮৯১-৯২	১৭০
১৮৯৪-৯৫	৩৭০
১৮৯৫-৯৭	৩৯৭
১৮৯৯-১৯০০	২৬০

মাতৃভাষায় মেডিক্যাল স্কুলগুলির পঠনপাঠন এবং সংলগ্ন হাসপাতালগুলির কার্যাবলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৮৯৩ সালে সরকার যে কমিটি গঠন করে, সেই কমিটিও এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করে।

ওই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়—এই স্কুলটির শিক্ষক সংখ্যা বেশ ভালো। তাঁদের মধ্যে ২০ জন ব্যক্তিগত পেশায় নিযুক্ত। শুধুমাত্র যাতায়াতের ভাড়া নিয়ে তাঁরা বিনা মাহিনায় এই স্কুলে পাঠদান করেন। ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন বিনা মাহিনায় পড়ে। স্কুলের শুভাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষ থেকে বহু পদক ও পারিতোষিক দেওয়া হয়।

১৮৯৭ সালে স্কুল ২৯৮ অংগার সারকুলার রোডে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি ছোটো হাসপাতাল চালু করা হয়। শয্যাসংখ্যা ছিল ১৪। পরবর্তী বৎসরে স্কুল কর্তৃপক্ষ বেলগাছিয়ায় ২৫০০০ টাকার বিনিময়ে প্রায় ১২ বিঘা জমি ক্রয় করেন।

এই জমিতে ৭০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি একতলা বাড়ি তৈরি করা হয়। এই ৭০,০০০ টাকার মধ্যে ১৮,০০০ টাকা পাওয়া যায় প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরের কলকাতা ভ্রমণ উপলক্ষে সংগৃহীত তহবিল থেকে। ডাঃ লালমাধব মুখার্জী, স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিঃ আর.ডি. মেহতা প্রভৃতির চেষ্টায় এই টাকা পাওয়া যায়।

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সার জন উডবার্ন এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনিই এই হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। হাসপাতালের নাম দেওয়া হয় অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল। শয্যাসংখ্যা ছিল ৩৬। ১৯০৩ সালের আগস্ট মাসে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল বেলগাছিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তী বৎসর বাবু মানিকলাল শীলের দানে ১২০০০ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয় পান্নালাল শীল আউটডোর ডিস্পেন্সারি।

ক্রমশ রোগীর চাপ বাড়তে থাকায় অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের দ্বিতীয় তলা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ডাঃ এম্.এন্. ব্যানার্জীর অনুরোধে এগিয়ে এলেন পোস্তার রানি কস্তুরীমঙ্গরী দাসী (কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের বিধবা স্ত্রী)। মোট খরচ (প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা) তিনি দান করলেন। এই টাকায় অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের দ্বিতল সম্পূর্ণ হল। শয্যাসংখ্যা এবার দাঁড়াল ১০০। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে স্যার এডওয়ার্ড বেকার নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যে ১৯০৪ সালে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটল।

কলেজ অফ ফিজিঅিয়ানস্ অ্যাণ্ড সার্জেনস্ অফ বেঙ্গল ছিল অপর একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৫ সালের ১০ জুলাই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জন মার্টিন কোটসের

মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে কোর্টস্‌ মেমোরিয়াল ফাণ্ড খোলা হয়। ওই ফাণ্ড থেকে পাওয়া অর্থ কোর্টসের স্মৃতিতে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস্‌ অ্যাণ্ড সার্জন্স অফ বেঙ্গল। ১৮৯৫ সালের প্রতিষ্ঠাবর্ষ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে কলেজ মানের শিক্ষা দেওয়া হত। ঠিকানা ছিল ২৯৪ আপার সারকুলার রোড। ১৯০৪ সালে এই কলেজে মাত্র ১২ জন ছাত্র ছিল।

১৯০৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হল। সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হল দি ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল অ্যাণ্ড দি কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস্‌ অ্যাণ্ড সার্জন্স অফ বেঙ্গল। এই সম্মিলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে দুটি শাখা ছিল। স্কুল বিভাগে মাতৃভাষায় চার বছরের শিক্ষাক্রম চালু ছিল। কলেজ বিভাগে চালু ছিল ইংরাজিতে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম। এরপর ঘটনাক্রমে এল নাটকীয় পটপরিবর্তন। ১৯১১ সালে মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বিল চালু হতে চলেছে। এই অবস্থায় সরকার সকল বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আবেদন জানানেন সকলে মিলিত হয়ে একটি উচ্চমানের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ গড়ার। সবকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক অনুদান দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলার মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন স্যার পার্ভে লিউকিস্‌ এবং সার্জন জেনারেল হ্যারিস। দু'বৎসর ধরে এই প্রচেষ্টা চলল। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্নরকম স্বার্থের সংঘাত এবং তাদের প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত আপোসহীন মনোভাবের জন্য এই প্রচেষ্টা সফল হল না।

এবার ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল অ্যাণ্ড দি কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্‌ অ্যাণ্ড সার্জন্স অব বেঙ্গল সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখল বেলগাছিয়ার এই প্রতিষ্ঠানটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত মেডিক্যাল কলেজরূপে গড়ে তোলার জন্য সরকারি অনুদানের। এব্যাপারে ১৯১২-১৩ সালে ডাঃ এম.এন. ব্যানার্জী, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যান্যরা বেশ কয়েকবার লর্ড কারমাইকেল (গভর্নর অব বেঙ্গল) এবং স্যার উইলিয়াম ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন।

অবশেষে ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট একটি কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি মেডিক্যাল স্কুল অনুমোদিত বেসরকারি (স্বাধীনভাবে চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত) মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করার ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। সরকার শর্তসাপেক্ষে এককালীন মুখ্য অনুদান হিসাবে পাঁচ লাখ টাকা এবং নিয়মিতভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকার বার্ষিক অনুদান দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অনুদানের শর্ত ছিল নিম্নরূপ :

- ১। নির্মায়মাণ বাড়িগুলির নক্সা সার্জন জেনারেলের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।
- ২। সকলপ্রকার নির্মাণকার্য সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে হবে।
- ৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মতো সরকারের পক্ষে একটি ডিউড সম্পাদন করতে হবে।

- ৪। কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর ভার থাকে—

ক) জনগণের কাছ থেকে দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা।

খ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৌরসভার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার অনুদান সংগ্রহ করা।

কলেজ কর্তৃপক্ষ এই শর্ত মেনে নেন। এরপর শুরু হয় অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। লোকহিতৈষী বদান্য ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ ৫০,০০০ টাকা দান করলেন। সমপরিমাণ অনুদান পাওয়া গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রক্ষিত প্রয়াত স্যার তারকনাথ পালিত ফাণ্ড থেকে। মিঃ পি. এন. টেগোর দিলেন ২৫,০০০ টাকা, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দিলেন ১০,০০০ টাকা, কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় দিলেন ৬০০০ টাকা। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বাসু এবং স্যার এস. পি. সিন্হা প্রত্যেকে দিলেন ৫০০০ টাকা। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বাসু সরকারের চাহিদা অনুযায়ী কয়েক লাখ টাকার আর্থিক দায়ভারের জামিনদার হলেন।

এইভাবে জনগণের বদান্যতায় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী মুখ্য অর্থনৈতিক দায়ভারের সংস্থান হল। মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অনুরোধে বাংলার মাননীয় গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। অবশেষে কর্পোরেশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় কলকাতা কর্পোরেশন বছরে ৩০,০০০ টাকা অনুদান দিতে রাজি হল।

কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা অনুদান দিতে অসমর্থ হল। স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারকে জানালেন যে তাঁরা এই টাকা তাঁদের প্রাপ্য ফি থেকে সংগ্রহ করবেন। অবশেষে সরকার এই শর্ত মকুব করলেন। ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিলিমিনারি সায়েন্টিফিক এম. বি পরীক্ষা পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে।

৫ জুলাই ১৯১৬ বাংলার মাননীয় গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ভারতের প্রথম সরকার অনুমোদিত বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করেন। কলেজটির নাম দেওয়া হয় বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট এম.বি. এবং ফাইনাল এম. বি. মানের অনুমোদন পেল যথাক্রমে ১৯১৭ এবং ১৯১৯ সালে।

এইভাবেই ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় চিকিৎসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। ১৯১৯ সালের ১৭ এপ্রিল মেডিক্যাল এডুকেশন সোসাইটি অফ বেঙ্গলের (কলেজের পরিচালন সংস্থা) বার্ষিক সাধারণ সভায় ডাঃ নীলরতন সরকারের প্রস্তাব অনুসারে কলেজের নামকরণ হয় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। ২ মার্চ ১৯৪৮। মেডিক্যাল এডুকেশন সোসাইটি অফ বেঙ্গলের বিশেষ সাধারণ সভায় আবার কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্তিত হয়। এবার নামকরণ হয় আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এই জাতীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের এক অনন্য কীর্তি। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে ডাক্তার আর. জি. কর এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন। এরপর একটানা ৩০ বছর এই স্কুলের এবং পরবর্তী কালে কলেজের সেক্রেটারি পদে তিনিই কাজ করেন মৃত্যুদিন পর্যন্ত (১৯।১২।১৯১৮)।

দেশের স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু এই কাজে এক দিনের জন্যও তিনি আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেননি। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। সকলের পশ্চাতে থেকে তিনি নিজ কর্তব্য পালন করতেন।

প্রথমে এই কাজে তিনি দেশের লোকের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পাননি। প্রায় সকলেই তাঁকে এই কাজে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিল। এমনকী স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে বলেছিলেন—সাধারণ স্কুল আর মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করার মধ্যে অনেক প্রভেদ। কয়েকটি বেঞ্চ ও চেয়ার লইয়া একটি সাধারণ স্কুল স্থাপন করা যায়। কিন্তু মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করতে হলে বিস্তারিত অর্থ, সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক যোগাড় না হলে মেডিক্যাল স্কুল একটি ভুয়া জিনিস হবে মাত্র। তার দ্বারা দেশের কাজ হবে না। কিন্তু ডাঃ কর নিরুৎসাহ হননি। ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং একান্ত নিষ্ঠায় তিনি তাঁর প্রয়াস চালু রেখেছেন। এবং অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন। পেয়েছেন সর্বসাধারণের কাছে থেকে উৎসাহ, সহানুভূতি এবং অর্থানুকূল্য। ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের এই প্রয়াসে এগিয়ে এসেছেন ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমূল্যচরণ বসু, ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ প্রাণধন বসু, ডাঃ এম. এন. ব্যানার্জী, ডাঃ সুরথচন্দ্র বসু, ডাঃ ভোলানাথ বসু, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কুমুদনাথ গাঙ্গুলী, ডাঃ এম. এল. দে প্রভৃতি খ্যাতিমান চিকিৎসকবৃন্দ। এঁরা নানাভাবে ডাঃ করকে সাহায্য করেন এবং তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করেন।

মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ছিলেন ডাঃ করের আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি প্রথম থেকেই ডাঃ করের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কর্পোরেশনের কাছ থেকে এবং সরকারি ভাণ্ডার থেকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।

এছাড়া কলেজের সরকারি অনুমোদনের সময় ভূপেন্দ্রনাথ কয়েক লাখ টাকার আর্থিক দায়ভারের জামিনদার হন। বাংলার মাননীয় গভর্নর লর্ড কারমাইকেল, ডিরেক্টর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস স্যার পার্ভে লিউকিস, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ সিভিল হসপিটাল, বেঙ্গল কর্নেল এডওয়ার্ডস, এবং এডুকেশন মেম্বর, ভাইসরয়ের কাউন্সিল স্যার শঙ্করণ নায়ার এই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমগ্র জাতি এঁদের কাছে ঋণী।

মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা

মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চা ছিল ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের একান্ত স্বপ্ন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। অবশ্য কলেজে সরকারি নির্দেশে ইংরাজিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়।

ডাঃ কর তাঁর মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অবসর সময়ে একের পর এক বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর লেখা একটি বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—“বাল্যকাল হইতে আমার বিশ্বাস বঙ্গমূল হইয়াছে যে, দেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে মাতৃভাষার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আমার স্বল্প বিদ্যা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর সাধ্য তাহার সমাধানে ক্রটি করি নাই।”

লিখিত ও সম্পাদিত পুস্তক

ভিষগবন্ধু—প্রকাশকাল ১৮৭১ সাল। মুখবন্ধে বলা হয়—“যাহারা চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষিত ও কৃতকার্য হইয়া চিকিৎসা কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহারা যতই বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হউন না কেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বহুদর্শিতার অভাবে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে সহজে সক্ষম হইলেন না। রোগীর কাতরতা ও নানাবিধ চিহ্ন দেখিলে এত ঔষধ এককালে মনে উদ্ভিত হয় যে তাহাদের মধ্যে কোন ঔষধটি প্রকৃত বিষয়ে উপযুক্ত হইবে, তাহা নির্বাচন করা বহুদর্শিতা ভিন্ন অন্য উপায়ে কঠিন হইয়া উঠে। এজন্যই শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসক : এই প্রবাদটি দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অভিনব চিকিৎসকদের এই কষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে ভিষগবন্ধু নামক এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।”

এই গ্রন্থে প্রেসক্রিপসন্ লিখবার ধারা, প্রয়োগ হিসাবে ঔষধের গুণের বৃদ্ধি বা হ্রাস, প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপসন প্রভৃতি চিকিৎসকদের নানা জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় তথ্য সম্মিলিত হয়েছে। মূল্য ছিল ১ টাকা।

সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব—বাংলায় অ্যানাটমি সম্বন্ধে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার মেডিক্যাল স্কুলগুলির ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক, চিত্রগুলি অতি উৎকৃষ্ট এবং বিষয়জ্ঞাপক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬৪। মূল্য ১২ টাকা। বইটি ইংরাজি গ্রেস্ অ্যানাটমির মতোই বাংলা ভাষার ছাত্রদের কাছে মূল্যবান।

বইটির মুখবন্ধে ডাঃ কর বলেন : “বঙ্গভাষায় শারীর তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের অসদৃশ্য আছে। সেই অভাব মোচনার্থে এই সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব প্রকাশিত হইল। পুস্তকের গুণ দোষ সবিস্তর পাঠকবর্গ বিচার করবেন। এইস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমি গ্রন্থখানি সাধারণের উপযোগী, ফলোপধারক বিজ্ঞান ও শাস্ত্রানুমত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা ও যত্নের ক্রটি করি নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সারগর্ভ, অখণ্ডনীয় তত্ত্ব সমুদয় ভারতবর্ষের জন সমাজে প্রচারিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই গ্রন্থ প্রণয়ণে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। বহুল প্রচার ও নিঃস্ব ছাত্রগণের পক্ষে সুলভ হইবে বলিয়া ইহার মূল্য স্বল্প করা হইল।”

রোগী পরিচর্যা—১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর “রোগী পরিচর্যা” বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্রদের জন্য লেখা হয়। পরে বেসরকারি শাই (ধাত্রী) দের জন্য তিনি এই বইটি প্রকাশ করেন। শুশ্রূষা ছাড়াও বিভিন্ন রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুতি করবার সঠিক বিবরণ এই গ্রন্থে লেখা হয়। মূল্যমান-১ টাকা।

ভিষক সুহৃদ—ডাঃ করের এই গ্রন্থটিতে যাবতীয় রোগের উৎপত্তি, নিদান ও চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে। ইংরাজি ভাষায় অসলারের পিস্টিপল্‌স্ এন্ড প্র্যাকটিস্ অব মেডিসিন-এর ন্যায় এটি-বাংলা ভাষায় একটি অমূল্য গ্রন্থ। বইটি ১২২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং অনেকগুলি চিত্র আছে। মূল্যমান ১২ টাকা।

“প্লেগ”—উনিশ শতকের শেষভাগে কলকাতায় প্লেগরোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাধাগোবিন্দ করের লেখা ‘প্লেগ’-বইটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার মুখবন্ধে ডাঃ কর জানান—“এই পুস্তিকা রচনা কালে আমার লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষিত চিকিৎসক

সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর জনসমাজের কাছে এই রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইহার কারণ, বৈশিষ্ট্য এবং যুক্তি সম্মত চিকিৎসার কথা পেশ করা, যা আমি সম্ভাব্য সকল প্রকার উৎস থেকে সংগ্রহ করেছি।”

দ্বী রোগের চিত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব—এটি ১৯০৮ সালে প্রকাশিত। গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ জার্মান চিকিৎসক ডাঃ সেফারের অ্যাটলাস অ্যাণ্ড এপিটোম অব গাইনিকোলজি নামক বইটির বাংলা অনুবাদ। এই সচিত্র গ্রন্থে সকল প্রকার দ্বী রোগের বিবরণ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে। বইখানি ৩৮৭ পৃষ্ঠার এবং মূল্যমান ৫ টাকা।

সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা—১৯০৯ সালে বইটি প্রকাশিত। শিশু চিকিৎসার এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২১। বইটি সচিত্র, মূল্যমান ২।। টাকা)

সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব—এটি মেটেরিয়া মেডিকা এবং ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ের পুস্তক। প্রকাশকাল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ। বইটিতে সংশোধনীয় ব্রিটিশ কার্মাকোপিয়ায় বর্ণিত ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় যাবতীয় নতুন বিষয় সম্মিলিত হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭১৬। এতে গাছ-গাছড়ার বহু চিত্র দেওয়া আছে, দাম ছিল ৫ টাকা।

কর সংহিতা—(এ হ্যাণ্ডবুক কর দি ইউজ অব ইয়ং মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স)—প্রকাশকাল ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ। নতুন চিকিৎসকদের জন্য লিখিত পুস্তক এটি। রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। খুব ছোটো অক্ষরে ছাপা বই, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৯। মূল্যমান ৩ টাকা।

কবিরাজ ডাক্তার সংবাদ—১৮৯২ সালে প্রকাশিত। এটি একটি অভিনব চিকিৎসা গ্রন্থ। কবিরাজ কালিপ্রসন্ন সেন এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর যৌথভাবে গ্রন্থটি রচনা করেন। এই পুস্তকে কবিরাজ ও ডাক্তারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্পাদিত গ্রন্থ

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর তাঁর পিতা দুর্গাদাস কর রচিত ভৈষজ্য রত্নাবলী নামক সুবৃহৎ মেটেরিয়া মেডিকার ২৭ টি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ছাত্র ও চিকিৎসকদের কাছে বইটি ছিল সমান আকর্ষণীয়। শুধুমাত্র এই বইটি পড়ে পল্লিগ্রামের অনেক ছোটোখাটো ডাক্তার প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন এবং সুযশের অধিকারী হয়েছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল প্রকার ক্রমোন্নতি ডাঃ কর এই গ্রন্থের পরের পর সংস্করণে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে প্রচুর গাছ গাছড়ার চিত্রসহ গ্রন্থটির আকার বেশ বড়ো হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ১২১২। মূল্যমান ছিল ১২ টাকা।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের কর্মজীবনে জাতীয় নবজাগরণের দ্যুতিতে আলোকিত দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সমাজসেবা ও শিক্ষা সংস্কারের এক অপূর্ব সমন্বয় পাওয়া যায়।

তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার অর্থবান বনেদি ঘরের সন্তান। ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। রসরাজ অমৃতলাল বসু ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট

বন্ধু। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর তিনি নিজ এলাকায় একাধারে ফিজিশিয়ান এবং সার্জন হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। অর্থ এবং যশ তাঁর করায়ত্ত হয়। কিন্তু খ্যাতি ও আরামের সহজ জীবন তাঁকে আকর্ষণ করেনি। দেশ ও জাতির জন্য কিছু করবার এক উদগ্র প্রেরণা তাঁকে ব্যাকুল করেছে। সম্ভবত নিম্নলিখিত কারণগুলি তাঁর মনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়।

- ১ দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল। মহামারীতে হাজার হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু।
- ২ দেশে চিকিৎসকের একান্ত অভাব। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে হাতুড়ে চিকিৎসকদের হাতে অসহায় জনগণের ভুল চিকিৎসায় অপমৃত্যু।
- ৩ রেনেসাঁসের প্রভাবে জনগণের মধ্যে মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি। কিন্তু দেশে তখন একটিমাত্র মেডিক্যাল কলেজ এবং দুটি মাত্র মেডিকেল স্কুল অতএব শিক্ষার সুযোগ নিতান্তই কম।
- ৪ ভারতীয় চিকিৎসকদের উপর বিদেশি সরকারের বর্ণ বৈষম্যমূলক অবিচার ও অত্যাচার এবং এর ফলে শুরু হওয়া মেডিক্যাল রিফর্ম আন্দোলন।
- ৫ ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে শুরু হওয়া জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। এছাড়া তাঁর পিতা ডাক্তার দুর্গাদাস করের জীবন বাংলাভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রসারে ডাক্তার আর. জি. করকে অনুপ্রাণিত করে।

ডাক্তার আর. জি. করের বহুমুখী কর্মজীবনকে আমরা মূলত চার ভাগে ভাগ করতে পারি :

- ১ পরাধীন দেশে জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- ২ মাতৃভাষা বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার।
- ৩ সমাজ সেবা মূলক কাজ

প্লেগ এপিডেমিকের সময় ডাক্তার করের ভূমিকা আগে আলোচিত হয়েছে।

- ৪ জাতীয় ঔষধ শিল্পে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে সহযোগিতা। (পূর্বে আলোচিত)

জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ডাক্তার কর তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৮ থেকে একটানা ৩০ বছর ডা: কর এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারির গুরুদায়িত্ব পালন করেন—মৃত্যু দিন পর্যন্ত। ১৯ ডিসেম্বর ১৯১৮, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মহামারির সময়, মৃত্যু ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

নিজের স্বপ্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভূগ (স্কুল) অবস্থা থেকে সাবলকৃত্ব অর্জন (কলেজ) পর্যন্ত তিনি আপন স্বক্ষে বহন করেন। এই ব্যাপারে তিনি যোগ্য সহযোগিতা পান তাঁর দ্বিতীয় সহধর্মিণীর কাছ থেকে। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালের রোগীদের খাবার ডাক্তার করের পত্নী রান্না করে পাঠিয়ে দিতেন।

ডাক্তার করের উইল অনুযায়ী তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর ৭৫০০০ টাকা মূল্যের সকল সম্পত্তি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ লাভ করে। এই টাকায় তাঁর প্রয়াত পিতা ডাক্তার দুর্গাদাস করের নামে একটি আউটডোর ডিস্পেন্সারি চালু হয়।

এর পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসা পুস্তকগুলি বাংলা ভাষার ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। মাতৃভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তাঁর প্রয়াস চিরস্মরণীয়।

এই অবশ্বয়ের যুগে এই মহাপুরুষের কর্মময় জীবন আমাদের সত্য অনুপ্রাণিত করে।

তথ্যসূত্র

- ১ পাবলিক হেল্‌থ পলিসি অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান পাবলিক : বেঙ্গল (১৮৫০-১৯২০)—সন্দীপ সিংহ, কলকাতা ১৯৯৮
- ২ উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা—বিনয়ভূষণ রায়, কলকাতা, ১৯৮৭।
- ৩ উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা—বিনয়ভূষণ রায়, কলকাতা ২০০২
- ৪ উনিশ শতকে দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা—বিনয়ভূষণ রায়, কলকাতা, ১৯৯৫।
- ৫ উনিশ শতকে বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা, দেশীয় ভেষজ ও সরকার—বিনয়ভূষণ রায়। কলকাতা, ১৯৯৮।
- ৬ উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ—সুব্রত পাহাড়ি, কলকাতা ১৯৯৭।
- ৭ সায়েন্স অ্যান্ড দি রাজ—দীপক কুমার, (১৮৫৭-১৯০৫)। ১৯৯৫
- ৮ বাংলার রেনেসাঁস—অন্নদাশঙ্কর রায়। কলকাতা ১৯৯৯।
- ৯ ইম্পিরিয়ালিজম্ এ্যাণ্ড মেডিসিন ইন বেঙ্গল—পুনমবালা, এ সোশিও হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ। নতন দিল্লি, ১৯৯১।
- ১০ দি অমৃত বাজার পত্রিকা, বৃহস্পতিবার, জুলাই ৬, ১৯১৬, পৃ: ৭
- ১১ মাসিক বসুমতী, ১৩৩৫, চৈত্র। ৭ম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৯৭৩-৯৮৩
- ১২ সান্নিমেণ্ট টু দি ইন্ডিয়ান ল্যাপেট। ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৮৯৬, মেডিক্যাল রিকর্ড ইন ইন্ডিয়া।
- ১৩ দি ইন্ডিয়ান ল্যাপেট, কলকাতা, এপ্রিল ১৬ই, ১৮৯৬ (পৃ: ৩৯০-৩৯১)
- ১৪ দি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ—রিপোর্ট অ্যান্ড প্রোসিডিংস্ অব দি সিলভার জুবিলি সেলিব্রেশান ১৯৪১।
- ১৫ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—ইনসেপশান অ্যান্ড গ্রোথ (সিলভার জুবিলি সেলিব্রেশন)
- ১৬ দিকারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, ৭ম রি-ইউনিয়ন, ওয়েলকাম অ্যাড্রেস। প্রবোধচন্দ্র রায়-এম. বি, চেয়ারম্যান, রিসেপশন কমিটি।
- ১৭ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন, ১৯১৭-১৯, রিপোর্ট, ভলিউম III পার্ট-১, অ্যানালিসিস অব প্রজেক্ট কন্ডিশন্স) চ্যাপ্টারস্ XXI-XXIX, পৃ: ৭১-৭৩
- ১৮ ৩৯ তম সেশন, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশান, কলকাতা ১৯৫২ সম্পাদনা—এস. এন. সেন। পৃষ্ঠা ১০১-১০২।
- ১৯ ডেসক্রিপ্টিভ্ গাইড বুক—ক্যালকাটা অ্যান্ড ইট্‌স্ এন্‌ভাইরন্স্ ১৫ তম সেশন অবদি ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, কলকাতা ১৯২৮।
- ২০ লাইফ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স অব অ্যান ইন্ডিয়ান কমিস্ট পি. সি. রায় ভ্যালিউম—১, কলকাতা ১৯৩২।
- ২১ বুশোভিন, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজও হসপিটাল, ভ্যালিউম-II, অক্টোবর ২০০১-মার্চ ২০০২, কলকাতা-২০০২।

বিস্মৃত এক সংগ্রাহক এবং একটি সংগ্রহালয় গড়ে তোলার ইতিবৃত্ত

সুমেধা মিত্র

ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গ্রামে-গঞ্জে জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক এবং গ্রামীণ সংগ্রহশালা গড়ে তোলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সেগুলি গড়ে উঠেছে বা উঠছে মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগে। সংস্কৃতিমনস্ক কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন ইতিহাস অনুসন্ধান, প্রত্নতত্ত্বের অন্বেষণে এবং প্রত্নসম্পদ সংগ্রহের আশায়। উদ্দেশ্য আমাদের অবহেলিত কৃষ্টিসম্পদগুলি উদ্ধার করে সংগ্রহশালা গড়ে তোলা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সেগুলি যথাযথভাবে প্রদর্শনযোগ্য পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালায় রূপায়িত হয়ে ওঠে না নানা কারণে। এই সমস্ত ব্যক্তির দীর্ঘকাল ধরে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির নিদর্শনের যে বহুমূল্য ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন তা পশ্চিমবাংলার একান্তই গৌরবের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের পুরাবস্তু, লোকশিল্প এবং পুথিপত্রের সংগ্রহ নিয়ে বিগত কয়েক দশকে এই ধরনের শতাধিক সংগ্রহশালার সন্ধান পাওয়া যায়। সম্প্রতিকালে বিজ্ঞান এবং কারিগরী বিষয়ক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার প্রবণতাও দেখা যায়।

একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত বাংলার বিভিন্ন ধরনের শিল্প, ভাস্কর্য, মুদ্রা, পটচিত্র, পুস্তক, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদির সম্মিলিত একটি সংগ্রহের নাম ‘নেহালিয়া সংগ্রহ’। যাঁর একক প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে এই সংগ্রহালয়টি গড়ে উঠেছিল, তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জ অঞ্চলের প্রয়াত জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং নেহালিয়া (১৮৮১-১৯৭২)। তাঁর এই অমূল্য সংগ্রহ নিয়ে ভবিষ্যতে একদিন একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা (মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালা, জিয়াগঞ্জ) প্রতিষ্ঠিত হবে এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর জীবদ্দশায় সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে উঠল না। অথচ একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় সব উপাদানই বর্তমান ছিল। অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশে উপযুক্ত স্থানে সংগ্রহালয় ভবন তৈরির জন্য ব্যবহার্য জমি, অর্থ এবং নানাবিধ সংগৃহীত প্রত্ন এবং অন্যান্য সম্পদ কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব শুধু সদিচ্ছা এবং উপযুক্ত কর্ণধারের। তাই মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালার জন্য দান করে যাওয়া এই অমূল্য সংগ্রহটি লোকচক্ষুর আগোচরেই রয়ে গেলো।

সমীচীন বোধে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, সম্প্রতি প্রয়াত শ্রদ্ধেয় তারাপদ সাঁতরা মহাশয় আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বে জেলাভিত্তিক, শহরাঞ্চল এবং সাধারণের গোচরে নেই পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ নিয়ে “বাঙ্গালীর সংস্কৃতি চিন্তা : বাংলার সংগ্রহশালা” শিরোনামে কয়েকটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে সেগুলি



▲
6



▲
5



▲
5



পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের এই মূল্যবান সংগ্রহটি বা প্রভাবিত মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালা সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে তিনি নীরব। তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা, বাগনান, হাওড়া ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ওই একই শিরোনামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে। সেই পুস্তকে (১৫১ পৃ.) আলোচ্য সংগ্রহশালা সম্পর্কে প্রয়াত সীতারার বস্তুব্য শুধু এইটুকুই — ‘মুর্শিদাবাদ জেলা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, জিয়াগঞ্জে জেলা মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে এবং বহুমূল্যবান পুরাবস্তু সেজন্য সংগৃহীত হয়েছে। তবে সংগ্রহশালা ভবনটি নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে এটি যে জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালা হিসাবে গড়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য।’

মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী। ভাগীরথীর স্রোতপথ ধরেই একদা এখানে গড়ে উঠেছিল নগর, জনপদ। বিকাশ ঘটেছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির। জিয়াগঞ্জ এই জেলারই একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। কলকাতা-হাওড়ার মতোই দ্বৈত শহর এই জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ। শহর দুটি বিভাজিত হয়েছে উভয় শহরের মধ্যাঞ্চল দিয়ে বয়ে চলা ভাগীরথী নদী দ্বারা। ভাগীরথীর পূর্বতীরে লালবাগ মহকুমার এই শহরটি মুর্শিদাবাদ শহর থেকে উত্তরে মাত্র ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে সরিয়ে এনে নিজের নামানুসারে নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ তৎকালীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কেন্দ্রীয় রাজধানী হওয়ার কারণে এই জেলার কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, বালিঘাটা প্রভৃতি বিভিন্ন শহরাঞ্চলে একে একে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। একসময় এই বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে ক্রমশ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় এবং ধনাভিলাষী ব্যক্তিদের আগমন ঘটতে থাকে। সেইসময় সুদূর রাজস্থান এবং মারওয়াড় অঞ্চল থেকে নওলাক্ষা, নাহার, দুগার, দুধোরিয়া প্রভৃতি ভাগ্যাম্বেষী বহু জৈন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। মূলত জৈন ব্যবসায়ীদের জন্যই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে।

এই স্থানেরই এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন জিয়াগঞ্জ-নেহালিয়া অঞ্চলের জমিদার প্রয়াত রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং নেহালিয়া। সুরেন্দ্রনারায়ণের পূর্বপুরুষ মণিকান্ত সিং একদা পাটনার বাকিপুর থেকে ভাগ্যাম্বেষণে মুর্শিদাবাদে আসেন। পেশায় তিনি ছিলেন তুলো ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি প্রায়শই নদীপথে জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলায় আসা-যাওয়া করতেন। ব্যবসার সুবিধার জন্য বাংলা ১১০৭-৮ সন নাগাদ তিনি জিয়াগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে সিং পরিবার এই অঞ্চলের জমিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এঁরা প্রকৃতপক্ষে বৃন্দেলখণ্ডের রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত।

সুরেন্দ্রনারায়ণের শিক্ষা শুরু হয় মুর্শিদাবাদ নবাবদের প্রতিষ্ঠিত নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনে। কলেজ জীবন অতিবাহিত হয় বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক গুরুদাস সরকার তাঁর সতীর্থ ছিলেন। প্রত্নবস্তু সংগ্রহের নেশার বাইরে সমাজসেবামূলক কাজের নেশাও তাঁর ছিল। জনহিতকর নানাবিধ কর্মসম্মে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। জড়িত ছিলেন জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে। এ জেলার খুব কম প্রতিষ্ঠানই তাঁর দান থেকে বঞ্চিত ছিল।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রিফর্ম কাউন্সিলের সদস্যপদে ব্রতী থাকেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের জন্য তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। জনকল্যাণে তাঁর অবদানের জন্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রায়-বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে কাইজার-ই-হিন্দ পদকের অধিকারী হন। এর বাইরেও সুরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তদানীন্তন সরকার এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকেও নানাবিধ পদক ও প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

তবে যে উদ্যোগের জন্য বাংলায় তাঁর স্মরণীয় এবং বরণীয় থাকার কথা, তা তাঁর সংগৃহীত পুরাবস্তুর এক বিশাল ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে একক প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা পুরাবস্তুসমূহ নিয়ে। এইসব পুরাবস্তুগুলি মূলত সংগৃহীত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিশেষভাবে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী আজিমগঞ্জ-মহীপাল-সাগরদীঘি-নবগ্রাম—এই চতুষ্কোণ ভূখণ্ড থেকে। উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত সম্পদ নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্যক্তি সুরেন্দ্রনারায়ণ, সেই সঙ্গে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার জন্য সুরেন্দ্রনারায়ণের ভাবনা-চিন্তা, দান, সর্বোপরি সংগ্রহশালাটি রূপায়ণের জন্য তাঁর উদ্যম এবং নিরলস প্রচেষ্টার কথা জেলার বাইরে তো বটেই, জেলার কজনই বা তার খোঁজ রাখে।

প্রায় চুয়ান্বিশ বছর পূর্বে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট সুরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর আজীবন সংগ্রহসমূহের দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জেলার কিছু সরকারি আধিকারিকসহ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জিয়াগঞ্জস্থিত ‘নেহালিয়া হাউসে’ এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় প্রস্তাবিত সংগ্রহশালাটি গঠন ও পরিচালনার প্রয়োজনে কতিপয় সরকারি এবং জেলার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পদাধিকারবলে যথাক্রমে সভাপতি এবং সহ-সভাপতি), সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং (সাধারণ সম্পাদক), দুর্গাপদ সিংহ, এম.এল.এ (সহ-সভাপতি), পান্নালাল সিং (কোষাধ্যক্ষ); পদাধিকারবলে সভ্য যথাক্রমে—মহকুমা শাসক, লালবাগ, সমাজশিক্ষাধিকারিক (মুর্শিদাবাদ), সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, অধ্যক্ষ (শ্রীপৎ কলেজ, জিয়াগঞ্জ), চেয়ারম্যান (মুর্শিদাবাদ পুরসভা), চেয়ারম্যান (জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভা) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তালিকাভুক্ত। এছাড়া সাধারণ সভ্য হিসাবে ছিলেন কালিনারায়ণ সিং, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ শিকদার, ইন্দ্র দুগার, বীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, শৈলেন অধিকারী, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেবরঞ্জন রায়চৌধুরী, মোহান্ত রামদাস আউলিয়া এবং শ্রীমণ্ডল গুপ্ত।

এই সভা মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। অবশ্য এর পূর্বে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর সংগ্রহসমূহ নিয়ে জিয়াগঞ্জে মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলাশাসককে একটি লিখিত প্রস্তাব দেন। সেইসঙ্গে প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ভবন তৈরির জন্য জমি দানেরও প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুরেন্দ্রনারায়ণ জিয়াগঞ্জস্থিত তাঁর বাসস্থান নেহালিয়া হাউসের সম্মুখে বেশ কিছুটা জমি (১৯০০ স্কো. মি.) দান করেন। সেই জমিতে তাঁর জীবিতকালে ১৯৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যথাক্রমে ৬৫,০০০ টাকা এবং ২৫,০০০ টাকার আর্থিক অনুদানে সংগ্রহশালার ভবন নির্মাণ শুরু হয়। কিন্তু

আদালতের নির্দেশে নির্মাণের কাজ দীর্ঘদিন স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে সুরেন্দ্রনারায়ণের দেহান্ত ঘটে। সেই কারণে সংগ্রহশালা ভবন নির্মাণের সমাপ্তি এবং সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা দেখে যাবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটেনি। তাঁর মৃত্যুর আড়াই বছর পরে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারী করে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা পরিচালনার জন্য ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ন্যায় পুনরায় দ্বিতীয়বার একটি সংগ্রহশালা পরিচালন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে সাধারণ সদস্যদের কিছু রদবদল হয়। প্রথম কমিটির অনেক সদস্যের প্রয়াণের কারণে নতুন কিছু সদস্য তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর আরও দু'একবার নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়েছে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রত্নবস্তুসমৃদ্ধ কোনো প্রদর্শনশালা গড়ে ওঠেনি। অতঃপর সংগ্রহশালা ভবন নির্মাণ সমাপ্তির পর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'নেহালিয়া হাউস'-এ রক্ষিত প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার পুরাবস্তুগুলির মধ্যে ভাস্কর্য সংগ্রহটি নবনির্মিত সংগ্রহশালা ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সেগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক ভাস্কর্যকলা তখন তিনটি কক্ষ সাময়িকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কোনো কারণে জনসাধারণের নিকট এর দ্বার তখন উন্মুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

'নেহালিয়া-হাউস'-এর উত্তরদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালাটি অবস্থিত। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এর অবস্থান, যেখানে রেল, সড়ক এবং নদীপথে অনায়াসেই পৌঁছানো সম্ভব। তবে সংগ্রহশালাটি এখনও সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এ ভাণ্ডারে কি রতন আছে, তা সাধারণজন তো দূরের কথা, বিশিষ্টজনেরও অজানা। কিছুদিন পূর্বেও সংগ্রহশালা ভবনটি আগাছার জঙ্গলে আকর্ষিত হয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। এ যেন শবরীর প্রতীক্ষা। দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরেও তার ঘুম ভাঙতে এ যুগের কোনো রামচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেনি। এই সংগ্রহশালার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন এবং যথাযথভাবে ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে এক নির্দিষ্ট স্থায়ী বেতনে একজন সহকারী কিউরেটর নিয়োগ করা হয়। প্রায় দুবছর পর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। তারপর এই পদে নতুন কোনো নিয়োগ আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। এই সহকারী কিউরেটর থাকাকালীনও এই সংগ্রহশালার দ্বার উন্মুক্ত হয়নি। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমানবেঙ্গ মুখোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর দ্বার উদঘাটন করেন। তথাপি আজও অর্গলবদ্ধ এই ভবনটি অনেক আশা নিয়ে তার ভাণ্ডারটি উন্মুক্ত করার অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

অতি সম্প্রতি (জানুয়ারি, ২০০৪) সংগ্রহশালা ভবনটির সংস্কারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তরভাস্কর্যগুলি যথাযথভাবে প্রদর্শনযোগ্য করে তোলার জন্য শো-কেস এবং উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিউজিয়াম ভবনের পশ্চিমদিকের দুটি কক্ষ প্রস্তরভাস্কর্যের গ্যালারির রূপ দেওয়া হয়েছে। মোট ছাব্বিশটি মূর্তি সেখানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে এই সংগ্রহশালা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের প্রবেশের এবং দর্শনের জন্য প্রস্তুত। অপেক্ষা শুধু পরিচালনযোগ্য উপযুক্ত কর্মীর।

এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলা বিশেষত বীরভূম জেলা থেকে সংগৃহীত অসংখ্য অমূল্য হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ এবং খুব স্বল্পসংখ্যক জৈন মূর্তি-ভাস্কর্য, শিলালিপি, কারুকার্যমণ্ডিত প্রস্তরস্তম্ভ এই সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য প্রত্নসম্ভার। এর মধ্যে বিষ্ণুমূর্তির আধিক্যই সবিশেষ। চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং নৃসিংহ অবতাররূপী বিষ্ণু ব্যতীত বৈষ্ণব ধর্মীয় মূর্তির তালিকার

মধ্যে গরুড়াকৃৎ নারায়ণীর একাধিক মূর্তি উল্লেখের দাবি রাখে। গরুড়পৃষ্ঠে উপবিষ্ট নারায়ণ বা বিষুসমূর্তির সন্ধান প্রায়শই পাওয়া গেলেও গরুড়াকৃৎ নারায়ণী মূর্তি সংখ্যার নিরিখে অপ্রতুল। এমন একটি নারায়ণী (৪০ সি.এম. X ৩৫ সি.এম.) এখানে চতুর্ভুজা (ছবি-১)। সালংকারা হলেও বাহুল্যবর্জিত অলংকারে ভূষিত। বাহু এবং উভয় পায়েই কিছু অংশ ভগ্ন। পদ-বন্ধনী বেষ্টিত দেবীর পদযুগল বাহন গরুড়ের উভয় হস্তের উপর রক্ষিত। অলংকরণ বর্জিত ত্রিরথ পাদপীঠের উপর বসার ভঙ্গি এবং পক্ষদুটির বিস্তারে বাহন গরুড়ের উড্ডীয়নমুখ ভঙ্গিটি স্পষ্ট। দেবীর ডান এবং বাঁ দিকের পশ্চাৎপটের উপর দুটি গজব্যাল উৎকীর্ণ। নারায়ণীর স্বক্ক এবং মস্তক বরাবর পশ্চাৎপট ভগ্ন। তবে এক্ষেত্রে দেবীর মস্তকের ডানদিকের সামান্য অংশ ছাড়া মূল মূর্তিটি অক্ষুণ্ণ। কালের নিরিখে মূর্তিটি আনুমানিক দশম শতাব্দীর।

এই প্রত্নসম্ভারের মধ্যে সংখ্যা এবং ভাস্কর্য শিল্পের গুণগত মান বা উৎকর্ষতার দিক থেকে শৈব ধর্মীয় মূর্তির মধ্যে মূর্তিতত্ত্বের নিরিখে দেবী দুর্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপের মূর্তি, উমা-মহেশ্বরের আলিঙ্গন মূর্তি, বহুহস্তবিশিষ্ট নৃত্যরত গণেশের মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে চামুণ্ডা, ভৈরব, নন্দী, কার্তিকেয়, ব্রহ্মা প্রভৃতি মূর্তিসমূহ। আর আছে গরুড়, বেণুগোপাল, হয়গ্রীব, বামন অবতার, লক্ষ্মী, কুবের ইত্যাদির মূর্তি। এর বাইরে আছে মুখলিঙ্গ, নাগস্তুভ, নবগ্রহ ফলক, দশাবতারের দীর্ঘ প্রস্তরফলক, মাতৃকাফলক, প্রস্তরনির্মিত খিলান, কারুকার্য-মণ্ডিত প্রস্তরনির্মিত খিলান, কারুকার্যমণ্ডিত প্রস্তরফলকের অংশবিশেষ ইত্যাদি বিবিধ প্রস্তর-ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল নমুনা বিশেষ। দশাবতারের দীর্ঘ প্রস্তরফলকটি তক্ষণশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এছাড়া এই সংগ্রহে সূর্যের বেশ কয়েকটি মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

আরবী ভাষায় এবং নাস্ক লিপিতে উৎকীর্ণ দুটি শিলালিপি এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। এই লিপি দুটির মধ্যে একটি সুলতান আলাল-দিন-হুসেন শাহের ৯২১ হিজরীতে (১৫১৫-১৬ খ্রি) উৎকীর্ণ। লিপিটি ৬৪সি.এম. X ৩৪সি.এম. মাপের কালো পাথরে দুটি লাইন সম্বলিত। লাইন দুটি বিভাজিত হয়েছে উভয়ের মধ্যবর্তী একটি সমান্তরাল বিভাজনরেখা দ্বারা।

আলোচিত লিপিফলকটি গুরুদাস সরকার মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার খেরুর গ্রামের নিকটবর্তী শেখের দীঘির পাশ থেকে আবিষ্কার করেন। অন্যান্য আরও পাঁচটি লিপিফলকের সঙ্গে আলোচ্য এই লেখটি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের (কলকাতা) তেরো সংখ্যায় (নতুন সিরিজের) প্রকাশিত হয়। এখানে ছবি ব্যতিরেকে কেবলমাত্র লেখটির পাঠ মুদ্রিত হয়েছে। লিপিটি পাঠে সুলতান আলাল-দিন-হুসেনশাহ-র রাজত্বকালে ৯২১ হিজরীতে একটি দীঘি খননের কথা জানা যায়।

দীর্ঘদিন যাবৎ লেখটির সন্ধান কেউ জানতেন না। কয়েক বছর পূর্বে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রীপ্রতীপকুমার মিত্র (রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, বেহালা) সুরেন সিং নেহালিয়ার সংগ্রহসমূহের মধ্যে এটি পুনরুদ্ধার করেন এবং ছবিসহ প্রকাশ করেন। (ছবি-২)

আলোচ্য সংগ্রহের বৌদ্ধমূর্তির মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দুবাছ বিশিষ্ট ললিতাসনে উপবিষ্ট লিপি সম্বলিত আনুমানিক দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধ তারা মূর্তিটি (৯৯ সি.এম. X ৪৭ সি.এম.)।

সম্ভবত তারার সাহচর্যে অশোকাকান্তা এবং একজটা এই দুই পার্শ্বদেবতা দণ্ডায়মান। মূর্তিটির পশ্চাৎপটের উপরিভাগের দুই প্রান্তে চারটি করে মোট আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি ভিন্ন ভিন্ন

রূপের তারামূর্তি দৃশ্যমান। পশ্চাৎপটের অন্তিম শীর্ষভাগে পাঁচটি উপবিষ্ট ধ্যানীবুদ্ধের ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি উৎকীর্ণ। লিপিটির সম্ভাব্য পাঠ “Sadhvi Sri (or Stri) Yasadharasya or Yasankarasya” (ছবি-৩)।

শিল্পগত উৎকর্ষতার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য চালচিত্রে লিপিসহ উপবিষ্ট প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তিটি (৩০সি.এম.×২০সি.এম.)। (ছবি-৪) মূর্তিটির হাত এবং পশ্চাৎপটের কিছু অংশ ভগ্ন। সরকারি নথিতে এটি বৌদ্ধ তারামূর্তি রূপে উল্লিখিত। এটির নির্মাণকাল আনুমানিক নবম-দশম শতাব্দী। আঃ দ্বাদশ শতাব্দীর উপবিষ্ট ব্রহ্মা (লিপিসহ), আঃ দশম-একাদশ শতকের ললিতাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ শিবমূর্তিটিও উল্লেখের দাবী রাখে। (ছবি-৫)

এই সংগ্রহের তালিকায় বিষ্ণুমূর্তির আধিক্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন রূপের চতুর্ভুজ বিষ্ণু, বিষ্ণুমূর্তির খণ্ডিত এবং ভগ্নাংশ, গুরুডাসীন বিষ্ণু, নৃসিংহ অবতাররূপী বিষ্ণু, দশাবতার ফলক প্রভৃতিসহ সরকারি নথিভুক্ত বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা সাতষট্টিটি। এগুলির নির্মাণকাল মোটামুটিভাবে আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। দু’একটি বেলেপাথরের বিষ্ণু ছাড়া আর সবগুলিই কালো কষ্টিপাথর নির্মিত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত দু’একটি বিষ্ণুমূর্তিও এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে।

নেহালিয়ার সংগ্রহের তালিকায় হিন্দুমূর্তির তুলনায় জৈনপুরাবস্তু বা জৈন দেবতার মূর্তির সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর একটি জৈন মূর্তির (১১৭ সি.এম. × ৫৭ সি.এম.) সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। মূর্তিটি ত্রয়োবিংশ জিন পার্শ্বনাথের (ছবি-৬)। সমপদ-স্থানক মুদ্রায় সর্পলাঙ্ঘিত পাদপীঠের উপর মূর্তিটি সংস্থাপিত। পশ্চাৎপটও সর্পকুণ্ডলী এবং সপ্তসর্পফণা বিশিষ্ট। সর্পচন্দ্রাতপের উপর কেবলবৃক্ষ দেবদারু দৃশ্যমান। পার্শ্বনাথের মস্তকের উপর এবং পশ্চাৎপটের উপরিভাগের ঠিক মধ্যস্থলে শাসনদেবতা উপবিষ্ট, দুপাশে দুটি উড়ন্ত গন্ধর্ব্ব। পার্শ্বনাথের দুপাশে জিন মাতা-পিতা দণ্ডায়মান। পাদপীঠের মধ্যবর্তী অংশে চক্র এবং দুপাশে দুটি সিংহমূর্তি খোদিত। মূর্তিটির পশ্চাৎপট সম্পূর্ণরূপে অলংকরণ বর্জিত। জিন পার্শ্বনাথ খুব স্বল্প আভূষণে ভূষিত। কর্ণে কুণ্ডল এবং জটামুকুট দৃশ্যমান।

এই সংগ্রহে কিছু মূল্যবান পটচিত্রও স্থান পেয়েছে। বীরভূমের পটুয়াদের আঁকা পট এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। তিনটি জুড়ানো পটের উল্লেখ করা যায়। একটি রামায়ণের কাহিনি নিয়ে চিত্রিত। দৈর্ঘ্যে এটি চার মিটার এবং প্রস্থে ৮১ সি.এম। আর একটি পট জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম সম্পর্কিত। মাপের দিক থেকে এটি ৩৯৩ সি.এম. × ৮২ সি.এম। এছাড়া কৃষ্ণ কাহিনি অঙ্কিত আর একটি পট যেটি ১৮১ সি.এম. × ৬৮ সি.এম. বিশিষ্ট। এই তিনটি পটই ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিত্রিত। (ছবি-৭, ৮, ৯)

বেশ কিছু মুদ্রা—সুলতানী, আফগান ও মোগল যুগের এই সংগ্রহের তালিকায় দেখা যায়। তবে অধিকাংশ মুদ্রাই অনেক পরবর্তীকালের। বিভিন্ন দেশের কিছু আধুনিক মুদ্রাও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। নবাবী আমলের কিছু অস্ত্র-শস্ত্রের সন্ধানও এখানে মেলে। মুদ্রা এবং অস্ত্রের সংগ্রহ লালবাগ ট্রেজারিতে রক্ষিত।

জেলার কুটিরশিল্পের কিছু মূল্যবান নিদর্শনও এই সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে। একসময় মুর্শিদাবাদের রেশম ও গজদন্তশিল্প ভারতবিশ্বব্যাপ্ত তো ছিলই, বহির্ভারতের নানাদেশেও এই শিল্পবস্তুর প্রভূত সুনাম এবং কদর ছিল। বিদেশের বাজারে চাহিদাও কিছু কম ছিল না। আলোচ্য সংগ্রহের

কিছু বালুচরী শাড়ী ও রুমাল শিল্পীর নিপুণতা এবং শিল্পবস্তুর অপার সৌন্দর্যের পরিচায়ক। বিদ্যুৎ শিল্পের এবং অধুনালুপ্ত মুর্শিদাবাদ জেলার একদা বিখ্যাত গজদন্ত শিল্পের কিছু নিদর্শন এই সংগ্রহের মূল্যবান সম্পদ।

বিভিন্ন ধরনের শিল্পকৃতি ছাড়াও সুরেন্দ্রনারায়ণের পুস্তক সংগ্রহটির বিষয়ে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে হাতে লেখা পুঁথিও দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু সংস্কৃত এবং কিছু বাংলা ভাষায় রচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বহু প্রাচীন পুস্তকও এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রথম সংস্করণের কপি, বঙ্গবাণী পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা ছাড়াও ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বহু উল্লেখযোগ্য পুস্তক এই সংগ্রহটিকে সমৃদ্ধ করেছে। পারিবারিক এই গ্রন্থাগারটি গড়ে তোলার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনারায়ণের অগ্রজ পান্নালাল সিং-এর অবদান অনস্বীকার্য।

সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত এই সমস্ত পুরাবস্তু, শিল্পবস্তু এবং গ্রন্থসমূহ মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালার মূল সংগ্রহ। এই সংগ্রহে এর বাইরে এখনও পর্যন্ত নতুন আর কোনো পুরাবস্তুর সংগ্রহ সংযোজিত হয়নি। তবে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের উপস্থিতিতে আলোচ্য সংগ্রহশালা পরিচালন কমিটির ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী এবং ধনী ব্যক্তি এই সংগ্রহশালা উন্মুক্ত হলে তাদের সংগৃহীত প্রত্নবস্তু দান করবেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।^২

পরিশেষে একটি মূল্যবান এবং অনন্য শিল্পবস্তু যা এই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেছে, তার সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। এই শিল্পবস্তু এক বিশেষ ধরনের তাস, 'গঞ্জিফা'। মোট বিরানব্বইটি তাসের একটি গুচ্ছ। প্রতিটি তাস গোলাকৃতি এবং ৪সি. এম পরিধি বিশিষ্ট। কাগজের উপর (Waste Paper) গালার প্রলেপ দেওয়া। এগুলি চিত্রিত তাস। নির্মাণকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। নেহালিয়ার সংগৃহীত দরবারী তাসগুলি (কোর্ট কার্ড) সম্ভবত মুর্শিদাবাদের স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত। একসময় মোগল দরবারের শিল্প-ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুর্শিদাবাদ দরবারের শিল্পীরা নবাবদের প্রতিচ্ছবি, দরবার দৃশ্য এবং অন্যান্য দৃশ্যচিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁরা গজদন্তে তৈরি সুদৃশ্য তাসও চিত্রায়িত করেছেন ক্ষুদ্র চিত্রশৈলীতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবার্ট ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ থেকে বত্রিশটি তাসের একটি গুচ্ছ ইংল্যান্ডে নিয়ে যান।

তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, মোটামুটিভাবে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইরান এবং ভারতবর্ষে এই তাসের প্রচলন ঘটে এবং ভারতে পৃষ্ঠপোষকতা পায় মোগল সম্রাটদের দ্বারা। মোগল সম্রাট আকবর যে গঞ্জিফা তাস খেলতেন, সেই তাস এবং তাসখেলার প্রচলন করেন তাঁর পিতামহ বাবর মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে।

আলোচ্য সংগ্রহের তাসগুলি ঘোড়া, হাতি, বাঘ ইত্যাদি জন্তুর উপর উপবিষ্ট উজিরের (মন্ত্রী) চিত্র সম্বলিত। দ্বিতীয় আর এক ধরনের তাসে সহচর পরিবৃত মীর-এর (রাজা) চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। আবার গাণিতিক মূল্য সম্বলিত (numeral value) আর এক ধরনের তাস এই গুচ্ছে আছে। এক একটি তাস এক থেকে দশ ত্রমিক সংখ্যা পর্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি জন্তুর প্রতিকৃতি (স্টাইলাইজড ফর্মে) চিত্রিত (ছবি-১০, ১১, ১২)। এক একটি চিত্রিত প্রতিকৃতি বা অবয়ব গাণিতিক মূল্যে একক হিসাবে নির্ধারিত হয়। এইভাবে এক থেকে দশ পর্যন্ত মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো সংগ্রহশালায় ছব্ব এই বিশেষ ধরনের গঞ্জিফা তাসের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে এটি একটি

মূল্যবান সংগ্রহ।

গঞ্জিফা তাসের সেটসহ এই সংগ্রহের সমস্ত প্রস্তরভাস্কর্যগুলি ভারত সরকারের ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ‘পুরাবস্তু ও বহুমূল্য কলাকৃতি অধিনিয়ম’ (The Antiquities & Art Treasures Act’ 1972) দ্বারা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নথিভুক্ত। নথিভুক্তিকরণের জন্য আবেদনের দায়িত্বে ছিলেন পদাধিকারবলে সেক্রেটারি হিসাবে লালবাগ মহকুমার মহকুমা শাসক। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা এবং কিউরেটর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে সুরেন্দ্রনারায়ণ সিং, ‘নেহালিয়া হাউস’-এ আহ্বান করেন তাঁর সংগৃহীত পুরাবস্তু চিহ্নিতকরণের (identification) জন্য। অধ্যাপক ঘোষ সেই সময় এই সমস্ত পুরাবস্তুর একটি তালিকা প্রণয়ন করেন। তালিকাটির একটি কপি জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারে (স্বর্গধাম, বহরমপুর) জমা দেওয়া হয়। এই প্রবন্ধের লেখক কর্মসূত্রে বহরমপুর যাত্রার প্রাক্কালে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নভাণ্ডার এবং প্রস্তাবিত মূর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালা সংক্রান্ত তথ্য জনতে পারেন প্রস্তাবিত এই সংগ্রহশালার প্রথম দুটি পরিচালন কমিটির (১৯৬০, ১৯৭৪) সদস্য শ্রীমণ্ডল গুপ্তের নিকট। শ্রীগুপ্তের নিকট আলোচ্য এই সংগ্রহশালা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার নেপথ্য কাহিনি শোনার পর এই অমূল্য রত্নভাণ্ডারটি দেখার জন্য উদগ্রীব হন। সুরেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমানে প্রয়াত কালিনারায়ণ সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ‘নেহালিয়া-হাউস’-এ রক্ষিত সংগ্রহটি সরঞ্জামে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর মনে হতে থাকে যে, এই অমূল্য ভাণ্ডারের প্রতিটি প্রত্নভাস্কর্য ‘পুরাবস্তু ও বহুমূল্য কলাকৃতি অধিনিয়ম, ১৯৭২’ অনুযায়ী নথিভুক্ত করা আশু প্রয়োজন। নচেৎ যে অবস্থায় ভাণ্ডারটি রক্ষিত, যে কোনো মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। কালিনারায়ণবাবুও এই বিপুল এবং অমূল্য সরকারি সম্পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের ক্রমাগত প্রচেষ্টায়, মূর্শিদাবাদ জেলাশাসক (পদাধিকারবলে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালার চেয়ারম্যান), লালবাগ মহকুমার মহকুমা শাসক (পদাধিকার বলে এই সংগ্রহশালার সেক্রেটারি), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি, প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষেত্রের ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগের মাধ্যমে অবশেষে এই মহামূল্যবান সংগ্রহটি নথিভুক্তিকরণের আওতায় নিয়ে আসার অনুমতি পাওয়া যায়। এবং অবশেষে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই সম্পদটি নথিভুক্ত হয়। এই কর্মযজ্ঞে লালবাগের তৎকালীন মহকুমা শাসক মিঃ পাণ্ডা, মহকুমা শাসকের অফিসকর্মী এবং সর্বোপরি কালিনারায়ণ সিং-এর সহযোগিতা এবং প্রচেষ্টা স্মরণীয়। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার মুখে, তথাপি প্রয়াত সুরেন্দ্রনারায়ণ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রয়াত কালিনারায়ণের স্বপ্ন, আশা আজও বাস্তবায়িত হলো না। অথচ আজ থেকে প্রায় উনষাট বছর পূর্বে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত বাংলার ভাস্কর্য এবং কুটিরশিল্পের একটি অমূল্য, অনবদ্য সংগ্রহ নিয়ে এই পশ্চিম বাংলায় একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয় বঙ্গীয় ব্রতচারী সমিতির তত্ত্বাবধানে, যা আজ ভুবন-বিখ্যাত। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ড. বিধানচন্দ্র রায় সেই সংগ্রহশালার দ্বার উদঘাটন করেন। দুবছর পর ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বজনের জন্য তার দরজা উন্মুক্ত হয়।

কালিনারায়ণবাবু এবং সুরেন্দ্রনারায়ণবাবু জীবিত থাকলে আক্ষেপের সঙ্গে হয়ত স্বগতোক্তি করতেন—

“আশার ছলনে ভুলি”

কি ভুল করিনু হয়!!

এই অমূল্য প্রত্ননিদর্শনের ভাণ্ডারটি যথাযথভাবে জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হলে এদের স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে এবং এদের বিদেহী আত্মাও শান্তি পাবে।

তথ্যসূত্র

- ১ Pratip Kr. Mitra : "Unnoticed Stone Inscription of The Husayn Sahi Sultans of Bengal", *Journal of Bengal Art*, Vol. 2, 1997, The International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka, Bangladesh, pp 254-55.
- ২ প্রতীপ মিত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন।
- ৩ প্রবন্ধে আলোচিত তারা মূর্তিটিতে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন ড. শ্যামচাঁদ মুখার্জী। মূর্তিটির দুই পার্শ্বদেবতার নামও চিহ্নিত করেছেন তিনি।
- ৪ উমানাথ রায়, *পরিক্রমা* : নবপর্যায় : ষষ্ঠবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২৪শে আগস্ট, ১৯৬০, বহরমপুর।
- ৫ মৃণাল গুপ্ত, *পরিক্রমা*, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০, বহরমপুর।
- ৬ শোক-তর্পণ : ২৫শে মার্চ, ১৯৭২, জিয়াগঞ্জ (সুরেন্দ্র নারায়ণের পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে প্রকাশিত)।
- ৭ Rudolf Von Leyden with contributions by Michael Dummett : *Ganjifa : The Playing Cards of India : A general Survey with a catalogue of the Victoria and Albert Museum Collection* : London, Victoria and Albert Museum, 1982.
- ৮ কিছু প্রাসঙ্গিক সরকারী নথিপত্র।
- ৯ শ্রীমৃণাল গুপ্ত।
- ১০ প্রয়াত কালিনারায়ণ সিং নেহালিয়া।
- ১১ প্রয়াত কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ১২ শ্রীঅক্ষণাভ মিত্র।

অবশেষে সম্প্রতি ২৮।৬।২০০৪ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার বিদায়ী জেলাশাসক শ্রীমনোজ পঙ্ক মহাশয় জিয়াগঞ্জস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলা সংগ্রহশালার দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের বাকি ছয়দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টো পর্যন্ত দর্শকদের জন্য এই সংগ্রহশালা খুলে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রবেশমূল্য ধার্য হয়েছে পাঁচ টাকা।

মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য*

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আজকাল দেশ জুড়িয়া আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, উর্দু। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ভারতের মুসলমানেরা সকলেই এক; সুতরাং তাহাদের মাতৃভাষাও এক। তাঁহারা আরও বলেন যে, অধিক পরিমাণে রাজনীতিক স্বার্থরক্ষার্থ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের সমস্ত প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে একতার বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মুসলমান অধিবাসিগণের মাতৃভাষা উর্দু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা এ দলের এই যুক্তি-তর্কের যথাযথ উত্তর বহু বার বিভিন্ন উপায়ে দিয়াছি। ভাষা এক না হইলে যদি মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপনের অপর কোন প্রশস্ত পথ না থাকে, তবে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানের মাতৃভাষা আরবী হওয়া উচিত। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই—ইহাই কোরাণের শিক্ষা। কিন্তু কোরাণে** অথবা হাদিসে*** মাতৃভাষা সম্বন্ধে ত কোন আদেশ ও বিধিব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না? ভাষা এক করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, আর ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অপর স্থানের মুসলমানেরা কি ভাসিয়া যাইবে? তাহার পর আর একটি কথা,—ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক। পৃথিবীর সাধারণ নিয়মানুসারে ন্যূনসংখ্যক ব্যক্তির সতত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিদের সহিত যোগদান করিয়া থাকে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা পৃথিবীর এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইবে কেন?—তাহারাই বা আত্মসম্মান ভুলিয়া পরের মাকে মা বলিবে কেন? রাজনীতিক স্বার্থরক্ষা ও একতা বৃদ্ধি অথবা একতা সুদৃঢ় করিবার জন্য যদি তাঁহাদের হৃদয় ত্রন্দন করে, তবে অল্পসংখ্যক তাঁহারাই কেন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করুন না? অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানকে কষ্ট না দিয়া যাঁহারা সংখ্যায় অল্প, তাঁহারাই এ কষ্টটুকু স্বীকার করুন না কেন?

আর এক দল বলিতেছেন,—বাঙ্গালী মুসলমানেরা বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সেই জন্য তাহারা বঙ্গভাষার সেবায় এত উদাসীন। হিন্দুদিগের সহিত একযোগে যখন তাহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহারা বঙ্গ-জন্যের সন্তান হইয়াও বঙ্গভাষা-জন্যের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখার আবশ্যিকতা স্বীকার করে না।

* নবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

** মুসলমানদিগের ধর্মবিশ্বাস মতে কোরাণ ঈশ্বরের বাক্য।

*** ধর্মগুরু হজরত মোহাম্মদ (দং) যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই হাদিস।

তৃতীয় দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার সেবা ও তাহার চর্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বন্ধিম প্রভৃতি লেখকদিগের তীব্র কষাঘাতে মধ্যপথ হইতে তাহাদিককে ফিরিতে হইয়াছে। তাই তাহারা হিন্দুদিগের তুলনায় বঙ্গভাষার চর্চায় এত পিছাইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার অনুশীলনে পূর্বে যেরূপ উদাসীন ছিল, এখন আর তাহাদের মধ্যে সেরূপ উদাসীন্য ভাব বর্তমান নাই। তাহারা এখন পূর্বাপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছে।

আমার মনে হয়, ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথম দলের উক্তি যে সমর্থনের অযোগ্য, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলের উক্তিও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মুসলমানদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এ পর্যন্ত যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতারা যে হিসাবে ও যে ভাবে এবং যতটা পরিমাণে বাণী-মাতার সেবা করিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরাও সেই হিসাবে এবং সেই ভাবে প্রায় ততটা পরিমাণে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। কেন, কি সাহসে দেশের আধুনিক শিক্ষিত জনসাধারণের এই সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে এত বড় কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছি, নিম্নে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় সমান ভাবে সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে দেশের আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ উল্টা ধারণা জন্মিল কেন, প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক। অনেক দিন হইতে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিতদিগের মনে এইরূপ ধারণা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।—একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু এবং আধুনিক শিক্ষিত ও হিন্দুভাবাপন্ন দুই চারি জন মুসলমান, মুসলমানদিককে “ভাষা-জ্ঞানীর সেবক নহে” বলিয়া বুঝিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সেই কারণের উল্লেখ করিতেছি।

অধুনা হিন্দু-ভ্রাতারা আসল বাঙ্গালা ভাষাকে একপ্রকার বর্জ্য করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা এখন বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্বে যে সমস্ত আরবী, পার্শী ও উর্দু শব্দ বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, এখন সেগুলিকে বহিষ্কার করিয়া দিয়া নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ আনিয়া তৎস্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কার্যে যে তাঁহারা কত দূর কৃতকার্য হইতেছেন, অথবা কৃতকার্য হইবার আশা করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

মুসলমানেরা বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গভাষার সহিত আরবী, পার্শী এবং উর্দু শব্দের ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না; তাঁহারা আবশ্যিকীয় আরবী, পার্শী ও উর্দু শব্দকে বর্জ্য করিয়া মাতৃভাষার আলোচনা ও সেবা করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও মাতৃভূমি বঙ্গদেশ হইলেও, তাঁহাদের ধর্মভাষা আরবী এবং পার্শী-উর্দুও কতকটা বটে। সুতরাং আরবী ও পার্শী-উর্দু ভাষায় বিশেষ ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে, ধর্মের বিধি, নিষেধ, ব্যবস্থা ও আদেশগুলি বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া তাহা প্রতিপালন করত ধর্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে না কি? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আরবী, পার্শীভাষায় আলেম (পণ্ডিত)

হওয়া ত সম্ভব নহে? তবে যদি তাঁহারা (বাঙ্গালী মুসলমানেরা) মাতৃভাষায় সমাজের আলেমমণ্ডলীর দ্বারা ধর্মগ্রন্থগুলি অনুবাদ করাইয়া লন, তাহা হইলে সেই সমস্ত অনুদিত পুস্তকের সাহায্যে তাঁহারা নিজে নিজেই স্বীয় ধর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া, কর্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন।

কিন্তু মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তন্মধ্যে আরবী, পার্শী শব্দ রাখিতেই হয় এবং কোন কোন স্থলে এমনও আবশ্যিক হইয়া পড়ে যে, প্রচলিত দুই চারিটি আরবী, পার্শী শব্দ ব্যতীত অপ্রচলিত আরবী, পার্শী শব্দও ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, আরবী বা পার্শী ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এখন নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কখনও সৃষ্টি হইতে পারিবে, সেরূপ আশাও নাই। আবার বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরাসরি ভাবে ধরিয়া লইলে তাহাদিককে কোন কোন আরবী, পার্শী শব্দের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ভাব ও অর্থের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই একটি মূল শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত তাহার প্রতিশব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“আল্লাহ” বলিলে একমাত্র ও নিরাকার খোদাতায়ালাকেই বুঝায়, আর পাঁচটি শব্দ যোগ করিয়া বুঝাইতে হয় না; কিন্তু ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। “রওজা” বলিলে পীর, ওলি ও পয়গম্বরদিগের কবরকেই বুঝায়। সাধারণ মানবের কবরের সহিত “রওজার” আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু গোর বা সমাধি বলিলে কি তাহা বুঝায়? “ইমাম”, “পয়গম্বর”, “গওস্”, “কোতব্” বলিলে যেমন বিশেষ বিশেষ ধর্মগুরুদিককে বুঝায়, “মহাপুরুষ”, “মহাত্মা” বলিলে কি তাহা বুঝিতে পারা যায়? “আলেম”, “ওলামা”, “মওলানা” বলিলে যাহা বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলে কি তাহা বুঝাইয়া থাকে? “আলেম” ও “ওলামা” বলিলে, মুসলমানেরা আরবী ও পার্শীভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং পণ্ডিতমণ্ডলীকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু “পণ্ডিত” ও “পণ্ডিতমণ্ডলী” বলিলে কি আরবী, পার্শীর নামোন্মেষ করিয়া বুঝাইতে হয় না? আবশ্যিক হইলে মুসলমানদিগের নিত্যাবশ্যকীয় এরূপ বহু শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত অথবা আবশ্যকীয় অপ্রচলিত আরবী ও পার্শী শব্দ বঙ্গভাষা হইতে বাদ দিলে কিম্বা আবশ্যিক হইলে নূতন শব্দ গ্রহণ না করিলে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ধর্মালোচনায় বাধা জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক। কেবল তাহাই নহে—আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে আবশ্যকীয় নব নব শব্দ গ্রহণ না করিলে, কিছুতেই বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ এবং ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিব না। আমার আরও মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াই এ পর্যন্ত বঙ্গ ভাষার কলেবর এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

বঙ্গভাষা হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও সেইরূপ। কেবল নাটক, নভেল, উপন্যাস লিখিবার অথবা তাহা পাঠ করিবার জন্যই বঙ্গভাষা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মাতৃভাষা শিক্ষার এবং তাহার আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মাতৃভাষার সাহায্যে ও সহায়তায় সহজে আপন আপন ধর্মকর্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা। কিন্তু বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে যদি আবশ্যকীয় আরবী ও পার্শী শব্দ বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝিতে

হইবে যে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষার অধিকার হইতে বে-দখল করা হইতেছে।

অতঃপর সংস্কৃতভাষার কথা। শুনিতে পাই, সংস্কৃত দেবভাষা। সে ভাষা শিক্ষা ও আলোচনা করিবার অধিকার “ম্লেচ্ছ” মুসলমানদিগের নাই। আজকাল যদিও দুই চারি জন মুসলমান ছাত্র, নানা কারণে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা যে “কট-মট” শিক্ষা, প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা নানা কারণে যে তাহাদের সাধ্যাতীত, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দ্বিবিধ কারণে, হিন্দুদের সহিত একযোগে মুসলমানেরা বাণীর সেবা করিবার জন্য দলে দলে বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। তাই তাহারা জন্মভূমির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিন্দুভ্রাতাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই কনিষ্ঠ মুসলমান কিরূপ নীরব সাধনাদ্বারা ভাষা-জননীর চরণ সেবা করিতেছে, তাহা হিন্দুভ্রাতারা দেখিতে পাইতেছেন না।

মুসলমানেরা আরবী, পার্শী ও উর্দুর “মোহ” ধর্মসিদ্ধত কারণে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এবং বর্তমান সংস্কৃতবহুল বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাঁহারা বাণী-মন্দিরে* প্রবেশ করিতে সাহসী হন না। তাই তাঁহারা আপনাপন পূর্বকুটীরে বসিয়া আপনাদের শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে মাতা বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমাদের সেই একনিষ্ঠ সাধক ভ্রাতাদিগের সাধনার কোন সংবাদই রাখি না। তাঁহাদের এই কার্যের জন্য উৎসাহপ্রদান এবং ধন্যবাদ করার পরিবর্তে আমরা তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক ব্যবহার এবং ঘৃণা-ভাবই তাঁহারা তাঁহাদের নীরব সাধনার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের মুসলমান-পরিচালিত প্রায় ৪০টি ছাপাখানায়, এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা হইয়া, তাহা বাজারে প্রচার এবং বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আমরা কি তাহার কোন খবর রাখি? শিক্ষিতাভিমাত্রী বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমরা, সেই সমস্ত পুস্তকের “বটতলার পুথি” এই নাম দিয়া আমাদের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছি। “বটতলার পুথি” পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা, নামটি শুনিতেই যেন আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—গায়ে জ্বর আইসে। ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখার ন্যায়, আমরা ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কু-কুটিপূর্ণ ও কু-কথার ভাণ্ডারের ছায়া দেখিতে পাই। তাই “বটতলার পুথি” হাতে লওয়াও মহাপাপ বলিয়া মনে করত ঘৃণায় নাসিকা কুণ্ঠিত করিয়া থাকি।

যে সমস্ত পুস্তক (“বটতলার পুথি”) সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, তন্মধ্যে হইতে দুই চারিখানি বাদ দিলে, অবশিষ্ট সকল পুস্তকগুলিই যে পদ্যাকারে লিখিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের কাব্যশক্তি, শব্দযোজনার ক্ষমতা, তাঁহাদের কাব্যে ভাষার লালিত্য, স্বাভাবিকতা ও মৌলিকতা এত অধিক পরিমাণে বর্তমান যে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়; আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। এই হতভাগ্য ও অকৃতজ্ঞ দেশে না জন্মিয়া যদি তাঁহারা অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাদের পারলৌকিক আত্মা শান্তিলাভ করিতে পারিত।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

হিন্দুশ্রুতাদিগের বাঙ্গালা “রামায়ণ” ও “মহাভারত” যেমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, মুসলমানদিগের “বটতলার পুথি”, “আমীর হামজা” এবং “দাস্তান আমীর হামজাও” সেইপ্রকার উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আবার কাব্যের দিক্ দিয়া সমালোচনা করিলে “রামায়ণ” ও “মহাভারত”কে যেমন মহাকাব্য বলা যাইতে পারে, “আমীর হামজা” ও “দাস্তান আমীর হামজা” নামক গ্রন্থ দুইখানিকেও সেইপ্রকার মহাকাব্য বলিলে, কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। “রামায়ণ” ও “মহাভারতের” সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার অপর কোন গ্রন্থ যদি বঙ্গভাষায় থাকে, তবে সে শাহ গরীব-উল্লা ও সৈয়েদ হামজার রচিত “আমীর হামজা” এবং বালেশ্বরের মৌলবী আব্দুলমজিদ ভূঞা-রচিত “দাস্তান আমীর হামজা”। কিন্তু “দাস্তান আমীর হামজার” ভণিতায় রচয়িতা স্বীয় নাম ব্যবহার না করিয়া, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নামও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এবং ইনিই অন্যতম “মুসলমান বৈষ্ণবকবি” কালিদাস। কিন্তু “দাস্তান আমীর হামজা” গ্রন্থ যে মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের রচিত নহে, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

গত বৎসর (১৩২২ সাল) বর্ধমান-অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, মুসলমান সাহিত্যিকদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হঠাৎ আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং আমি আমার অগ্রজপ্রতিম পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সহিত এতৎসম্বন্ধে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত না করিলে বোধ হয়, আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতাম না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেন। এমন কি, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকার কালে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন মাত্র পূর্বে, যখন আমি তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখনও তিনি এই কার্যের জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহদান করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু হায়! আজ তিনি কোথায়? আমার কার্য শেষ হইবার পূর্বেই তিনি চিরশান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

যদিও দীর্ঘ এক বৎসর কাল আমি এই অনুসন্ধানের জন্য সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সংসারের নানাপ্রকার ঝঞ্জাটে পড়িয়া, আমি যথানিয়মে এই কার্যে সময় ব্যয় করিতে পারি নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে গত পৌষ মাস হইতে আমি এই অনুসন্ধান-কার্যে লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতৎসম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জানিতে পারিয়াছি যে, এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান কবি, পূর্ব্বকথিত “বটতলার পুথি” নামক ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এখনমাত্র ৪৪৪৬ খানি কাব্য ছাপা হয় ও বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খানি কাব্যের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ৭৯৫ খানি পুস্তক ওয়ারিশদিগের মধ্যে আত্মকলহের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি গ্রন্থের প্রচার সরকার বাহাদুর আইন অনুসারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম।
যথা,—

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ১ অভয় দুর্লভ | ৩৭ আফতাব দাস্তান |
| ২ অষ্টখণ্ড | ৩৮ আব্দুল্লাহ হাজার সওয়াল |
| ৩ আশকে রসুল | ৩৯ ইউসুফ জেলেখা |
| ৪ আশকে মোহাম্মাদী | ৪০ ইবলিসনামা |
| ৫ আজায়েব চার ইয়ার | ৪১ ইন্দ্রসভা |
| ৬ আলাওদ্দিন | ৪২ ইমাম যাত্রা |
| ৭ আহমকনামা | ৪৩ ইব্রাহিম আদহাম |
| ৮ আকুল ক্রন্দন | ৪৪ ইসলামে দিন |
| ৯ আবেদা বিবি | ৪৫ ইমাম চুরী |
| ১০ আজায়েব সোলেমানী | ৪৬ ইমামবধ নাটক |
| ১১ আহকাম শরিয়ৎ | ৪৭ ইসলামোন্মেকা |
| ১২ আদম ও হাওয়া | ৪৮ ইসলামিয়া মজ্ব |
| ১৩ আকেবত-বায়ের | ৪৯ একে জহর ও জাহান্ আরা |
| ১৪ আবুশামা | ৫০ একদিল শাহ |
| ১৫ আসমান সিংহ | ৫১ এলাজে বাঙ্গলা প্রথম ভাগ |
| ১৬ আরবা আরবাইন হাদিস | ৫২ „ „ দ্বিতীয় ভাগ |
| ১৭ আমীর হামজা | ৫৩ „ „ তৃতীয় ভাগ |
| ১৮ আলেফ লায়লা | ৫৪ এলাজে গাও |
| ১৯ আহকামল জবেহ | ৫৫ একশত ত্রিশ ফরজ |
| ২০ আহকামল জুমা | ৫৬ এসরারল ওজুদ |
| ২১ আখবারল ওজুদ | ৫৭ এলাজ-উল্ ফোকরা |
| ২২ আশ্বিয়ার বাণী | ৫৮ ওম্মর উশ্মিয়ার নকল ও ভোজেরবাজী |
| ২৩ আদম আশক | ৫৯ ওম্মর আলী ইরবতী |
| ২৪ আজায়েবল ওজুদ | ৬০ ওজুদনামা |
| ২৫ আলী ও দিলবাহার | ৬১ ওয়ারেসাতুল আশ্বিয়া |
| ২৬ আখবারস্ সালাত | ৬২ ওফাতনামা |
| ২৭ আদম ওজুদতত্ত্ব | ৬৩ ওসিয়াতুস্ সালেহীন |
| ২৮ আশকনামা | ৬৪ কালর নসিহত |
| ২৯ আসরারস্ সালাত | ৬৫ কওলেল আরেফিন |
| ৩০ আজায়েবল কবর | ৬৬ কালু গাজী ও চম্পাবতী |
| ৩১ আলম স্বামী বাহারজান | ৬৭ কটুর মিঞা |
| ৩২ আহকামল মোস্লেমিন্ | ৬৮ কালু গাজী হামিদিয়া |
| ৩৩ আহকামল হেদায়েৎ | ৬৯ কাঞ্চনমালা |
| ৩৪ আখলাকাল আউলিয়া | ৭০ কাশাসোল আশ্বিয়া |
| ৩৫ আজকারে তরিকায়ে কাদেরিয়া | ৭১ কলিয় চরিত্র |
| ৩৬ আহকামল ইসলাম | ৭২ কালমবী |

৭৩ কেয়ামতনামা	১০৯ গাজী কালু চম্পাবতী
৭৪ কাশফল মারফত	১১০ গেদে গোল হররোজ
৭৫ কলি জমানা	১১১ গঞ্জে মারফৎ
৭৬ কল্‌মা মোনাজাত	১১২ গোলজারে ইব্রাহিম
৭৭ কাশফল এস্‌রার	১১৩ গমের দরিয়া
৭৮ কাজী হয়রান	১১৪ গোল কামরোজ
৭৯ কুঞ্জবিহারী	১১৫ গোলে কোহিনূর
৮০ কাজীনামা	১১৬ গঞ্জে নূর ইস্‌লামেদিন
৮১ কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী	১১৭ গোলজারে আকরম
৮২ খানে নিয়ামত	১১৮ গাঞ্জল আরস (বাঙ্গালা)
৮৩ খাবনামা	১১৯ গোলে নওনেহার
৮৪ খায়রে দো-জাহান	১২০ ঘুণিনামা
৮৫ খোলা সাতল্‌ মসায়েল	১২১ চৌত্রিশ অক্ষরের কজিলত
৮৬ খোলাসাতমেকা	১২২ চোরচক্রবর্তী
৮৭ খোলাসাতল আশ্বিয়া	১২৩ চেমন বাহার
৮৮ খতনামা	১২৪ চন্দ্রাবলী
৮৯ ষোড়শ ১ম ও ২য় ভাগ	১২৫ চাহার দরবেশ
৯০ খোতবা (বাঙ্গালা)	১২৬ চৌদ্দ উজির
৯১ খোলাসাতল হায়েজ	১২৭ চন্দ্রাওলি বিশ্বকেষু
৯২ খায়ের-উল্‌বশর	১২৮ ছিলচত্র রাজার জঙ্গ
৯৩ গোলে আরজান্	১২৯ ছম্‌ছমল মওয়াহেদিন
৯৪ গোলে আন্দাম	১৩০ ছমির জালাল
৯৫ গরক্‌নামা	১৩১ জেবল মুলুক শামারোক
৯৬ গোলে নওবাহার	১৩২ জঙ্গে হয়দার
৯৭ গোলে বকাওলী	১৩৩ জান রওশন
৯৮ গোলে হরমুজ	১৩৪ জঙ্গে খয়বর
৯৯ গোলজারে আতশ	১৩৫ জুগী কাছের (যোগী কাছের)
১০০ গোলবা বাহরাম	১৩৬ জৈগুণ
১০১ গোল্‌ সনুবর	১৩৭ জামাই শশুরের ঝগড়া
১০২ গোলশানে মোহাক্কাত	১৩৮ জঙ্গে নওশাদ
১০৩ গোলশানে রুম	১৩৯ জঙ্গে জামাল
১০৪ গোলজাদি বিবি	১৪০ জঙ্গে রসূল ও জঙ্গে হজরত আলী
১০৫ গোলশানে আজায়েব	১৪১ জঙ্গে বল্‌কান
১০৬ গোলে বেথেজান	১৪২ জাহরা বিবির কেস্‌সা
১০৭ গোলবা সানুওয়ার	১৪৩ জঙ্গনামা
১০৮ গোলে নূর রওশন জামাল	১৪৪ জঙ্গে সোহরাব

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ১৪৫ জঙ্গের কারবালা | ১৮১ নূরুল ইমান |
| ১৪৬ জাওয়াকল ইমান | ১৮২ নসিহতনামা |
| ১৪৭ জকিনামা | ১৮৩ নসিহতে জানানা |
| ১৪৮ জমজমার কেসসা | ১৮৪ নূরনামা |
| ১৪৯ জেয়ারতে কবর | ১৮৫ নজমনিসা |
| ১৫০ জঙ্গ হযদার | ১৮৬ নবী-নামা |
| ১৫১ জোল্মাতনামা | ১৮৭ নাজাতলওয়া |
| ১৫২ জুরা-সূরা | ১৮৮ নসিহতনামা |
| ১৫৩ জেয়ারতে মক্কা | ১৮৯ নজ্জুমী কালাম |
| ১৫৪ জবেহ আহকাম | ১৯০ নসিহতল ফোসসাক |
| ১৫৫ জোবেদা খাতুন | ১৯১ নূর বখ্ত নওবাহার |
| ১৫৬ জামিনী ভান্ | ১৯২ নাজাতল আরওয়াহ |
| ১৫৭ জল্‌সা নামা | ১৯৩ নেক বখ্ত খসম পিয়ারী |
| ১৫৮ জমানল ফেরদওস | ১৯৪ নসিহতে আহলে কলি |
| ১৫৯ যোগী কাচ বাড় | ১৯৫ নসিহতে ঘোর কলি |
| ১৬০ জাদু তেলসুমাত | ১৯৬ নসিহতে আম |
| ১৬১ জেয়াফতে আম্ | ১৯৭ নসিহতল ইমান |
| ১৬২ ঝগড়ানামা | ১৯৮ তকরার দাফে জোল্মাত |
| ১৬৩ নূরজাহান | ১৯৯ তিলিস্‌ সমে হোলরোবা |
| ১৬৪। নেকবিবি | ২০০ তমিমগোলাল |
| ১৬৫ নসিহতে করিমী | ২০১ তক্বিয়েতল ইমান |
| ১৬৬ নূরল বসর | ২০২ তিলিসমাত সোলেমানী |
| ১৬৭ নব চিকিৎসাবোধ | ২০৩ তালেনামা |
| ১৬৮ নওখরিদ পাহালওয়ান | ২০৪ তুতিনামা |
| ১৬৯ নারিকেলবেড়ের লড়াই | ২০৫ তেব্‌কনবী |
| ১৭০ নিয়েতনামা-হেদায়েৎ উল্‌ ইসলাম | ২০৬ তাজ্জেক্‌রাতুল আউলিয়া |
| ১৭১ নারীপুরুষ | ২০৭ তাজ্জকিরাতুল্লোসা |
| ১৭২ নাজাতোল ইসলাম | ২০৮ তাজ্জ-উল্‌ আলম |
| ১৭৩ নবীন্‌ মঙ্গল বিষহরা | ২০৯ তশ্বিহল্‌ জাহেলীন |
| ১৭৪ নসিহতসসালাত | ২১০ তফসির বিস্মিন্নাহ |
| ১৭৫ নকশে সোলেমানী, প্রথম খণ্ড | ২১১ তুস্তনামা |
| ১৭৬ " " দ্বিতীয় খণ্ড | ২১২ তৃষণবতী বিরামুর |
| ১৭৭ " " তৃতীয় খণ্ড | ২১৩ তোহফাতুল নসিহত |
| ১৭৮ " " চতুর্থ খণ্ড | ২১৪ তাজ্জল আলম মাহিগীর |
| ১৭৯ নদেরচাঁদ কুস্তীর (১) | ২১৫ তোহফাতুল মোস্‌লেমিন্‌ |
| ১৮০ নেজাম পাগলা | ২১৬ তফসির ফজায়েলে বিস্মিন্নাহ |

- ২১৭ তেলাওতল ওজুদ
 ২১৮ তখিয়াতম্বেসা
 ২১৯ তোহফাতল্ মোবতাদী
 ২২০ তবলিগুল ইসলাম
 ২২১ তারিখে আবুহানিফা
 ২২২ দাকাএকল হেকাএক
 ২২৩ দেলরোবা চারচমন
 ২২৪ দেলারাম
 ২২৫ দলিল-উল্ আহকাম
 ২২৬ দারা সেকান্দারনামা
 ২২৭ দেলপসন্দ
 ২২৮ দিনকানা শ্বশুর
 ২২৯ দেলবাহার গোলেস্তান
 ২৩০ দেলফেরেব পিয়ারজাহান
 ২৩১ দিদার ইলাহী
 ২৩২ দরবেশনামা
 ২৩৩ দেলদিওয়ানা
 ২৩৪ দোররাতল মোমেনিন
 ২৩৫ দেলবাহার
 ২৩৬ দুইসতীনের ঝগড়া
 ২৩৭ দেলদার কুমার
 ২৩৮ দেলরওশন হাদিস
 ২৩৯ দাওয়াতে মোহাম্মাদী
 ২৪০ দেওনামা তালেনামা
 ২৪১ দিওয়ান বোরহান
 ২৪২ দেলখোষ
 ২৪৩ দামলা মোস্তালা
 ২৪৪ দুলাদুলহীনের খেলা
 ২৪৫ দুইশত উপদেশ
 ২৪৬ প্রেমতরঙ্গ
 ২৪৭ পদ্মাবতী
 ২৪৮ পবনকুমারী
 ২৪৯ পীর গোরচাঁদ ১ম
 ২৫০ পীর গোরচাঁদ ২য়
 ২৫১ পীর ফরিদ
 ২৫২ পরিবানু শাহাজাদী
 ২৫৩ পাকপঞ্জতনের নকশা
 ২৫৪ প্রেমচোরা
 ২৫৫ ফেসানায়ে আজায়েব
 ২৫৬ ফাতেমার জুহরানামা
 ২৫৭ ফজিলাতেহুদ্ব
 ২৫৮ ফজায়েলে হরমায়েন
 ২৫৯ ফেসানা বেদার বক্ত
 ২৬০ ফাজিলাতে দরুদ
 ২৬১ ফুলভোমরা
 ২৬২ ফতুহশ্বাম, ১ম খণ্ড
 ২৬৩ ঐ ২য় খণ্ড
 ২৬৪ ঐ ৩য় খণ্ড
 ২৬৫ ঐ ৪র্থ খণ্ড
 ২৬৬ ফতুহল্ এরাক
 ২৬৭ ফতুহল্ মেসের
 ২৬৮ ফকির বিলাস
 ২৬৯ ফয়সালে আহকাম ২য়
 ২৭০ ফাজিলাতে বারচান্দ
 ২৭১ ফজায়েলে সাহরে সিয়াম
 ২৭২ ফরাজেজ বাঙ্গালা
 ২৭৩ বাহার দানেশ
 ২৭৪ বিধবা-বিচ্ছেদ
 ২৭৫ বিবি জোবেদাখাতুন
 ২৭৬ বড় তুতিনামা
 ২৭৭ বে-নজির বদ্রেমুনির
 ২৭৮ বারমাস
 ২৭৯ বাগবাহার
 ২৮০ ব-কারবালা মাতমহোসেন
 ২৮১ বে-নমাজী নারী
 ২৮২ বত্রিশধার লালকুমার
 ২৮৩ বদিওজ্জমান্
 ২৮৪ বন্ বিবির জুহুরা
 ২৮৫ বিশ্বকোশ চন্দ্রাবলী
 ২৮৬ বেদারল গাফেলিন
 ২৮৭ বাপ-বোটর লড়াই
 ২৮৮ বে-নমাজীর নসিহত

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ২৮৯ বেভাষনামা | ৩২৫ মাদায়েনল ওলুম |
| ২৯০ বড়পীর গুণাবলী | ৩২৬ মোহকাতে গুলশান |
| ২৯১ বিশ্বকৈতু চন্দাবলী | ৩২৭ মাহতাববাল |
| ২৯২ বেলালনামা | ৩২৮ মাণিকপীর |
| ২৯৩ বেহেস্তনামা | ৩২৯ মাজারে ফেরদওস |
| ২৯৪ ভানুবতীর লড়াই | ৩৩০ মনসুরহান্নাজ |
| ২৯৫ ভেলুওয়া সুন্দরী | ৩৩১ মফিদল মোমেনিন |
| ২৯৬ ভূমিকম্প | ৩৩২ মজমুওয়া মোনাজাত |
| ২৯৭ ভাষানযাত্রা | ৩৩৩ মারফতেহকানী |
| ২৯৮ মধুমাল | ৩৩৪ মসায়ালে মউতা |
| ২৯৯ মৌলুদ বাহারিয়া | ৩৩৫ মারফতনামা |
| ৩০০ মৌলুদ গোলজারে বাহারিয়া | ৩৩৬ মারফতে মওলা |
| ৩০১ মৌলুদ গোলজারে আকরম | ৩৩৭ মেয়ারাজনামা |
| ৩০২ মৌলুদ আহয়াল কুলুব | ৩৩৮ মেসবাহল ইসলাম |
| ৩০৩ মৌলুদ তওয়ান্দানামা | ৩৩৯ মোহাম্মদী বেদ ১ম খণ্ড |
| ৩০৪ মৌলুদ জিন্নাতলবাগ | ৩৪০ ঐ ২য় খণ্ড |
| ৩০৫ মৌলুদ গোলশানে বাহার | ৩৪১ মুর্শিদনামা |
| ৩০৬ মৌলুদ মোস্তাফা | ৩৪২ মোহসেন-উল্ ইসলাম |
| ৩০৭ মৌলুদ গোলশানে আরব | ৩৪৩ মোনহরমালতী |
| ৩০৮ মৌতনামা | ৩৪৪ মাহেরমজানের কেসসা |
| ৩০৯ মফিদল ইসলাম | ৩৪৫ মোহরে সোলেমানী |
| ৩১০ মফিদল হোজ্জাজ | ৩৪৬ মোনাফেহাত তাস্বিহলজাহেলিন |
| ৩১১ মল্লিকার হাজার সওয়াল | ৩৪৭ রাতকানা জামাই |
| ৩১২ মফিদুল খালায়েক | ৩৪৮ রাজকন্যা মধুমাল |
| ৩১৩ মাল্কা জোহরা | ৩৪৯ রঙ্গিনবাহার কলির অবতার |
| ৩১৪ মোনাইযাত্রা | ৩৫০ রঙ্গবাহার |
| ৩১৫ মোকসুদ-উল্ মোহসেনিন | ৩৫১ রাঁড়ের মক্কর, ১ম ভাগ |
| ৩১৬ মেপ্তাহল জিন্নাত | ৩৫২ ঐ ২য় ভাগ |
| ৩১৭ মল্লিকা আকার | ৩৫৩ রসনোসা-কন্যা |
| ৩১৮ মনোরায় জাহানারা | ৩৫৪ রংবেলাল রঙ্গিনী |
| ৩১৯ মালতীকুসুমমালা | ৩৫৫ রহমতেহক |
| ৩২০ মালঞ্চকন্যা | ৩৫৬ রৌশনল মোমিনীন |
| ৩২১ মোবারক গাজীশাহ | ৩৫৭ রূপবান্-রূপবতী |
| ৩২২ মেপ্তাহল ইসলাম | ৩৫৮ রাগমালা শতময়না |
| ৩২৩ মারফতেজঙ্গ | ৩৫৯ রেজওয়ানসাহা |
| ৩২৪ মস্নবী | ৩৬০ রাহেনাজাত |

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ৩৬১ রওশনল ইমান | ৩৯৭ সের আলী |
| ৩৬২ রোকমনিপরি | ৩৯৮ সাদ্দাদেব নকল বেহেস্ত |
| ৩৬৩ রসের খনি | ৩৯৯ সুন্দরকলি বারমাসী |
| ৩৬৪ লালবানু শাহাজামাল | ৪০০ সংসারচরিত্র |
| ৩৬৫ লালমতি সয়ফলমুগ্ধক | ৪০১ সতীময়নাপ্রকাশ সৈয়দ ময়না |
| ৩৬৬ লাইলীমজনু | ৪০২ সপ্তপয়কর |
| ৩৬৭ লালমিঞা শিবতারা | ৪০৩ সাপের মস্ত |
| ৩৬৮ লালমোন | ৪০৪ শাহীতখতে সোলেমানী |
| ৩৬৯ লজ্জাবতী | ৪০৫ শরাহবেকায়ী |
| ৩৭০ লজ্জতয়েসা | ৪০৬ শশীমুক্তা |
| ৩৭১ লালকুমার ভানুবতী | ৪০৭ শাহ এশ্রাণ চন্দ্রবান |
| ৩৭২ লক্ষ্মী-শনিব ঝগড়া | ৪০৮ শেখ ফরিদ |
| ৩৭৩ লোকমান হাকিমের উপদেশ | ৪০৯ শাহাদাতনামা |
| ৩৭৪ সরফলমুগ্ধক (বড়) | ৪১০ শাহমাদারের কেসসা |
| ৩৭৫ সরফলমুগ্ধক (ছোট) | ৪১১ শাহরুম |
| ৩৭৬ সোলতান জমজমা | ৪১২ শিরিফরহাদ |
| ৩৭৭ সুরতলাল বিবি | ৪১৩ শাহ জ্বালাল জমিলাখাতুন |
| ৩৭৮ সেকান্দারনামা | ৪১৪ শাহ ঠাকুরবর |
| ৩৭৯ সায়েতনামা | ৪১৫ শাহকামাল সূর্যভানু |
| ৩৮০ সাখাওয়াৎনামা | ৪১৬ শাহদৌলা |
| ৩৮১ সেরাজ-উল ইসলাম | ৪১৭ শাফাতুলবালা |
| ৩৮২ সালাতেনুর | ৪১৮ শাহকলন্দর |
| ৩৮৩ সোলেমানী তালেনামা | ৪১৯ শ্যামসোহাগীর কেসসা |
| ৩৮৪ সুরতজামাল | ৪২০ শ্যামসুন্দর পরিমালা |
| ৩৮৫ সুরতনামা | ৪২১ শামনুরিমান |
| ৩৮৬ সেরাতলমোমেনিন | ৪২২ শীতবসন্ত |
| ৩৮৭ সিদ্দিকলুওয়ায়েজিন | ৪২৩ শাহনামা |
| ৩৮৮ সত্যপীর | ৪২৪ শাহসুফি সোলতান |
| ৩৮৯ সোলতানবলখী | ৪২৫ শামসুল আহকার |
| ৩৯০ সোণাভান | ৪২৬ শরাহমোহাম্মাদী |
| ৩৯১ সূর্যউজাল | ৪২৭ হদ মজার শ্বশুরবাড়ী |
| ৩৯২ সমৃতভান | ৪২৮ হয়রাতালফেকা |
| ৩৯৩ সখিসোণা | ৪২৯ ছজ্জতল ইসলাম |
| ৩৯৪ শ্বাশুড়ী বৌর ঝগড়া | ৪৩০ হায়জানামা |
| ৩৯৫ সতীবিবি | ৪৩১ হেদায়েতুলইসলাম (বাঙ্গালা) |
| ৩৯৬ সহীদে কারবালা | ৪৩২ হাসেল মকসুদ |

৪৩৩ হরনুরবিবির কেসসা	৪৪২ হাবিল কবিলের কেসসা
৪৩৪ হায়েজনেফাস	৪৪৩ হাদিস দেল্‌রওশন
৪৩৫ হাতেমতাই	৪৪৪ হকিকতস্ সালাত
৪৩৬ হাকিকতল আশ্বিয়া	৪৪৫ হালাতননবী
৪৩৭ হাজ্জার মসলা	৪৪৬ হাসেন হোসেন
৪৩৮ হাদিস আরবাইন	৪৪৭ হাসিনাবানু
৪৩৯ হায় বাতুল মোমিনীস	৪৪৮ হেকায়েত চারইয়ার
৪৪০ হেদায়েতুল মোবতাদী	৪৪৯ হদয়ের প্রেম-লহরী
৪৪১ হেদায়েতুল ফোসসাক	৪৫০ হস্ত আক্লিমের বাদশাহ

“বটতলার পুথি” বলিয়া আমরা যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করি না, কেবল ঘণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, উপরের তালিকায় সেই শ্রেণীর ৪৫০ খানি পুস্তকের নাম লিখিত হইল। বাজারে প্রচলিত ৪৪৪৬ খানি “বটতলার পুথির” মধ্যে, এ পর্যন্ত ৪৫০ খানি পুস্তকই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে যে কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িতার নাম, ঠিকানা এবং রচনার সাল নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

অভয়দুর্লভ—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ানোড়া গ্রামনিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা কর্তৃক বিরচিত।

আখ্‌বার-উল্ ওজুদ—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আশ্বিয়ার বাণী—১১৬৫ সালে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট ঝাড়বিম্বা গ্রামনিবাসী কাজী হায়াতমোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আখ্‌বারস্ সালাত—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

আস্‌রারস্ সালাত—১২৯৬ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্সী আব্দুল ওহাব এই পুস্তক রচনা করেন।

আরবা-আরবাইন হাদিস—১৩০৯ সালে এই পুস্তক হাজী গরিবউল্লাহদ্বারা বিরচিত।

আবুসামা—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলা নিবাসী জয়নাল আবেদিন কর্তৃক এই পুস্তিকা বিরচিত।

আজ্জায়েব সোলেমানী—১৩০৫ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

আলাওদ্দিন—১৩০৮ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়দ জিন্নত আলী দ্বারা এই পুস্তক বিরচিত।

আহকামল শরিয়ত—১২৮৮ সালে আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

আজ্জায়েব চা'র ইয়ার—১২০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার ফেলু ওস্তাগার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইবলিসনামা—১১৭৮ সালে মুন্সী শাহ গরিবুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

আস্মানসিং—১৩০১ সালে বরিশাল জেলার সলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ইমামচুরী—১২৫০ সালে বঙ্গের খাঁ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

ইমামযাত্রা—১৩০৯ সালে বগুড়া জেলার গৈনারীকান্দি নিবাসী দুর্গতীয়া সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইউসুফ জেলেখা—১২৪০ সালে ফকির মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

একশত ত্রিশ ফরজ—১২৪৬ সালে হাওড়া জেলার বাম্ববপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

এলাজে বাঙ্গালা—১২৯৮ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক এই পুস্তক রচনা করেন। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

একশ জহর—১৩২২ সালে ফরিদপুর জেলার সুন্দরদিনিবাসী আব্দুল হাকিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “এশকে জহর বা জাহান্ আয়ার কেসসা”।

একদিলশাহ—১২৪১ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পীর গোরাচাঁদ—১২৭৮ সালে বর্ধমান জেলার খেজুরহাটী-বাহাদুরপুরনিবাসী খোদা-নওয়াজ সাহেব এই পুস্তক রচনা করেন।

তব্লিগ-উল্ ইসলাম—১৩১৫ সালে হুগলী জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামনিবাসী মোহাম্মাদ দাউদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম “তব্লিগ-উল্ ইসলাম অর্থাৎ তোহফাতুল মোমেনিন।”

তারিখে-আবুহানিফা—১৩১৮ সালে চট্টগ্রাম জেলানিবাসী মৌলবী ইয়ার মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

দরবেশনামা—১২৬৬ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জেমারফৎ—১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

শশীমুক্তা—১৩১১ সালে বরিশাল জেলার জয়ানিবাসী আফতাবউদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দিলদিওয়ানা—১২৬৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা-হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

শহীদেকারবালা—১২৮৯ সালে হুগলী জেলার ভুরগুট-কান্‌পুরনিবাসী মোহাম্মাদ মুন্সী এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরআলী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ সেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরলইমান—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার মোম্বা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

নকশে সোলেমানী—এই পুস্তক চারি খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড ১২৬৮, ২য় খণ্ড ১২৬৯, ৩য় খণ্ড ১২৭০ এবং ৪র্থ খণ্ড ১২৭১ সালে বিরচিত হয়। হুগলী জেলার ধসানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নেজাম পাগ্লা—১১৭৩ সালে মুন্শী মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

নুরনামা—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্শী মোহাম্মাদ ষাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

বাগড়ানামা—১২৭২ সালে ২৪ পরগণা জেলার ধান্যখোলা মোহনপুরনিবাসী আসিরদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ওজুদনামা—১৩০৩ সালে কলিকাতানিবাসী আব্দুল অহাচ এই পুস্তক রচনা করেন।

কল্‌মা মোনাজাত—ঢাকা জেলার মফিজদ্দিন আহমদ গত ১২৯৮ সালে এই পুস্তক রচনা করেন।

চৌদ্দ উজির—১৩০৩ সালে নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়ানিবাসী মোহাম্মাদ ওমর এই পুস্তক রচনা করেন।

গমের দরিয়া—১২৯০ সালে ঢাকা জেলার শয়াফংগঞ্জনিবাসী আব্দর রহমান এই পুস্তক রচনা করেন।

চাহার দরবেশ—বিগত ১১৭৮ সালে মুন্শী মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

কেয়ামতনামা—১২৪১ সালে ২৪ পরগণার বসিরহাটনিবাসী উর্দু হেদায়েৎ ইসলাম রচয়িতা, হাফেজ সৈয়েদ আমানত-উল্লা সাহেব এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সায়তনামা—১২৯২ সালে ঢাকা জেলার মুন্শী মফিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গেসোহরাব—১২৯৪ সালে ২৪ পরগণার হায়দারপুর গ্রামনিবাসী হবিব-উল-হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলেমানী তালেনামা—১২৯৮ সালে গোলাম ফরিদ নামক এক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনা করেন।

নাজাতুল আরওয়াহ—১৩১০ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্শী আব্দুল ওহাচ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোন্দেগোলহরয়োজ—১২৮৪ সালে হুগলী জেলানিবাসী মোহাম্মাদ তাহের এই পুস্তক রচনা করেন।

তুস্তনামা—১২৮৬ সালে শ্রীরত্নেশ্বর দাস এই পুস্তক রচনা করেন।

বেদারল গাফেলিন—১২৬৮ সালে হুগলী জেলার বালিয়া বামনপাড়া নিবাসী সমিরউদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফয়সালে আহকাম—১৩১০ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার মোহাম্মাদ মুন্শী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফজিলাতে বারচাঁদ—১২৯৪ সালে হুগলী জেলার ধসানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফকিরবিলাস—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ীনিবাসী মুন্শী এনায়েতুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাজার মসলা—১১৭৬ সালে মোহাম্মাদ জন এই পুস্তক রচনা করেন।

দিদার ইলাহী—১২৭২ সালে বর্ধমান জেলার গোলাম ইমাম ওরফে বুদ্ধশাহ এই পুস্তক

রচনা করেন।

সপ্ত পয়কার—১১৬০ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

সতী ময়না—১১৪১ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত কাজী দৌলত ও পণ্ডিত সৈয়েদ আলাওল এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “সতী ময়না, প্রকাশ সৈয়েদ ময়না ওরফে লোরচন্দ্রানী।”

খায়রে দো জাহান্—১২৮৬ সালে যশোহর জেলার মুন্শী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্ বা সানুওয়ার—১২৯০ সালে হাওড়া জেলার মোম্বা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহে এম্বাণ চন্দ্রবান্—১২৮৭ সালে মুন্শী মোহাম্মাদ দ্বারা বিরচিত।

মনসুরহাঙ্গাজ—১২৮২ সালে ২৪ পরগণা জেলার শেখ আমির উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

শেখ ফরিদ—১২৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

নসিহাতে আহলেকলি—১৩১৫ সালে হাওড়া জেলার আদমপুরনিবাসী মোহাম্মাদ আইনদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

তুতিনামা—১২৯৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরবখ্ত নওবাহার—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার চন্দ্রপুরনিবাসী শেখ আব্দলগফ্কার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাতেমতাই—১১১০ সালে হাওড়া জেলার বসন্তপুরনিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরাতল মোমেনিন—১২৯৬ সালে মুন্শী মালেমোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

তৃম্বাবতী বিরাক্ষরু—১২৬৭ সালে যশোহর জেলার মধুভোগনিবাসী মুন্শী মণিরদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

কাসাসোল আশ্বিয়া—১৩০২ সালে কলিকাতানিবাসী মৌলবী রহমতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গনামা—১১০১ সালে মুন্শী মোহাম্মাদ ইয়াকুব এই পুস্তক রচনা করেন।

বোনবির জঙ্গরানামা—১২৮৭ সালে হাওড়া জেলার মুন্শী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশালে আজায়েব—১২৯৯ সালে ঝগলী জেলার মণ্ডলঘাটনিবাসী শাহাদাৎউল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

দিলফেরের পিয়ারজাহান—১২৯১ সালে হাওড়া গোলাবাড়ীনিবাসী সৈয়েদ মোহাম্মাদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

সতীবিবির কেসসা—১৩০৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালধ্বকন্যা—১৩০৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দেলবাহার গোলেস্তা—১৩০০ সালে ২৪ পরগণা জেলার কোমরদিন কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হয়।

জন্মরা বিবির কেসসা—১২৮১ সালে ঢাকা জেলার গড়পাড়া নিবাসী মুনশী তাজদ্দিন মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালতীকুসুমমালা—১৩০২ সালে মোহাম্মদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

দিনকাগা শ্বশুর—১৩১১ সালে ২৪ পরগণার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

সমির জ্বালাল—১৩২০ সালে ঢাকা জেলার কোমরদিন খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

চন্দ্রাবলী—১২৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মোহাম্মদ আবেদ এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্বশুড়ী বৌর ঝগড়া—১৩১০ সালে ২৪ পরগণা নিবাসী মোহাম্মদ মাহমুদ এই পুস্তক রচনা করেন।

নারীপুরুষের রঙ্গ রসের ঝগড়া—১২৮২ সালে রাজসাহী জেলার জোবেদ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে চলকান্—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী নিবাসী শেখ আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

বদিগুজ্জমার লড়াই—১৩১৮ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

কলির চরিত্র—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার বামনসুন্দর ভরদ্বাজহাটনিবাসী হাফেজ হাশমত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর নিবাসী (আসল) মুনশী মোহাম্মদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সূর্য উজ্জাল—১২৪৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার বস্তুর খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল বা বাহুরাম—১২৮৪ সালে মোহরদিন মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পবনকুমারী—১২৯৫ সালে নদীয়া জেলা নিবাসী খোন্দকার গোলাম ইসমাইল এই পুস্তক রচনা করেন।

রসনেসা কন্যা—১৩০৬ সালে বরিশাল জেলার শৈলাদা নিবাসী মোকাম্মেল খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

সোনাভান—১১৫৫ সালে ২৪ পরগণা নিবাসী ফকির মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লালমোন্—১১১১ সালে মোহাম্মদ আরিফ এই পুস্তক রচনা করেন।

সামুতভান্—১২৯৬ সালে হাবিলদিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

হুরনুর বিবি—১৩০৬ সালে মেদিনীপুর জেলার হোসেনাবাদ নিবাসী দেবাজতুল্লা ওরফে আব্দুল সাত্তার এই পুস্তক রচনা করেন।

জামাই শ্বশুরের ঝগড়া—১৩১০ সালে আসগার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শামসোহাঙ্গীর কেসসা—১৩২১ সালে রাজসাহীর বাহাদুরপুরনিবাসী মোহাম্মদ মফির উদ্দিন ও মফিজ উদ্দিন আহমদদ্বয় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশানে মোহাম্মাদ—১২৮৬ সালে মুন্সী তমিজ উদ্দিন কর্তৃক বিরচিত।

গোলশানে রুম—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণার মেটিয়া-বুরুজ নিবাসী আব্দুল জব্বার এই পুস্তক রচনা করেন।

শাম নূরিমান—১২৯০ সালে ২৪ পরগণার মুন্সী মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল সনুবর—(গদ্য) ১২৯০ সালে ২৪ পরগণার শ্রীকানাইলাল শীল এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গেশ নওশাদ—১৩১৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মস্তানিবাসী সুবেদার আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

যামিনী ভানু—১২৯৮ সালে হাওড়া জেলার মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্যামসুন্দর পরিমালা—১৩১৯ সালে রংপুর জেলার মোহাম্মাদ ইদ্রিস এই পুস্তক রচনা করেন।

মল্লিকা আকার—১২৭২ সালে আমিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলজাদী বিবি—১৩২০ সালে জলপাইগুড়ির হায়হায়পাথারনিবাসী তমিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লজ্জাবতীর পুঁথি—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার হাত হেড়ে নিবাসী আজহার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল পসন্দ—১২৯৯ সালে হুগলী তালপুরনিবাসী আয়জদ্দিন কর্তৃক বিরচিত।

শীতবসন্ত—১৩২০ সালে গোলাম কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতজামাল—১৩১৬ সালে হাওড়া জেলার খয়রুল্লা মোহাম্মাদ ও জেনাব আলী কর্তৃক বিরচিত।

মনোরায়ে জাহান্ আরা—১৩১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার চাঁদগাঁওনিবাসী মোহাম্মাদ আব্বাস আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্বশুড়ীজামাইর ঝগড়া—১৩২১ সালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী কর্তৃক বিরচিত।

সখীসোণা—১৩১৮ সালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বত্রিশধার লালকুমার—১৩১৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার হায়হায়পাথার নিবাসী ইদ্রিস মোহাম্মাদ কর্তৃক বিরচিত।

জঙ্গেশ জামাল—১৩২১ সালে হাওড়া জেলার খলসানীনিবাসী মৌলবী শেখ আজহার এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতলাল বিবি—১৩২০ সালে ২৪ পরগণা জেলার হাতিয়াগড়নিবাসী মোহাম্মাদ বাবন এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গেশ রসুল—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার খলসানীনিবাসী মৌলবী আজহার আলী কর্তৃক বিরচিত। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম “জঙ্গেশ রসুল ও জঙ্গেশ হজরত আলী”।

সমসামল মোয়াহেদিন—১২৯৪ সালে নদীয়া জেলার বড় চাঁদঘরনিবাসী ফসিহদ্দিন

কর্তৃক বিরচিত।

রাশিনামা—১২৯৬ সালে এই “রাশিনামা, তালেনামা ও চিকিৎসারত্নাবলী” নামক পুস্তক কুমিল্লা জেলার মুনশী ফয়জদ্দিন রচনা করেন।

লালমিঞা শিবতারা—১৩১২ সালে নোয়াখালী জেলার নলপুরনিবাসী মুনশী আব্দুল কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

শাফাতোলবালার—১২৯৯ সালে দিনাজপুর জেলার জগন্নাথপুরনিবাসী হাজী হাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহাদৌলা—১৩১০ সালে মোহাম্মাদ আকবর আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকামাল সূর্য্যভানু—১২৯০ সালে ময়মনসিংহ জেলানিবাসী আব্দুলগণী এই “শাহকামাল সূর্য্যভানু বিবি” নামক পুস্তক রচনা করেন।

শাহঠাকুরবর—১৩১০ সালে ২৪ পরগণার ডাউকী নিবাসী নসিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলতান বলখী—১২৮৬ সালে আব্দুল মজিদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাসেল মকসুদ—১২৯০ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

হেদায়েৎ ইসলাম—১২৯৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা, এই পুস্তকের দ্বারা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সুবিধার জন্য, উর্দু ভাষায় লিখিত মূল “হেদায়েৎ-উল ইসলামের” বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

হায়জানামা—১২৯২ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা ও প্রকাশ করেন।

হুজ্জতুল ইসলাম—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার বালড়নিবাসী রহিম বক্শ এই পুস্তক রচনা করেন।

কাঞ্চনমালা—১২৯৩ সালে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণচান্দলানিবাসী সৈয়দ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকলন্দর—১২৮৬ সালে বগুড়া জেলার শাহমামুদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ঘণিনামা—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার কুঁচিয়ামোড়া গ্রাম নিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা এই পুস্তক রচনা করেন।

মোনিহ যাত্রা—১২৮৩ সালে বগুড়া জেলার নাজের মোহাম্মাদ সরকার এই পুস্তক রচনা করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহার সংশোধন করেন। পুস্তকের ভণিতায় উভয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মালকা জোহরা-বিবি—১২৯৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

প্রেমতরঙ্গ—১২৮৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার মোশায়াটক নিবাসী মুনশী মোহাম্মাদ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর উম্মিয়ার নকল—১৩০০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

কটুর মিঞা—১২৯৪ সালে কুমিল্লা জেলার সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।
কালুগাজী ও চম্পাবতী—১২৮৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার খোন্দকার আহমদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

কওসেল আরেফিন—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ শেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

খানে নিয়ামত—১২৯২ সালে বর্ধমান জেলার বামনিয়া নিবাসী মুনশী গোলাম মওলা ওরফে ফেলু মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর আলী হুঁরাবতী—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার ওসিমদ্দিন শাহ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

নুরুল বসর—১২৯৭ সালে পাবনার সাহাজাদপুরনিবাসী আব্দুল শুকুর ওরফে মাণিক মিঞা এই পুস্তক রচনা করেন।

নসিহতে করিমী—১৩০০ সালে ফরিদপুর জেলার চর-শিমুলিয়া নিবাসী ও মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জল আরশ—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক আরবী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।

শাহজুলাল জমিলা খাতুন—১২৯৯ সালে কুমিল্লা জেলার বকশ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

মফিদল্ হোজ্জাজ্জ—১৩০০ সালে দিনাজপুর জেলার যোগীবাড়ী নিবাসী হাজী হেদায়েতুজ্জামা এই পুস্তক রচনা করেন।

তেলেস্মাত সোলেমানী—১২৯৮ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার অপর একটি নাম “আজারের সোলেমানী দ্বিতীয় ভাগ”।

ভানুবতীর লড়াই—১৩০১ সালে বগুড়া জেলার খলিল উদ্দিন গাইন এই পুস্তক রচনা করেন।

ব-কারবালা মাতম হোসেন—১২৯৬ সালে মেদিনীপুর জেলার মৌলবী আব্দুলকাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

বাগবাহর—১৩০২ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ডেলুওয়া সুন্দরী—১২৮৪ সালে চট্টগ্রামনিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী মৌলবী হামিদুজ্জামা এই পুস্তক রচনা করেন।

লালবানু শাহজামাল—১৩০০ সালে রঙ্গপুর জেলার সাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বাহার দানেশ—১৩০২ সালে শ্রীদ্বারিকানাথ রায় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলেআরজান—১২৮২ সালে কাজী রয়হান-উদ্দীন আহমদ ও সাদুজ্জামা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তক পাঠ করিলে, গ্রন্থকারদ্বয়কে বগুড়া জেলার লোক বলিয়া বোধ হয়।

জঙ্গে হযদার—১৩২২ সালে মুনশী কোবাদ আলী এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শাহআলম নূরজাহান—১২৯১ সালে শেখ মেহেরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা

করিয়াছেন।

ভুতিনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

রাজকন্যা মধুমালী—১৩০৭ সালে ময়মনসিংহ নিবাসী সৈয়দ জোবেদআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

রাতকাণা জামাই—১৩১৫ সালে মোহাম্মাদ দেরাছতুমা এই পুস্তক রচনা করেন।

জোবেদা খাতুন—১২৯২ সালে ঝগলী জেলার মুনশী জোনাব আলী ইহার রচনা করেন।

শিরিফরহাদ—১২৮৫ সালে ঝগলী জেলার কাজী রয়হানউদ্দিন আহমদ ও তমিজদ্দিন খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলআন্দাম—১২৯০ সালে ঝগলী জেলার হরিপালনিবাসী মুনশী আয়জদ্দিন দ্বারা বিরচিত।

হদমজার শ্বশুরবাড়ী—১৩১৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

বেনজীর বদরেমুণির—১২৭৯ সালে হাওড়া জেলার করিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

খয়বরের জঙ্গনামা—১২৮৪ সালে দিনাজপুর জেলার মৌলবী দোস্তমোহাম্মাদ চৌধুরী এই পুস্তক রচনা করেন।

মেফতাহল লেন্নাত—১২৮০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

মকসুদুল মোহসিনি—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার জলঢাকানিবাসী মৌলবী জহিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা বেদার বখ্ত—১৩১৪ সালে ফরিদপুর জেলার পালংনিবাসী কাজী আব্দুল ওয়াজেদ এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম “ফেসানা বেদার বখ্ত ও পরিমাহেলাক”।

জৈগুণ—১২০৪ সালে ঝগলী জেলার ভুরগুট নিবাসী সৈয়দ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

দারা সেকান্দরনামা—১১৯৫ সালে চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলজারে আতশ—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী আব্দুল্লাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

দলিল উলআহকাম—১২৯৫ সালে ফরিদপুর জেলার বন্ধুরা কোটালীপাড়ানিবাসী মৌলুবী দলিলউদ্দিন আহম্মদ দ্বারা বিরচিত।

পদ্মাবতী—এই পুস্তকের রচনার সাল তারিখ আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশকের যে নামের মোহর পুস্তকে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ১২৮৭ সাল লেখা আছে।

হুমরাতাল ফেকা—১২৭৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলামমওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

নিয়তনামা—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎহোসেন, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত “হেদায়েৎ-উল্ ইসলাম” নামক উর্দু পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়াছেন।

মল্লিকার হাজার সওয়াল—১২৭৬ সালে মুনশী শেরবাজ এই পুস্তক রচনা করেন।
নারিকেল বেড়ের লড়াই—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার সাজনগাজী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা আজায়েব—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফজায়েলে হরমায়েল—১২৮৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাঁর আদিম নিবাস ফরিদপুর জেলায়।

ফজিলাতে হক্কু—১২৯৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

ফাতেমার জহুরানামা—১৩০০ সালে বগুড়া নিবাসী আস্‌মতুল্লা খোন্দাকার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

বে-নমাজী নারীর পুথি—১৩০০ সালে কুমিল্লা রাজগঞ্জ নিবাসী কলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

মফিদল খালায়েক—১২৯০ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

যুগী কাছের—১২৩৪ সালে বগুড়া নিবাসী সাহেজুল্লা খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

রং বাহার—১২৭১ সালে কটকনিবাসী মৌলবী হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তক্বিয়েতুল ইমান—১২৭০ সালে ২৪ পরগণা জেলার বাইশহাটা-খুলিহারী নিবাসী উমেদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেলরোবা টার চমন—১২৯৬ সালে কটকের মৌলবী ও হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা ইহা রচনা করেন।

রঙ্গিন বাহার—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার কুজাইল নিবাসী মোহাম্মাদ আরিফ ইহা রচনা করেন।

খাব্‌নামা—১৩০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

গোলে বকাওলি—১৩০০ সালে পাবনা জেলার দুলাই নিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ওরফে মানিক মিঞা ইহা রচনা করেন।

গোলশানে নওবাহার—১৩০৪ সালে পাবনা জেলার দুলাইনিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ইহা রচনা করেন।

গারক্‌নামা—১২৮৩ সালে বরিশাল ভোলা মহকুমার আলিনগরনিবাসী শেখ গেন্‌হাজ্‌দ্দিন ইহা রচনা করেন।

চোরচক্রবর্ত্তী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

চৌত্রিশ অক্ষর—১৩০০ সালে রংপুর জেলার মেলাবর সাকিনের রসুলমোহাম্মাদ খোন্দাকার ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম “চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলত”। :

বারমাস—১২৮৩ সালে মোহাম্মাদ আকবর ইহা রচনা করেন।

মফিদল ইসলাম—১৩০১ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম ইহা রচনা করেন।

মউতনামা—১২৮৩ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ গোলাজারে বাহারিয়া—১২৯৪ সালে রংপুর জেলার মুনশী রসুল মোহাম্মদ খোন্দাকার ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ বাহারিয়া—১২৮২ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

নওখরিদ পাহালুওয়ান—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণার মুনশী মোহাম্মদ ইক্‌হাক ইহা রচনা করেন।

নবচিকিৎসা বোধ—১২৪৩ সালে বরিশাল জেলার কবিরাজ শ্রীনবকুমার নাথ ইহা রচনা করেন।

কালুগাজী-চম্পাবতী—১৩০২ সালে হুগলী জেলার মোহাম্মদ মুনশী ইহা রচনা করেন।

সয়ফুল মুহুক বদিওজ্জমাল—১২৮৪ সালে মুনশী আব্দুল আজিজ ইহা রচনা করেন।

লাইলীমজনু—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী আব্দুল অহাব ইহা রচনা করেন।

রাঁড়ের মক্করনামা—১৩১৬ সালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জনিবাসী মুনশী গিয়াজদ্দিন ইহা রচনা করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

গোলেহরমুজ—১২৮১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের ইহা রচনা করেন।

সোলতানজমজমা—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মধুমালী—১২৫৮ সালে কুমিল্লার মুনশী সৈয়েদ জিন্নাতআলী ইহা রচনা করেন।

চেমনবাহার—চট্টগ্রামের পণ্ডিত ফাইমদ্দিন ১২৪৫ সালে ইহা রচনা করেন।

ছিলহুরাজার জঙ্গ—১২৪৬ সালে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল নিবাসী বাতাসু সরকার ইহা রচনা করেন।

দেলারাম—১৩১৮ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী রিয়াজদ্দিন খাঁ ইহা রচনা করেন।

লালমতি—১২৯৫ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত আব্দুল হাকিম ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম, “লালমতি সয়কল মুহুক”।

কলির নসিহত—১২৭০ সালে ২৪ পরগণার চানক নিবাসী শেখ রমজানউল্লা ইহা রচনা করেন।

জান্নরওশন—১২৯০ সালে নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী মোহরদ্দিন আহম্মদ ইহা রচনা করেন।

বিধবা বিচ্ছেদ—১৩০৩ সালে বরিশাল চাঁদপাশা নিবাসী সলিমউদ্দিন ইহা রচনা করেন।

নেকবিবি—১২৯২ সালে ঢাকা রহমাগঞ্জ নিবাসী মুনশী গরীবউল্লা ইহা রচনা করেন।

সত্যপীর—১২৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী ইহা রচনা করেন।

তমিম গোলাল—১২৭১ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ মোহাম্মদ রাজা ইহা রচনা করেন।

সয়ফুল মুহুক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করেন। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

দাকায়েক-উল্‌হেকায়েক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ মৌলবী নুরুদ্দিন ইহা রচনা করেন। ইহার অপর দুইটি নাম, “কহনামা ও মউতনামা”।

জেবল-মুহুক সামারোক—ইহা চট্টগ্রামের সৈয়েদ আকবর আলী দ্বারা বিরচিত। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

উপরে যে সমস্ত পুস্তকের নাম এবং রচনার সন-তারিখ সহ গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত

পরিচয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। তালিকায় লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়।

- (১) আরবী ও পার্শী ভাষায় লিখিত, ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকের মূল এবং তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ। (ক) শরিয়ৎ—গার্হস্থ্য ধর্ম, (খ) মারফৎ—সম্মাসধর্ম।
- (২) জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতির বিচার। গণনা-প্রণালী। স্বপ্ন-বিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক। কু-ফল দূর করিবার ব্যবস্থা।
- (৩) পশু ও মানব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক। (ক) আয়ুর্কেদ, (খ) পৈতে, (গ) হাকিমী, (ঘ) অবধৌতিক।
- (৪) দোওয়া, এসেম ও কবচ (তাবিজ) ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক।
- (৫) দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।
- (৬) সাধনা-প্রণালী এবং সিদ্ধি লাভের উপায় সম্বন্ধীয় পুস্তক।
- (৭) মিলনাস্তক ও বিয়োগাস্তক উপন্যাস (প্রেম-কাব্য)।
- (৮) নাটক (প্রহসন ও গীতাভিনয়)।
- (৯) সমাজচিত্র, সংসারচিত্র—চাবুক।
- (১০) ইতিহাস এবং ইতিহাসের ছায়া।
- (১১) জীবন-চরিত।
- (১২) বিবিধ উপদেশ।

এ সম্বন্ধে বলিবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় অদ্যকার মত ইহার উপসংহার করিলাম। সময় ও সুযোগানুসারে কবিদিগের রচনা-শক্তির ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল, এ দেশে আমরা হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় বাস করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু ভাতারা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। তাই তাঁহারা অনেক সময়, ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা যে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে লিখিত “বটতলার পুথি” গুলিকে ঘৃণা না করিয়া, যদি অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহারা পাঠ করেন, তাহা হইলে, মুসলমান ধর্ম ও মুসলমানের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল ধারণাগুলি দূর হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বলিয়াছি যে, “আমার অনুসন্ধান-কার্য এখনও শেষ হয় নাই এবং বহুসংখ্যক পুস্তক এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।” সকল পুস্তকগুলি সংগৃহীত এবং অনুসন্ধান-কার্য শেষ হইলে উহার এক এক খণ্ড পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তক-ভাণ্ডারে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি-২

অশোক উপাধ্যায় সঙ্কলিত

বাঁকুড়া

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মল্লভূমি বিষ্ণুপুর। সংহতি। ৩৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, পৃ ৭০-৭২।

অজ্ঞাত

বাঁকুড়ায় ইন্দ। বাসনা (চুচুড়া, হুগলী)। ১/৭, কার্তিক ১৩০১, পৃ ২১৯-২২১।

চন্দ্রবর্মার চক্রচিহ্ন। সমীরণ। ৩/৪, বৈশাখ ১৩০৩, পৃ ২২১-২২৩।

....গত নবেম্বর মাসে (১৮৯৫) এসিয়াটিক সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে বিশ্বকোষসম্পাদক বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ চন্দ্রবর্মার কিয়ৎ পরিমাণে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উক্ত প্রবন্ধের সার নিম্নে সংগৃহীত হইল।

শুণুনিয়া। প্রবাসী। ১৩/২/৫, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ ৪৯১-৪৯৭। সচিত্র

শ্রী স্বাক্ষরিত।

বাঁকুড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। বাঁকুড়া-লক্ষ্মী (বাঁকুড়া)। ১/১-২, বৈশাখ ও শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ ৩-৪।

বাঁকুড়ায় পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-সমাচার। তদেব, পৃ ২১-২৬।

শালবান্দ। তদেব, পৃ ২৭-৩১।

বাঁকুড়ার স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনী। তদেব, পৃ ৩৯-৪৪।

বাঁকুড়ার আকুই গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর মন্দির। প্রবাসী। ৪৭/১/৬, আশ্বিন ১৩৫৪, পৃ ৬২৪। সচিত্র

অতুলবিহারী বক্সী

বিষ্ণুপুর বা দ্বিতীয় দিল্লী। সাহিত্য। ৩০/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৭, পৃ ৫২৫-৫২৯।

অনাথনাথ ঘোষ

মল্লভূমি/বিবিধ সংগ্রহ। বিচিত্রা। ১/২/১, পৌষ ১৩৩৪, পৃ ১৩৯-১৪৪।

অপূর্বরতন ভাদুড়ী

ইন্দ্রপুরী বিষ্ণুপুর। অমৃত। ১/১৫, ১ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ ২৩৫-২৩৭।

অবিনাশচন্দ্র দাস

বাঁকুড়ায় ইংরেজীশিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের বিবরণ। প্রবাসী। ১৬/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩, পৃ ১৩১-১৩৭। সচিত্র

সোণাতাপল। লক্ষ্মী (বাঁকুড়া)। ১/১১, ভাদ্র ১৩৩২, পৃ ৪৩৫-৪৪১।

অমরেশচন্দ্র সিংহ

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী। ২৫/১/১, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ১৩৫-১৩৭। সচিত্র

অমলকুমার গাঙ্গুলী

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি পুস্তক প্রসঙ্গে। কৌশিকী। ৫ম খণ্ড, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭, পৃ ৬-৭।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখা হয় নাই : ১৬ বিষ্ণুপুর : দশাবতার তাস। দেশ। ৩৮/৪৫, ১ আশ্বিন ১৩৭৮, পৃ ৬৮৭-৬৯০। সচিত্র

দেখা হয় নাই : ৩৭ বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ। দেশ। ৩৯/১৯, ২৭ ফাল্গুন ১৩৭৮, পৃ ৫৬১-৫৬৪। সচিত্র

বাঁকুড়ার ঘোড়া। কৌশিকী। ৪/৯-১০, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১, পৃ ৪৩-৪৭।

সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

'শুভঙ্কর'। কৌশিকী। ১৪শ বর্ষ, শারদীয় ১৯৮৮, পৃ ৯-১২।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন অবস্থা। পুরোহিত। ১/৩, মাঘ ১৩০০, পৃ ১৪০-১৪৫।

অরুণচন্দ্র দত্ত

বাঙালা সাহিত্যের নীরব পূজারী বসন্তরঞ্জন। প্রবর্তক। ২৩/১/১, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ ৭০-৭৩। সচিত্র

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রসঙ্গে।

অশান্ত সোম [তারাপদ সাঁতরা]

'মুরলী' গ্রামের হাতী-ঘোড়া। কৌশিকী। ১ম খণ্ড, পৌষ ১৩৭৭, পৃ ৬। সচিত্র

অহীন্দ্রনাথ ঘোষ

মল্লভূমি ও মল্লভূপগণ। উদ্বোধন। ১৭/১, মাঘ ১৩২১, পৃ ৪৮-৫৮ ; ১৭/২, ফাল্গুন ১৩২১, পৃ ১১৯-১২৫ ; ১৭/৩, চৈত্র ১৩২১, পৃ ১৮০-১৮৯ ; ১৭/৪, বৈশাখ ১৩২২, পৃ ২৪৯-২৫৫ ; ১৭/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ২৮৯-২৯৪।

আনন্দ বাগচী

বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি। দেশ। ৩২/২৭, সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ১২৭-১২৯ ; ১৩১-১৩৫ ; ১৩৭-১৩৮। সচিত্র

আশীষ বসু

মোমগলানো ধাতু-শিল্প বা ডোকরা কাজ। মাসিক বসুমতী। ৪১/১/৫, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ ৯৪৬-৯৪৭। সচিত্র

পাঁচমুড়া গ্রামের শিল্প। অমৃত। ৭/৩৫, ২০ পৌষ ১৩৭৪, পৃ ৭৫৬-৭৫৭। সচিত্র

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস। ভারতী। ৮/৬, আশ্বিন ১২৯১, পৃ ২৫২-২৬১।

২৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঁকুড়ার চন্দ্রশিল্প প্রদর্শনী। বাঁকুড়া-লক্ষ্মী। ১/৩-৪, কার্তিক ও পৌষ ১৩২৯, পৃ ৬০-৬৫।

কমল মজুমদার

পাঁচমুড়ার মাটি। দেশ। ২২/৪৩, ১০ ভাদ্র ১৩৬২, পৃ ২৫৩-২৫৪।

কমলাচরণ চক্রবর্তী

নড়রা (বাঁকুড়া)/পঞ্চগ্রাম। বর্তমান। ১/২/৪, মাঘ ১৩৫৪, পৃ ৪৮০-৪৮১।

কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেউলভিড়া ও একতেশ্বরের বৌদ্ধ মূর্তি। প্রবাসী। ৪১/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ২৩৭-২৪১। সচিত্র

রাইপুরের মহামায়া ও শিখরবংশ। প্রবাসী। ৪৯/২/৫, ফাল্গুন ১৩৫৬, পৃ ৪৪৫-৪৪৭।

কৃষ্ণকিশোর দাস

সঙ্গীতকেশরী স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্রগণ। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা। ৬/১০, মাঘ ১৩৩৬, পৃ ৬৫৫-৬৬০।

স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা। ৮/৩, আষাঢ় ১৩৩৮, পৃ ১২৯-১৩১।

গঙ্গাগোবিন্দ রায়

মল্লভূমি ও মল্লরাজ (প্রত্নতত্ত্ব)/সম্পাদকের বৈঠক। ভারতবর্ষ। ১২/১/৩, ভাদ্র ১৩৩১, পৃ ৪৭০-৪৭১।

শ্রীশ্রীমদনমোহন ও মহারাজ বীরহাষির। লক্ষ্মী (বাঁকুড়া)। ২/২, কার্তিক ১৩৩২, পৃ ৩৬-৩৮।

প্রবন্ধটি রাধাগোবিন্দ রায়ের নামে ছাপা হয়। পরবর্তী সংখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে এর প্রকৃত লেখক গঙ্গাগোবিন্দ।

চন্দ্রনাথ শর্মা

মল্লভূমি : মল্ল-রাজবংশ। অনুসন্ধান। ৩/১৭, ৩১ চৈত্র ১২৯৬, পৃ ৩৮৯-৩৯১।

মল্লভূম বা মল্লভূমি। যমুনা। ২/৫, ভাদ্র ১৩১১, পৃ ১৪৮-১৫২।

চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

জয়পুরের দুটি মন্দির। কৌশিকী। ১২/১, অক্টোবর ১৯৮৫, পৃ ২৪-২৯।

জি এস দত্ত [গুরুসদয় দত্ত]

খোজুর গাছ। বাঁকুড়া-লক্ষ্মী। ১/৩-৪, কার্তিক ও মাঘ ১৩২৯, পৃ ৫৭-৫৫।

তপন কর

পোড়ামাটির শাঁখ : পাঁচমুড়ার অবদান। কৌশিকী। ৯/১-১২, পৌষ ১৩৮৫-অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃ ১৪-১৫।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর ঘরানা প্রসঙ্গে। অমৃত। ৫/২৯, ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৭২, পৃ ২৫৩-২৫৫।

তরুণদেব ভট্টাচার্য

বিষ্ণুপুরের মদ্ররাজ্য, বীরহাষীরবৃত্ত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৮৭/৩, ১৩৮৭,
পৃ ২৮-৪০।

তৃপ্তি ব্রহ্ম

সোনামুখীর বাউল মেলা। সমকালীন। ২৪/৩, আষাঢ় ১৩৮৩, পৃ ১১৯-১২২।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর-ঘরাণা ও বাহাদুর খাঁ। বিশ্ববাণী। ২৩/৮, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃ ৪৫৬-৪৬৪; ২৩/৯,
কার্তিক ১৩৬৮, পৃ ৫০৯-৫১৪; ২৩/১০, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, পৃ ৫৫৬-৫৫৯; ২৩/১১, পৌষ
১৩৬৮, পৃ ৬০০-৬০৪।

দেবব্রত সিংহঠাকুর

ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ সংগীত। উত্তরসুরি। ২৪/২, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩,
পৃ ১৪৭-১৫২।

ধর্মানন্দ মহাভারতী

দল-মাদল : হিন্দু কীর্তি (প্রথম প্রস্তাব)। হিন্দু-পত্রিকা (যশোহর)। ১১/৭, কার্তিক ১৩১১,
পৃ ১৯৩-২০০; (দ্বিতীয় প্রস্তাব), ১১/৯, পৌষ ১৩১১, পৃ ২৫৯-২৬৫; (তৃতীয় প্রস্তাব)
১২/৮, শ্রাবণ ১৩১১, পৃ ১১৯-১২৪; (পরিশিষ্ট), ১২/৭, কার্তিক ১৩১২, পৃ ১৯৭-২০১।

নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাঁকুড়া জেলার একটি প্রাচীন শিলালিপি। প্রবাসী। ৩৩/২/৬, চৈত্র ১৩৪০, পৃ ৮১০-৮১৩।
সচিত্র

নিখিলনাথ রায়

বীর হাষির। বঙ্গবাণী। ১/২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৯, পৃ ৪৭০-৪৭৭।
শুশুনিয়া শৈলে। ভারতবর্ষ। ১০/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ ৮২৬-৮৩২।
বিষ্ণুপুরের কথা। পঞ্চপুষ্প। ৩/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ ২১৯-২২৫; ৩/৩, আষাঢ় ১৩৩৭,
পৃ ৪১৮-৪২৫।

নির্মলকান্তি চক্রবর্তী

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ভ্রমভ। মাসিক বসুমতী। ২৮/২/৩, পৌষ ১৩৫৬, পৃ ৩৪৯-৩৫০।
সচিত্র

পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ

বাংলার মন্দির : মল্লভূম। প্রবর্তক। ৪৭/৩, আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ ১০৪-১০৮।

পরমেশপ্রসন্ন রায়

বিষ্ণুপুর-বিবরণ/কল্পতরু। ভারতবর্ষ। ৫/১/১, আষাঢ় ১৩২৪, পৃ ৬৪-৭৮। সচিত্র

প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার কথোপকথনের বাঙ্গালা। সুপ্রভাত। ৫/৯, চৈত্র ১৩১৮, পৃ ৩৯১-৩৯৫।

প্রফুল্লকুমার দাস

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরসুরি। ১৯/২-৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৮- বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯,
পৃ ৩২০-৩২৮।

২৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

প্রফুল্লচন্দ্র কর

বাঁকুড়ায় পর্বতগাত্রে প্রাচীন বিষ্ণুচক্র। *উজ্জীবন* (খড়দহ)। ১১/৬, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ ৪২৭-৪২৮।

প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডীদাসের ভিটা। *প্রবর্তক*। ১৫/৩, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ ২৩৯-২৪০।

প্রভাতকুমার সাহা

বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজপরিবার ও গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। *ঐতিহাসিক*। প্রবন্ধ সংকলন : ৬, শ্রাবণ ১৩৮৫, জুলাই ১৯৭৮, পৃ ১২-৩২।

প্রভাতচন্দ্র দে

প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও ছিয়াত্তরের মল্লস্তর/বিবিধ প্রসঙ্গ। *ভারতবর্ষ*। ৭/২/২, মাঘ ১৩২৬, পৃ ২১৯-২২২।

প্রভাসচন্দ্র দে

প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও বর্গীর হাঙ্গামা। *বাণী*। ৩/১, বৈশাখ ১৩১৭, পৃ ১৬-২৯।

প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও বৈষ্ণবধর্ম। *বাণী*। ৩/১০-১১, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৭, পৃ ৬১০-৬১৯।

বীরভূমি ও মল্লভূমি। *বাণী*। ৪/১, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ ৪-১২ ; ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ ৬৭-৭৮।

প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও বৈষ্ণবধর্ম। *শ্রীগৌরঙ্গসেবক*। ১১/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, পৃ ১৩১-১৩৬।

প্রভাসচন্দ্র পাল

রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস। *সংহতি*। ১৮/৪, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ ১৮৫-১৮৮।

বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে।

প্রত্নতত্ত্বে কুর্মাভতার মূর্তি। *সংহতি*। ২২/১২, চৈত্র ১৩৬২, পৃ ৬০৮-৬০৯।

পশ্চিম বঙ্গের পুরাকীর্তি। *সংহতি*। ২৩/১১, ফাল্গুন ১৩৬৩, পৃ ৫৯২-৫৯৩।

প্রমথনাথ রায়

বিষ্ণুপুর। *আর্য্যাবর্ত*। ৪/১১, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ ৯৮৯-৯৯৫।

প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

একতেশ্বরে পৌষের মেলা। *দেশ*। ২৪/১৪, ১৯ মাঘ ১৩৬৩, পৃ ২৯-৩২। সচিত্র

শাল-মহয়ার দেশের মানুষ। *দেশ*। ২৪/২৩, ২৩ চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ৬৮২-৬৮৬। সচিত্র

বাঁকুড়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে।

বাঁকুড়া জেলার স্থাপত্য ও পুরাতত্ত্ব। *সংহতি*। ২৪/১১, ফাল্গুন ১৩৬৪, পৃ ৫৪৯-৫৫২।

প্রহ্লাদচন্দ্র ব্রহ্মচারী

বাঁকুড়ার এন্ডেস্‌শ্বর মন্দির। *হিন্দু*। ২৫/২, ৯ বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ ১৫-১৬।

ফকিরদাস চট্টোপাধ্যায়

শ্রীধর্মমঙ্গল-প্রণেতা কবিবর রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত। *সাহিত্য-সংহিতা*। ৭/৭, কার্তিক ১৩১৩, পৃ ৪৪৬-৪৪৮।

ফকীরদাস চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়া-জেলার বিবরণ। *সাহিত্য-সংহিতা*। ৬/১১, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ৬৫৩-৬৬৯ ; ৬/১২,

চৈত্র ১৩১২, পৃ ৭২৫-৭৩২।

* সাহিত্যসভার ঊষ্ঠ বার্ষিক দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বনশ্রী রায়

ইন্দাস। অমৃত। ৮/৩৮, ১৭ মাঘ ১৩৭৫, পৃ ১১১৯।

বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

জগদ্রাম রায়। দাসী। ৪/৬, জুন ১৮৯৫, পৃ ৩৩৭-৩৪৩ ; ৪/৭, জুলাই ১৮৯৫, পৃ ৩৯৪-৪০৩ ; ৫/৪, এপ্রিল ১৮৯৬, পৃ ১৭১-১৭৫।

বলীন্দ্র সিংহ

রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী। বীরভূমি (কীর্ত্তহার)। ৫/৩, ফাল্গুন ১৩১১, পৃ ১০৭-১১৬ ; ৫/৫, বৈশাখ ১৩১২, পৃ ১৬৩-১৭১।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পিতৃদেবের জীবন কথা। প্রবাসী। ৬৭/১/৪, শ্রাবণ ১৩৭৪, পৃ ৪২৩-৪২৪।

রায় রামসদন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রসঙ্গে।

বিজয়গোপাল বসু

কথকতার সৃষ্টিতে গঙ্গাধর শিরোমণি। হিন্দু। ২৪/৩৮, ১৬ পৌষ ১৩৫৬, পৃ ৪৮২-৪৮৪।
সোণামুখীর বাসিন্দা, অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি।

বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১৩/২, ১৩১৩, পৃ ৮১-৯৬।

বিষ্ণুপুরী

বিষ্ণুপুর। প্রবাসী। ১৮/২/৫, ফাল্গুন ১৩২৫, পৃ ৪২৫-৪৩৯ ; ১৮/২/৬, চৈত্র ১৩২৫, পৃ ৫৩২-৫৪৪। সচিত্র

বিহারীলাল দত্ত

স্বর্গীয় তারাচাঁদ কর। তাম্বুলি-পত্রিকা। ৩/৯, ভাদ্র ১৩২৪, পৃ ২৬৬-২৬৯।

বীররুদ্র রায়

বাঁকুড়ায় কাপাসের চাষ। বাঁকুড়া-লক্ষ্মী। ১/৩-৪, কার্তিক ও মাঘ ১৩২৯, পৃ ৫৪-৫৬।

ব্যোমকেশ মুস্তফী

বাঁকুড়া জেলায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান/আলোচনা ৫। গৃহস্থ। ৪/১২, আশ্বিন ১৩২০, পৃ ৮৯২-৮৯৪।

ভাগবতদাস বরাট

বাঁকুড়ার তুঘু। হিন্দু। ২৮/২২ [২৭/২২], ২৮ ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ ২৫৪-২৫৬।

বাঁকুড়ার তুঘুপূজা। মন্দিরা। ২৪/৭, কার্তিক ১৩৬৮, পৃ ৩৪৪-৩৪৬।

মতিলাল দাশ

শুভঙ্কর। মাসিক বসুমতী। ৯/২/৬, চৈত্র ১৩৩৭, পৃ ৮৬৯-৮৭৫।

মতিলাল দাস

চণ্ডীদাসের লীলাভূমি। মাসিক বসুমতী। ৯/১/৫, ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ ৮২৬-৮৩৫। সচিত্র

২৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

মথুরানাথ মহান্তী

তসর চাষ : বাঁকুড়ার রাইপুর অঞ্চলে কি প্রকারে তসর চাষ হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ।

বাঁকুড়া-লক্ষ্মী । ১/৩-৪, কার্তিক ও মাঘ ১৩২৯, পৃ ৭০-৭২।

মদনমোহন কুমার

হাড়মাসড়া গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৮২/৩-৪, ১৩৮২, পৃ ৯৬-৯৮।

মনোজিৎ বসু

পশ্চিমবঙ্গ-পরিভ্রম : বাঁকুড়া। বসুধারা । ১/৩, আষাঢ় ১৩৬৪, পৃ ৩৫৪-৩৫৬। সচিত্র

মহাদেব রায়

দেশীয় তাসে শিল্পকলা। প্রবাসী । ৪১/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪৮, পৃ ৫৬৮-৫৭১। সচিত্র

বাঁকুড়ার দশাবতার তাস প্রসঙ্গে।

মানিকলাল সিংহ

কাঁসাই সভ্যতা। সমকালীন। ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, পৃ ৩৪-৩৭।

বাঁকুড়ায় সূর্যপূজা। বিশ্ববাণী । ২৭/৮, আশ্বিন ১৩৭২, পৃ ৪৩৫-৪৩৮।

‘কল্যাণী’ বৈশাখ ১৩৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।

মল্লভূমের মল্লরাজা দেবতাদের আদিবৃত্তান্ত। কৌশিকী । ৪/৯-১০, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১, পৃ ৩৩-৪১।

বাঁকুড়া জেলার মন্দির ও ডেভিড ম্যাককাচন্। কৌশিকী । নবপর্যায়, ২/২-৭, মাঘ ১৩৭৮-আষাঢ় ১৩৭৯, পৃ ৩৫-৪০। সচিত্র

যামিনীকান্ত সেন

বিষ্ণুপুরের প্রত্নকলাকীর্তি। বঙ্গপ্রবীণ । ৬/১/৩, চৈত্র ১৩৪৪, পৃ ৩৬৪-৩৬৮। সচিত্র

যোগেশচন্দ্র রায়

বাঁকুড়ার পত্র। প্রবাসী । ১৯/১/৫, ভাদ্র ১৩২৬, পৃ ৪৪৩-৪৪৯ ; ১৯/১/৬, আশ্বিন ১৩২৬, পৃ ৫৬৭-৫৭২ ; ১৯/২/৩, পৌষ ১৩২৬, পৃ ২২৬-২৩২।

[ছাতনায় চন্দ্রীদাস] : মন্তব্য। প্রবাসী । ২৬/১/১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ৩০।

“বস্তুবো”র বিজ্ঞপ্তি/আলোচনা। প্রবাসী । ২৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ৫১২-৫১৪।

ছাতনায় চন্দ্রীদাস : ২য় মন্তব্য। প্রবাসী । ২৬/২/৬, চৈত্র ১৩৩৩, পৃ ৭৬৯-৭৯৩।

* মাঘ মাসে এক বিশেষ অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

বাঁকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা। প্রবাসী । ৩৪/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ ৬৭৫-৬৭৯। সচিত্র

বাঁকুড়ার দুটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রবাসী । ৩৭/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৪, পৃ ৩২৩-৩২৬।

(১) অপরিখাপ্ত ধান্য (২) মেলেরিয়া-হ্রাস।

একতেশ্বর শিব/ আলোচনা। প্রবাসী । ৪১/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪৮, পৃ ৪৬১-৪৬৩।

কোক-মুখা দুর্গা। প্রবাসী । ৪৯/২/৬, চৈত্র ১৩৫৬, পৃ ৫৩৯-৫৪০।

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কিংবদন্তীর বিষ্ণুপুর। অমৃত । ৭/১৩, ১১ শ্রাবণ ১৩৭৪, পৃ ৯৭৫-৯৭৮। সচিত্র

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

তুঘুগানে রামকাহিনী। সমকালীন। ২৪/৬, আশ্বিন ১৩৮৩, পৃ ২৪৯-২৫৪।

মনসার ঝাঁপান : মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর। কৌশিকী। ৮/৮-১০, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৫, পৃ ৩০-৩৫।

রাসলীলার পিরামিড ও অন্যান্য রাসমঞ্চ। মাসিক বসুমতী নবকলেবরে। ১/২, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃ ৮৪-৮৭। সচিত্র

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য (যদু ভট্ট) মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা। ৮/৪, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ ২২৫-২২৭।

রাখালচন্দ্র নাগ

বাঁকুড়ায় গন্ধবণিক্। গন্ধবণিক্। ৬/৯, আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ ৩২০-৩২২।

স্বর্গীয় হরিরচণ দাস। গন্ধবণিক্। ৭/৭, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ ২৭০-২৭৭।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শুশুনিয়ার পর্কর্তলিপি। প্রবাসী। ১৩/২/৫, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ ৪৯৭-৫০০।

রাধাগোবিন্দ রায়

পরলোকে স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা। ৬/৫, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ ৩৪৪-৩৫০।

রামপ্রসাদ সরকার

ধারার মেলা। গল্প-ভারতী। ২৫/৯, ফাল্গুন ১৩৭৬, পৃ ৯৯১-৯৯২। সচিত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা। প্রবাসী। ২৩/২/৬, চৈত্র ১৩৩০, পৃ ৮৪৩-৮৫০।

বাঁকুড়ার উন্নতি। প্রবাসী। ২৪/১/১, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ ১১৪-১৩০। সচিত্র

বাঁকুড়ার প্রস্তাবিত ম্যুজিয়ম। প্রবাসী। ৪০/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ ৩৬০-৩৬৩। সচিত্র

রামানুজ কর

ঝাঁটিপাহাড়ী। তাম্বুলি-পত্রিকা। ২/১২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩, পৃ ৩৫০-৩৫১।

বাঁকুড়া জেলার বিবরণ। প্রবাসী। ২০/২/৬, চৈত্র ১৩২৭, পৃ ৫৪৬-৫৪৯।

বাঁকুড়া জেলায় তাম্বুলীর সংখ্যা। তাম্বুলি-পত্রিকা। ১০/৪, চৈত্র ১৩৩০, পৃ ৮৯-৯০।

* বিভূতিভূষণ দত্ত। তাম্বুলি-পত্রিকা। ১০/৭, আষাঢ় ১৩৩১, পৃ ১৮৭-১৮৮।

বাঁকুড়ার কংগ্রেস কর্মী বিভূতিভূষণ দত্ত প্রসঙ্গে।

বর্তমান বাঁকুড়া। প্রবর্তক। ১৯/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, পৃ ১৩৬-১৪৪; ১৯/২/৩, পৌষ ১৩৪১, পৃ ২৫৩-২৫৮; ১৯/২/৪, মাঘ ১৩৪১, পৃ ৪১৩-৪১৬; ১৯/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ ৪৯৬-৫০৪।

শঙ্কুনাথ ঘটক

পরেশনাথের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কৌশিকী। নবপর্যায়, ২/১, পৌষ ১৩৭৮, পৃ ১৩-১৪।
পাঁচমোড়ার 'মা-পুতুল'। কৌশিকী। নবপর্যায়, ২/১১-১২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, পৃ ১৩৪-১৩৬।

বিহারীনাথ প্রসঙ্গে। কৌশিকী। নবপর্যায়, ৩/৯-১০, শারদীয় ১৩৮০, পৃ ৪০-৪১।

বাঁকুড়ী ভাষার শব্দাবলী প্রসঙ্গে। কৌশিকী। ৪/১-৫, পৌষ-বৈশাখ ১৩৮০-১৩৮১, পৃ ৬-৭।

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

রেশম পোকার চাষ। লক্ষ্মী (বাঁকুড়া)। ১/৩, পৌষ ১৩৩১, পৃ ১১৫-১১৭।

রেশম পোকার চাষ ও বাঁকুড়ার রেশমশিল্প। লক্ষ্মী। ১/৫, ফাল্গুন ১৩৩১, পৃ ১৮৩-১৮৭ ; ১/৬, চৈত্র ১৩৩১, পৃ ২৩০-২৩৩ ; ১/৭, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ২৭৩-২৭৪ ; ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, পৃ ৩০৭-৩০৮ ; ১/১১, ভাদ্র ১৩৩২, পৃ ৪৫২-৪৫৫ ; ১/১২, আশ্বিন ১৩৩২, পৃ ৪৮৯-৪৯০।

শিবেন্দু মাস্তা

লৌকিকদেবী খাঁদুরাণী। কৌশিকী। ৩/১-৫, পৌষ ১৩৮০-বৈশাখ ১৩৮১, পৃ ১৪।

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাঁকুড়া। মাসিক বসুমতী। ৪৭/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, পৃ ২৮০-২৮৩; ৪৭/২/৩, পৌষ ১৩৭৫, পৃ ৪৩৫-৪৩৭। সচিত্র

শ্রীরা [রামানুজ কর]

রামজীবনপুরের পিরী বংশ। তাম্বুলি-পত্রিকা। ২/৮, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ২২৪-২২৮।

স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র কর। তাম্বুলি-পত্রিকা। ২/১১, কার্তিক ১৩২৩, পৃ ৩০৭-৩১৫।

শ্রীস্বজাতি সেবক [রামানুজ কর]

কেঙ্কাকুড়ার ইতিহাস। তাম্বুলি-পত্রিকা। ১/৪, কার্তিক ১৩২১, পৃ ১১৫-১১৯ ; ১/৫, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ ১৩৪-১৩৯।

সত্যকিঙ্কর সাহানা

ছাতনায় চণ্ডীদাস। প্রবাসী। ২৬/১/১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ২০-৩০। সচিত্র

উত্তর/আলোচনা। প্রবাসী। ২৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৩৩, পৃ ৫১২।

লেখকের প্রবন্ধ বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য-র উত্তর।

ছাতনায় চণ্ডীদাস (২)। প্রবাসী। ২৬/২/৫, ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃ ৬২৩-৬৩০। সচিত্র

আশ্রয় ও স্বাস্থ্য লাভার্থ বাঁকুড়ার উপযোগিতা। প্রবাসী। ৪১/২/৩, ফাল্গুন ১৩৪৮, পৃ ৫৪৯-৫৫১।

সত্যকুমার রায়

জগদ্রাম রায়ের সময় নিরূপণ। দাসী। ৫/৫, মে ১৮৯৬, পৃ ২৭৩-২৭৫।

সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মদ্রভূমি বিষ্ণুপুর। বসুধারা। ৯/২/৪, মাঘ ১৩৭২, পৃ ২১৭-২১৮।

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়

ডিহরের তাম্রযুগীয় সভ্যতা। কৌশিকী। ১১/২-১২, এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ ৯-১০।

সুখময় সরকার

বিদ্যদ্বন্দ্বত বসন্তরঞ্জন। প্রবাসী। ৫৪/১/৩, আষাঢ় ১৩৬১, পৃ ৩১১-৩১৪। সচিত্র

*বাঁকুড়া টাউন হলে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বন্দ্বভের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পঠিত।

সুধাকান্ত দে

বাঁকুড়ায়। *আর্থিক উন্নতি*। ১/১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ৭১-৭৫।

সুধাংশুকুমার রায়

বাঁকুড়ার কয়েকটি কারুশিল্প। *প্রবাসী*। ৪১/২/৩, পৌষ ১৩৪৮, পৃ ২৯১-২৯৬। সচিত্র
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গের পুঙ্করণা-জনপদ। *বঙ্গশ্রী*। ১/২, ফাল্গুন ১৩৩৯, পৃ ১৩৫-১৩৬।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসের উপেক্ষিত। *প্রবাসী*। ৫৩/১/৪, শ্রাবণ ১৩৬০, পৃ ৪৯২-৪৯৬।

সুভাষ চৌধুরী

আচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। *দেশ*। ৩৮/৪৩, ১১ ভাদ্র ১৩৭৮, পৃ ৩৪৯-৩৫২।

সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

স্বর্গীয় কেমদারনাথ কুণ্ডু। *তাম্বুলি পত্রিকা*। ৬/১২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭, পৃ ৩৩০-৩৩২।

আমার পুঁথি বা রাজহাটি থাকের ইতিহাস। *তাম্বুলি-পত্রিকা*। ৩/১০, আশ্বিন ১৩২৪,
পৃ ৩১২-৩১৫ ; ৪/১, পৌষ ১৩২৪, পৃ ১১-১৪ ; ৪/৯, ভাদ্র ১৩২৫, পৃ ২৯৯-৩০১ ;
৪/১০, আশ্বিন ১৩২৫, পৃ ৩১১-৩১৩।

* বিপিনবিহারী কুণ্ডু ও রাজহাটি নিমজ্জন প্রথা। *তাম্বুলী-পত্রিকা*। ৭/৫, বৈশাখ ১৩২৮,
পৃ ১১৮-১২২।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

“ছাতনায় চণ্ডীদাস” সম্বন্ধে বক্তব্য/আলোচনা। *প্রবাসী*। ২৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৩৩,
পৃ ৫০৯-৫১২।

পদকর্তা রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ। *ভারতবর্ষ*। ১৬/২/১, পৌষ ১৩৩৫, পৃ ১৬-২২।

পঞ্চরংগ। *উদয়ন*। ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, পৃ ২০৯-২১৭। সচিত্র

হারানন্দ দত্ত

বাঙ্গালী গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর। *সমকালীন*। ১৯/১০, মাঘ ১৩৭৮, পৃ ৪৮৫-৫০২।

হিরণ্ময় সেন

বাকুলিয়া (বাঁকুড়া)/পঞ্চগ্রাম। *বর্তমান*। ২/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫, পৃ ১৮৫-১৮৬।

হেমেন্দ্রনাথ পালিত

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নূতন কথা। *প্রবাসী*। ৩৪/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪১,
পৃ ২৪২-২৪৫।

বাঁকুড়ার পুঁথি। *প্রবাসী*। ৪২/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃ ১৮০-১৮২।

শুভঙ্কর ও শুভঙ্করী। *প্রবাসী*। ৪৪/১/৫, ভাদ্র ১৩৫১, পৃ ৩৭০-৩৭২।

দেশাবলি বিবৃতি ও বাঁকুড়া হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ভূমি। *প্রবাসী*। ৪৯/২/৩, পৌষ ১৩৫৬,
পৃ ২৭৮ ; ২৮০।

বন-বিষ্ণুপুর। *প্রবাসী*। ৫১/১/১, বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ ৪৬।

নিরুপমা রাঢ়া (রাধা)। *প্রবাসী*। ৫১/১/৬, আশ্বিন ১৩৫৮, পৃ ৫২৮-৫২৯।

ওন্দার মাঠ। *প্রবাসী*। ৫২/১/৪, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ ৪৯৯-৫০১।

বীরভূম

অস্ত্রগাত

বামা পাগ্লা। *বেদব্যাস*। ৩/১১, ফাল্গুন ১২৯৫, পৃ ২৭৩-২৭৪ ; ৩/১২, চৈত্র ১২৯৫, পৃ ২৭৫-২৭৬।

বক্রেম্বর। *গৃহস্থ*। ৫/৬, চৈত্র ১৩২০, পৃ ৬৭৬।

দুবরাজপুরের তাম্বুলী। *তাম্বুলি-পত্রিকা*। ২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ১৭৬-১৭৮।

অন্নদাচরণ বিশ্বাস

* রামানন্দ রায়ের জীবনী। *মহাজন্মবন্ধু*। ১/১২, মাঘ ১৩০৮, পৃ ২৮৫-২৮৮।

অমলেন্দু মিত্র

পল্লীকবি সূর্যকান্ত। *সংহতি*। ২৫/৩, আষাঢ় ১৩৬৫, পৃ ২৩৩-২৩৬।

রাঢ়ে ধর্মঠাকুর ও মনসা। *অমৃত*। ৭/৫১, ১৩ বৈশাখ ১৩৭৫, পৃ ৯৮৯-৯৯১।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখা হয় নাই ১২ : পাকুড়হাঁস। *দেশ*। ৩৮/৪৪, ২৫ ভাদ্র ১৩৭৮, পৃ ৫৬৯-৫৭১। সচিত্র

দেখা হয় নাই ১৫ : হাটি সেরান্দি। *দেশ*। ৩৮/৪৮, ২২ আশ্বিন ১৩৭৮, পৃ ৯১০-৯১৩।

সচিত্র

ইলামবাজারের গালার কাজ। *কৌশিকী*। ৬ষ্ঠ খণ্ড, শারদীয় ১৩৭৮, পৃ ২-৪।

‘দেশ’-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের (আশ্বিন ১৩৭২) সংক্ষেপিত আকারে পুনর্মুদ্রণ।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

বীরভূমির বিবরণ। *অনুসন্ধান*। ৭/৩-৪, ১৫-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০, পৃ ১০৩-১০৬ ; ১৫৬-১৬২।

অরুণ চৌধুরী

বীরভূমের ‘মণ্ডল’ প্রথা। *চতুষ্কোণ*। ৫/৭, কার্তিক ১৩৭২, পৃ ৮৯৭-৯০২।

অগ্নিযুগের প্রথম দণ্ডিতা দুকড়িবালা দেবী। *চতুষ্কোণ*। ৭/৯, পৌষ ১৩৭৪, পৃ ৯১১-৯১৫।

আবদুল মওদুদ

বীরভূমের মুসলমান রাজাদের ইতিহাস। *মাসিক মোহাম্মদী*। ১৯/১০, শ্রাবণ ১৩৫৩, পৃ ৮৪০-৭ ; ১৯/১১, ভাদ্র ১৩৫৩, পৃ ৯৫১-৯৫৩।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বীরভূমের বাউল সম্প্রদায়। *সংহতি*। ২২/৫, ভাদ্র ১৩৬২, পৃ ২৩৫-২৩৭।

ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বামা ক্ষ্যাপা। *প্রবর্তক*। ২৫/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, পৃ ১৪৯-১৫১।

উমাপদ রায়

ব্রাহ্মণডিহির নবরত্ন মন্দির। *ভারতবর্ষ*। ৪৪/২/৩, ফাস্খুন ১৩৬৩, পৃ ৩১৬-৩১৭। সচিত্র
এম, আবদুর রহমান

চণ্ডীদাস ও কেলাহগীর। *মাসিক মোহাম্মদী*। ৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ ১১৭-১১৯।

বেগম জাল বিবি। *মাসিক মোহাম্মদী*। ৪/১১, ভাদ্র ১৩৩৮, পৃ ৮০৫-৮০৮।

রাজর্ষি আসাদ উল্লাহ। *মাসিক মোহাম্মদী*। ৬/৩, পৌষ ১৩৩৯, পৃ ১৬৩-১৬৪।

কবি জমির উদ্দীন দফাদার। *গুলিস্ত*। ১/৫, আষাঢ় ১৩৪০, পৃ ২২৭-২২৮।

বীরবাহু আলিনকি খাঁ। *মাসিক মোহাম্মদী*। ৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃ ৮৯-৯৩।

ঐতিহাসিক ও কবি মুন্সি নেজাবৎ হোসেন। *সংকল্প*। ঈদ সংকলন, মাঘ ১৩৭২,
পৃ ১০৫-১১২।

কর্মী

বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জেলাসমূহ—বীরভূম। *প্রবাসী*। ২৪/২/১, কার্তিক ১৩৩১, পৃ ১০৮-১১২।

কালীপদ ঘটক

বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ। *প্রবাসী*। ৬২/১/৪, শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃ ৪৭৬-৪৮২।

কালীমোহন ঘোষ

ধর্মরাজ পূজা। *পন্নী-স্বরাজ*। ২/৪-৫, মাঘ-ফাস্খুন ১৩৩৭, পৃ ১০৮-১১১।

কুমারলাল দাশগুপ্ত

নানুর। *প্রবাসী*। ৬৭/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, পৃ ১৭৫-১৭৯। সচিত্র

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন

সম্পাদকীয় মন্তব্য। *বীরভূমি* (নব পর্যায়)। ১/৯, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ৪৩৭-৪৪০।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের লেখা 'চণ্ডীদাস সম্বন্ধে স্থানীয় কিস্মদন্তী' প্রবন্ধ (শ্রাবণ ১৩১৮,
পৃ ৪৩৩-৪৩৭) প্রসঙ্গে।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রী কঙ্কালী পীঠ। *মানসী ও মর্মবাণী*। ১৩/২/৬, মাঘ ১৩২৮, পৃ ৫১০-৫১২।

শ্রীশ্রী কঙ্কালী পীঠ। *অর্চনা*। ১৯/১০, অগ্রহায়ণ ১৩২৯, পৃ ৩৫২-৩৫৩।

ললাটেশ্বরী। *প্রভাতী*। ৩/১২, চৈত্র ১৩২৯, পৃ ৪৯০-৪৯২।

গীতিকা গুহ

সূত্রধরের আঁকা দুর্গাপট। *সমকালীন*। ২৪/৬, আশ্বিন ১৩৮৩, পৃ ২৬০-২৬৩।

হাটসেরান্দি গ্রামের দুর্গাপট প্রসঙ্গে।

গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাদশাহী সড়ক। *সমকালীন*। ২৩/৫, ভাদ্র ১৩৮২, পৃ ২১০-২১১।

গোলোকবিহারী দে

আলিপুর। *পুণ্য*। ৫/১, আশ্বিন ১৩১২, পৃ ৩৭-৩৮।

গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য

নানুরের বিস্মৃত মহামহোপাধ্যায়। *ভারতবর্ষ*। ৪৩/১/১, আষাঢ় ১৩৬২, পৃ ১০-১৩।

মহামহোপাধ্যায় জগদ্বল্লভ ন্যায়ালঙ্কার প্রসঙ্গে। জীবৎকাল ১৮ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৯ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে।

গৌরীধর মিত্র

বক্রেশ্বর। মানসী ও মন্মথবাণী। ১৫/২/৩, কার্তিক ১৩৩০, পৃ ২৬৪-২৬৫।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি। প্রবাসী। ২৪/২/৫, ফাল্গুন ১৩৩১, পৃ ৬৮৮-৬৯০।

বীরভূমের তসর-শিল্প। প্রবাসী। ২৬/১/১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ৫৬-৬০।

বীরভূমের রেশম-শিল্প। প্রবাসী। ২৬/১/৫, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃ ৭৭০-৭৭৫।

বীরভূমের শর্করা-শিল্প। প্রবাসী। ২৭/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ১৭৬-১৮০।

সাঁওতাল-বিদ্রোহ। ভারতবর্ষ। ১৫/১/৩, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ ৪৩৯-৪৪৬।

বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৩৪/২, ১৩৩৪, পৃ ১৩৯-১৪৮।

বীরভূমের সূত্র-শিল্প। প্রবাসী। ২৭/২/১, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ ৫৮-৬০।

বীরভূমের লাক্ষা-শিল্প। প্রবাসী। ২৭/২/৫, ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃ ৬০৬-৬১২।

বীরভূমের কৃষি-কথা। প্রবাসী। ২৮/১/৪, শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃ ৫১৬-৫২২।

লক্ষুর/বিবিধ-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ। ১৬/১/৪, আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ ৫৫৯-৫৬৫।

বীরভূমের খনিজ-সম্পদ। প্রবাসী। ২৮/২/৫, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ ৬৪০-৬৪৬। সচিত্র

বীরভূমের বিবিধ শিল্প। প্রবাসী। ২৯/১/৬, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ ৮৫৫-৮৬৩।

বীরভূমে মেলা/বিবিধ-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ। ১৭/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ ৯৩১-৯৩৫।

বীরভূমি। পঞ্চপুষ্প। ৩/২/৩, পৌষ ১৩৩৭, পৃ ৩৪৫-৩৫১।

বীরভূমের শিক্ষার কথা। বঙ্গলক্ষ্মী। ৬/৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ ৪৪৬-৪৪৮ [৫৪৬-৫৪৮]।

বীরভূমের জল-প্রণালী/বাংলার সম্পদ। আর্থিক উন্নতি। ৬/৬, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ ৪০৩-৪০৪।

বীরভূমবাণী (সিউড়ি) পত্রে প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।

নৃসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর/আলোচনা। পঞ্চপুষ্প। ৪/২/১-২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, পৃ ৯৪৮-৯৪৯।

বীরভূমের শিল্প-কথা। আর্থিক উন্নতি। ৭/১, বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ ৩-৫।

বীরভূম-বাণীতে প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।

নলহাটি/বাংলার সম্পদ। আর্থিক উন্নতি। ৭/৩, আষাঢ় ১৩৩৯, পৃ ১৭১-১৭২।

বীরভূমবাণী ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।

জয়দেব উড়িয়া নহেন/আলোচনা। পঞ্চপুষ্প। ৫/১/২, শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ ২২২-২২৪।

বর্তমান বীরভূমি/দপ্তর। মাসিক বসুমতী। ১২/১/৩, আষাঢ় ১৩৪০, পৃ ৪১৩-৪১৬।

* কেন্দুবিষ্ণু ও জয়দেব। দেশ। ২/২৩, ২৭ এপ্রিল ১৯৩৫, পৃ ৬১-৬৩।

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মভূমি। দেশ। ৬/৩১, ২ আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৪০৪-৪০৬।

বক্রেশ্বর। প্রবাসী। ৩৯/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ ৫১৪-৫১৮।

পদকর্তা জগদানন্দ সরকার ঠাকুর। ভারতবর্ষ। ৩১/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৫০, পৃ ৪৮২-৪৮৫।

ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতবর্ষ। ৩১/২/৩, ফাল্গুন ১৩৫০, পৃ ১৬৮।

কবি যাদবিন্দ বা যাদবেন্দু বা যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ভারতবর্ষ। ৩১/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, পৃ ৪২৪।

বীরভূমের কবিওয়ালা। মাসিক বসুমতী। ২৪/২/৪, মাঘ ১৩৫২, পৃ ৪৪৯-৪৫০।

ময়নাডালে মহাপ্রভু ও মিত্রঠাকুর পরিবার। বঙ্গশ্রী। ১৩/২/২, মাঘ ১৩৫২, পৃ ১১৩-১১৭। সচিত্র

ঐতিহাসিক ছড়া। বঙ্গশ্রী। ১৬/১/৩, ভাদ্র ১৩৫৫, পৃ ২৫৫-২৬০।

বীরভূমের জাতি-প্রসঙ্গ। প্রবাসী। ৪৮/২/৫, ফাল্গুন ১৩৫৫, পৃ ৪২৫-৪৩৩। সচিত্র

বীরভূমে সাহিত্য চর্চা। অগ্রগামী (সিউডী)। ১/১, শ্রাবণ ১৩৫৯, পৃ ১৪-১৮।

বীরভূমে সাহিত্য চর্চা ও প্রসিদ্ধ স্থান। অগ্রগামী। ১/২, ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ ৬৬-৭৭।

চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কলেশ্বরের শিবমন্দির/ আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার। ভারতী। ২৯/৪, শ্রাবণ ১৩১২, পৃ ৩৮৯-৩৯৩।

জলধর সেন

বীরভূমের কথা। ভারতবর্ষ। ৪/২/৩, ফাল্গুন ১৩২৩, পৃ ৪১২-৪২২। সচিত্র

শিবাভোগ। সচিত্র শিশির। ১/১/১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ ৩০-৩১।

লাভপুরের দেবী ফুল্লরার মন্দিরে শিবাভোগ প্রসঙ্গে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন

* তারাপীঠ। সমাজ। ৩/১, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ ১২-১৫।

তারাপদ সাঁতরা

বাংলার বর্ধিষু পরিবারের উপাসিত বিগ্রহ : একটি সমীক্ষা। কৌশিকী। ৮/১১-১২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, পৃ ৬২।

তুলসীদাস চক্রবর্তী

বীরভূমের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। বীরভূমি (নব পর্য্যায়)। ১/৯, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ৪৪৫-৪৪৭।

রাজনগরের আসাদ উল্লা ও বদী উল জমান প্রসঙ্গে।

ত্রৈলোক্যনাথ পাল

গোপভূমের আটজন সদগোপ রাজা। সদগোপ পত্রিকা। ১/৭, মাঘ ১৩৩৫, পৃ ১৮১-১৮৯।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বীরভূমের লোকসংগীত। সংহতি। ৩৩/১১, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃ ৩৮৫-৩৮৭।

দীনেশচন্দ্র সরকার

সিয়ান গ্রামের শিলালেখ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৮৩/৩-৪, কার্তিক-চৈত্র ১৩৮৩, পৃ ১-২২।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বক্রেস্বরের উপাখ্যান। দেশ। ২৫/১৬, ৩ ফাল্গুন ১৩৬৪, পৃ ১৬১-১৬৪; ২৫/১৭, ১০ ফাল্গুন ১৩৬৪, পৃ ২৫৪-২৫৮। সচিত্র

দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপাট মূলুক : বৈষ্ণব সাধনার পীঠস্থান। *মাসিক বসুমতী*। ৪১/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, পৃ ২০৫-২০৮।

শ্যামারূপার গড়। *মাসিক বসুমতী*। ৪১/২/৫, ফাল্গুন ১৩৬৯, পৃ ৯২৪-৯২৫।

শ্রীপাট মূলুক : বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম পীঠস্থান। *ভারতবর্ষ*। ৫১/১/১, আষাঢ় ১৩৭০, পৃ ৭৩-৭৫।

দেবদত্ত

তারাপীঠ। *মানসী ও মন্মথবাণী*। ১১/১/৬, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ ৬০৭-৬১৪।

ধ্রুব পাণ্ডা

বীরভূমের আলকাপ। *অমৃত*। ১/৪২, ১১ ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ ২৮২-২৮৩।

নগেন্দ্রনাথ সোম

নন্দীপুর-নন্দিনী। *অর্চনা*। ৮/১২, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৪৪৬-৪৪৮।

বক্রেশ্বর। *আর্য্যাবর্ত*। ২/১১, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৭৯১-৮০০।

নবদ্বীপচন্দ্র চট্টরাজ

চণ্ডীদাস নানুরের কথা। *প্রবাসী*। ৬৯/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, পৃ ২২৪-২২৬।

নিয়তি রায় চৌধুরী

মহারাজ নন্দকুমার ও তাঁর জন্মভূমি। *ভারতজ্যোতি*। পূজা সংখ্যা, ১৩৭০, পৃ ৪৭-৪৯।

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন। *প্রতিভা* (ঢাকা)। ১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২, পৃ ১৭২-১৭৮। (সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ)

বীরভূমের কথা। *ভারতী*। ৫০/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩, পৃ ২১৩-২২০।

* সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের সার মর্ম্ম।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়

বীরভূমি। *সংসঙ্গ* (কীর্ত্তহার)। ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, পৃ ৪০-৪৫; ৫/৩, আষাঢ় ১৩০৫, পৃ ৬১-৭১; ৫/৪, শ্রাবণ ১৩০৫, পৃ ১১৫-১২০; ৫/৬, আশ্বিন ১৩০৫, পৃ ১৫৭-১৬২।
সাঁওতাল বিদ্রোহ। *সংসঙ্গ*। ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩০৫, পৃ ২২১-২২৬; ৫/১০, মাঘ ১৩০৫, পৃ ২৫৬-২৬০।

পঞ্চানন তর্করত্ন

নামুর। *জন্মভূমি*। ৪/১১, কার্তিক ১৩০১, পৃ ৬৮০-৬৮৩।

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

হেতমপুরের মৃন্ময় দেউল। *এষা*। ২/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪, পৃ ২০৬-২১২।

পূর্ণচন্দ্র রায়

উদ্বোধন। *শ্রীনিত্যানন্দ সেবক* (কাশীমবাজার, মুর্শিদাবাদ)। ১/১১, ভাদ্র ১৩২১ (১৫ পৌষ ১৩২২), পৃ ৩০৯-৩১৪।

বীরভূম বড়লানিবাসী কমলাকান্ত দাসের বংশবৃত্তান্ত।

প্রফুল্লকুমার সরকার

ইলামবাজার—অজয়সেতু। ভারতবর্ষ। ৪৩/২/৪, চৈত্র ১৩৬২, পৃ ৪৮৮।

প্রভাসচন্দ্র দে

বীরভূমি ও মল্লভূমি। বাণী। ৪/১, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ ৪-১২; ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ ৬৭-৭৮।

প্রভাসচন্দ্র পাল

বাংলার ‘বীরভূমি’। সংহতি। ৩৩/১, বৈশাখ ১৩৭৩, পৃ ১৯-২৩।

বিজয়রত্ন মজুমদার

কবি-তীর্থে। সচিত্র শিশির। ১/২/৪০, ৩১ শ্রাবণ ১৩৩১, পৃ ১২৫৯-১২৬৫। সচিত্র নানুর প্রসঙ্গে।

বিশ্ব বিশ্বাস

কাকসার গড়। সংহতি। ২৬/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬৬, পৃ ৪২০-৪২১।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গড়তলীর প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্য। কৌশিকী (বাগনান)। ফাল্গুন ১৩৭৭, পৃ ৩-৫।

প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্যকথা। দূসর মাটি (সিউড়ি)। শারদীয় সংকলন, ১৩৭১, পৃ ৬২-৬৪।

বিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত

রাজনগরের দুই একটি কথা। সচিত্র শিশির। ১/১৩, ২৬ মাঘ ১৩৩১, পৃ ৩৮৭।

ব্রজসুন্দর সান্যাল

চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। জাহ্নবী। ২/১১, ফাল্গুন ১৩১৩, পৃ ৩০০-৩০৩।

ভাগবতদাস বরাট

জয়দেবের মেলা। প্রবাসী। ৬৮/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫, পৃ ২৩৩-২৩৫।

ভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূমের চিনির কারখানা। মহাজনবন্ধু। ১/৯, কার্তিক ১৩০৮, পৃ ২০৭-২১০।

মণি চক্রবর্তী

সপ্তস্বির দেশ—বক্রেশ্বর। অমৃত। ৪/৪২, ৭ ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ ১৭১-১৭৩। সচিত্র

মনোজিৎ বসু

বীরভূম/পশ্চিমবঙ্গ-পরিক্রমা। বসুধারা। ১/৫, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ ৫৯৯-৬০৩; ১/২/৩, পৌষ ১৩৬৪, পৃ ৩৪১-৩৪৭। সচিত্র

মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী

সুপুর। গৃহস্থা। ৪/১১, ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৮৬৪-৮৭৩।

অভিভাষণ (বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির উদ্বোধনে)। শাস্ত্রতী। ২/৯, পৌষ ১৩২১, পৃ ৫৭৩-৫৭৭।

শ্যামারূপার গড়। গৃহস্থা। ৬/৬, শ্রাবণ ১৩২২, পৃ ৯৬৩-৯৬৯।

* বর্ধমান অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখায় পঠিত।

বীরভূমিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ/বিবিধ-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ। ৩/২/৪, চৈত্র ১৩২২, পৃ ৬০১-৬০৪।

বীরভূমের অজয়-তীরবর্তী ঐতিহাসিক সম্পদ। ভারতবর্ষ। ৪/১/৩, ভাদ্র ১৩২৩, পৃ ৪৬০-৪৬৫। সচিত্র

একচক্র। ভারতবর্ষ। ৪/২/৪, চৈত্র ১৩২৩, পৃ ৪৯৪-৫০২। সচিত্র

রাঢ়ে সেন-রাজধানী। ভারতবর্ষ। ৭/১/২, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ ২২২-২২৯। সচিত্র

জয়দেব-কেন্দুলীর মেলা। সারথি। ১/২, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ ১১৮-১২০।

মুলুক। মানসী ও মন্মবাণী। ১৯/১/৬, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ ৫৩৫-৫৪০।

কাঁদরা/বিবিধ-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ। ১৫/১/২, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ ২৬৮-২৭০।

মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবগোপাল মুখোপাধ্যায়

রাঢ়ভূমিতে মোঙ্গল প্রভাব (প্রতিবাদ আলোচনা)। কথাসাহিত্য। ২৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ ২৯৪-২৯৬।

অমলেন্দু মিত্র-র লেখা 'রাঢ়ভূমিতে মোঙ্গল প্রভাব' প্রবন্ধের (শ্রাবণ ১৩৮১) প্রতিবাদ।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে স্থানীয়-কিম্বদন্তী। বীরভূমি (নব পর্য্যায়)। ১/৯, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ৪৩৩-৪৩৭।

সম্পাদকীয় মন্তব্য (পৃ ৪৩৭-৪৪০) সহ। সম্পাদক কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

পল্লী-উৎসব। পল্লী-স্বরাজ্য। (নব পর্য্যায়)। ৩/৪, পৌষ ১৩৪২, পৃ ১২৫-১২৬।

বীরভূম জেলার রাখাল বালকদের বনভোজন উৎসব ও হেল বোল (<হোর বোল) ও তার ছড়া।

যামিনীকান্ত সেন

বীরভূমের প্রত্ন-কলা সম্পদ। বঙ্গপ্রত্নী। ৫/২/৬, পৌষ ১৩৪৪, পৃ ৮৭৬-৮৮০। সচিত্র

রঞ্জন গুপ্ত

বীরভূমের লৌহ উৎপাদন শিল্প : উত্থান ও পতন। ঐতিহাসিক। প্রবন্ধ সংকলন : ৬, শ্রাবণ ১৩৮৫, জুলাই ১৯৭৮, পৃ ৩৩-৫৮।

কোম্পানি আমলে বীরভূমের উৎপাদক ব্যবসায়ী : সুরুলের সরকার পরিবার।-কৌশিকী। তয় পর্য্যায়, ২য় বার্ষিক সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১৭২-১৯৬।

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যাদুপটুয়া। কৌশিকী। ৩/১-৫, পৌষ ১৩৮০-বৈশাখ ১৩৮১, পৃ ১৪-১৫।

রামতারণ রায়

বীরভূমে বাসুদেবমূর্তি/আলোচনা ১২। গৃহস্থ। ৪/৯, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ৫৪৫-৫৪৭।

প্রভু নিত্যানন্দ ও স্বদীয় জন্মভূমির দুর্দশা। গৃহস্থ। ৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ ১৫২-১৫৯।

ইটিগাড়া। গৃহস্থ। ৬/৯, আষাঢ় ১৩২২, পৃ ৮৭৫-৮৮১।

রেবতীমোহন সরকার

বীরভূমের ভাদু পরব। কল্যাণী। ৬/৫, ফাল্গুন ১৩৬৯, পৃ ২১৬-২১৮।

শান্তিদেব ঘোষ

বীরভূমের সাংস্কৃতিক জীবন। দেশ। ৩২/২৭, সাহিত্য সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭২, পৃ ১০৭; ১০৯;

১১১; ১১৫-১১৬। সচিত্র

শিবরতন মিত্র

বীরভূমির ইতিবৃত্ত, ১ম ভাগ ১ম অধ্যায়, বীরভূমের নামতত্ত্ব ও সীমানা। *বীরভূমি* (কীর্ত্তহার)। ১/৩, পৌষ ১৩০৬, পৃ ৮১-৮৬; ২য় অধ্যায়, সীমানা। ১/৫, ফাল্গুন ১৩০৬, পৃ ১৩০-১৩৭; ৩য় অধ্যায়, পুরাতত্ত্ব ও পূর্ব ইতিহাস, ১ প্রবাদমূলক। ১/১১, ভাদ্র ১৩০৭, পৃ ৩৩৯-৩৪২।

প্রবাদ প্রসঙ্গ। *বীরভূমি* (কীর্ত্তহার)। ১/৯, আষাঢ় ১৩০৭, পৃ ২৫২-২৫৫; ১/১২, আশ্বিন ১৩০৭, পৃ ৩৪৫-৩৫১; ২/৩, পৌষ ১৩০৭, পৃ ৬৫-৭১।

আলোচিত প্রসঙ্গ : ১। বিরূপাক্ষ গোস্বামী, ২। কেদার রায়; ৩। অর্জুন রায়, ৪। ঘনশ্যাম গোস্বামী, ৫। ছকু বিদ্যাবাগীশ, ৬। রুদ্রচরণ রায়; ৭। ঘনশ্যাম মিত্র, ৮। রামসুন্দর তর্কালঙ্কার। পদকর্ত্তা কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। *বীরভূমি*। ২/১, কার্ত্তিক ১৩০৭, পৃ ১-১৯।

ঐতিহাসিক ছড়া-সংগ্রহ। *বীরভূমি*। ২/৪, মাঘ ১৩০৭, পৃ ৯৯-১০৬; ২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, পৃ ২২১-২২৫; ২/১১-১২, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮, পৃ ৩৫২-৩৫৩।

১২৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে লিখিত ছড়া, রচয়িতা রাইকৃষ্ণ দাস; গোরার কবিতা; বানভাসীর কবিতা [সন ১২৩০ সালের বন্যা উপলক্ষে রচিত]।

* কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। *বীরভূমি*। ২/৯, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ ২৪১-২৫৫।

বীরভূমে সেঙ্গস বা জনসংখ্যা : ১৯০১। *বীরভূমি*। ২/৯, আষাঢ় ১৩০৮, পৃ ২৫৭-২৬৭। জমিদারী বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। *বীরভূমি*। ২/১১-১২, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮, পৃ ৩৪৫-৩৫২।

পাড়রা বা পোন্ধার ডিহি গ্রামের রাজবংশাবলী প্রসঙ্গে।

গঙ্গানারায়ণ বিরচিত “ভবানী-মঙ্গল”। *প্রবাসী*। ১০/২/১, কার্ত্তিক ১৩১৭, পৃ ৮৫-৯৪।

বীরভূমে সাহিত্য-চর্চা। *বীরভূমি* (নব পর্য্যায়)। ১/১, অগ্রহায়ণ ১৩১৭, পৃ ২১-৩০।

* বীরভূম সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত (১৪ই আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ন ৪।। ০২রা অক্টোবর ১৯১০।।

মহিলা-কবির রামায়ণ। *বীরভূমি*। ১/১১, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ ৫৪৮-৫৫৩।

* “বীরভূম সাহিত্য পরিষদ”এর ২য় বর্ষের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে (২৮শে শ্রাবণ ১৩১৮) পঠিত।

বঙ্কু-স্মৃতি। *মনসী ও মন্সবানী*। ১৯/১/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ৩৩৪-৩৪০।

কবি মহম্মদ আজীজ উস্ সোভান প্রসঙ্গে।

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

বীরভূম। *মাসিক বসুমতী*। ৪৭/২/৪, মাঘ ১৩৭৫, পৃ ৬৩২-৬৩৪; ৪৭/২/৫, ফাল্গুন ১৩৭৫, পৃ ৭৫৪-৭৫৬। সচিত্র

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

মেলা-দর্শন। *সাধনা*। ২/১/৬, বৈশাখ ১৩০০, পৃ ৫৪৪-৫৪৮।

ব্রহ্মদৈত্যের মেলা, বক্রেশ্বরের মেলা এবং বক্রেশ্বর মন্দির প্রসঙ্গে।

২৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

শ্রীহর্ষ মল্লিক

বাবুইজোড়ের হাতী-ঘোড়া। *কৌশিকী*। ১৩ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ ৬-৯।
সতীশচন্দ্র মিত্র

তারাপীঠ। *পন্নীচিত্র* (বাগেরহাট, খুলনা)। ৪/৪, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ১০২-১০৮।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত

বীরভূমের ঢেকার জাতি। *বীরভূমি* (নব পর্যায়)। ১/৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ ৩৫৭-৩৬৬।

* বীরভূম সাহিত্য পরিষদের ২য় বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে, ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, সিউড়ী রামরঞ্জন টাউনহলে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। লেখক।

বীরভূমের খনিজ সম্পদ (১) লৌহ। *বীরভূমি*। ১/৮, আষাঢ় ১৩১৮, পৃ ৪০১-৪০৭।

বীরভূমের খনিজ সম্পদ (২) কয়লা। *বীরভূমি*। ১/৯, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ৪২৭-৪৩১।

বীরভূমে গালার কারবার। *বীরভূমি*। ১/১০, ভাদ্র ১৩১৮, পৃ ৫০৭-৫১৬; ১/১১, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ ৫২৫-৫৩২।

জগদানন্দ ও নয়নানন্দ। *সাহিত্য-সংবাদ* (হাওড়া)। ৩/৭, মাঘ ১৩২০, পৃ ৩১৯-৩২২; ৩/৮, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ ৩৭২-৩৭৫।

সাগরময় ঘোষ

বীরভূমের সাঁওতাল। *প্রবাসী*। ৩৮/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪৫, পৃ ৪৮৫-৪৯৩। সচিত্র

সারদাচরণ মিত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। *কায়স্থ-পত্রিকা*। ৮/৩, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩১৬, পৃ ১২৪-১২৬।

সিন্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

শৈবতীর্থ রাখড়েশ্বর। *সমকালীন*। ২৪/১০, মাঘ ১৩৮৩, পৃ ৪১৩-৪১৫।

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা : বীরভূম। *সমকালীন*। ২৫/৫, ভাদ্র ১৩৮৪, পৃ ১৮৭-১৯২।

বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেব। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। ৯০/৩, ১৩৯০, পৃ ২১-২৫।

ইতিহাসের আলোতে-ছায়াতে “বীরভূম-বিবরণ”। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*। ৯৪/১-২, ১৩৯৪, পৃ ৪১-৫২।

শ্রীপাট মুলুক : বীরভূম জেলার একটি গ্রাম। *কৌশিকী*। ৩য় পর্যায়, ২য় বার্ষিক সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৬, পৃ ১৩০-১৪৩।

সিরাজুল হক

বীরভূমে মধ্যযুগের মুসলমান কবি। *সমকালীন*। ২৩/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃ ৩২৩-৩৩০।

রমজান আলীর ‘আদ্য বেকতি’ কাব্য (লিপিকাল ১১২৫ বঙ্গাব্দ) প্রসঙ্গে।

সুভাষ পাঠক

বিশ্মৃত আর এক পদকর্তা—সতীশচন্দ্র। *সমকালীন*। ২৫/৪, শ্রাবণ ১৩৮৪, পৃ ১৫৬-১৬৪।

শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা চৌহাট্টা গ্রামনিবাসী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৭৬-১৩২২) প্রসঙ্গে।

সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে এক সপ্তাহ। *পঞ্চপুষ্প*। ৫/১/৩, ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ ২৯৫-৩০৪। সচিত্র

লাভপুর ও বীরভূম ভ্রমণ প্রসঙ্গে।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বক্তৃৎস্বর। যমুনা। ৪/১১, ফাল্গুন ১৩১৯, পৃ ৪৪৭-৪৫১।

স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রাচীন বঙ্গলার ভাস্কর্য্যবিজ্ঞান ও তক্ষণশিল্প। বঙ্গপ্রী। ৮/১/৬, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ ৭৭২-৭৭৯।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

চণ্ডীদাস। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৬/২, ১৩২৬, পৃ ৭৫-৮৪।

হরদাস মিত্র

বীরভূমে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান। মানসী ও মন্মথবাণী। ১২/১/৬, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ ৬৩০-৬৩৩।

বীরভূম বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা।

চণ্ডীদাস ও বাসুলীদেবী। বঙ্গপ্রী। ২/১/২, ফাল্গুন ১৩৪০, পৃ ২০০-২০৬। সচিত্র

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন মঙ্গলডিহি। বীরভূমি (নব পর্য্যায়)। ৩/৩, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ১৫০-১৫৯।

বীরভূমের গ্রাম্য ক্রীড়া। বীরভূমি। ৩/৯, পৌষ ১৩২০, পৃ ৫৪৩-৫৪৬।

সুপূর। গৃহস্থ। ৫/৬, চৈত্র ১৩২০, পৃ ৫৫০-৫৫২।

মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তীর লেখা 'সুপূর' (ভাদ্র ১৩২০) প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

বীরভূমের বিবিধ প্রসঙ্গ (১) : * বক্তৃৎস্বর শ্রীশ্রীমহিমমন্দিরী মূর্তি। গৃহস্থ। ৭/৬, চৈত্র ১৩২২, পৃ ৫৪০-৫৪৪।

স্বর্ণলালী। ভারতবর্ষ। ১৭/১/২, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃ ২৯৪-২৯৭।

খুশিটিগেরী। বঙ্গপ্রী। ১/৬, আষাঢ় ১৩৪০, পৃ ৬৮৭-৬৯১।

চণ্ডীদাস। উত্তরা (কাশীধাম)। ৮/১২, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ ৭৭৪-৭৭৯।

চণ্ডীদাস-নানুর। ভারতবর্ষ। ২৮/২/৫, বৈশাখ ১৩৪৮, পৃ ৬৪৩-৬৪৬। সচিত্র

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

তারাদীঘি। মানসী ও মন্মথবাণী। ১৯/২/৪, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ ৩৪৯-৩৫৪।

চণ্ডীদাস। রাজভোগ (ঢাকা)। ২/৫, কার্তিক ১৩৩৫, পৃ ১০৩-১০৬।

চণ্ডীদাসের দেশ ও কাল। ভারতবর্ষ। ৪২/২/৩, ফাল্গুন ১৩৬১, পৃ ৩৩৮।

জয়দেব কেন্দুলীর মেলা। আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয়া ১৩৭২, পৃ ১৯৯-২০২।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

গণপুরের মন্দির। দেশ। ৩৬/২১, ৮ চৈত্র ১৩৭৫, পৃ ৮১৫-৮২০। সচিত্র

হাওড়া

অজিতকুমার মজুমদার

থলিয়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প ও শিল্পী। *কৌশিকী*। ৫/১-১২, পৌষ ১৩৮১-অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃ ১৪-১৫।

অজিতকুমার মাইতি

বালিয়া (হাওড়া)/পঞ্চগ্রাম। *বর্তমান*। ১/২/৫, ফাল্গুন ১৩৫৪, পৃ ৫৮৫-৫৮৬।

অজ্ঞাত

হাওড়ায় সাধারণ পাঠাগার। *সাহিত্য-সংবাদ* (হাওড়া)। ৩/৬, পৌষ ১৩২০, পৃ ২৮৯-২৯৩।

পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পরিচয়। *মাহিষ্য-সমাজ*। ১৫/৭, কার্তিক ১৩৩২, পৃ ৩৪৫-৩৫৬।

ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী, এম-ডি। *বাতায়ন*। ৩/২৮, ৯ চৈত্র ১৩৪০, পৃ ৪-৭। *সচিত্র*
সুরেন্দ্রনাথ দাশ [শিল্পরত্ন]/চারজন। *মাসিক বসুমতী*। ৩৬/২/৩, পৌষ ১৩৬৪, পৃ ৩৮০-৩৮১।

অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীশ্রী গড়চণ্ডী মাতা। *মাহিষ্য-সমাজ*। ৬/১২, চৈত্র ১৩২৩, পৃ ২৪১-২৪৬।

অনাদি ঘোষ

পোটোরা বলছে আমাদেরও পোকায় খেয়েছে। *কৌশিকী*। নবপর্যায়, ২/১, পৌষ ১৩৭৮, পৃ ৫-৮।

অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

জগৎবল্লভপুরের মন্দির। *কৌশিকী*। নবপর্যায়, ২/৮-৯, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৯, পৃ ৮০-৮১।

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

হাওড়ার জনস্বাস্থ্য। *আর্থিক উন্নতি*। ২২/৭, কার্তিক ১৩৫৪, পৃ ৭৭-৭৯।

অন্নদাচরণ সেন

বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়/আলোচনা। *প্রবাসী*। ৩৪/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ ৭০৫।

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নিরঞ্জন কবি। *সাহিত্য-সংবাদ* (হাওড়া)। ৩/১, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ ১৯-২২।

অক্ষয়কুমার দে প্রসঙ্গে। শিবপুরের এক বণিক সন্তান, বণিকের দোকানে মসলা বাঁধার কাজ করতেন।

শিবপুর-কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড ১। আধুনিক শিবপুরের কথা। *আলোচনা* (হাওড়া)। ২৫/৩, আষাঢ় ১৩২৮, পৃ ৭৭-৮১; ২-শিবপুরের পরিচয়। ২৫/৫, ভাদ্র ১৩২৮, পৃ ১৪৩-১৪৬ ;

৩-ব্রাহ্মণ- প্রাধান্য। ২৫/৭, কার্তিক ১৩২৮, পৃ ২০৩-২১১।

অবিনাশচন্দ্র দাস

বটকৃষ্ণ পাল। গঙ্গাবণিক। ২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ ১১৬-১২০।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখা হয় নাই ১১ : দেউলপুর। দেশ। ৩৮/৪৩, ১৮ ভাদ্র ১৩৭৮, পৃ ৪৬৯-৪৭২। সচিত্র।

দেখা হয় নাই ৪০ : আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা : বাগনান। দেশ। ৩৯/২২, ১৮ চৈত্র ১৩৭৮, পৃ ৮৮৯-৮৯৪। সচিত্র

দেখা হয় নাই ৪৩ : ভাস্কুর। দেশ। ৩৯/২৫, ৯ বৈশাখ ১৩৭৯, পৃ ১১৯৫-১১৯৮। সচিত্র

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

বিশপস্ কলেজ : গথিক স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শন। কৌশিকী। ৭/৫-১১, বৈশাখ-কার্তিক ১৩৮৪, পৃ ২৬-২৮।

অশান্ত সোম [তারাপদ সীতারা]

হাওড়া জেলার সয়লা উৎসব। সংহতি। ২৫/৯, পৌষ ১৩৬৫, পৃ ৫৫০-৫৫২।

হাওড়া জেলার পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন্দ পাঁচালী। প্রবাসী। ৫৯/১/৫, ভাদ্র ১৩৬৬, পৃ ৬১৭ ; ৬২০-৬২১ ; ৬২৪-৬২৫।

অশ্বিনীকুমার সেন

স্যার উইলিয়াম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষা। ঐতিহাসিক চিত্র। ৩/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৪, পৃ ২৪২-২৪৫।

* ১৯০৭। জুন সংখ্যা "Hindusthan Review" পত্রিকায় প্রকাশিত "Sir William Jones How he learnt Sanskrit" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

অসীম মুখোপাধ্যায়

আমতার মন্দির। অমৃত। ১/১৫, ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃ ২০৬-২১০। সচিত্র

আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হাওড়ার হরিনারায়ণপুর। কৌশিকী। ৪র্থ খণ্ড, চৈত্র ১৩৭৭, পৃ ৬-৮। সচিত্র

হাওড়া জেলার একটি লৌকিক দেবতা। কৌশিকী। নবপর্যায়, ২/৮-৯, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৯, পৃ ৭৮-৮০। সচিত্র

বাণীবন গ্রামের জঙ্গলবিলাস পীর প্রসঙ্গে।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জঙ্গলবিলাসের দরগা। সুপ্রভাত। ৬/৬, পৌষ ১৩১৯, পৃ ২৭৮-২৮১। সচিত্র

বাণীবন গ্রামের (উলুবেড়িয়া মহকুমা) পীর জঙ্গলবিলাসের দরগা প্রসঙ্গে।

উপেন্দ্রনাথ রায়

স্বর্গীয় হাফেজ জাহাঁদার বক্স মন্ডিক। দেবালয়। ২/১০, মাঘ ১৩১৭, পৃ ২৪১-২৪৩।

করুণাময় ভট্টাচার্য

স্বর্গীয় কদারনাথ। সাহিত্য-সংহিতা (হাওড়া)। ৫/১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ৫৪৮-৫৫২।

কদারনাথ ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে।

২৫৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

কাসিমবাজার হিন্দুসমিতি

মহারাজ জামাতা ধর্মদাস দে-র জীবনী। তিলিবাঙ্কব। ২/৭, কার্তিক ১৩১৭,
পৃ ১৫৪-১৬৩।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্বচীন মন্দির-মসজিদ। কৌশিকী। ৪/১-৫, পৌষ-বৈশাখ ১৩৮০-১৩৮১, পৃ ৯-১২।

বেড়াবেড়িয়া গ্রামের শিবমন্দির প্রসঙ্গে।

ঢেংকেশ্বর শ্রীশ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র। কৌশিকী। ৭/১-৪, পৌষ-চৈত্র ১৩৮৩, পৃ ১০-১২।

সেদিনের বটতলা : আজকের বাসস্তপ। কৌশিকী। ৩/৬-৮, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০,
পৃ ২৬-২৮।

খাজিম আহমেদ

জাস্টিস সৈয়দ আবুল মাসুদ : অন্তঃশীল সাক্ষাৎকার। কাফেলা। ১/৪, শ্রাবণ ১৩৮৮,
পৃ ৫১-৫৩। সচিত্র

গোপালচন্দ্র রায়

কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের জন্মস্থান। ভারতবর্ষ। ৩৮/১/৫, কার্তিক ১৩৫৭,
পৃ ৩৬২-৩৬৫।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বাংলাদেশে তিব্বতী দেবালয় : ভোটবাগান মঠ। মাসিক বসুমতী। ৪৭/২/৪, মাঘ ১৩৭৫,
পৃ ৫৪৫-৫৪৬। সচিত্র

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

রায়-বাঘিনী। ভারতবর্ষ। ৩১/১/৫, কার্তিক ১৩৫০, পৃ ৪১১-৪১২।

চারুচন্দ্র মিত্র

রাঢ়ে বৌদ্ধ মঠ : ভোটবাগান (সঙ্কলন)। ভারতবর্ষ। ১/৩, ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৪০৫-৪০৯।
সচিত্র

চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়। প্রবাসী। ৩৪/২/৩, পৌষ ১৩৪১, পৃ ৩৯৩-৩৯৭। সচিত্র

জীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ার ইতিহাস : ১ সিংটী-শিবপুর। সাহিত্য-সংবাদ (হাওড়া)। ৩/৫, অগ্রহাষণ ১৩২০,
পৃ ২৩৩-২৩৬।

মৌড়ীর শ্মশানেশ্বর। নন্দিনী (শিবপুর, হাওড়া)। ৩/৭, কার্তিক ১৩২১, পৃ ১৯৪-১৯৬।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ সাহিত্যিক “যোগীন্দ্রনাথ”। নন্দিনী (শিবপুর, হাওড়া)। ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১,
পৃ ৫৭-৬০।

‘ভারত-কুসুম’ এবং ‘আলোচনা’ মাসিক পত্রের সম্পাদক, ঔপন্যাসিক যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রসঙ্গে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

নেপাল প্রবাসী কাপ্তেন রাজকৃষ্ণ কর্মকার। প্রবাসী। ১৪/২/৬, চৈত্র ১৩২১,

পৃ ৬৩০-৬৩৬। সচিত্র

জ্যোৎস্নাময় ব্যানার্জী

গ্রামের পরিচয়। নবশক্তি। ৪/২২, ৪ কার্তিক ১৩৩৯, পৃ ৩৬-৩৮।

মুগকল্যাণ গ্রামের পরিচয়।

তারাসীতরা

হাওড়া জেলার মাটির ঘর। প্রবাসী। ৬৮/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৭৫, পৃ ২৩৩-২৩৬।

তারাপদ পাল

বিলুপ্ত জনপদ ফিঞেরডাঙ্গা। সমকালীন। ১৭/৬, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ ৩০৯-৩১৩।

তারাপদ সীতরা

আর এক হরিনারায়ণপুর। আনন্দম্ ১ (আনন্দ নিকেতন [নবাসন], বাগনান, হাওড়া)। শারদীয়

১৩৭১, পৃ ৬০-৬৮। সচিত্র

ডেভিড ম্যাক্কাচন ও আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা। কৌশিকী। নবপর্যায়, ২/২-৭, মাঘ ১৩৭৮-আষাঢ় ১৩৭৯, পৃ ৫৯-৬৬। সচিত্র

গ্রামের নাম কি করে হল? (১) ভুলগেড়ে। কৌশিকী। ৩/৬-৮, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০, পৃ ২৫-২৬। (২) বামুনধুকুড়ে। ৩/১১, কার্তিক ১৩৮০, পৃ ৬৩-৬৫। (৩) জালপাই। ৩/১২, অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পৃ ৭৮-৭৯। (৪) শিঙ্গোড়া। ৪/১-৫, পৌষ-বৈশাখ ১৩৮০-১৩৮১, পৃ ৮। (৫) বাঁকুড়দা। ৪/৬-৮, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮১, পৃ ৩০-৩১। (৬) নবাসন। ৪/৯-১০, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১, পৃ ৪৮। (৭) বাঘাবেড়ে। ৪/১১-১২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ ৫৭-৫৮। (৮) খাদিনান। ৫/১-১২, পৌষ ১৩৮১-অগ্রহায়ণ ১৩৮২, পৃ ৯-১০। নবঘরা। ৭/১-৪, পৌষ-চৈত্র ১৩৮৩, পৃ ৯। সারোঙ্গা। ৮/১-৭, পৌষ ১৩৮৪-আষাঢ় ১৩৮৫, পৃ ১৫।

নবাসন : হাওড়া জেলার একটি গ্রাম। কৌশিকী। ৩য় পর্যায়, ১ম বার্ষিক সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ ১১৮-১৩৯।

ত্রিপুরা বসু

‘মেলাই-চণ্ডী’র পুঁথি। কৌশিকী। ৮/১১-১২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, পৃ ৫৮-৬০।

দেবাশিস বসু

সেকালের আদুল ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। কৌশিকী। ১১/১, অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ ১৫-১৬।

ধর্মানন্দ মহাভারতী

ভূরশুট রাজ্য। আরতি (ময়মনসিংহ)। ৬/৬, আষাঢ় ১৩১৩, পৃ ১৬১-১৬৪।

নলিনচন্দ্র মিশ্র

বালীগ্রামের প্রাচীন সমাজ। সাহিত্য-সংবাদ (হাওড়া)। ৯/৯, চৈত্র ১৩২৬, পৃ ৩৫৮-৩৬৩ ; ৯/১০-১১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, পৃ ৩৮৩-৩৮৬।

পঞ্চানন রায়

মহাকবি ভারতচন্দ্রের বংশ ও জন্মস্থান। শিক্ষা ও সাহিত্য। বৈশাখ ১৩৬৩।

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান। বিংশ শতাব্দী। ৯/৫, কার্তিক ১৩৭১, পৃ ৭৮১-৭৮৪।

২৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

পাঁচুগোপাল রায়

রামকৃষ্ণ রায় কবিত্ত্ব । *ভারতবর্ষ* । ৪২/১/৪, আশ্বিন ১৩৬১, পৃ ৪২০-৪২১।

কলিকাতা গ্রামের ঐতিহ্য । *কৌশিকী* । ৫ম খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ ৪-৬।

প্রকাশচন্দ্র সরকার

ভোটবাগানের ইতিহাস । *মাহিষ্য-সমাজ* । ১২/১০, মাঘ ১৩২৯, পৃ ৪৩৮-৪৪২ ; ১২/১২, চৈত্র ১৩২৯, পৃ ৫২৪-৫২৭।

প্রফুল্লচন্দ্র কর

ইতিহাসের এক অধ্যায় (ভিক্ত-ভারত মৈত্রী প্রচারক শ্রীমৎ পূর্ণগিরি স্কাংস্বামী) । *বিশ্ববাণী* । ১৭/১২, মাঘ ১৩৬২, পৃ ৫৭৫-৫৭৯।

প্রবাল রায়

বিখিরা ও রাউতাড়ার পুরাকীর্তি । *কৌশিকী* । ৮/১১-১২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, পৃ ৫১-৫৬।

হাওড়া শহর : লৌকিক দেবদেবী (১ম পর্ব) । *কৌশিকী* । ১০/১-১০, পৌষ ১৩৮৬-আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ ১-৯।

প্রভাসচন্দ্র কর

ভিক্ত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র—ভোটবাগান মঠ । *প্রবাসী* । ৩২/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৬০, পৃ ১৯৫-২০২।

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বালির ইতিহাস । *ভারতবর্ষ* । ২৪/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ ৮৯২-৮৯৬। সচিত্র

বলাইলাল মুন্সী

মাহিষ্য-কুল-তিলক মহেন্দ্রনাথ রায় । *মাহিষ্য-সমাজ* । ১৫/৭, কার্তিক ১৩৩২, পৃ ৩৫৭-৩৬১।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য

ভারতচন্দ্র । *সাহিত্য-সংবাদ* (হাওড়া) । ৮/১, শ্রাবণ ১৩২৫, পৃ ৯-২৪।

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাস । *আলোচনা* (হাওড়া) । ২০/৯, পৌষ ১৩২৩, পৃ ২৯৪-৩০০ ; ২০/১০, মাঘ ১৩২৩, পৃ ৩১৮-৩২৪ ; ২০/১১, ফাল্গুন ১৩২৩, পৃ ৩৫৭-৩৬৪ ; ২১/১, বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ২২-২৮ ; ২১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ ৬০-৬৩ ; ২১/৩, আষাঢ় ১৩২৪, পৃ ৮৯-৯২ ; ২১/৫, ভাদ্র ১৩২৪, পৃ ১৫৬-১৫৮ ; ২১/৭, কার্তিক ১৩২৪, পৃ ২০৯-২১৫।

বিপদবারণ সরকার

তুলট কাগজ । *পদ্মী-স্বরাজন*, প, ১/১০-১১, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৪১, পৃ ২৩৩-২৩৫।

মৈনেন গ্রামের কাগজ শিল্প প্রসঙ্গে।

ব্যোমকেশ মুস্তফী

হাবড়া-ঘুসুড়ির বৌদ্ধ-মঠ । *অনুশীলন* । ১/১, আশ্বিন ১৩০১, পৃ ৬-২১।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

নৈয়ায়িক কেশরী কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ । *প্রবর্তক* । ২২/১/১, বৈশাখ ১৩৪৪,

পৃ ৯০-৯২।

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পটচিত্রে শেষ স্বাক্ষর। দেশ। শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬০, পৃ ১৭৬-১৭৯। সচিত্র
চণ্ডীপুর গ্রামের পটুয়া যোগেন চিত্রকর প্রসঙ্গে।

রাজেন্দ্রনাথ সোম

বেতোড়ে বাণিজ্য। সাহিত্য-সংবাদ (হাওড়া)। ৩/৪, কার্তিক ১৩২০, পৃ ১৬২-১৬৬।
হাওড়ায় এগুি। কৌশিকী। ৪/৬-৮, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮১, পৃ ৩১-৩২।
'বঙ্গবাণী' পত্রে প্রকাশিত (১৪ জুলাই ১৯৩০) প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

রামপদ বিশ্বাস

দুর্কার খাঁ রায় চৌধুরী। মাহিষ্য-সমাজ। ১৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ ৫০-৫৩।

রামপ্রসাদ মজুমদার

হাওড়া জেলার লোকের উপাধি/আলোচনা। সমকালীন। ১৭/১, বৈশাখ ১৩৭৬,
পৃ ৬৩-৬৪।
হাওড়ার প্রাচীন ভাস্কর্য (চিত্রাদি)/আলোচনা। সমকালীন। ১৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬,
পৃ ১১৯-১২১।
হাওড়া জেলার প্রাচীন গ্রন্থ ও ভাষা। সমকালীন। ১৮/৫, ভাদ্র ১৩৭৭, পৃ ২৪৭-২৫০।

শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি। ভারতবর্ষ। ২৬/১/৪, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ ৫৩৭-৫৩৯।

শিবেন্দু মামা

হাওড়া জেলায় আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু। সমকালীন। ২৩/৯, পৌষ ১৩৮২, পৃ ৩৭৫-৩৮২।
হাওড়া জেলায় দারু-তক্ষণ শিল্প। সমকালীন। ২৪/১২, চৈত্র ১৩৮৩, পৃ ৪৯০-৪৯৬।
হাওড়া জেলায় পশ্চের কাজ। কৌশিকী। ৭/৫-১১, বৈশাখ-কার্তিক ১৩৮৪, পৃ ১৫-২৩।
চোঙঘুরালি গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য : একটি সূর্যমূর্তি। কৌশিকী। ১২/১, অক্টোবর ১৯৮৫,
পৃ ৪৫-৪৭।
গড়বালিয়া : হাওড়া জেলার একটি গ্রাম। কৌশিকী। ৩য় পর্যায়, ২য় বার্ষিক সংখ্যা, জুলাই
১৯৯৬, পৃ ১৪৪-১৫৯।

শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়

গ্রামের কথা—সামতা। নবশক্তি। ৪/২৬, ১৮ কার্তিক ১৩৩৯, পৃ ৩২-৩৪।

সন্তোষকুমার দাস

অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক। মাহিষ্য-সমাজ। ১২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ ৪৬-৪৯।

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

হাওড়া। মাসিক বসুমতী। ৪৯/১/৪, শ্রাবণ ১৩৭৭, পৃ ৬০২-৬০৪; ৪৯/১/৫, ভাদ্র ১৩৭৭,
পৃ ৭৩৭-৭৪০।

সতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু

হাওড়া জেলার গ্রাম্য দেব-দেবী ও আর্থীকরণ। কৌশিকী। ১১/১, অক্টোবর ১৯৮৪,
পৃ ৫-৮।

২৫৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

সমর বসু

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ/ব্যায়ামে বাঙালী। সংহতি। ৩১/১০, মাঘ ১৩৭১, পৃ ৪৪০-৪৪২।

সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ

ভোটবাগান ও মন্দির। ভারতী। ৪৮/১, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ ৭৩-৭৭। সচিত্র

সুকুমার মিত্র

বাগনানে প্রথম বিমান অবতরণ। কৌশিকী। ৩/১২, অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পৃ ৮০-৮২।

সুকুমার সেন

দক্ষিণ রাঢ়ের ইসলামি বাঙলার কবি। দেশ। শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৪, পৃ ১৮৩-১৮৭।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-তিব্বত ইতিহাসের এক লুপ্ত অধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা। বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫৯, পৃ ৮১-৮৩।

তিব্বত-ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্র—ভোটবাগান/আলোচনা। প্রবাসী। ৫৩/২/৪, মাঘ ১৩৬০, পৃ ৫০০; ৫০২।

একটি মন্দিরের ইতিহাস। অমৃত। ১/৩৬, ২৭ পৌষ ১৩৬৮, পৃ ৮৭৩-৮৭৪।

ভোটবাগানের মন্দির প্রসঙ্গে।

সুরেশচন্দ্র ঘোষাল

আমতা মেলাই চণ্ডীদেবীর প্রাচীনত্ব। অর্চনা। ৪৪/৯, কার্তিক ১৩৫৫, পৃ ২৪৪-২৪৭।

সুশোভন সরকার

পূর্ণ গিরি গোস্বামী। উত্তরা (কাশীধাম)। ৮/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃ ৪১৪-৪২৩।

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

অনাদিলিঙ্গ কল্যাণেশ্বরের কাহিনী। উদ্বোধন। ৫৮/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩, পৃ ৬৩৯-৬৪০।

বালির কল্যাণেশ্বরের প্রসঙ্গে।

হরিধন কুণ্ডু

হাওড়ার কথা। সাহিত্য-সংবাদ (হাওড়া)। ৮/১০-১১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, পৃ ৪৫৩-৪৬২।

(হাওড়া সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হরিধন কুণ্ডু কর্তৃক ইতিহাস-শাখায় পাঠিত।)

হরিশ্রর শেঠ

রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর। প্রদীপ। ৫/৮-১২, শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ ১৩০৯, পৃ ২২৫-২২৯। সচিত্র

মানভূম

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

মানভূমের সংস্কৃতি। সংহতি। ২৭/১, বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ ১৩-১৪।

অমিয় দত্ত

টুসু পরবে পুরুলিয়ায়। দেশ। ৩৪/১৪, ২১ মাঘ ১৩৭৩, পৃ ৫৩-৫৮। সচিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মানভূম তথা পুরুলিয়ার লোকসংগীত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৮৮/২, ১৩৮৮, পৃ ২০-৩২।

ইন্দুভূষণ সেন

মানভূমের গ্রাম্য কবি। পঞ্চপুষ্প। ২/১২, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ১৭০৯-১৭১২।

কমলাকান্ত বসু

মানভূমের পল্লী শ্রী। জন্মভূমি। ৩৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ ৫৫-৫৮; ৩৬/৩, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ ৭৫-৭৮।

ছট্টমুড়া, রামপুর এবং পঞ্চকোট পাহাড় প্রসঙ্গে।

করবী রায়চৌধুরী

লোকসংস্কৃতির পাতায়: পুরুলিয়া। অমৃত। ৬/১১, ৩০ আষাঢ় ১৩৭৩, পৃ ৮০৯-৮১৪।
সচিত্র

গৌর ঘোষ

দীর্ঘ দেবতালয়। দেশ। ২৪/২৩, ২৩ চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ৬৭৭-৬৮১। সচিত্র

তেলকুপির মন্দির প্রসঙ্গে।

বিড়কিচানগরে ঘর। অমৃত। ৭/৩৩, ৬ পৌষ ১৩৭৪, পৃ ৬২৪-৬২৬।

পুরুলিয়ার 'পাড়া' গ্রাম [বিড়কিচানগর] প্রসঙ্গে।

চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়

ভাদুপুজা। ঐতিহাসিক চিত্র। ৪/৭, কার্তিক ১৩১৫, পৃ ৩১৯-৩২৭।

চিত্তরঞ্জন দেব

ঝুমুরের দেশ মানভূম। প্রবাসী। ৫৫/২/৬, চৈত্র ১৩৬২, পৃ ৭৩১-৭৩৬।

চুণীলাল রায়

মানভূম-বরাহভূমে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৮/১, ১৩২৮, পৃ ২৪-২৭।

পুরীকুবাণ মুদ্রা প্রসঙ্গে।

জয়দেব রায়

টুসুগান। সংহতি। ২২/৭, কার্তিক ১৩৬২, পৃ ৩৯১-৩৯২।

জীবনহরি সামন্ত

ভাদ্র পরব। প্রবাসী। ১৪/১/৬, আশ্বিন ১৩২১, পৃ ৭৫৩-৭৫৪।

মানভূমের ভাদুপূজা প্রসঙ্গে।

জীমূতবাহন সেন

মানভূমের ইতিহাসের গোড়ার কথা। সংহতি। ২১/৯, পৌষ ১৩৬১, পৃ ৪০৫-৪১২।

তরুণদেব ভট্টাচার্য

মানা মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৯০/৩, ১৩৯০, পৃ ৩৩-৪২।

দীপকরঞ্জন দাস

সীমান্ত বাংলার একটি মেগালিথিক নিদর্শন। কৌশিকী। ৬ষ্ঠ খণ্ড, শারদীয় ১৩৭৮, পৃ ১৪-১৫। সচিত্র

মেনহির প্রসঙ্গে।

দেউলটাড়ের একটি মন্দির। কৌশিকী। নবপর্ষায়, ২/১০, শারদীয় ১৩৭৯, ১০০-১০২।

পুরুলিয়ার মাল সম্প্রদায়। কৌশিকী। ৩/৬-৮, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০, পৃ ১৭-১৮।

দেবকুমার চক্রবর্তী

পুরুলিয়া জেলায় তাম্রায়ুধসম্ভার আবিষ্কার। কৌশিকী। ৬ষ্ঠ খণ্ড, শারদীয় ১৩৭৮, পৃ ৪-৭। সচিত্র

ধর্মদাস মিত্র

মানভূমের সম্পদ। কায়স্থ-পত্রিকা। ৩৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ২৫৪-২৫৬।

নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মানভূমের লোকসংগীত। মাসিক বসুমতী। ৩৯/২/৪, মাঘ ১৩৬৭, পৃ ৮৩২-৮৩৫।

নির্মলকুমার বসু

মানভূম জেলার মন্দির। প্রবাসী। ৩৩/১/৫, ভাদ্র ১৩৪০, পৃ ৬১৫-৬২২। সচিত্র
দ্রষ্টব্য [প্রবন্ধে ব্যবহৃত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের অর্থ]। তদেব, পৃ ৬৫০।

প্রভাসচন্দ্র দে

মানভূমে প্রাচীন জৈন-কীর্তি (সরাক জাতি)। জাহ্নবী। ৫/৬, আশ্বিন ১৩১৬, পৃ ১৮৯-১৯৮।

প্রভাসচন্দ্র পাল

পশ্চিমবঙ্গের নব কলেবর। সংহতি। ২৪/৭, কার্তিক ১৩৬৪, পৃ ৩৭০-৩৭৩।

পুরুলিয়া জেলা গঠন প্রসঙ্গে।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

পুরীকুষণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৮/১, ১৩২৮, পৃ ২৭-২৯।

মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৮/২, ১৩২৮, পৃ ৭৬।

বিশাখা গুপ্তরায়

নাটুয়া নাচ। পশ্চিমবঙ্গ। ৫/৪৭, ৬ শ্রাবণ ১৩৭৮, ২৩ জুলাই ১৯৭১, পৃ. ৪৯০।

ভবতোষ মজুমদার

মানভূম জেলায় প্রাচীন ঋৎসাবশেষ। ভারতবর্ষ। ৩১/১/২, শ্রাবণ ১৩৫০, পৃ. ১৪৯-১৫০।

ভাগবতদাস বরাট

মানভূমের ইতিহাস ও বিবর্তন। মন্দিরা। ২১/৪, শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃ. ২৩৫-২৩৭।

মানভূমের ইতিহাস। প্রবাসী। ৬৭/২/৫, ফাল্গুন ১৩৭৪, পৃ. ৬৬১-৬৬২।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

পুরীকুবাণ মুদ্রা সম্বন্ধে মন্তব্য (২)। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৮/১, ১৩২৮, পৃ. ২৯-৩৩।

মানিক সরকার

পুরুলিয়া জেলার ছো-নাচ। পশ্চিমবঙ্গ। ৫/৩৫, ১৬ বৈশাখ ১৩৭৮, ৩০ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ৩১৬-৩১৮। সচিত্র

রত্নেশ্বর রায়

মানভূমের স্থাপত্য ও শিল্প। কৌশিকী। ৪/১১-১২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ. ৫৪-৫৭।

‘মুক্তি’ সাপ্তাহিক পত্রে (পুরুলিয়া) ৪ জুন ১৯২৮ তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

রাখালরাজ রায়

মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা। ভারতবর্ষ। ২/২/৪, চৈত্র ১৩২১, পৃ. ৬৯২-৬৯৪।

রামকিঙ্কর চক্রবর্তী

মধুতটী (মানভূম)/পঞ্চগ্রাম। বর্তমান। ২/১/৪, শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ৩৭০-৩৭১।

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী

পুরুলিয়ার লোকনৃত্য-সম্পদ। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। ৪/৪, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩, পৃ. ৭-১৩।

রামশংকর চৌধুরী

মানভূমের কথ্য শব্দার্থ। সমকালীন। ২২/৩, আষাঢ় ১৩৮১, পৃ. ১২৫-১২৯; ২২/৪, শ্রাবণ ১৩৮১, পৃ. ১৭০; ২২/৫, ভাদ্র ১৩৮১, পৃ. ২১২-৪১৪ [২১৪]; ২২/৭, কার্তিক ১৩৮১, পৃ. ২৯৫-২৯৬; ২২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ. ৩৩১-৩৩৫; ২২/১০, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ৪২০-৪২২।

রেখা সিংহ

মানভূম ও মানভূমী ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। সঙ্কিতা (পাটনা)। ২/২-৩, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৫, পৃ. ৮২-৮৫।

শরৎচন্দ্র রায়

মানভূম জেলায় সাহিত্য-সেবা ও গবেষণার উপাদান। প্রবাসী। ৩৫/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ. ৫৩৫-৫৪৮। সচিত্র

* বিগত ১৮ই মে তারিখে পুরুলিয়ার হরিপদ-সাহিত্য-মন্দিরের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের দ্বিতীয় অংশ।

২৬২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১১ বর্ষ, ১ সংখ্যা

শান্তি সিংহ

চেলিয়ামা মন্দির। কৌশিকী। ৬ষ্ঠ খণ্ড, শারদীয় ১৩৭৮, পৃ ৩২।

বাদার মন্দির। কৌশিকী। নবপর্যায়, ২/১০, শারদীয় ১৩৭৯, পৃ ১২৬।

শিবরতন মিত্র

জমিদারবংশাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। বীরভূমি (কীর্ত্তহার)। ২/১১-১২, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮, পৃ ৩৪৫-৩৫২।

পাড়রা বা পোন্দার ডিহি গ্রামের রাজবংশাবলী প্রসঙ্গে।

শিবেন্দু মাস্তা

লৌকিক দেবতা ইষ্টনাথ। কৌশিকী। ৩/৯-১০, শারদীয়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮০, পৃ ৫০-৫৩।

লোকায়ত শিল্পকলা : ছো-নাচের মুখোশ। সমকালীন। ২১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পৃ ৩৬৫-৩৭১।

সুবোধ বসুরায়

দাঁড়বুমুরে সমাজচিত্র। কৌশিকী। ৬/১-১০, পৌষ ১৩৮২-আশ্বিন ১৩৮৩, পৃ ১৪-১৬।

দাঁড়বুমুরে সমাজচিত্র (প্রকৃতিপর্ব)। কৌশিকী। ৬/১১-১২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৩, পৃ ৪৫-৪৭।

সোমনাথ চক্রবর্তী

পুরুলিয়ার লোকশিল্প : ছো-নাচের মুখোশ। অমৃত। ১৭/৩৯, ৫ ফাল্গুন ১৩৮৪, পৃ ২৭-৩১।

সচিত্র

হরিনাথ ঘোষ

মানভূমের ভাষা। জাহ্নবী। ৩/১২, আষাঢ় ১৩২১, পৃ ৫৮৯-৫৯৬।

মানভূমের কুর্নি-জাতি। প্রবাসী। ১৪/১/৫, ভাদ্র ১৩২১, পৃ ৫৬৭-৫৭০।

মানভূম-ইছাগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ২৮/২, ১৩২৮, পৃ ৭৫।

* ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পরিষৎ-সংবাদ

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও পুরস্কার প্রদান

৮ শ্রাবণ ১৪১১ ২৪ জুলাই ২০০৪ শনিবার পরিষৎ-সভাকক্ষে একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে ১১১-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সভায় মূল সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার উপস্থিত থাকতে না পারায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকানাইচন্দ্র পাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সাংসদ মহম্মদ সেলিম। সভার সূচনায় পরিষদ-সম্পাদক অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী, তাঁর প্রতিবেদনে সংক্ষেপে সার্বিক উন্নয়নের দিকে উপস্থিত সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং সর্বস্তরের সাহিত্যসংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে সহায়তার বিষয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত প্রধান অতিথি তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর সাধ্যমতো সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় অর্চনা চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রবীণ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কারের প্রাপক কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুতত্ত্ব বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক সূরজ ভান স্বয়ং উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি, যেজন্য তাঁর পুরস্কারমূল্য ও মানপত্র ইত্যাদি পরে ডাক যোগে প্রেরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষাংশে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক বরুণ দে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ভাষণ দেন, বিষয় : 'নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসচর্চা'। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি প্রসঙ্গে আমাদের যেসব চেষ্টা ইতিপূর্বে রূপায়িত হয়েছে, তার কিছু কিছু উদাহরণ সহ

মূল্যায়ন ও বিচ্যুতির প্রশ্ন উত্থাপন করে যে মনোজ্ঞ ভাষণ তিনি দিয়েছেন তা সময়ভাবে বিস্তার দেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু সময়োপযোগী মূল্যবান বিশ্লেষণটি উপস্থিত সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতির বিশিষ্ট সদস্য অধ্যাপক অভিজিৎ রায়।

স্মরণ

১৮ ভাদ্র ১৪১১ ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ শনিবার পরিষৎ-ভবনে প্রয়াত দুই স্বনামধন্য লেখকের স্মরণসভা আয়োজিত হয়। তারা হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু ও খ্যাতকীর্তি সাংবাদিক নিখিল সরকার—যিনি শ্রীপাঙ্ক ছদ্মনামে লেখক হিসেবে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। শেঁষোক্ত জন পরিষদের দুঃসময়ে একান্ত হিতৈষীর মতো গঠনমূলক অনেক কাজে অংশ নিয়েছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পবিত্র সরকার। তাঁদের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে সভায় স্মৃতিচারণ হয়—নিমাইসাধন সম্পর্কে শ্রী পবিত্র সরকার ও শ্রী হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপাঙ্ক সম্পর্কে শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী রমাকান্ত চক্রবর্তী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী

৯ আশ্বিন ১৪১১ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রবিবার অপরাহ্নে পরিষৎ সভাকক্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮৫-তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনাসভা ও একটি প্রদর্শনী

আয়োজন করা হয়। 'বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা' বিষয়ে ভাষণ দেন শ্রীপরমেশ আচার্য। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে তরুণ কথাসাহিত্যিক আনসার উদ্দীনকে পূর্বঘোষিত ইলা চন্দ পুরস্কার এই অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীবিমান বসু। পরিষদের বিদ্যাসাগর সংগ্রহের বিভিন্ন গ্রন্থ পত্রিকাদি, তাঁর প্রাপ্ত উপাধি ছাড়াও পরিষদে রক্ষিত বিদ্যাসাগর-ব্যবহৃত নানা সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটি চিত্তাকর্ষক করে তুলতে আলোকচিত্রের মাধ্যমে তাঁর কলকাতাবাসের নানা ঘটনাকে তুলে ধরা হয়। প্রদর্শনী কক্ষে বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত বিশালায়তন টেবিলটি একটি অন্যতম দ্রষ্টব্য হিসেবে স্থান পায়। পনেরোদিন ধরে প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে রাখা হয়। সুধীদর্শকমণ্ডলী প্রতিদিনই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেছেন এবং উল্লেখ্য সংবাদপত্রে আলোচ্য প্রদর্শনী সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

প্রকাশন

পরিষদের ১১১-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন মূল অনুষ্ঠান-মধ্যে সভাপতি অধ্যাপক পবিত্র সরকার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১১০ বর্ষের ৪ সংখ্যাটি এবং অমিয় ধর রচিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার গোপাল হালদার শীর্ষক জীবনীগ্রন্থটি অনুষ্ঠানকভাবে প্রকাশ করেন। বিগত কয়েক মাসে প্রকাশন কর্মকান্ডের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে পুরাতন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ। বিশেষকরে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত তেরোটি গ্রন্থ নুতন করে মুদ্রিত হয়েছে, সেগুলির ক্রমিক সংখ্যা সহ শিরোনাম : ৪ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ৬ রামরাম বসু; ৭ গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য;

৮ গৌরকিশোর তর্কবাগীশ; ৯ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ; ১৫ উইলিয়াম কেরি; ১৭ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; ২০ রাধাকান্ত দেব; ২৩ মধুসূদন দত্ত; ২৪ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার; ২৭ নীলমণি বসাক; ৩৯ শ্যামাচরণ সরকার; ৪৯ রাজনারায়ণ বসু।

এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সীতার কন্যাস; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই খণ্ড বাংলা সাময়িক পত্র; সিস্টার নিবেদিতার Unpublished Notes; নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক; পলাশীর যুদ্ধ; বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মহিলা; পরিষদের পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে মদনমোহন কুমার সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে গিরিবালাদেবী ও জ্যোতির্ময়ীদেবী; ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জীবনী। সাবিত্রী রায়, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, চিত্তাহরণ চক্রবর্তীর জীবনী তিনটি মুদ্রণের কাজ চলছে।

আগ্রহী পাঠকমণ্ডলীর কাছে আনন্দের খবর এবার নিয়মিত একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থমালার প্রথমতমটি প্রকাশিত হবে আগামী কলকাতা পুস্তক মেলায়। ১৮২২ থেকে ১৮৬৪-র মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্ঞানিশিক্ষাভারের আগের পর্বে রচিত জ্ঞানীশিক্ষা বিষয়ক চারটি দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ পুস্তিকা পুনর্মুদ্রিত হবে, যেগুলি জ্ঞানীশিক্ষা বিধায়ক / গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার; ভায়তবর্ষীয় জ্ঞানীশিক্ষার বিদ্যালোভ / তারাশঙ্কর তর্করত্ন; জ্ঞানীশিক্ষা-বিধান/দ্বারকানাথ রায়; হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভাস / কৈলাশবাসিনী দেবী। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা লেখা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন অধ্যাপক স্বপন বসু।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬



সম্পাদকের প্রতিবেদন : ১৪১০ বঙ্গাব্দ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১০-তম বার্ষিক অধিবেশনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করি।

প্রথমেই সর্বনিয়ম নিবেদন এই যে, ১৪১০-এর ২৭ অগ্রহায়ণে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে আমি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হয়েছিলাম। তার আগে সম্পাদক ছিলেন শ্রীকল্যাণকুমার রায়। ২৭ অগ্রহায়ণের আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে সব কাজ হয়েছে, তার পূর্ণতর বিবরণ হয়তো শ্রীকল্যাণকুমার রায় দিতে পারতেন। আমি নথিপত্র দেখে বিবরণ লিখেছি। আমার মনে হয়েছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হলেই ভাল হয়। তাতে ছবিটা স্পষ্ট হয়।

ইতিমধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত হয়েছেন :

ঐন্ডাভাষ্যকার	অজয় বসু।
অভিনেত্রী	সুরাইয়া।
বেহালাশিল্পী	ভি. জি. যোগ।
ন্যায়াধীশ	মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়।
অভিনেত্রী	সুরভা চট্টোপাধ্যায়।
সেতার শিল্পী	বিলায়েত-হোসেন খাঁ।
পরিষদের কর্মী	মুরারি ঠাকুর।
জাতীয় শিক্ষক	কানাইলাল ভট্টাচার্য।
সাংবাদিক	বিক্রম নায়ার।
জননেতা	ই. কে. নয়নার।
পরিষদের শুভার্থী	পার্বতীনাথ মুখোপাধ্যায়।
অধ্যাপিকা	পম্পা মজুমদার।
প্রাক্তন সাংসদ এবং	
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী	হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
সাহিত্যিক	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক এবং	
প্রাক্তন উপাচার্য	নিমাইসাধন বসু।
সাংবাদিক এবং	
ঐতিহাসিক	নিখিল সরকার।
গীতশিল্পী	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
অধ্যাপক	হুমায়ুন আজাদ।
সাহিত্যিক	মল্লিকরাজ আনন্দ।
রবীন্দ্রগীত শিল্পী	রমা মণ্ডল।
পুথিগবেষক	অক্ষয়কুমার কয়াল।

এই সকল বিশিষ্টজনের প্রয়াণে আমরা দুঃখ অনুভব করি। তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সহানুভূতি জানাই। তাঁদের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এখন, বঙ্গাব্দ ১৪১০-এ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে কাজ হয়েছে তার বিবরণ দিচ্ছি। প্রসঙ্গত বঙ্গাব্দ ১৪১১-তেও চলে আসতে হবে কখন কখন।

১৪১০-এ নয় বার কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন হয়েছে। সমস্ত অধিবেশনেই সদস্যদের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। উপসমিতিসমূহের পৌনঃপুনিক অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপসমিতির আরও বেশি অধিবেশন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, মাসিক অধিবেশন হয়েছে মাত্র একবার। এসিয়াটিক সোসাইটিতে মাসিক অধিবেশন মাসের শুরুতেই নির্দিষ্ট তারিখ-এ অপরাহ্ন পাঁচটায় অনুষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টান্ত যথাসাধ্য আমাদেরও অনুসরণ করা উচিত। মাসিক অধিবেশন হবে; সেখানে প্রবন্ধ বা নিবন্ধের সারাংশ পাঠিত এবং আলোচিত হবে; বিদ্যাচর্চা ধারাবাহিক হয়ে উঠবে। এই স্বপ্ন দেখি যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পণ্ডিতদের ও পড়ুয়াদের আগমনে, গবেষকদের ভাষণে, বহুসংখ্যক শ্রোতাদের উপস্থিতিতে গমগম করবে, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করা উচিত।

আয়ব্যয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'বাজেট'-ও আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আপেক্ষিক দারিদ্র্যই তার প্রধান কথা। তবে, সে-কারণেই, ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এবং এইরূপ নিয়ন্ত্রণের জন্যই আমাদের আর্থিক অনটন অসহনীয় হয়ে ওঠেনি। তবুও, বড় বিস্ময় লাগে এই দেখে যে, বঙ্গীয় র্যানেসাঁস-এর শেষ কীর্তি, অসামান্য ঐতিহ্যসম্পন্ন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, অদ্যাবধি অর্থাভাবে দুর্বল। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা যায় না; গ্রন্থাগার সম্প্রসারিত হয় না; মলিনতা দূর করা যায় না। পরিষদের সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ ঐতিহ্যময় প্রাচীনতা। অর্থাভাবে আলোকিত হয়ে ওঠা যায় না। প্রসঙ্গত বলি, পরিষদের উন্নতির জন্য ধনী আমেরিকান বাঙ্গালির কাছে অর্থভিক্ষা চেয়ে জ্ঞানগর্ভ দুর্বাক্য শ্রবণের ও অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতাও

নিঃশেষে মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু, ইংল্যান্ড থেকে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার পরিষৎকে সত্তর হাজার টাকা দিয়েছেন। বিদেশস্থ গবেষক অধ্যাপক শ্রীদীপেশ চক্রবর্তী দিয়েছেন দশ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আট লক্ষ টাকা দিয়েছেন সরকারের উচ্চ-শিক্ষা-দপ্তর থেকে এই টাকা এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগ থেকে বইপত্র কেনার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ থেকে পাঁচজন পরিষৎ-কর্মীর বেতনরূপে পাওয়া গিয়েছে পাঁচ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছ'শ ঊনপঞ্চাশ টাকা। বলাই বাহুল্য, ১৪১০ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকেই সব চেয়ে বেশি টাকা পাওয়া গিয়েছে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ সমস্ত দাতাদের গুণ গাই, আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদক-প্রদত্ত ১৪১০-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে এই কথা আছে যে, মননীয় সাংসদ ও প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রীমৃণাল সেনের সাংসদ তহবিল থেকে পঞ্চান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। টাকা এখনও আসেনি; তবে এ বিষয়ে নিয়মানুসারে সমস্ত কর্মই ইতোমধ্যে নিষ্পন্ন হয়েছে। এ-টাকা কবে যে পরিষৎ পাবেন, সুনিশ্চিতভাবে তা আমি এখন বলতে পারছি না। বামনের মতো ফললাভের আশায় উদ্বাহ হয়ে থাকাই হয়তো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ললাটলিখন।

প্রকাশনার সঙ্গে আয়ের সম্পর্ক নিবিড়। এখন প্রকাশনার ও পুস্তক-বিক্রয়ের বিবরণ দিচ্ছি। তা এইরূপ, যথা :

প্রকাশিত হয়েছে,

‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’-১৫০ : শ্রী বন্দীরাম চক্রবর্তী-রচিত ‘কবি জসীমউদ্দীন’ (কার্তিক, ১৪১০)

‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’-১৫১ : শ্রী নির্মলকুমার নাগ-রচিত ‘হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’

(মাঘ, ১৪১০)

‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’-১৫২ : শ্রীমতী ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়-রচিত ‘গিরিশচন্দ্র ঘোষ’ (মাঘ, ১৪১০)

ত্রৈমাসিক ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ বিবিধ গুণসম্পন্ন হয়ে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য, সম্পাদক শ্রীপ্রভাতকুমার দাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে পরিশ্রম করেছেন, তার জন্য তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ দিই।

১৪১০-এ বই বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছ'শ ত্রিযাত্রার টাকা।

কলকাতা বইমেলায় বই বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ তেবট্টি হাজার সাতশ' সাত টাকা। কিন্তু, বইমেলায় জন্য ব্যয় হয়েছে একত্রিশ হাজার চারশ' ঊনত্রিশ টাকা। এই সংখ্যা

বিস্ময়গ করে বইমেলায় লাভ হয়েছে বত্রিশ হাজার দুশ আটাত্তর টাকা।

এখন আলোচনার বিষয় গ্রন্থাগার ও পাঠক-পরিষেবা। পাঠকক্ষের আয়তন ক্ষুদ্র। লেনদেন বিভাগের আয়তন ক্ষুদ্র। বইপত্র বাখার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। যে ঘরে পত্র-পত্রিকা আছে, তাকে একটি গহ্বর বললে অত্যুক্তি হয় না। পরিষদের অর্থাভাব; তাই গ্রন্থাগারের কর্মী-সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তবুও আশাব্যঞ্জক তথ্যাদি এইরূপ, যথা :

১৪১০-এর ৩১ চৈত্র তারিখে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ:

আজীবন সদস্য ৬২৫ জন, সাধারণ সদস্য ৩৩৪ জন, বিশিষ্ট সদস্য ৮ জন এবং মফস্বল সদস্য ৫ জন; মোট ৯৮৩ জন।

এ ছাড়া, ১৪১০-এ পরিষদের সাধারণ সদস্য হয়েছেন ২৫৪ জন এবং আজীবন সদস্য হয়েছেন ৬৪ জন।

পরিষৎ খোলা ছিল ২৭১ দিন। আরও বেশি দিন খোলা থাকলে ক্ষতি হত।

এজন্য কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

পাঠকক্ষে পড়াশোনা করেছেন ৫৪৩৮ জন ব্যক্তি। সংখ্যাটি অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন। সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ৭.৫.১৪১০-এ, ৩৭ জন পাঠকের। ১৯.১.১৪১০-এ লেনদেন-বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ৯ জন পাঠকের।

৫০০ বাংলা বই, ৩২০-টি পত্র-পত্রিকা, অন্যান্য ৮০-টি বই পঞ্জীকৃত হয়েছে। বাঁধাই হয়েছে ২৩৮-টি বই। এসব সংখ্যা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

অত্যন্ত জীর্ণ, মৃতপ্রায়, অব্যবহার্য বইপত্রের সংখ্যা অনেক। এই সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বই রাখার ঘর আর্দ্র, কীটাদুষ্মিত, ধূলিকণায় পূর্ণ। এই অবস্থায় আনুমানিক দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বইপত্র, এবং পাঁচ হাজার পুঁথিপত্রকে বাঁচিয়ে রাখা একটা বড় সমস্যা। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জীর্ণতার দূরীকরণ, মৃতপ্রায় গ্রন্থাদির ও পত্রপত্রিকার নবরূপে, বা কম্প্যাক্ট ডিস্ক-রূপে পুনরুজ্জীবন, অর্থাভাবে সুদূরপর্যায়ত।

একজন সহায় দাতা একটি কম্পুটার দিয়েছিলেন। আমি সম্পাদক হয়ে দেখি যে এই গণকযন্ত্র নানা কারণে গণনার বাইরে চলে গিয়েছে। এখন সেটির পুনরুজ্জীবনই সমস্যাসঙ্কুল। এ বিষয়ে চেষ্টা চলছে।

সি.ডি. করবার জন্য যদিও বা 'কম্পুটার' কেনা যায়, তবুও তা চালু রাখার জন্য কুশলী কর্মী নিয়োগ করতে হবে। টাকা না পাওয়া গেলে এসব হবে না।

উপহার স্বরূপ-প্রাপ্ত বইপত্রের মূল্য সব নিয়ে আটচল্লিশ হাজার পঁচাত্তর ত্রিশ টাকা।

দু'হাজার সংস্কৃত বইয়ের 'লেবেলিং' করা হয়েছে।

পাঠকক্ষ ও লেনদেন-বিষয়ক তথ্য নিচে সাজিয়ে দিচ্ছি।

বিষয়	লেনদেন	পাঠকক্ষে পঠিত
দর্শন	২	৪২
ধর্ম	১৬	২৯৬
সমাজ	৫	২২৫
শিক্ষা	৯	৫৮
ভাষা	৯	১৩৭
বিজ্ঞান	১	২৬
ফলিত বিজ্ঞান	৩	৪০
শিল্পকলা	০	৪৪
সঙ্গীত	২	১৪৬
সাহিত্য	৪৩০	৩৯০৪
ভূগোল	৫	১০৫
জীবনী	৮৬	১০৯৭
ইতিহাস	২৮	৫৮৮
সহায়ক গ্রন্থ	১১	৩৫৩
পত্রপত্রিকা	০	৫৪৮৭
হিন্দী, ইংরেজি, সংস্কৃত	২	৩৬৫

৬০৯

১২৯১৩

সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এইসব তথ্য দিয়েছেন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অরুণা পাধ্যায়। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। পুথিশালা থেকে এই তথ্য পাচ্ছি যে, মোট জন পাঠক পুথি পড়েছেন। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের গ্রন্থাগার সব গুরুত্বসম্পন্ন। গ্রন্থাগারই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণাধার। পাঠাগারে বিশেষভাবে বৈদ্যবিদ্যাচর্চা অব্যাহত, এবং ক্রমবর্ধমান। যাকে ‘ভূমা’ বলা হয়েছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আজও তা দীপ্তিমান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রন্থাগার থেকে দুষ্প্রাপ্য বই, পুথি এবং পত্রপত্রিকা বাইরে নিয়ে গওয়ার নিয়ম নেই। জীর্ণগ্রন্থের ও পত্রপত্রিকার ব্যবহারও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়মিতভাবে গিটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হলেও, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ‘রৌপ্য মৎস্য’-নামক কীটের রিক্রাজন দূর্বীর। আধুনিক অগ্নি-নির্বাপক-ব্যবস্থা যা আছে, তা বলার মতো নয়। এজন্য চিত্ত বর্জ্য শঙ্কাগ্রস্ত। সমগ্র ভবনের আধুনিকীকরণেই এইসব সমস্যার সমাধান সম্ভাব্য।

একটা দুঃখের কথা বলি। বড় চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর একমাত্র পুথিটি সংরক্ষিত

হয়ে আছে; কিন্তু একটি প্রাচীন ও দুর্মূল্য হস্তলিখিত প্রতিবেদন ১৪১০ সাল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কী পুস্তকরাশির মধ্যে লুকিয়ে আছেন, না কী চৌর্যবৃত্তির শিকার হয়েছেন, তা বলা যাচ্ছে না। সঘনে তদন্ত চলছে। হয়তো প্রকৃত সদ্য উদ্ঘাটিত হবে শী

১৪১০-এ বইপত্র কেনার জন্য মাত্র আটান্ন হাজার আটষষ্ঠি টাকা ব্যয় হয়েছে।

টাকার অঙ্ক সামান্যই; তবে পুস্তকাদি ক্রয়ের ধারা যে অব্যাহত, তা বলা যায়।

আগেই বলেছি, গ্রন্থাগারে আনুমানিক আড়াই লক্ষ বইপত্র আছে; আছে, আনুন্ন পাঁচ হাজার পুঁথি। এই সংখ্যাটা কমবেশি হতে পারে। ১৯৭৬-এ 'স্টক টেকিং' হয়ো, এখন স্টক টেকিং করতে হলে, প্রতিটি বইয়ের জন্য এক টাকা এবং আনুষঙ্গিক অন্, কাজের জন্য টাকা, সব নিয়ে, আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। দেখি, এই কোথায় পাওয়া যায়।

তবে, সুখের কথা, ১৪১০ সালে, যথাসাধ্য, পরিষৎ ভবনের সংস্কার করা হতে আভাস্তর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার সাধিত হয়েছে। অগ্নিভয় নিবারণার্থে এই সং প্রয়োজনীয় ছিল। প্রকাশিত পুস্তক সংরক্ষণ ও সর্জনা করে রাখার জন্য যে ঘর আছে, সংস্কার সাধন করা হয়েছে; 'পি. ভি. সি.'-জলাধার, এবং সুনির্মল জলের জন্য 'একম' স্থাপিত হয়েছে; 'জেনারেটর' এবং 'জেনারেটর-ঘর' সুসংস্কৃত হয়েছে। বলাই ব আধুনিকীকরণার্থে এসব সংস্কার, অর্থাভাবে, অবস্থা অনুসারে যথাসম্ভব ব্যবস্থা-গ্রহণ ম।

এইসব তথ্য দিয়েছেন পরিষদের প্রধান কর্মী ও হিসাব রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মাস্তি। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে অনুষ্ঠানাদির যে বিবরণ প্রস্তুত করেছি তা একটু পরেই বলব। তার আগে এই তথ্য উল্লেখ্য যে, একবার সম্পাদকের ঘরে হিঁ গোদরেজের সিঙ্ক খোলার সময়ে পরিষদের ন্যাসরক্ষকগণ সমবেত হয়েছিলেন। তখন যান্ত্রিক জটিলতার জন্য সিঙ্ককাটি খোলা যায়নি। কিছুকাল আগে সে ক্রটি দূরীভূত হয়েছে।

বৈদ্যুতিক সংস্কার সাধনের জন্য এবং অন্যান্য কর্মের জন্য, প্রত্নবস্তুসমূহ তিন তলা ঘরে রাখা হয়েছিল। এখনও সেখানে গেলে দেখা যায়, অপরূপ সুন্দর মূর্তি লীলাময় মূর্তি একটু হেসে যেন আমাদের অভয় দিচ্ছেন। দেয়ালে দেয়ালে মহাপ্রাণ বাঙ্গালিদের ছবি তাঁরা আমাদের মতো অকৃতীদেরও যেন আশীর্বাদ করছেন। যেন তাঁদের ইচ্ছাতেই কিছুটা আগে জাদুঘরের, পুঁথিঘরের ও চিত্রাবলির সংরক্ষণের জন্য সদাশয় ভারত-সরকার পরিষদ দেয় বোল লক্ষ টাকার অনুদান মঞ্জুর করেছেন।

অন্যদিকে আমাদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী এবং সম্ভবত পরিষদের প্রবীণতম সদস্য শ্রীকানাইচন্দ্র পাল পরিষদের 'রেজিস্ট্রেশন' - এর পুনর্নির্ধারণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা শ্রীকানাইচন্দ্র পালের শারীরিক অসুস্থতার জন্য ব্যাহত হয়েছে একাজ শীঘ্রই আবার শুরু হবে। আমরা শ্রীকানাইচন্দ্র পালের দ্রুত আরোগ্য কামনা

অনুষ্ঠানাদির বিবরণ দিচ্ছি। তা এইরূপ, যথা :

- ১৪১০ সাল
- ৩ আষাঢ় প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে
অনুষ্ঠিত সভা। সভাপতি, শ্রীপবিত্র সরকার। বক্তা, শ্রীঅজিতকুমার
ঘোষ, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ
মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীকল্যাণকুমার রায়। শ্রোতা সংখ্যা-৮৭।
- ২৭ আষাঢ় আলোচনা। বিষয়, 'কলকাতার ঠাকুরদালান'। আলোচক, ডাক্তার
দেবাশিস বসু। সভাপতি, শ্রীপবিত্র সরকার। স্বাগত ভাষণ,
শ্রীকল্যাণকুমার রায়। শ্রোতা সংখ্যা - ১৬০। বহু ঠাকুরদালানের ছবি
দেখানো হয়।
- ২৫ জুলাই পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস - উদ্‌যাপন। সভাপতি, শ্রীপবিত্র সরকার।
২০০৩ অতিথি, মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা,
শ্রীঅশোক সেন। বক্তৃতার বিষয়, 'রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক সাম্প্রতিক
আলোচনার ধারা'। এই অনুষ্ঠানে 'পদকস্বতন্ত্র' - প্রথম খণ্ডের
আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। প্রকাশক, মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন
চক্রবর্তী। দেওয়া হল, 'অর্চনা স্মৃতি-পুরস্কার'। পেলেন শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ
বসু। 'ইলাচন্দ স্মৃতি-পুরস্কার'। পেলেন শ্রীস্বপ্নময় চক্রবর্তী।
'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-স্মৃতি-পুরস্কার'। পেলেন শ্রীমতী দেবলা
মিত্র। সঙ্গীত, শ্রীদেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। যন্ত্রসঙ্গীত, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ
শীল। শ্রোতা সংখ্যা- ১৫৮।
- ৪ আশ্বিন 'রামকমল সিংহ-স্মারক-বক্তৃতা'। বক্তা, শ্রীস্বপন বসু।
সভাপতি, শ্রীপবিত্র সরকার। বক্তৃতার বিষয়, 'উনিশ শতকের বাংলার
সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চা ও যোগেশচন্দ্র বাগল'। যোগেশচন্দ্র বাগলের
আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্তি-উপলক্ষে তাঁর বইপত্রের ও পাণ্ডুলিপির
প্রদর্শনী। স্বাগত ভাষণ, শ্রীকল্যাণকুমার রায়। শ্রোতা সংখ্যা - ৮৯।
- ২ নভেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির যৌথ-
২০০৩ উদ্যোগে কবি জসীমউদ্দীন-এর আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন।
সভাপতি, শ্রীপবিত্র সরকার। বক্তা, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এবং
শ্রীঅরুণকুমার বসু। শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী-রচিত, 'সাহিত্য-সাধক-চরিত

মালা - ১৫০; কবি জসীমউদ্দীন' নামক পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ
সঙ্গীত, শ্রীদিনেন্দ্র চৌধুরী। শ্রোতা সংখ্যা - ৮০।

৬ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা। প্রাক্তন সভাপতি ও
সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের প্রমাণে স্থগিত।

২৫ অগ্রহায়ণ প্রয়াত অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের স্মরণে সভা। সভাপতি,
শ্রীপবিত্র সরকার। বক্তা, শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য, শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী,
শ্রীগৌতম নিয়োগী, শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। সঙ্গীত, শ্রীদেবজিত
বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রোতা সংখ্যা - ৫০।

২৭ অগ্রহায়ণ ৬ অগ্রহায়ণে স্থগিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সাধারণ
সভা। সভাপতি, শ্রীপবিত্র সরকার। সর্বসম্মতিক্রমে কর্মাধ্যক্ষদের
নির্বাচন। কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা।
সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায়ের প্রতিবেদন পাঠ। আয়ব্যয় সংক্রান্ত
বিবৃতি দান। শ্রোতা সংখ্যা - ৫৯।

১৪ মার্চ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কবি জসীমউদ্দীন-জন্মশত উদ্‌যাপন-
২০০৪ সমিতির যৌথ প্রয়াসেবক্তৃতার অনুষ্ঠান। সভাপতি, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
বক্তা, শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। বক্তৃতার বিষয়, 'মানুষ জসীমউদ্দীন'।
শ্রোতা সংখ্যা - ৮২।

২৭-২৮ মার্চ 'দুই শতকের বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র' - বিষয়ক আলোচনা
২০০৪ এবং প্রদর্শনী। ২৭ মার্চ, সভাপতি শ্রীপবিত্র সরকার। বক্তা, শ্রী
ধর এবং শ্রীঅলোক রায়। ২৮ মার্চ, সভাপতি : শ্রীনিরেন্দ্রনাথ
চক্রবর্তী। বক্তা, শ্রীসন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীস্বপন বসু। দুই
শতকের বাংলা পত্রপত্রিকার চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী। দুই দিনে শ্রোতা
ও দর্শকের সংখ্যা - ২০১।

আমার কথা শেষ করার আগে ধন্যবাদজ্ঞাপন আবশ্যিক কৃত্য। ১৪১০ সালের
অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত সম্পাদকরূপে কাজ করেছি। সে - কাজ, সভাপতি
শ্রীপবিত্র সরকারের, কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅশোক রায়চৌধুরীর, সহসম্পাদক শ্রীমতী মঞ্জু

পাধ্যায়েব, সহসম্পাদক শ্রীঅলোক দাসের এবং কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যদের স্বপূর্ণ সমর্থন ছাড়া কবতে পারতাম না। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা একটা অনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। মতবিরোধও যে এতো ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, তা আমার জানা ছিল। তাঁরা আমার বিবিধ অনুপপত্তি এবং অযোগ্যতা ক্ষমা করেছেন, আমাকে উদ্বেষিত করেননি। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ জানাই সাহিত্য পরিষদের সহিষ্ণু কর্মীদের, যাঁদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ধনের জন্য আমি বোধ হয় কিছুই করতে পারিনি। আমি কখন কখন অসন্তোষ প্রকাশ করলেও, তাঁরা অসন্তুষ্ট হননি, এবং আমার সঙ্গে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন।

ধন্যবাদ জানাই দর্শনীয়ভাবে সক্রিয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঠক সমাজকে, যার ন্যাগণ অধ্যাপক স্বপন বসু, ড. নির্মলকুমার নাগ, এবং শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর সুদক্ষ পরিচালনায়, শুভ রচনাশ্রম কর্মে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। যে অনুষ্ঠানের বিবরণ দিলাম, পাঠক সমাজের উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছাড়া সে সব অনুষ্ঠান স্রাণ হয়ে যেত।

মনে হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুদিন আসবে। সুদিন আসছে। এই শেষ কথা লিখি, আপনাদের ধৈর্যের প্রশংসা করে, সবাইকে সন্নিয় সশ্রদ্ধ অভিবাঙ্গ জানিয়ে, প্রতিবেদন শেষ করি।

রমাকান্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক।